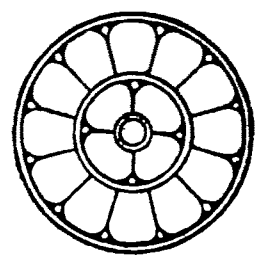
CUK-HO5287-4-P86161

প্রবুদ্ধ

অতীতে মানুষ যা করেছে চিরকাল তারই পুনরাবৃত্তি করে চলা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ হল অভিনব সিদ্ধি, অচিন্ত্যপূর্ব ঈপ্সিতা সব অর্জন করা।

—শ্রীঅরবিন্দ





সম্পাদকীয় উপদেষ্টা :

শ্রী লক্ষ্মী কান্ত ঠাকুর

বিংশতি বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩

পূর্বাচল

P 36,161

পঞ্চবিংশতি বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৮৩

সূচী—

শ্রীঅরবিন্দ

সাবিত্রী ৮১

'সাবিত্রী' সম্বন্ধে পত্রাবলী ৮৫

ভবিষ্যতের কবিতা ৭৫

শ্রীমা

মায়ের ঘরোয়া কথা ৬৯

যোগ-জীবন ৭২

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আদি লেখা ৬৫

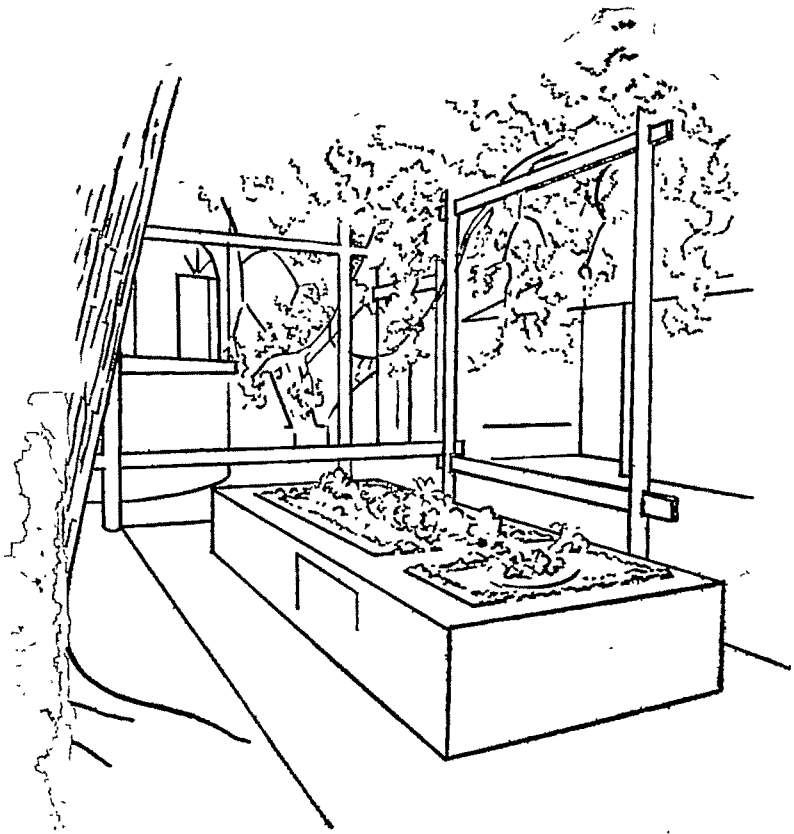
একটি অসমাপ্ত পত্র ৭৪

অমলেশ ভট্টাচার্য

অচিন পথের পাগল (কবিতা) ৮৯

হিমাংশু নিয়োগী

শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহাবশেষ সংস্থাপনা উৎসবে ৯১



সম্পাদক : **অমলেশ ভট্টাচার্য**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **নিখিলকান্ত গুপ্ত**

সম্পাদকীয় কার্যালয় : শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮ শেক্সপীয়ার সরণী, কলিকাতা-১৬
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং 'পূর্বাচল' কার্যালয়, ৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
ফোন : ৩৪-১৩৫১

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক সডাক : দশ টাকা

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

আদি লেখা

বর্তমানের সমস্যা

['নারায়ণ,' ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৭]

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

এ-যুগটি ওলট-পালটের যুগ। এ ওলট-পালট যে কান বাহিরের জগতে স্থূল বিষয়ে চলিয়াছে তা নয়। বন্দুক কামান লইয়া গায়ের জোরে যে ঠেলাঠেলি মারামারি দাঙ্গা করা চলিয়াছে তা তো সকলেই স্পষ্ট চোখের সামনে দেখিতেছেন। কিন্তু মানুষের অন্তরে তার স্বভাবে তার সংস্কারে যে ভাঙন উঠিয়াছে সেইটাই আসল জিনিস, আর সেইটার দিকেই সর্ব-সাধারণের নজর আমরা ভাল করিয়া ফিরাইতে চাই। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া যেসব জিনিস বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যাদের সম্বন্ধে মনে করিয়াছি .তাহারা সনাতন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ, ঠিক সেই সব জিনিসই কেমন টলমল করিয়া উঠিয়াছে সে খবরটাই আজকালকার দিনের প্রধান খবর। সমাজের মানুষের একেবারে গোড়া ধরিয়াই টানাটানি পড়িয়াছে, বাহিরের এই চারিটা ভাসা ভাসা জিনিস যে ধ্বসিয়া ছিটাইয়া পড়িবে তাতে কোন আশ্চর্যই নাই। এখনকার দিনে কোন জিনিসকে, তা মানুষ যতই আপনার বলিয়া বোধ করুক না কেন, তাহা ছাড়িতে মানুষের প্রাণে যতই কষ্ট হউক না কেন, কোন জিনিসকেই তেমন অটুট নিত্য-সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। অতি প্রিয়তম জিনিসের উপরেও বিচারের তীক্ষ্ণ আলোক ফেলিতে হইবে, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে হইবে তাহার শক্তি কতখানি সত্য কতখানি। নতুবা প্রাণে সাড়া দেয় না এই জন্য চোখ বুজিয়া পুরাতন পরিচিতকে আঁকড়িয়া যে ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে বিপদের হাত সে এড়াইতে পারিবে না। কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় সীতাদেবীকেও উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এছাড়া আর উপায় নাই।

সভ্য সমাজের অতি পুরাতন ও অতি শ্লাঘ্য একটা সংস্কার হইতেছে বিবাহ। ইউরোপে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠিয়াছে বিবাহ কি এতই প্রয়োজনীয় বরণীয় জিনিস? এটি ছাড়া মানুষের সভ্যতা, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা কি

একেবারেই পচিয়া যায়? এ-প্রশ্নে শুধু শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না। সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, অবিচলিত চিত্তে আলোচনা করিয়া নির্ভয়ে মীমাংসা করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এ-সমস্যার তরঙ্গ এখনও আসে নাই। এখানে তরুণদলে দেখা দিয়াছে এই তরঙ্গেরই অব্যবহিতপূর্ব তরঙ্গটি। বিবাহকে বাদ দিলেও চলে কি না তাহা নয়, প্রশ্ন হইতেছে স্বাধীন ইচ্ছায় বিবাহ; ভালবাসার পরে বিবাহ আত্মীয়স্বজনের দেওয়া বিবাহ অপেক্ষা ভাল কি না। পুরাতনের দিক হইতে বলা হইয়া থাকে যুবক যুবতীর প্রেমের বিবাহ বাস্তবিক পক্ষে হইতেছে কামের বিবাহ, স্বাধীন ইচ্ছার বিবাহ হইতেছে স্বেচ্ছাচারের বিবাহ। অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান গুরুজনেরা চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া, স্বভাব-চরিত্র রূপগুণ সব যথাযথ ওজন করিয়া যে পাত্র ও পাত্রীর মিল করাইয়া দেন তাহাই হইতে পারে,—অন্ততঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাহারই হইবার সম্ভাবনা আছে—আদর্শ মিল রাজযোটক। ভালবাসার নামে স্বাধীনভাবে যে মিল সেটা ক্ষণিকের মোহ, দুই দিনেই কাটিয়া যায়, পরে আরম্ভ হয় ঘোরতর অমিল। ইউরোপে যেমন দাম্পত্য কলহ, বিবাহলঙ্ঘন (divorce) দেখা যায় ভারতে কি তেমন আছে? নূতনের দল বলিবেন, স্বাধীনভাবে যাহা করা যায় তাহারই একটা মূল্য আছে; হউক না কাম, হউক না ক্ষণিকের মোহ কিন্তু সেটা আমার স্বাধীনতার সৃষ্টি। পরাধীনভাবে অন্ধভাবে ঠিক পথে চলা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে ভুল পথে চলাও অনেক ভাল; কারণ এখানে আছে অন্তরাত্মার জাগরণ আর ওখানে অন্তরাত্মার মৃত্যু, এখানে জীবনের চাঞ্চল্য আর ওখানে মরণের শান্তি। তারপর নিজের পাওয়া ও দেওয়া ভালবাসাটা কাম আর পরের হাতে পাওয়া ও লওয়া জিনিসটায় কাম নাই তাই বা কে বলিতে পারে? দুইটি অজানা অচেনা জীবকে যে একসঙ্গে করিয়া দেওয়া হয়, সেখানে তো প্রথমে দুইটি শরীরকে, শরীরের স্থূলতম পর্দাকে এক সাথে করিয়া দেওয়া হইয়াছে, প্রাণের মনের মিল তো সেখানে আদর্শ মাত্র ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; পরস্পরে জানাশুনার ফলে যে দুইটি জীব এক সাথে হইতে চায় সেখানে অন্ততঃ আছে জ্ঞান-তরঙ্গের মিল, মনেরও একটা মিল। নতুবা এক সাথে হইতে তাহারা চাহিবে কেন? তারপর দাম্পত্যকলহ—সেটা আমাদের পরিবারে কি এতই দুর্লভ জিনিস ইউরোপে সেটা না হয় ফুটিয়া ফাটিয়া বাহির হইতে কিন্তু আমাদের সমাজে সেটা বাহির হইবার পথ না পা ভিতরে ভিতরে খাইয়া চলিয়াছে, তাহা কি কাহারো পড়ে নাই?

আমাদের দেশে বিবাহটা ব্যক্তিগত জিনিস এটি সমাজগত জিনিস। অর্থাৎ আমি বিবাহ আমার জন্য নয়, কিন্তু আমার পরিবারের জন্য, আ আত্মীয় স্বজনের জন্য, সমাজের জন্য। এই জ হইয়াছে বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা। বয়সের সাথে সা মানুষের স্বাতন্ত্র্যটা বাড়িয়া যায়; তাই আমাদের ম স্বাধীন মত স্বাধীন ইচ্ছা ফুটিবার আগেই পুরুষ ও মেয়ে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, পরিবারের সমাজের ঢালা স্রোতের ম পড়িয়া যাহাতে তাদের ধার সব মরিয়া যায়, পৃথক অ আর না থাকে, পরিবারের সমাজের তাহারা একেব অঙ্গীভূত হইয়া যায়। পুরুষের পক্ষে স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ যাহ বা সম্ভব মেয়ের পক্ষে তাহাও সম্ভব নয়। জ্ঞান হইব আগেই মেয়েকে পাত্রস্থ করিতে হয়,শ্বশুরঘরে তাহাকে গড়ি পিটিয়া তৈয়ার করিয়া লইবার জন্য। বড় হইলে স্বাত জন্মে, স্বাতন্ত্র্য জন্মিলে ইচ্ছামত আর গড়া-পেটা চলে না নিজের নিজের ইচ্ছায় যদি প্রত্যেকে চলে তবে যে যা খু তাই করিতে পারে, ইহাতে আসে সমাজে বিশৃঙ্খলত সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা সুব্যবস্থা রাখিবার জন্য সমাজই আম হইয়া আমার জীবনের সাথীটিকে পছন্দ করিয়া দে কন্যাপক্ষ বরের দেখেন বিদ্যাধন, বরপক্ষ কন্যার দেখেন গুণ—কিন্তু কুলশীল স্বভাব চরিত্র এ-সকলের সাথে হৃদয়ে অন্তরাত্মার মিলের সম্বন্ধ কি? ব্যক্তির নিজের প্রের সমাজের সুবিধার কাছে না হয় সমাজের মঙ্গলের কাছে হইল, তাই-বা বলি দিবে, এ কোন কথা? সমাজ বড় ব্যক্তি বড়? ব্যক্তিকে খর্ব করিয়াই কি সমাজের শ্রীবৃদ্ধি উভয়ের সামঞ্জস্য নাই? ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ, ব্যষ্টির দা কি, দায়িত্ব কি আর সমষ্টিরই-বা দাবি কি, দায়িত্ব কি—ে গোড়ার তত্ত্ব লইয়া গোলমাল, ইহাও আজকালকার যু একটা মস্ত সমস্যা। আমরা তত্ত্বের মধ্যে যাইব না ত প্রকারান্তরে এক রকম ইহারই একটা উদাহরণের ক বলিব। কথাটা সমাজে পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ।

আজকালকার সমাজ পুরুষের সমাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজে নারীর স্বাধীন স্বতন্ত্র স্থান নাই, তাহার ধর্ম কর্ম সমস্তই পুরুষের সেবায়, পুরুষের সুখ সুবিধা-উপকারের জন্য নির্দিষ্ট নিয়োজিত। সমাজে স্বাধীন সজীব জীব যদি কেউ থাকে তবে সে পুরুষ, নারী যেন পুরুষের জড় ধনসম্পত্তির অন্তর্গত। ব্যবস্থাই আছে, বাল্যকালে মেয়েরা পিতার জিনিস, যৌবনকালে পতির জিনিস আর বৃদ্ধকালে পুত্রের জিনিস। অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্যা, পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম। পাশ্চাত্যের দার্শনিকপ্রবর দেকার্ত (Descartes) ইতর জীবদের অন্তরাত্মা (soul) আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না; আমাদের মনে হয় স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধেও আমাদের সমাজ ব্যবস্থাপকদের যেন সেই মতই ছিল। মেয়েদের শিক্ষার যে কোনই বন্দোবস্ত ছিল না বা তাহাদিগকে কেবলই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হইত এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। কিন্তু সে-সব যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় তা যেন অনেকটা দয়ার দান; মেয়েদের নিজেদের দাবির জোরে নয়। উত্তরে বলা যাইতে পারে মেয়েরা যে স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয় তার কারণ তাদের স্বভাব। নারীর স্বভাবই হইতেছে পুরুষের আশ্রয়ে পুরুষকে ধরিয়া চলা, তাহারা হইতেছে অবলা জাতি (weaker sex) কাহাকেও না ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। আর তাদের স্বভাবের মধ্যে অনেক খারাপ জিনিস আছে, পুরুষ যদি তার রাশ টানিয়া না ধরে তবে সহজেই বিগড়াইয়া যায়। দ্বিতীয় কথা, স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য হইলেও নারীকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিত নয় সমাজের কল্যাণকল্পে। কারণ মেয়েরা হইতেছে ঘরে লক্ষ্মী, তাদেকে কেন্দ্র করিয়া পরিবারের সমাজের দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। মূলে, ঘরে কেন্দ্রে যদি স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয় মেয়েরা যদি স্বৈরচারিণী হয় তবে পরিবার বলিয়া কিছু থাকে না, সমাজ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। পুরুষের পক্ষে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য স্বেচ্ছাচার এমন কি উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক সহ্য করা যায়—তাতে সমাজের বিশেষ কিছু আসে যায় না—পুরুষের কারবার যে বাহিরের জগৎ লইয়া; কিন্তু মেয়েদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিলে যে সমাজের ভিতরে প্রাণের মধ্যে মিলন গ্রন্থিতে একেবারে ঘুণ ধরিতে আরম্ভ করে। এখন প্রশ্ন, মেয়েরা যে স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয় বা হইতে পারে নাই সেটা বাস্তবিক পক্ষে তার জন্মগত স্বভাবের দোষের ফল না শুধু সংস্কারের অভ্যাসের ফল? একটা বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়া একটা বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার ফলে নারীর স্বভাব স্বধর্ম এই রকম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এইটিই তার সনাতন ধর্ম—এষ ধর্মঃ সনাতনঃ—তাই কে বলিতে পারে? অন্য রকম ব্যবস্থা অন্য রকম শিক্ষাদীক্ষার ফলে নারীর ধর্ম কর্ম অন্য রকমও হইতে পারে না? আর তা যদি সম্ভব হয় তবে নারীর স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্য দিয়াই সমাজ বা পরিবার আর এক রকম ব্যবস্থায় সুব্যবস্থাতেই গড়িয়া উঠিতে পারে না? কিন্তু বাস্তবিক যদি ফলে কোন সুব্যবস্থা না-ই হয়, তবুও জিজ্ঞাসা করা যায় সমাজের কি অধিকার আছে যে একটা বিশেষ অঙ্গের উপর সে অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে? পাছে উচ্ছৃঙ্খল হয় বলিয়া স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যটুকু হইতে নারী বর্জিত হইবে কেন? সমাজের মধ্যে আছি বলিয়া নারী হইয়াছি বলিয়া কি নিজের ইচ্ছা জিনিসটিকে সমূলে নির্মূল করিতে হইবে? সমাজের একটি অঙ্গকে এই রকম নির্বীর্য মরণাহত করিয়া রাখিলে সমাজ সুশৃঙ্খলা পাইতে পার শান্তি পাইতে পার কিন্তু জীবন পুষ্টি বৃদ্ধি পাইবে?

এখানে কথা উঠিবে, নারীকে তবে দাও সেই রকম শিক্ষা, সেই রকম দীক্ষা—শুধু স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য বলিয়া চীৎকার করিলে হইবে না আর সেই জন্যই প্রাচীন ব্যবস্থা-কারও বলিয়া গিয়াছেন পুত্রের মত কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে। নূতন আর আমরা কি বলিলাম? নূতন জিনিস এই প্রাচীন শিক্ষা মেয়েদের দাসত্ব জিনিসটাকেই ভাল করিয়া সুচারুরূপে করিতে শিখাইত, কেবল এই দাসত্বকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করা হইত বড় বড় কথা দিয়া যথা সেবা আত্মোৎসর্গ বিনয় লজ্জা। কিন্তু নূতন শিক্ষার লক্ষ্যই হইবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা নিজেকে জানা স্বাধীনভাবে নিজের ভিতরের ভগবানকে ফুটিয়া উঠিতে দেওয়া। শিক্ষা আগে পরে স্বাধীনতা, একথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য হইতেছে আগে স্বাধীনতা পরে শিক্ষা। স্বাধীনতার ভিতর দিয়া জীবন্ত শিক্ষা ফুটিয়া উঠে।

কিন্তু অপরপক্ষ বলিতে পারে নারীর অবস্থা যে সমাজে এ রকম হইয়াছে, সে যে স্থান পাইয়াছে, যে ধর্মকর্ম অনুসরণ করিতেছে এটা কি শুধু বাহির হইতে আরোপ শুধুই পুরুষের কারসাজি? সমাজ যুক্তি করিয়া কোন্ দিন এ

রকম অত্যাচার আরম্ভ করিল? বলা যায় না কি নারীর এ রকম ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অনুমতি ছিল, কেবল অনুমতি নয় এইটির মধ্যেই ছিল তার স্বভাবের আনন্দ নতুবা এরকম ব্যবস্থা আদৌ উৎপন্ন হইল কেমন করিয়া দেশে দেশে যুগে যুগে ঠিক এই একই ব্যবস্থা এ যাবৎ চলিয়া আসিল কেমন করিয়া? একটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে শুধু মায়া শুধু মিথ্যা শুধু জুয়াচুরির উপরই এত বড় জিনিসটা গড়িয়া উঠিয়াছে? পুরুষ যেমন স্বাধীন স্বতন্ত্র হইতে চায়, আপনার ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে ব্যগ্র নারীও কি ঠিক তেমনি চায়? এ চাওয়াটা যদি নারীর সত্য হইত তবে তাহা কি সমাজে, সমাজের ব্যবস্থায় ফুটিয়া উঠিত না? সমাজটা পুরুষের সমাজ হইল কেন? নারী পুরুষের ছায়া হইয়া থাকিতেই চায়, অধীন হওয়াটাই নারীর স্বাধীন ইচ্ছা এই জন্যই কি নয়?

আমাদের মনে হয় আসল সত্যটা এই রকমের। প্রাচীন কালে এক সময়ে সমাজের গতি অনুসারে একটা আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল—যুগধর্মের বশে পুরুষ ও নারী উভয়েই এক একটা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন সার্থকতা পাইয়াছিল, সমাজকে একটা বিশেষ বিধি ব্যবস্থা দিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। সীতা সাবিত্রীর যুগে নারী আপন ব্যক্তিত্বকে স্বেচ্ছায় পুরুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিল, তাহার অন্তরাত্মা আপনাকে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া পুরুষের আন্তরাত্মাকেই উপচিত করিয়া চলিত। নারী ছিল দাতা পুরুষ ছিল গ্রহীতা। পুরুষ ছাড়া আপনার ভিন্ন অস্তিত্ব নারী উপলব্ধি করে নাই, করিতে চাহে নাই, তার কোন প্রয়োজনও অনুভব করে নাই। সেইটাই সেই যুগের ছিল ধর্ম। কেন এই রকম ধর্ম হইল, সমাজের বিবর্তনের কি রকম স্তরে অথবা মানবাত্মার কোন্ প্রেরণাকে কোন্ সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য সে কূট সমস্যা আমরা আলোচনা করিব না। শুধু বলিব, তখনকার দিনে পুরুষের ও নারীর সম্বন্ধ ছিল তাহাদেরই ভিতরের একটা জীবন্ত আদর্শ, একটা সত্য ধর্মের ফল; সমাজের ব্যবস্থাও দিল সেইটিকে ফলাইয়া ধরিবার জন্য সজীব কাঠাম। পরে কিন্তু সে আদর্শ সে ধর্ম লোপ পাইতে লাগিল, সমাজের ব্যবস্থাটা কিন্তু তেমনি অটুট রহিল; শুধু তাই নয়, অন্তর্মান আদর্শটিকে ধর্মটিকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সে ব্যবস্থাকে আরও বিশদ করিয়া খুঁটিনাটিতে ভরিয়া কঠোর করিয়া তোলা হইতে লাগিল। প্রথমে যে সম্বন্ধটা ছিল সহজ ও আনন্দপূর্ণ পরে তাহা হইল শুধু অভ্যাসের কর্তব্যের। প্রথমে নারী যে জিনিসটা দিত স্বেচ্ছায়, সানন্দে, পুরুষও লইত পূজার দান রূপে, পরে পুরুষ লইতে আরম্ভ করিল দাবিরূপে, নারীও দিতে আরম্ভ করিল অজ্ঞানের সংস্কারের বশে। কেন এ রকম হইল সে প্রশ্ন তুলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু এ জিনিসটি যে স্বাস্থ্যকর নয়, পুরুষ ও নারীর জন্য, সমাজের জন্য যে ইহার পরিবর্তন চাই শুধু তাই নয় আর একটা সত্য আর একটা ধর্ম আর একটা আদর্শ যে এই পুরাতন জীর্ণ কাঠাম ভাঙিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাই আমাদের বুঝিবার দেখিবার জিনিস।

সেটা হইতেছে পুরুষের ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন, সেই সঙ্গে নারীরও ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন। পুরুষের ছায়া মাত্র হইয়া নারী যে সত্যকে পরিপূর্ণ করিয়াছে, তাহা অতীতের কথা। ভবিষ্যতের কথা, নারী পাইবে আপনার কায়া, ফেলিবে আপনার ছায়া। পুরুষের সম্পর্ক ছাড়াও নারীর যে আছে একটা নিজস্ব সত্য—নাই কি?—তার পরিস্ফুরণ বর্তমান যুগের একটা প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাজকে পূরণ করিতে হইবে, পুরুষকেও সে বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। প্রাচীন ব্যবস্থা উল্টাইতে গেলে সমাজে একটা বিষম গোলমাল হইবে, ওলট-পালট ভাঙাচুরা হইয়া যাইবে, পুরুষ তার সনাতন অনেক সুখের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবে—এ সব কারণ দেখাইয়া শান্তি স্বস্তিকে চরম আদর্শ করিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না, সম্ভবপরও হইবে না।

মায়ের ঘরোয়া কথা

বুধবার, ৪.১১.৫৩

সকালে মাকে আমাদের একজন বলল, এড্‌ভকেট এস. বি. বলছেন যে সেই বইটির মূল লেখকের সঙ্গে অনুবাদকের যে রফা হয়েছিল, (যেটার খস্‌ড়া ইনিই করে দিয়েছিলেন) তাতে এমন কোন জটিল ব্যাপার নেই, যার জন্যে তাকে আবার ওভাবে চিঠি লিখতে হবে। ইনি নিজে পত্রালাপের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবেন। তবে অনুবাদক একটি কথা বলল, সে টাকা চায়। কিন্তু সোজাসুজি চায় না। চায় এমন পুস্তক প্রকাশকের মাধ্যমে, যে বন্ধুত্বের খাতিরে টাকা দেবে, ব্যবসার অঙ্গ হিসেবে দেবে না। এ সম্বন্ধেও ইনি তাকে পরামর্শ দিতে রাজী আছেন। এখন তুমি কি বল ?

মা শুনে বললেন, "না আমার মনে হয় না, এটা যুক্তি-যুক্ত হবে"।—তখন সে আর মাকে কিছুই বলতে পারল না, কারণ তিনি এগিয়ে ঘরের দিকে চলতে লাগলেন, এবং অন্য অনেকে সামনে এসে গেল।

এর ঘণ্টা দুই পরে, অর্থাৎ বারটার ব্যাল্‌কনি সেরে যখন তার সামনে উপস্থিত হলেন, তখন তার পালা আসতেই নিজে থেকে মা বললেন "Je ne comprends pas très bien, pourquoi vous voulez avoir de l'argent, une fois que vous avez dit, vous n'en voulez pas !"

অর্থাৎ "আমি তো বুঝতে পারছি না, কি করে তুমি বলছ, তুমি টাকা চাও, যখন গোড়াতেই জানিয়ে দিয়েছ যে তুমি টাকা নেবে না ?"

উত্তরে সে বলল, "overhead expense বলে একটা কথা আছে। (কথাটা সে নতুন শিখেছে) তার মানে তো আনুসঙ্গিক খরচটা মানুষ নেবে।"

মা বললেন, "C'est le premier pas de déshonnêtté....C'èst l'èsprit de l'âge" "ও হল অসাধুতার পথে প্রথম পদবিক্ষেপ আর ওটাই হল এখনকার যুগের মনোভাব।"

উত্তরে সে বেচারা বলল, "বেশ, আমি তাহলে আর ও সব কথা তুলব না।"

* * *

সকাল বেলা মায়ের ওখান থেকে শিশুদের বিদায় দেবার সময়, মা জিজ্ঞাসা করলেন, "Beaucoup de questions ? Qui a une question ?" "আজ সন্ধ্যায় ক্লাসের জন্য তোমরা অনেক প্রশ্ন তৈরী করে রেখেছ তো ? আজকের বিষয়টা কি ?"

শিশুরা বলল, "La Soumission et Le Sacrifice."

মা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "ওটা খুব চমৎকার বিষয়। কিন্তু ও সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আমি বলেছি। কোন বইতে যেন ছাপাও হয়েছে।"

শিশুরা বলল, *Words of the Mother*, 3rd. Series-এ আছে। কিন্তু সে বইটার এখনও সবটা ফরাসীতে অনুবাদ করা হয়নি।

মা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখনও হয়নি ? কিন্তু এই সমর্পণের অংশটাও কি হয়নি ?" (শিশুদের তা মনে নেই। তাই তারা সঠিক খবর দিতে পারল না। আমি পরে আমার খাতা খুলে দেখলাম ওটা হয়েছে। কেবল Renunciation-এর অধ্যায়টা সবে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু এ বছরের প্রথম মাসেই তা আটকা পড়ে গেছে। এখনও মা সেটাকে নতুন করে শুরু করার সময় পাচ্ছেন না।)

* * *

বৃহস্পতিবার, ৫.১১.৫৩

আজও ব্যালকনিতে আসতে মায়ের অনেক দেরী হয়ে

গেল। পৌনে-একটা হল। তথাপি কথা উঠল এবারের স্কুলের ব্যবস্থা নিয়ে।

মা পবিত্রকে বললেন নতুন ইরাণী অধ্যাপকের (সস্ত্রীক ও দুটি পুত্র কন্যা সহ) থাকার ব্যবস্থা করতে।

বললেন, "ওরা সরলভাবের মানুষ, তাই ব্যবস্থার গণ্ডগোল না হবারই কথা'। মা আরও বললেন, "অধ্যাপকের স্ত্রী পারস্য ভাষা শেখাবার ভার নেবে। ছাত্রও অবশ্য হবে।"

পবিত্র জিজ্ঞাসা করল, "সেটা বিদ্যালয়ের এলাকায় না বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় যাবে?'

মা বললেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায়।"

* * *

শুক্রবার ৬.১১.৫৩

আজ কালীপূজার দিন। মা কালো পাড়ের শাড়ী পরলেন। ব্যালকনি আজ তাড়াতাড়ি। তবু দশটা দশের আগে হল না। 'সু'—মাকে বলল সে কিছু কাজ করতে চায়।

মা খুশি হয়ে বললেন, "বেশ কথা। কি কাজ? কোথায় করবে?"

—তুমি যেখানে দেবে।

মা : তা এখন আমি বলব কি করে? তোমার কি কাজের যোগ্যতা আছে সেই বুঝে তো করবে। হয়তো কোথাও তোমায় পাঠাব, আর তারা দাবী করবে উক্ত কাজের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, ইত্যাদি সব চাই, নইলে তারা তোমায় পছন্দ করবে না।"

ঠিক সেই সময় পবিত্র মাকে বলল, "স্কুলে একজন দরকার যে ছাত্রদের পড়াশুনোর হিসেব রাখবে। কে কতটা পড়ছে, কোথা থেকে কি পড়ে এসেছে, এখন কি কি পড়ছে বা পড়বে, এই সবের খবরাখবর যথাযথ ভাবে থাকা চাই, নইলে আমাদের কাজেব বড়ই অসুবিধা হচ্ছে।

মা হেসে 'সু'-র দিকে চেয়ে তাকে আঙুল দিযে ইসারা করলেন, পবিত্রর সঙ্গে এই কাজের বিষয আলাপ করতে। এখন কথা উঠল,সে আর স্কুলে পড়াতে চায় না একেবারেই। তাই মা কারণ জিজ্ঞসা করাতে সে বলল, "আমি পড়াবার সময় মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। ছাত্র যদি বেয়াড়া হয় তা হলে আমি সহ্য করতে পারি না, কড়া হতে চেষ্টা করি, কিন্তু তার ফল ভাল হয় না। ছাত্ররা মোটেই কথা শোনে না।"

মা বললেন, "সেই জন্যে, তুমি পড়ানো ছেড়ে দিতে চাইছ কি বলে? ঠিক এটাই তো হল এক অপূর্ব সুযোগ, তোমার আত্মসংশোধনের জন্যে। তোমাকে চেষ্টা করতে হবে নিজের মধ্যে একটা নির্লিপ্ত অথচ আত্মমর্যাদার ভাব আনতে। তাহলে ছাত্ররা তোমার কাছে দুষ্টুমি করতে পারবে না। এ সুযোগ তুমি হারাবে কি করে? পড়াতে তোমাকে হবেই। খুব ধৈর্যশীল হয়ে, নিজেকে সংযত করে গাম্ভীর্য বজায় রেখে অধ্যাপনার কাজ করতে হবে। দেখবে তোমার কত উন্নতি হবে। উন্নতিব এত বড় সুযোগ, আর কি হতে পারে? কেউ যখন আমার কাছে খুব উৎসাহ করে বলে, এ কাজটা আমার ভারি ভাল লাগছে, আমি খুব খুশি এটাতে, ভারি মজার ব্যাপার এটা,—তখন আমি তাকে বলি, তোমাকে এখনও অনেক শিখতে হবে, নিজের দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করবার মন যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ কাজের উন্নতি লাভের আশা কম। কিন্তু কেউ যখন তার কাজের মধ্যে নিজের দুর্বলতাটা আবিষ্কার করতে পারে, তখন আমি তাকে খুব উৎসাহিত করি। তাই তোমার এটা খুবই ভাল লক্ষণ।" এই বলে সস্নেহে মা তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে, বার কয়েক জোরে চাঁটি মারলেন। সেও খুব খুশি হয়ে মায়ের কথা মেনে নিল।

* * *

আমার পালা আসতে আমি মাকে বললাম, আজ খানিক আগে পবিত্র স্কুলে গিয়ে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার যে কথা বলল, তা বড়ই মনোজ্ঞ হয়েছে।

মা প্রথমটা যেন বুঝতে পারলেন না। পবিত্রর দিকে ফিরে জিজ্ঞসা করলেন,

"Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il raconte?"

"কি কথা? কি বিষয়ে বলছে এ?"

পবিত্র বলল, স্কুলে নতুন পড়ানোর ব্যবস্থার কথা, যা সে খানিক আগে বলে এসেছে।

আমি তার কথার জের টেনে বললাম, সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছে।

মা : তুমি কি করে বুঝলে যে সুন্দর হয়েছে? তোমার

কি এ বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে ?

"Comment est-ce que vous le trouvez ··? Est-ce que vous en savez quelque chos ?"

আমি : অভিজ্ঞতা অনেক হয়েছে।

"Oui, j'ai eu beaucoup d'expériences."

মা : এক বছরের মধ্যই ?

—"Beaucoup ! dans un an ?"

আমি : হাঁ। "Oui."

মা : তাহলে তোমার সম্ভাবনা আছে।

—Cela veut dire que vous n'avez plus besoin de progresser! (Mère rit) La première réponse était meiux." —Alors vous avez de la chance !"

আমি : না, আমি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

—"Non, j'ai beaucoup d' expériences."

মা : তার মানে, তোমার আর উন্নতির লাভের কিছুই বাকি নেই। প্রথম উত্তরটাই বরং ছিল ভাল। (বলে মা খুব হাসতে লাগলেন

(একটা হাসির রোল উঠল আমার আশে পাশের সঙ্গীদের মধ্যে থেকে। আমি বুঝলাম যে, ভুল উত্তর দিয়েছি। পরে পবিত্রকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে যখন মা বললেন, "তোমার তাহলে সম্ভাবনা আছে," তখন আবার কেন বলতে গেলাম, না আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে !...এখন এর দুটো মানে হতে পারে। এক, সেটাই আমি বলিনি, কিন্তু অবশ্যই আমার মনে মনে ছিল। এক বছরের মধ্যে অনেকটাই বুঝতে পেরেছি, এখন কি ভাবে এগুতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় মানেটা হচ্ছে, এবং সেটাই মা ধরে নিয়ে উত্তর করলেন, তবে সেটা মা কৌতুক করেই ধরে নিলেন যে, আমি বলছি, যথেষ্ট হয়েছে আর দরকার নেই।

মায়ের সঙ্গে কথাবার্তায় এই ভুলটা আজকাল আমার প্রচুর হয়। এটা শুধু ভাষাজ্ঞানের অভাব মাত্রই নয়। এ হল আত্মজাহিরের একটা লক্ষণ।

* * *

শনিবার, ৭.১১.৫৩

আজ ব্যালকনির পর মাকে দেখালাম—'র'-র লেখা চিঠি, যাতে সে বর্ণনা করেছে, Foreign Country-র officers-রা তাকে কত প্রশ্ন করেছে আমার সম্বন্ধে : লোকটি কে ? কত বয়স ? কি করে ? কোথায় থাকে ? কত উপার্জন করে ? কেন লেখক হিসেবে নিজের নাম গোপন করছে ? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মা ওই অংশটি পড়ে বললেন—

"Si cela vous amuse, que les gens parlent de vous

Ca vient comme ca,"

অর্থাৎ "লোকেরা তোমার কথা এই ভাবে বলাবলি করবে, আলোচনা করবে, তোমার যদি তাতে খুব আত্মগরিমা বাড়াবার সুযোগ নিতে চাও··· । ওই ভাবেই এ সব জিনিস আসে।"

আমি তা শুনে স্বীকার করে বললাম, হ্যাঁ, তা সত্যি।

(মায়ের কথার অর্থ নিজে বুঝতে পারি, কিন্তু অন্যরা যখন আমার ব্যাপারে জড়িত হয়, তখন আমার বোধ তাদের সব সময়ে যে বোধগম্য হবে, তা নয়। যেমন এ ক্ষেত্রে। অমুক মত দিল, "লেখকের নাম প্রকাশ করতে বারণ কর। তা হলেই ল্যাঠা চুকে যাবে, তোমার উদ্দেশ্য যা তা সিদ্ধ হবে, লেখাটা প্রচার হবে, অথচ গোলযোগ বাধবে না।" সেই মর্মে চিঠিও লিখে দিলাম—কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় মায়ের ইচ্ছাই বজায় রইল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে গেল। আমিও বাঁচলুম।)

[জনৈক সাধকের ডাইরি থেকে]

যোগ-জীবন

প্রশ্নোত্তরে শ্রীমা

১৯৫১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী, শ্রীমা বলেছিলেন :

যারা ভাবে দেহকে অলস করে রেখে, প্রাণকে ঘুম পাড়িয়ে, মনকে একরকম হতবুদ্ধি করে দিয়ে (বেশীরভাগ সময় তারা যাকে "স্তব্ধতা" বলে তা হল হতবুদ্ধি করা) যোগের পথে উন্নতি হবে, ঠিক জেন,একটি অভিজ্ঞতা এলেই তারা হয়ে পড়ে একেবারে বিশৃঙ্খল। তারা হারিয়ে ফেলে তাল, অসংযত কাজকর্ম করে কিংবা খুবই দুঃখদায়ক কিছু ঘটে তাদের...চাই নির্ভরযোগ্য ক্ষমতাপূর্ণ দেহ, সুনিয়ন্ত্রিত প্রাণ, সংগঠিত নমনীয় যুক্তিধর্মী মন ; তাহলে তুমি যদি আস্পৃহার ভাবে থাক আর উত্তর পাও, তোমার সম্পূর্ণ সত্তা হবে সমৃদ্ধ, বিস্তৃতি হবে দীপ্তিময়, পাবে পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তি, আর তোমার পাত্র উপচে পড়বে না বেশী ভরা বলে, অপটু হাতে কোন এলোমেলো মানুষ যেমন ভরা পাত্র সামলাতে পারে না, তেমন হবে না। কেমন জান ? যেমন, মনে কর, ওখানে একটি পাত্র আছে, বেশ ছোট পাত্রটি, ওটি ছোটই থাকবে যদি না তুমি তাকে বড় করার ব্যবস্থা কর, তারপর আচমকা যদি তুমি তাকে কিছু দিয়ে ভরে দাও যা বেশী শক্তিশালী, সবই উপচে ছিটিয়ে পড়বে।

১৯৫১ সালের ১লা মার্চ কথা প্রসঙ্গে বলছেন :

এমন মানুষ আছে যারা সারা জীবন ধরে নিজেদের মনটিকে সংগঠিত করে। কিছু লোককে আমি জানি যারা তাদের মনটি একটি দুর্গের মত করে গড়েছে, একটি বিশাল গঠন (আমি যাদের কথা বলছি তারা অসাধারণ মানসিক ক্ষমতা ধরে)। তারা তাদের মনটিকে করেছে একটি বিরাট অট্টালিকা, মহা শক্তিশালী, শক্ত দেওয়ালের আড়ালে এমনই পাকাপাকিভাবে স্থাপনা করেছে যে বাইরের মন জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক গেছে হারিয়ে : তারা থাকল নিজেদের গড়া গঠনের মধ্যে এবং চেতনার সব চেহারাগুলি তাদের নিজেদের তৈরী – তাদের আর বাইরের মন-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রইল না। তাদের নিজেদের প্রাণের সঙ্গে, তাদের দেহের সঙ্গে যোগাযোগ অবশ্য রইল কিছু পরিমাণে, তবে তাদের চেতনার চেহারা ছবিগুলি সব জমা থাকল তাদের মনের তোলা গঠনের আড়ালে—আর তারা বেরিয়ে আসতে পারল না তার থেকে। এই অবস্থা ভীষণ উগ্র হয়ে ওঠে তাদের ক্ষেত্রে যারা আধ্যাত্মিক জীবনের খোঁজে জড় চেতনা পরিত্যাগ করেছে প্রাচীন পন্থাধরে,আর নিজেকে একাগ্র করেছে অন্তর সত্তার দিকে, তার সঙ্গে একীভূত হবার জন্য। আমি যদি কিছু লোকের নাম করি তোমরা খুবই অবাক হয়ে যাবে। তাদের কল্পনার বুননের মধ্যে তারা সৃষ্টি করে মনের সব কয়টি বিন্যাস ক্রম, যেমনি কঠিন তার গঠন তেমনি কায়েমী তার স্থাপনা যে, তার মধ্যেই তারা বন্দী হয়ে যায় এবং যখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা বিরাট সত্যে এসে পৌঁছেছে আসলে তারা কিন্তু পৌঁছায় গিয়ে নিজেদের মনগড়া দুর্গটির কেন্দ্রে।

সেখানে তাদের দূরদর্শিত সব অভিজ্ঞতাই হয় মুক্তির অভিজ্ঞতা, দেহ থেকে বাইরে যাবার অভিজ্ঞতা, ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাবার অভিজ্ঞতা, সব সব, কিন্তু সবই তাদের নিজেদের সৃষ্টি ; বিশ্ব সত্যের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। তারপর কেউ যদি সেটিকে ছোঁয়, যে কোন কারণেই হোক কেউ যদি স্পর্শ করার শক্তি পেল, কিংবা কোন একটি দেওয়ালে একটু ফাটল ধরাল, তাহলে প্রথমে তারা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তারপর তারা ধরে নেয় যে,যে শক্তি এই

স্পর্শ ঘটাল তা হল একটি ভয়ঙ্কর ধ্বংসের শক্তি, যেন একটি নিকৃষ্টতম প্রতিকূল শক্তি প্রকট হয়েছে!

২৬শে এপ্রিল ১৯৫১ সাল। শ্রীমা তুললেন যৌগিক নিয়ন্ত্রণের কথা সেদিন। বললেন:

সমস্ত কিছুর, সমস্ত কিছুর জন্য একই নিয়ম। এমন কিছুই নেই যা যৌগিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়ে না, অবশ্য যদি সঠিকভাবে করা যায়। আর যদি ঠিক ভাবে না করা হয়, তাহলে তপস্যা করাও বৃথা, তাতে তুমি থেকে যাবে যে-কে-সেই অবস্থায়। কারণ সে যে হল একই ব্যাপার, যদি তুমি তপস্যা কর আর তপস্যা করছ বলে সর্বক্ষণ নজর তোমার নিজের উপর—আর নিজেকে বলছ, "আমার কি কোন উন্নতি হল, এতেই কি ভাল হবে, আমি কি সফল হব?" তাহলে কি হয়? তোমার অহং ক্রমে ক্রমে প্রকাণ্ড বড় হয়ে সমস্ত জায়গাটা জুড়ে বসে থাকে, আর অন্য কিছুর জন্য একটুও জায়গা থাকে না। আর সেদিন বলছিলাম আধ্যাত্মিক অহমিকা হল সব থেকে খারাপ, সেটি যে আবার নিজের হীনতা সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন, তার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে একটা বিরাট কেউকেটা, একেবারে দেবপম না হলেও!

যখন তুমি স্কুলে পড়, তখন তুমি হয়ে যাও সেই একাগ্রতা, যে একাগ্রতা শিক্ষক কি বলছেন তা ধরতে সাহায্য করে, সেই চিন্তাধারা হয়ে ওঠ যা তোমার মধ্যে প্রবেশ করছে, কিংবা হও সেই জ্ঞান যে জ্ঞান তোমায় দেওয়া হল। তাই তোমার হয়ে ওঠা উচিত। তুমি নিজের কথা ভাববে না, কেবল ভাববে যা তুমি শিখতে চাইছ তাই। তাহলে দেখবে তোমার ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ হয়ে উঠবে।

বেশীর ভাগেরই এই হীনতাভাব, চরিত্রগত অপূর্ণতা, ইতরতা, অক্ষমতা দেখা দেয় যখন তারা নিজেরা নিজের কাছে পিঠ ফিরে দাঁড়ায়, যখন নিজেকে একটি অণুবীক্ষণিক অহমিকার চৌহদ্দির মধ্যে বদ্ধ করে রাখে। নিজেকে প্রসারিত কর, খুলে দাও দুয়ারগুলি। এর জন্য সব থেকে ভাল উপায় হল, যে কাজ করছ তাতেই একাগ্র হও, নিজের উপর একাগ্র না হয়ে।*

অনুবাদ: **অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়**

* *Questions & Answers*, 150-51-এর ৮৮, ১৭৩ ও ৩২১ পৃষ্ঠার অনুবাদ

ভ্রম সংশোধন

গত চৈত্র (১৩৮২) সংখ্যার 'শৃঙ্খল'-তে প্রকাশিত "যতীনদা'র কাছে গল্প-শোনা" শীর্ষক রচনার লেখিকা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সাধিকা শ্রীমতী এলোরা মুখোপাধ্যায়। শ্রীকানাই সামন্ত নয়। এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক

নলিনীদা'র একটা অসমাপ্ত পত্র

১৩-৬-৫৪

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার শেষ চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। মনে করছিলাম একটু ভাল করে উত্তর দেব—কিন্তু খুব ভাল করে হয়ে উঠছে না, তা যা পারি লিখছি।

ব্যাধি একটা বড় দুর্ভাগ্য—বিশেষতঃ গুরুতর ব্যাধি। তবে জগতে অভাবগ্রস্ত লোক যেমন আছে, কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত লোকও আছে তেমনি বহু। এদের জীবন কি ব্যর্থ? কি ব্যর্থ হতে বাধ্য? তা নয়। অভাব নিয়ে ব্যাধি নিয়ে পঙ্গু হয়েও দেখেছি অনেকে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছে, কর্ম করেছে, মানুষও হয়েছে। দেখেছি দেহের পঙ্গুতা সহায়ই হয়েছে মনের সমৃদ্ধির পক্ষে। তোমাকেও আমি ঐ কথাই বলতে চাই। মানুষের দেহে যত খাদ থাক না, তা অন্তরেও পৌঁছিবে তা নয়। অন্তরকে আলাদা করা যায়, দেহের কথা ভুলে বা দৃক্‌পাত না করে, অন্তরের জগতে বিচরণ করা যায়। এই অন্তরেরও অন্তর আছে আবার--সেখানেই মানুষ মানুষ, তুমি তোমার সত্যকার তুমি। তাঁর খোঁজ নেওয়া যেতে পারে, সেখানেও পৌঁছান যায়। দেহের পারিপার্শ্বিকের বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও। অবশ্য এর জন্য দরকার সাহস, ধৈর্য, আস্থা—একটা বীরত্ব। কিন্তু সে বীরত্ব তো মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়।

তা ছাড়া, আমরা বলি বিশ্বাস করি এবং জানি যে ব্যাধি থেকে, দুঃখদৈন্য থেকে মুক্ত হবার পথও ঐ দিক দিয়ে। আমরা বলি অন্তরের চেতনায় যে পৌঁছেছে, অন্তরতমের শুদ্ধি ও স্বাস্থ্য যে অর্জন করেছে, বাহিরে এই দেহেও তার শুদ্ধি ও স্বাস্থ্য ক্রমে ফিরে আসবেই। এমন ব্যাধি নাই, এমন দুরবস্থা নাই যা এই অন্তরতম চেতনা নিরাময় করতে পারে না। একে বলতে পার সাধনা, আধ্যাত্মিক সাধনা, যোগ-সাধনা—কারণ এর অর্থ ভিতরের একত্বের সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে, নিজের স্বরূপের—দিব্যভাবের সঙ্গে সংযোগসাধন।

দেহকে ভুলে গিয়ে, তবে দেহের উপর ফেলতে হবে দেহের অন্তর্যামীর আলো, বাহ্য অবস্থা ভুলে গিয়ে একটা ঊর্ধ্বস্থিতির শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে সর্বদা বাস করতে হবে, তবেই লাভ হতে পারে নবজীবন।

মনে করো না এ সব হল বড় বড় কথা, অসম্ভব কথা। আমরা ছোট ছোট কথার মধ্যে আবদ্ধ, একান্ত সম্ভব ছাড়া আর কিছু জানি না বিশ্বাস করি না—ঠিক এই জন্যই আমাদের দুর্গতির শেষ নাই। সব দুর্গতির শেষ হয়। তবে দুর্গতির মাত্রা যত বেশি হয়, পথটাও তত কঠিন হতে বাধ্য।

কঠিন পথে চলবার সাহস আছে কার? কিন্তু এও দেখা যায়—একবার পথে উঠে চললে, যতটা কঠিন মনে হয়েছিল পথটা প্রথমে ততটা কঠিন নয় বাস্তবিক।

আমার কথাগুলি তোমার পক্ষে হয়তো খুব নূতন বুঝতে পারবে কি না জানি না।

ভবিষ্যতের কবিতা

শ্রীঅরবিন্দ

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাব্যের আত্মা

আমাদের প্রস্তাবিত অতীত ও ভবিষ্যতের পথে সার্থকভাবে অনুসরণ করে চলবার মত একটি বলিষ্ঠ সূত্র আমাদের দরকার। সেই সূত্রটি পাবার জন্যে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা বোধহয় ভুল হবে না যে, কাব্যের কাছ থেকে কোন্ মহত্তম শক্তি আমরা দাবি করি। কিংবা আরো ব্যাপকভাবে সমস্যাটি উত্থাপিত করে বিষয়টির মূলের আরো নিকটবর্তী হতে পারি এইভাবে: কাব্যের প্রকৃতি এবং তার আত্মিক বিধান কি? এবং তা থেকে কাব্যকে পরম সত্যের 'মন্ত্র' হিসাবে ব্যবহারের সম্ভাবনা কেমন করে দেখা দিতে পারে? কাব্যসৃষ্টির যে প্রাণ-রহস্য, তার মত গভীর গূঢ় এবং সংজ্ঞাতীত একটি বিষয়ের সংজ্ঞা রচনা করতে গিয়ে আমরা কোন ব্যর্থপ্রয়াস যে করতে চাই, তা নয়; সরস্বতীর বহু-তার-সমন্বিত বীণাযন্ত্রটিকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্যে খণ্ড-খণ্ড করে গ্রহণ করতে গেলে সর্বদাই তা হবে একটি সংকীর্ণ এবং তার চেয়েও বেশি নিরর্থক বিলাস-মাত্র। আমরা বরং চাই একটি দিগ্‌দর্শক সম্বোধি, প্রয়োজন আমাদের কিছু বর্ণনার, যা আমাদের সাহায্য করতে পারে, আমাদের অন্বেষণার পথে আলোকসম্পাত করতে পারে। সেইভাবে, সংজ্ঞা নির্ণয়ের দ্বারা নয়, বরং বর্ণনার দ্বারা আমরা নির্দেশ করে দিতে পারি যে, কাব্যের আত্মিক উপাদানের সন্ধান অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয় এবং তা একটা নিষ্ফল প্রয়াসও নয়।

এক্ষেত্রে আমরা দুটি সাধারণ ভ্রান্তির সম্মুখীন হই: তাদের মধ্যে একটি ভ্রান্তির সবচেয়ে বেশি কবলিত হয়েছে প্রাকৃতজনের অপরিশীলিত চিত্ত, অন্য ভ্রান্তিতে পড়েছেন অতি-শীলিত সমালোচক অথবা বুদ্ধিগত বিচারে অতিমাত্র নিষ্ঠাশীল শিল্পী বা কারিগর। কাব্যের অন্তরে যথার্থতঃ প্রবেশ না করে তাকে বাইরে থেকে বিচার করতে গেলে, প্রাকৃত মনের কাছে প্রতিভাত হয়,—কাব্য যেন কল্পনা, বুদ্ধি ও শ্রুতির রসসম্ভোগ বা একরকমের উন্নতমানের চিত্ত-বিনোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তা-ই যদি সব কথা হ'ত, তবে তো কাব্যের আত্মা, তার অন্তরের উদ্দেশ্য, তার গভীরতর বিধান,—এসব তত্ত্ব অন্বেষণ করে আমাদের সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজনই হ'ত না। প্রীতিপ্রদ, উপভোগ্য এবং শ্রুতিমধুর যে-কোন রচনাই—তাতে একটা সুন্দর ভাব থাকলেই হল—আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারত; অ্যানাক্রিয়োনের একটি গান কিংবা মিমনের্মসের একটি ফরিয়াদই হ'ত অয়ডিপাস, আগা-মেম্‌নোন্ বা অডিসির মত উত্তম সৃষ্টি! কারণ, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের দিব্যি মনে হ'ত যে, নিটোল সংহতি বা সংক্ষিপ্ততার কথা বাদ দিলে আলোকসম্পদের দিক থেকে প্রথমোক্তগুলি হল শেষোক্তগুলির সমান, কিংবা এমনকি, কারো কারো মতে, বেশি সমৃদ্ধ। আনন্দ নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যাশা করি কাব্যের কাছ থেকে, যেমন করি অন্য শিল্পের কাছ থেকে; কিন্তু বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ, এমনকি আন্তর কল্পনালব্ধ আনন্দ হল কাব্যের প্রাথমিক উপাদান মাত্র। বুদ্ধি, কল্পনা ও শ্রুতির উচ্চতম চাহিদা মেটাবার জন্যে এই ধরনের আনন্দকে শুদ্ধীকৃত পরিষ্কৃত

হয়ে হতে হবে আরো উর্ধ্বায়িত, এবং প্রকৃতিগতভাবে তার নিজের সর্বোচ্চ স্তবকেও তাকে অতিক্রম করে যেতে হবে।

কারণ, বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা বা শ্রুতি কোনটাই কাব্যানন্দের প্রকৃত গ্রহীতা নয়, এমনকি এরা কাব্যের আসল স্রষ্টাও নয়। এরা হল কাব্যানন্দ গ্রহণের পথ ও যন্ত্র মাত্র; তার আসল স্রষ্টা ও প্রকৃত শ্রোতা হল অন্তরাত্মা। যতটা দ্রুততর বেগে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে তারা অন্তরাত্মার কাছে আনন্দকে পৌঁছে দেবার কাজটুকু করতে পারে, যত কম তারা তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র পরিতৃপ্তির দাবি করে, কাব্যবাণী যত সোজাসুজি অন্তরাত্মার কাছে পৌঁছে তার গভীরে তলিয়ে যেতে পারে, কাব্য ততই মহৎ হয়ে উঠে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাব্য যতদিন না যন্ত্রের এই আনন্দকে উর্ধ্বায়িত করে তাকে অন্তরাত্মার গভীরতর আনন্দে রূপান্তরিত করছে, ততদিন সে তার ব্রত সিদ্ধ করতে পারছে না, অন্ততঃ তার মহত্তম ব্রত তো নয়ই। দিব্য এক আনন্দ—যে আনন্দ একাধারে ব্যাখ্যাতা, সৃষ্টিকর্তা, উদ্‌ঘাটয়িতা এবং রূপ-নির্মাতা, সেই আনন্দকেই—কবির আত্মা অনুভব করে থাকে। অনেকটা এরকম বলা যেতে পারে যে, যে আধ্যাত্মিক সত্য, যে রহস্যব্যাখ্যাকারী মহাচেতনা এবং সর্বভূতের যে জীবন, শক্তি ও আবেগ ব্রহ্মার মূল সৃষ্টি-স্বপ্নে বিধৃত ছিল, তাকে তিনি যখন বিশ্বের ছন্দিত রূপরাজির মধ্যে মেলে ধরলেন, তখন তাঁর মহাশক্তির প্রস্রবণটি খুলে ধরার মধ্যে যে আনন্দ তিনি পেয়েছিলেন, কবির আনন্দ হল তারই বিপ্রতীপ প্রতিবিম্ব। কবি যখন তাঁর ব্রতসাধনার পথে মানবীয় বাধাগুলিকে জয় করে ফেলেন, তখন এই আনন্দকে বরণ করার জন্যে যারা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যেও তাকে ঢেলে দিতে পারেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এই আনন্দ শুধুই একটা দেব-সুলভ-চিত্ত-বিনোদন নয়, এ হল এক রূপবচয়িতা আলোক-বিস্তারী মহাশক্তি।

পক্ষান্তরে, এক ধরনের সমালোচক বা বুদ্ধিগতভাবে অতিসচেতনশিল্পী প্রায়ই বলে থাকেন যে, কাব্য হল যেন প্রধানতঃ ত্রুটিহীন নিখুঁত, অথবা বড়জোর, অত্যুৎকৃষ্ট আঙ্গিকেরই ব্যাপার। উত্তম আঙ্গিক নিশ্চয়ই সব শিল্পেই পূর্ণ সিদ্ধির পথে প্রথম ধাপ, কিন্তু আরো তো অনেক ধাপ রয়েছে, তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগে আঙ্গিকের বাইরে একটা গোটা জগৎই তো তোমার সামনে পড়ে আছে। আঙ্গিকের বাইরের এই জগৎ এতই বড় যে, এমনকি প্রকাশভঙ্গির একটা দুর্বল ত্রুটিপূর্ণ প্রকরণও একটি গভীর অনুভূতিশীল ও প্রতিভাধর আত্মাকে মহৎ কাব্য-সৃষ্টিতে বাধা দিতে পারে না, এবং সে কাব্যও এমন মহৎ হতে পারে যে, তা শতাব্দীর পর শতাব্দী তার প্রভাব বিস্তার করে যেতে পারে। তাছাড়া, আঙ্গিক যতই অপরিহার্য হোক না কেন, অন্যান্য শিল্পের চেয়ে কাব্যে বোধহয় তার স্থান অনেক কম। কারণ, প্রথমতঃ, কাব্যের যে প্রকরণ, অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ বাক্, তা সূক্ষ্ম ও অমূর্ত উপাদানে অধিকতর পূর্ণ। তারপরের কারণটি হল, শিল্পস্রষ্টার সর্ববিধ মাধ্যমের মধ্যে কাব্য হল সবচেয়ে জটিল, নমনীয় এবং বিচিত্ররূপে ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই তো অন্য যে-কোন শিল্পকলার চেয়ে কাব্য অনেক বেশি সম্ভাবনাপূর্ণ। ছন্দিত বাণীর একটি সূক্ষ্ম অনুভূতিময় উপাদান রয়েছে, সেটা হল তার ধ্বনি-মূল্য; আর রয়েছে একেবারে অমূর্ত উপাদান, সেটা হল তার অর্থ-গৌরব বা চিন্তা-মূল্য; এবং তার ধ্বনি-ও অর্থ দুয়েরই আবার রয়েছে পৃথকভাবে এবং যুগপৎ একটি আত্মিক মূল্য, একটি প্রত্যক্ষ আত্মিক শক্তি। এই আত্মিক শক্তিই হল অসীম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এবং যদিও আঙ্গিকের নিয়মাধীন সামান্য একটি উপাদানকে আশ্রয় করেই এই শক্তির আবির্ভাব হয়, তবু আবির্ভাবের পরমুহূর্তেই, তার গগন-বিহার শুরু হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই, এই শক্তি যান্ত্রিক নির্মাণ-বিধির সমস্ত এলাকা ছাড়িয়ে একেবারে ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

বরং বলা যায়, কাব্য তার নিজের রূপবন্ধ নিজেই নিয়ন্ত্রিত করে। শিল্পসৃষ্টির সময়ে শিল্পের আঙ্গিকের দিকে নজর রাখার ব্যাপারে সর্বশ্রেণীর শিল্পীর মধ্যে কবির ব্যাকুলতাই সবচেয়ে কম। আঙ্গিক নিঃসন্দেহেই তাঁকে আয়ত্ত করতে হয়; কিন্তু সৃষ্টিক্রিয়ার চরমমুহূর্তে আঙ্গিকের বুদ্ধিগত ধারণা একটি গৌণক্রিয়া হয়ে পড়ে, কিংবা এমনকি তখন কবির মনে এটি একটি চাপা কণ্ঠস্বররূপেই ধ্বনিত হতে থাকে। এবং তাঁর সৃষ্টির মাহেন্দ্রলগ্নে কবি আঙ্গিকের কথা একরকম পুরোপুরিই ভুলে যেতে পারেন। কারণ, তখন তাঁর ধ্বনিপ্রবাহ ও রচনাশৈলীর সাফল্য আসে সম্পূর্ণরূপে তাঁর অন্তরাত্মার স্বতঃউৎসারিত রূপবন্ধ হিসাবেই: বিশ্ব-

আত্মা যেমন করে তাঁর অন্তর্নিহিত শাশ্বত নাদশক্তি থেকে বিশ্বচ্ছন্দের সৃষ্টি করেছেন, আর বাকি যান্ত্রিক কাজটুকু ছেড়ে দিয়েছেন প্রকৃতির অবচেতন অংশের উপরে তার সংগুপ্ত আত্মার ক্রমিক জাগরণের স্রোতে সম্পাদিত হবার জন্যে, তেমনি কবি-আত্মাও একটা প্রেরণা-লব্ধ ছন্দে, একটা অন্তর্জাত ধ্যানলব্ধ মন্ত্রে আত্ম-গুঞ্জরণ করে উঠে। এই ধ্যানলব্ধ পরাৎপরা বাক্-ই হল শ্রেষ্ঠতম কাব্যবাণী, কবির কাব্যে তার অবিনশ্বর অংশ। এর স্বল্পাংশও যদি থাকে, তবে কবিসৃষ্টির অবশিষ্ট অংশকে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট। 'স্বল্পম্ অপ্যস্য ধর্মস্য···'।

এই শক্তিই কবির ছন্দিত বাক্‌কে করে তোলে মানুষের অধিগম্য সেই সর্বোত্তম বাণী, যা দিয়ে সে প্রকাশ করবে তার আত্ম-দর্শন ও বিশ্ব-দর্শন। এটা লক্ষণীয় যে, মানুষের সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা—বস্তুর অন্তরের শুদ্ধতম অধ্যাত্ম, যাকে কখনোই পুরোপুরি প্রকাশ করা যায় না, তাকেও—যখন সে শুধু বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করে বরং তাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে, তখন তা প্রায়ই সহজাতভাবেই ছন্দোবন্ধের দিকেই ঝোঁকে, যে ছন্দোবন্ধ প্রায় সর্বদাই হল কাব্যেরই নিজস্ব বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি। অবশ্য কাব্য চেষ্টা করে থাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির এলাকা বাড়িয়ে সর্ববিধ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে—এমনকি নিতান্ত বস্তুগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও—তাকে প্রয়োগ করতে। সেইজন্যে বস্তুর কেবল বাহ্যরূপের অতীত একটা কিছুকে প্রকাশ করার জন্যেই কাব্যের একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা রয়েছে, এমনকি, আপাতদৃষ্টিতে যখন মনে হয়,এই শুধু প্রাতিভাষিক রূপগুলিতেই কাব্য আনন্দ পাচ্ছে, তখনো।

এবারে, কাব্যের সেই অনির্বচনীয় আত্মার প্রতি নয়, বরং কাব্যবাণীর যেটা নিজস্ব বিশিষ্ট প্রাথমিক উপাদান সেই উচ্চতা ও গভীরতার প্রতি আমরা সফলতার সঙ্গে একবার দৃষ্টিপাত করতে পারি। সাধারণ কথাবার্তায় ভাষার ব্যবহার প্রধানতঃ হয় যোগাযোগের সীমাবদ্ধ ব্যবহারিক প্রয়োজনে; এক্ষেত্রে জীবনের প্রয়োজনে, বেঁচে থাকার পক্ষে উপযোগী ও আবশ্যক ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের তাগিদেই, ভাষার ব্যবহার হয়ে থাকে। একাজে তখন শব্দের স্বাভাবিক শক্তির প্রতি আমাদের শুধু অবহেলা-ভরা একটা মনোযোগ নিয়ে আমরা শব্দগুলিকে ব্যবহার করি বিভিন্নভাবের প্রথাগত প্রতীক হিসাবে, অনেকটা যেমন আমরা ব্যবহার করি যে-কোন রকমের একটি সাধারণ যন্ত্র বা হাতিয়ারকে। শব্দগুলির সঙ্গে আমাদের আচরণ হল অনেকটা এইরকমের যে, আমাদের প্রাণধারণের ক্ষেত্রে যদি-বা তাদের প্রয়োজন আছে, তবু তাদের নিজেদের যেন কোন প্রাণ নেই। আমরা যখন তাদের মধ্যে আরো বেশি প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করতে চাই, তখন সে শক্তি আমাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই তাদের ধার দিতে হয়। সেটা আমরা দিয়ে থাকি বিশিষ্ট স্বরভঙ্গিমার সাহায্যে, শব্দের মধ্যে যে আবেগ ও প্রাণশক্তি আমরা সঞ্চারিত করি তার সাহায্যে। একাজ আমরা করি যাতে প্রচলিত শব্দ-চিহ্নগুলির মধ্যে যা সহজাত নয়, তা-ই আমরা ভরে দিতে পারি। কিন্তু যদি আমরা অতীতে পিছিয়ে গিয়ে ভাষার ইতিহাস অনুসন্ধান করি এবং আর একটু এগিয়ে গিয়ে তার উৎসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে, আমার মনে হয়, আমরা দেখতে পাব, মানুষের ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা চিরকাল সে রকম ছিল না। তখন শব্দগুলির শুধু যে একটা নিজস্ব বাস্তব এবং জীবন্ত প্রাণই ছিল তা নয়, উপরন্তু আমরা আমাদের যন্ত্রীভূত ও বিদগ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে সে সম্পর্কে আজ যতটা সচেতন হতে পারি, তখনকার বক্তারা সে সম্পর্কে তার চেয়েও বেশি সচেতন ছিলেন। এর সূত্রপাত হয়েছিল ভাষার আদিম প্রকৃতি থেকেই। ভাষার সেই প্রথম প্রয়োগের দিনে একথা অভিপ্রেত ছিল না—অথবা বলতে পারি একথা অভিপ্রেত হলেও সে অভিপ্রায় ছিল অনভিব্যক্ত—যে, ভাষা যতটা আবেগ অনুভূতি এবং মনের অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ধারণার বাহক হবে, ততটাই বুদ্ধির সুস্পষ্ট ভাবেরও প্রকাশক হবে। মনের অস্পষ্ট ধারণাগুলির যে সূক্ষ্ম গুণগত পার্থক্য সেদিন ধরা পড়ত সেগুলি তো আজ আমরা অনুধাবন করার প্রয়োজনও বোধ করি না। স্পষ্ট চিহ্নিত বুদ্ধিগত অর্থ সেদিন নিশ্চয়ই ভাষার গৌণ উপাদান ছিল, আজ ভাষার বিবর্তনের ফলে সেইটাই হয়ে উঠেছে প্রধান।

এর হেতু হল,—বিশেষ-বিশেষ ধ্বনি যে বিশেষ-বিশেষ নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করতে আরম্ভ করে তার কারণটি কিন্তু ধ্বনি ও তার বুদ্ধিগত অর্থের কোন স্বাভাবিক ও সহজাত

সাযুজ্যের মধ্যে নিহিত নেই, যেহেতু ধ্বনি ও তার বুদ্ধিগত অর্থের মধ্যে সে রকম কোন প্রকৃতিদত্ত ও সহজাত সাযুজ্য বলেই কিছু নেই। যে-কোন ধ্বনি যে-কোন অর্থই প্রকাশ করতে পারে, অবশ্য লোকে যদি সেই ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে একটা প্রথাগত সাযুজ্য মেনে নিতে রাজি থাকে। মানুষের প্রাণে, তার অনুভূতি, আবেগ ও স্থূল মানসিক চেতনায় কতকগুলি স্পন্দন সৃষ্টি করার যে একটি অনির্দেশ্য গুণ বা ক্ষমতা ধ্বনির রয়েছে, তা-ই থেকেই বিশেষ-বিশেষ ধ্বনি বিশেষ-বিশেষ ভাবের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আমি যা বোঝাতে চাই তা একটি উদাহরণের সাহায্যে আরো স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা যাবে। 'Wolf' (নেকড়ে বাঘ) শব্দটির উৎস আজ আর আমাদের মনে নেই। আমাদের বুদ্ধির কাছে এই শব্দটির অর্থ হল—এক রকমের সজীব পদার্থ, তার বেশি কিছু নয়। বাকিটুকু আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে কল্পনা করে নিই। তেমনি সংস্কৃত শব্দ 'বৃক'-এর মূল অর্থ ছিল 'বিদীর্ণকারী'। শেষে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়—'এক রকমের সজীব পদার্থ'। কিন্তু মূলে শব্দটি বাঘ ও মানুষের মধ্যে সেই ইন্দ্রিয়ানুভূতিময় সম্পর্কটিই বোঝাত যা মানুষের জীবনে অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। শব্দটি এটা বোঝাত ধ্বনির একটা বিশেষ গুণের দ্বারা যা নিজের সঙ্গে বিদীর্ণ করার অনুভূতিটি ইতিমধ্যেই যুক্ত করে নিয়েছিল। অনুভূতির এই অনুষঙ্গ আদিকালের ভাষাকে নিশ্চয়ই দিয়ে থাকবে একটা বলিষ্ঠ প্রাণ, একটা মূর্ত তেজ, এবং একদিকে একটি স্বাভাবিক কাব্যিক শক্তি। ভাষা আজ সেটা হারিয়েছে, অন্যদিকে সংক্ষিপ্ততা, স্বচ্ছতা এবং কার্যকারিতার দিক থেকে ভাষা আজ যা-কিছুই অর্জন করে থাকুক না কেন।

এখন, কাব্য একদিক দিয়ে পিছনে ফিরে যায় এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে হলেও যথাসাধ্য ভাষার সেই আদি উপাদানই পুনরুদ্ধার করে। এটি সে করে সেই পুরাতন ইন্দ্রিয়ানুভূতিময় বাস্তবতাকে সরিয়ে তার বদলে অংশতঃ চিত্রকল্পের উপরে গুরুত্ব আরোপের দ্বারা, এবং অংশতঃ ধ্বনির ব্যঞ্জনাশক্তির প্রতি, তার প্রাণ ও বীর্যের প্রতি, তার দ্বারা উপস্থাপিত মানস-চিত্ররূপের প্রতি অধিকতর মনোযোগের দ্বারা। এক্ষেত্রে বুদ্ধির অবদান যে সুনির্দিষ্ট চিন্তা-গৌরব তাকেও এর সঙ্গে যুক্ত করে দেয় এবং উভয়কেই পরস্পরের সহযোগিতাই ঋদ্ধিমান্ করে তোলে। এই ভাবে কাব্য সেই সঙ্গে বাক্-শক্তিকে করে তোলে বুদ্ধি বা প্রাণের নয়, বরং অভিজ্ঞতার উচ্চতর অভিযানের প্রকাশ-মাধ্যম। কারণ কাব্য শব্দের শুধু সুনির্দিষ্ট বুদ্ধিগত তাৎপর্যই উদ্‌ঘাটিত করে না, তার শুধু আবেগ ও অনুভূতির শক্তিকে, শুধু প্রাণিক ব্যঞ্জনাকেই আবিষ্কার করে না, বরং এসবের মাধ্যমে এবং এসবকে ছাড়িয়েও তার আত্মিক অভিব্যঞ্জনাকে, তার আত্মাকেই, সে সম্মুখে তুলে ধরে। সুতরাং শব্দ যে সীমাবদ্ধ বুদ্ধিগত অর্থ বহন করে, কাব্য তাকে উত্তীর্ণ হয়ে সীমাহীন অর্থব্যঞ্জনায়-উপনীত হয়। আদিমকালের ভাষা যেমন করত, কাব্য তেমন মানুষের শুধু প্রাণময় পুরুষকেই প্রকাশ করে না; কিংবা আজকাল ভাষা সাধারণতঃ যে কাজ করে থাকে, কাব্য সেরকম শুধু বুদ্ধিগত ভাবকেই প্রকাশ করে না; বরং বলতে পারি, কাব্য ব্যক্ত করে মানুষের অন্তঃস্থিত উর্ধ্বতর ব্যাপকতর আত্মারই অভিজ্ঞতা, দিব্যদর্শন এবং ভাবরাজিকে। এসব জিনিসকে কাব্য যেমন আমাদের বুদ্ধির সামনে উপস্থাপিত করে, তেমনি আমাদের প্রাণময় পুরুষের কাছে সেগুলিকে বাস্তব করে তোলে এবং তার ফলে নাদশক্তির সাহায্যে আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে ধরে অধ্যাত্ম লোকের প্রবেশ-দ্বার।

গদ্যরীতিও ভাষাকে তার সাধারণ ব্যবহারের চেয়ে অনেক উচ্চতর শক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়; কিন্তু কাব্যের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে, কাব্যের মত সে তার এই প্রয়াসকে মহত্তর করে তোলে না। কারণ গদ্যের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা হল শব্দের বুদ্ধিগত তাৎপর্যের উপরে। সাধারণ কথাবার্তায় যে ছন্দঃ-স্পন্দন উপেক্ষিত, গদ্য তাকেই কাজে লাগায়, এবং একটা সাধারণ স্বচ্ছন্দ গতি-সুষমার দিকেই লক্ষ্য রাখে। শব্দগুলিকে সে এমন মনোজ্ঞ ও দীপ্ত করে পরস্পর-সম্বদ্ধ করতে চায় যে তা যেন আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে করে যুগপৎ তৃপ্ত ও স্বচ্ছ। যে নির্ভুল, সূক্ষ্ম, নমনীয় এবং উপভোগ্য প্রকাশভঙ্গি অর্জনের জন্যে সাধারণ অমার্জিত বাগভঙ্গি তেমন কোন যত্ন করে না, গদ্য তারই জন্যে অধিকতর সচেষ্ট। ভাষার মহত্তর যথাযোগ্যতা গদ্যের প্রথম লক্ষ্য। এই যথাযোগ্যতার অতিরিক্ত তার লক্ষ্য নিবদ্ধ হতে পারে ভাষার বিভিন্ন কৌশলের সাহায্যে অধিকতর সাবলীলতা এবং অব্যর্থতালাভের দিকে।

ভাষার বুদ্ধিগত আবেদন সৃষ্টির শক্তিকে ঊর্ধ্বায়িত করার জন্যে গদ্যের সেই সব কৌশল হল নানারকমের আলঙ্কারিক উপায়। এই যে যথাযোগ্যতা এবং সাবলীলতা, এর প্রাথমিক সীমাটি অতিক্রম করে, অথচ সর্বদা একটা মাত্রা-বোধ বজায় রেখে, গদ্য আরো জোরাল ছন্দঃস্পন্দনকে স্থান করে দিতে পারে, আরো প্রত্যক্ষভাবে আরো বলিষ্ঠতার সঙ্গে আমাদের আবেগকে জাগ্রত করতে পারে, আমাদের আরো জীবন্ত সৌন্দর্যবোধের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি, গদ্য এমন স্বচ্ছন্দ এবং সমৃদ্ধভাবে চিত্র-কল্পের ব্যবহার করতে পারে যে, তাতে কাব্যশৈলীর সঙ্গে তার একটা বাহ্য সান্নিধ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্য সে-সবের প্রয়োগ করে প্রসাধন হিসাবে, অলঙ্কাররূপে; অথবা যে বস্তু বা ভাবের সে বর্ণনা দেয়, সংজ্ঞা রচনা করে, তার বলিষ্ঠতর বুদ্ধিগত রূপ দেওয়ার ব্যাপারে তাদের একটা সক্রিয় উপযোগিতা সৃষ্টির জন্যে। যে গভীরতর প্রত্যক্ষতর দিব্যদর্শনের জন্যে কবি নিরন্তর অন্বেষণ করে চলেন, গদ্য-কারের চিত্রকল্পের ব্যবহার কিন্তু তার জন্যে নয়। গদ্যের দৃষ্টি সর্বদাই নিবদ্ধতার মুখ্য শ্রোতা এবং বিচারক বুদ্ধির উপরে, এবং অন্যান্য শক্তিকে সে যে আবাহন করে, তাও বুদ্ধিরই সমর্থনলাভের পথে তাকে সাহায্য করার জন্যে। যুক্তি ও রুচি-বুদ্ধিবৃত্তির এই দুই অনুচর—গদ্যশিল্পীর কাছে এরাই হল পরম ইষ্ট। অথচ কবির কাছে এরা হল অপ্রধান দেবতামাত্র।

এসব সীমা অতিক্রম করে গদ্য যদি প্রকরণের ক্ষেত্রে আরো আকর্ষণীয় ছন্দঃ-সুষমার দিকে এগিয়ে যায়, দিব্য-দর্শনের প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে চিত্রকল্পের ব্যবহার করে, ভাষার বলবত্তর প্রাণশক্তির দিকে নিজেকে খুলে ধরে, তাহলে গদ্যশৈলী তার নিজের এলাকা ছাড়িয়ে কাব্য-পরিধির দিকে পা বাড়ায়, কিংবা এমনকি, তাতে অনুপ্রবেশও করে। তখন তা হয়ে উঠে কাব্যধর্মী গদ্য, অথবা এমনকি, একেবারে কাব্যই—গদ্যের বাহ্য কাঠামোকে তখন সে ব্যবহার করে শুধু-একটা ছদ্ম-বেশ কিংবা ঢিলে-ঢালা পোশাক হিসাবে। মহৎ কিংবা সুচারু যথাযোগ্যতা, অব্যর্থতা, বুদ্ধির দীপ্তি এবং সযত্ন-চর্চিত রসবোধের পরিতৃপ্তি—এসব হল গদ্যের ভাষার স্বভাবজাত এবং স্বাভাবিক শক্তি। কিন্তু কবির বিশেষ অধিকার হল এসবকে ছাড়িয়ে গিয়ে আবিষ্কার করা ভাষার সেই তীব্রতর আলোক-দীপ্তিকে, সেই প্রেরণাদীপ্ত বাক্‌কে, সেই পরম অপরিহার্য বাণীকে, যার মধ্যে এসে মিলিত হয় দিব্য ছন্দোময় গতিপ্রবাহের সঙ্গে অর্থের গভীরতা এবং অসীম ব্যঞ্জনাশক্তি; এই অসীম ব্যঞ্জনাশক্তির প্রত্যক্ষ উৎসারণ ঘটছে আমাদের অন্তর্যামী আত্মার গঙ্গোত্রী-মুখ থেকে। কবি সব সময়ে তাকে খুঁজে না-ও পেতে পারেন, কিন্তু তার জন্যে সন্ধান চালিয়ে যাওয়াই হল তাঁর বাণীর বিধান। এবং যখন তিনি তাকে শুধু খুঁজেই পান না, উপরন্তু তাতে স্বয়ং আত্মারই কোন উদ্ভাসিত সত্যকে ভরে দেন, তখনই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠে 'মন্ত্র'।

কিন্তু সর্বদাই,—সন্ধানেই হোক, আর প্রাপ্তিতেই হোক, —কাব্যের সমস্ত রচনা-শৈলী এবং ছন্দঃ-স্পন্দনই হল এমন এক অভিব্যক্তি ও গতি যা আসে আমাদের আত্মায় সূক্ষ্ম-দর্শনজনিত এক রকমের আত্মিক সংবেদন থেকে। তাকে প্রকাশ করার জন্যে আত্মা সর্বদাই ব্যাকুল। এই যে সূক্ষ্ম-দর্শন, তা প্রকৃতি, ঈশ্বর, মানুষ, প্রাণীর জীবন বা বস্তুর জীবনের যে-কোন জিনিসেরই হতে পারে। এটা হতে পারে শক্তির ও কর্মের, কিংবা ইন্দ্রিয়গম্য সৌন্দর্যের, কিংবা চিন্তাজাত সত্যের, কিংবা আবেগ ও সুখ ও দুঃখের, কিংবা ঐহিক জীবন বা পারত্রিক জীবনের সাক্ষাৎ দর্শন। এই দর্শনলাভ যদি আত্মা নিজে করে এবং চক্ষু, ইন্দ্রিয়, হৃদয় ও চিন্তাশ্রয়ী মন যদি তার হাতের নিষ্ক্রিয় যন্ত্র হয়ে থাকে, তা হলেই যথেষ্ট। তার ফলেই পাই খাঁটি কবিতা, মহৎকাব্য। কিন্তু এই সংবেদন যদি খুব বেশি মাত্রায় বুদ্ধির হয়, যদি এটা কল্পনা, আবেগ ও প্রাণিক ক্রিয়ার হয় এবং তারা যদি ছন্দোময় সাবলীল ও সক্রিয় প্রকাশ চায়, অথচ তাতে যদি যথেষ্ট পরিমাণে এমন মহত্তর আত্মিক সংবেদনের অভাব থাকে যা এসবগুলিকে নিজের বুকে স্থান দিতে পারে, আর এসবই যদি আত্মার গহনে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোথিত না থাকে, তাতে অভিষিক্ত দ্রবীভূত না হয়ে থাকে, এবং তাদের প্রকাশ যদি একরকমের আধ্যাত্মিক রূপান্তরের মাধ্যমে শুদ্ধীকৃত ঊর্ধ্বায়িত হয়ে না আসে, তবেই কাব্যের নিম্নতর ভূমিতে আমাদের পতন ঘটে, এবং তখন আমরা যে শিল্পকর্ম পাই তার অমরত্ব অনেকটাই সংশয়িত হয়ে পড়ে। কাব্যের আবেদন যখন হয় পুরোপুরিই আমাদের ভিতরের

নিম্নতর উপাদানগুলির কাছে, শুধুই মনের কাছে, তখন আমরা কাব্যের সত্যকার এলাকার বাইরে গিয়ে পড়ি, আমরা গদ্যের পরিধির দিকে যাই, অথবা কাব্যের বাহ্য রূপের মুখোশ-পরা একেবারে গদ্যই পেয়ে থাকি। তখন এই জাতীয় রচনার সঙ্গে গদ্যের পার্থক্য থাকে শুধু, অথবা মুখ্যতঃ, যান্ত্রিক উপকরণের দিক থেকে। এ হবে ভাল পদ্যবন্ধ ; এবং গদ্যলেখক তাঁর ভাষার সহজতর শিথিলতর বিন্যাসে সাধারণতঃ যা অনুমোদন করেন, এই সৃষ্টি হবে বোধহয় তার চেয়েও বেশি সংহত, আকর্ষণীয় ও উদ্দীপক অভিব্যক্তি। অর্থাৎ তাতে কাব্যের আত্মিক উপাদান আদৌ থাকবে না, কিংবা যদি-বা থাকে তবে তা যথেষ্ট নয়।

কারণ, ভাষা যেসব জিনিসকে প্রকাশ করতে পারে, তাদের সকলেরই মধ্যে দুটি উপাদান আছে—বাহ্য বা আধারভূত উপাদান এবং আধ্যাত্মিক বা সারভূত উপাদান। যেমন, চিন্তায় রয়েছে বুদ্ধিগত ভাব—বুদ্ধি যাকে আমাদের কাছে সংহত ও নির্দিষ্ট করে ধরে,—আর রয়েছে আত্মিক ভাব—যা বুদ্ধিকে অতিক্রম করে যায় এবং প্রকাশিত বস্তুর সামগ্রিক সত্যের সঙ্গে আমাদের সান্নিধ্য বা তাদাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে। অনুরূপভাবে আবেগের ক্ষেত্রে কবি শুধু আবেগকেই চান না, বরং আবেগের অন্তরালশায়ী আত্মাকে চান। তারই আনন্দের জন্যে আমাদের এবং জগতের অন্তরস্থিত আত্মা আবেগময় অভিজ্ঞতাকে কামনা করে এবং বরণ করে। তেমনি বস্তুর কাব্যিক অর্থের ব্যাপারেও কবির প্রয়াস হল তাঁর বাণীতে জীবনের সত্য বা প্রকৃতির সত্যকে মূর্ত করে তোলার জন্যে। এই মহত্তর সত্য এবং তার আনন্দ ও সৌন্দর্যই কবি অনুসন্ধান করে চলেছেন ; তিনি খুঁজে চলেছেন সেই সুন্দরকে যা সত্য, এবং সেই সত্যকে যা সুন্দর, এবং সেইজন্যে যা শাশ্বত আনন্দ-স্বরূপ। কারণ এইটি তার নিজের গভীরতর সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে আমাদের কাছে এনে দেয় আত্মার আনন্দ।

গদ্যের অপেক্ষাকৃত ভীরু ও সংযত ভাষা এই মহত্তর উপাদানকে কখনো-কখনো আমাদের কাছে মেঘাবৃত করে দেয়, কিন্তু কাব্যের সমুন্নত ও নির্ভীক শৈলী তাকে ঘনিষ্ঠ ও জীবন্ত করে তোলে এবং কাব্যের উন্নততর ছন্দ তার পাখায় এমন সব জিনিস বহন করে চলে যা কোন শৈলীর পক্ষে আনা সম্ভব হ'ত না। এই হ'ল সেই তীব্রতা ও গভীরতার উৎস যেটা কাব্যিক ভাষা ও কাব্যিক গতির পরিচয়-চিহ্ন। বাণীর অন্তরে আত্মিক দর্শনের তীব্রতা থেকেই এর জন্ম। এই অন্তরের ও বাইরের জগতে নাম ও রূপের ঐন্দ্রজালিক দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এই হল আত্মানুসন্ধানের ছন্দিত অভিযানের আত্মিক সংবেদন। [ক্রমশ]

অনুবাদক : **রামেশ্বর শ'**

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

২য় পর্ব—বিশ্ব পর্যটক

৬ষ্ঠ সর্গ—বৃহত্তর প্রাণলোক সব এবং তাদের দেববৃন্দ

(২)

এই রাজ্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে আমাদের বৃহত্তর আশা সব দিয়ে ;
এরই শক্তিপুঞ্জ আমাদের পৃথ্বীমণ্ডলের উপর নেমে এসেছে,
এরই চিহ্নসব তাদের রূপরেখা যত এঁকে দিয়েছে আমাদের জীবনের পরে
অজেয় গতিবেগে আমাদের নিয়ে চলেছে আমাদের নিয়তির অভিমুখে,
এরই উচ্ছল তরঙ্গাবলী তুলে ধরে জীবনধারার সমূর্ধ্ব উপপ্লাবনে।
যা কিছু আমরা খুঁজে চলি সবেরই আদিমূর্তি আঁকা সেখানে
আর যা কিছু আমরা জানি নাই খুঁজি নাই
তবে একদিন জন্মিবে যা মানুষী হৃদয়ে
যাদের আশ্রয়ে কালাতীত কালগত বস্তুর মধ্যে আপনাকে পূর্ণ করে ধরবে।
দৈনন্দিনের রহস্যধারায় মূর্ত,
সনাতন অনবরুদ্ধ শাশ্বতের মাঝে,
ঊর্ধ্বগামী অন্তহীন সম্ভাবনা এক
উঠে চলেছে স্বপ্নের অশেষ সোপান বেয়ে
চিরকাল মহাসত্তার সচেতন সমাধির মধ্যে।
সবই চলে সেই সোপান বেয়ে অদৃশ্য এক গন্তব্যে।
নিরন্তর নশ্বরতার মহাবেগে এক অনুপ্রাণিত এই পথযাত্রা,
নাই সেখানে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা
প্রকৃতির তীর্থাভিযান এই যে অজ্ঞাতের অভিমুখে।
হারান উৎসের দিকে এই আরোহণে
মহাশক্তির আশা, খুলে ধরবে যা কিছু হবার সম্ভাবনা,
সমুচ্চ ক্রমগতি তার চলে ধাপে ধাপে,
পদক্ষেপ ধায় সবেগে দৃষ্টি হতে বৃহত্তর দৃষ্টির মধ্যে,

কার্যধারা চলে রূপ হতে উদারতর রূপে,
বাহিনী এক অফুরন্ত রূপাবলীর
চলেছে সীমাহীন চিন্তাবৃত্তির বলধারা বহন করে।
কালাতীত আত্মশক্তি তার, একদিন ছিল যে শয়ান
আদিহীন অন্তহীন প্রশান্তির অঙ্কে,
বিচ্ছিন্ন এখন সৎপুরুষের অমর আনন্দ হতে,
তুলে ধরে হারান যত উল্লাসের রূপাবলী ;
নশ্বর বস্তুকে সবলে রূপ দিয়ে,
আশা এই সৃষ্টির প্রবেগ এনে দেবে মুক্তি
অতিক্রম করে যাবে এই যে বিচ্ছেদের গহ্বর ভরে দিতে পারে না সে,
বিচ্ছেদ-বেদনার উপশম এনে দেবে ক্ষণতরে,
ক্ষণতরে পাবে মুক্তি ক্ষুদ্রতার কারাকক্ষ হতে,
সাক্ষাৎ পাবে শাশ্বতের বিশাল যত তুঙ্গতার—
খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত যা এখানে এই অনিশ্চিত কালক্ষেত্রে।
পৌঁছে যায় বুঝি চিরদিন অগম্য যা তার কাছে ;
শাশ্বতকে বদ্ধ করে রাখে নিমেষের মধ্যে,
ক্ষুদ্র এক জীবাত্মাকে ভরে দেয় অনন্ত দিয়ে ;
নিশ্চল স্থাণু আনত হয় যেন তার যাদুকর আহ্বানে ;
দাঁড়িয়ে এখন সে সীমাহীনের প্রান্তে,
দেখে সকল রূপে অরূপ অন্তর্বাসীকে,
অনুভব করে চারিদিকে তার আনন্ত্যের আলিঙ্গন।
এ মহাশক্তি জানে না শেষ কোথায়, লক্ষ্য নাই তার,
কাজ করে চলে যায় অনামা এক এষণার প্রেরণায়
উঠে যে এসেছে এক অজ্ঞেয় অরূপ বৃহৎ হতে।
তার গোপন অসম্ভব ব্রত হল
সীমাহানকে বেঁধে দেবে জন্মের জালে,
আত্মাকে ঢেলে গড়বে জড়রূপে,
অনির্বাচ্যকে দেবে ভাষা আর চিন্তাবৃত্তি ;
চালিত হয়েছে সে ব্যক্ত করবে চির-অব্যক্তকে।
চাতুর্যে তার তবু অসম্ভব হয়েছে সম্ভব :
অনুসরণ করে চলে সে তার সমুচ্চ তর্কাতীত পরিকল্পনা,
আবিষ্কার করে কৌশল সব তার যাদুবিদ্যার,

নিত্য নবদেহ গড়ে দেয় অনন্তের,
অকল্পনীয়ের ধরে দেয় রূপাবলী ;
শাশ্বতকে প্রলুব্ধ করে এনে ধরেছে কালের আলিঙ্গনে।
এখনও তবু জানে না সে কি কার্য সাধন করেছে।
সবই সাধিত হয়েছে দুর্বোধ এক অবগুণ্ঠনের পশ্চাতে :
প্রচ্ছন্ন সত্যটি নয়, তার ছায়া এক
বাহ্যরূপ গ্রহণ করে মায়ার যাদুবলে,
কালতাড়িত অসত্যের ছদ্মবেশ,
নিত্যনবরূপধারী অন্তরাত্মার অসম্পূর্ণ সৃষ্টি এক
নিত্যনব দেহে নিত্য নব অধিবাসীর আগমনে।
তুচ্ছ তার যন্ত্র সব, সীমাহীন কর্ম ;
রূপহীন চেতনার বিরাট ক্ষেত্রে
মনের ও ইন্দ্রিয়ের খণ্ডিত ক্ষুদ্র সব আঘাতে
অন্তহীন সত্যকে খুলে ধরে সে অন্তহীন কাল ধ'রে ;
কালাতীত রহস্য এক আপনাকে ব্যক্ত করে ধরে কালের ধারায়।
যে মহত্ত্ব স্বপ্ন তার তাকে হারিয়ে ফেলেছে কর্মাবলী তার,
শ্রমবেগ তার হৃদয়াবেগ আর বেদনা,
উল্লাস আর যন্ত্রণা, মহিমা আর অভিশাপ তার ;
তবু অন্য পন্থা নাই তার, শ্রম করে চলে সে ;
বিপুল বক্ষ তার অন্তরায় কর্মবিরতির।
সৃষ্টি যতদিন, ব্যর্থতা তার বেঁচে থাকবে
যুক্তির দৃষ্টিকে বিমূঢ় করে ব্যর্থ করে ;
এ এক বাক্যাতীত মূঢ়তা আর সৌন্দর্য,
অতুলন উন্মত্ততা ইচ্ছাশক্তির বেঁচে থাকবার,
দুঃসাহস এক, উল্লাসের প্রলাপ।
এই তার সত্তার আপন বিধি, তার একমাত্র আশ্রয় ;
আপনার ক্ষুধা মিটিয়ে চলে, তৃপ্তি কভু লভে না,
বুভুক্ষু এষণা তার—সর্বত্র পরিবেশন করবে
মহান্ আত্মার বহুরূপী কল্পনা সব
আর অদ্বিতীয় সদ্বস্তুর সহস্র রূপাবলী।
একটা জগৎ সে সৃষ্টি করেছে সত্যের উড়ন্ত অঞ্চল স্পর্শে,
একটা জগৎ ঢেলে গড়েছে সত্য যা চায় তার স্বপ্ন দিয়ে,

P 36,161

সত্যের বিগ্রহ, সচেতন রহস্যের মূর্তি।
তবে দাঁড়িয়ে রয় না সে পার্থিব মনের মত ঘেরা চারিদিকে
আপাতদৃষ্ট ঘটনার নিরেট প্রাচীর দিয়ে;
দুঃসাহসে আস্থা রাখে স্বপ্নালু মন আর অন্তরাত্মার উপর।
শিকারী সে অধ্যাত্ম সত্যের শিকারে চলেছে—
এখন শুধু চিন্তায় অথবা অনুমানে অথবা বিশ্বাসে ধরা যায় যাদের—
কল্পনায় ধরে আর বেঁচে রাখে পিঞ্জরে
বর্ণে আঁকা স্বর্গের বিহঙ্গ।
এই যে বৃহত্তর প্রাণধারা মুগ্ধ সে অদৃশ্যের প্রেমে;
তার স্পর্শের উর্ধ্বে এক ঊর্ধ্বতম জ্যোতিকে আহ্বান করে সে,
অনুভবে আসে তার সেই নীরবতা এনে দেয় যে অন্তরাত্মার মুক্তি;
অনুভব করে সেই পরিত্রাতার স্পর্শ, ভাগবতরশ্মি এক:
সত্য শিব সুন্দর হল দেবতা তার।
সন্নিকটে তার স্বর্গ হতে গরীয়ান্ স্বর্গ সব, পৃথিবীর চক্ষু দেখে না যারে
আর এক নিদারুণ ঘোর অন্ধকার, মানুষের জীবন যা বহনে অক্ষম।
সাজাত্য তার দানবের আর দেবতার সঙ্গে।
তার হৃদয় সঞ্চালিত করেছে অদ্ভুত উৎসাহ এক;
বুভুক্ষা তার তুঙ্গ শিখরের তরে, প্রাণাবেগ তার পরমের দিকে।
খুঁজে চলে সে অক্ষত বাক্ আর অক্ষত আকার,
ছুটে চলে সে ঊর্ধ্বতম চিন্তার, ঊর্ধ্বতম জ্যোতির অভিমুখে।
রূপের মধ্যে অরূপ নিকটে এসে যায়
আর সব পরিপূর্ণতা পরাৎপরের কোল ঘেঁষে যায়।
স্বর্গের সন্তান —আপন ভবন দেখেনি কখনও,
তার প্রবেগ সনাতনের স্পর্শ পায় কোথাও এক বিন্দুতে গিয়ে:
নিকটে যায় শুধু স্পর্শ করে কিন্তু ধারণ করে না;
উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠ সে সমুজ্জ্বল এক প্রান্তের অভিমুখে:
মহত্ত্ব তার হল খুঁজে চলা আর সৃষ্টি করা।

অনুবাদ: **শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত**

'সাবিত্রী' সম্বন্ধে পত্রাবলী

শ্রীঅরবিন্দ

(১১)

To blend and blur shades owing to technical exigencies—এই লাইনটি বুদ্ধিগত কবিতার পক্ষে যথাযোগ্য হতে পারে, কিন্তু আমি যা সৃষ্টি করতে চাই তার উপযুক্ত হবে না। তাতে একটি কথার পরিবর্তে আর একটি যে কোন কথা ব্যবহার করা যায় না। এমন কি বুদ্ধিগত কবিতাতেও এটা হল অপকৃষ্ট উপায়। gleam এবং glow দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিস। আর যে কবি এ দুটি কথা যথেচ্ছ ব্যবহার করেন তাঁর দৃষ্টি রয়েছে শুধু কথার উপরে, বস্তুটির উপরে নয়।

—১৯৩৭

* * *

And driven by a pointing hand of Light
Across his soul's unmapped immensitudes.[১]

নূতন কথা সৃষ্টি করার অধিকার আমি নিজেই গ্রহণ করি। immensitudes কথাটি infinity-র জুড়ি infinitudes-এর চেয়ে অধিক অদ্ভুত নয়। তবে eternitudes ব্যবহার করব না হয়তো। আমার মনে হবে ফরাসী শব্দ éternuer এবং কসে হাঁচি দেব।

—১৯৩৬

* * *

The body and the life no more were all.

আমার তো মনে হয় লাইনটি খুব সুন্দর এবং আমি যা বলতে চাই তা পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে। আর কিভাবে বলতে পারতাম আমি জানি না, অর্থটিকে ক্ষুণ্ণ না করে বা অতিরঞ্জিত না করে। আর "সাদামাঠা" যে বলছ, এরকম সহজ সরল নিরাভরণ লাইন, কোন রকম উজ্জ্বল পোশাক-পরিচ্ছদ না চড়িয়ে, অশোভন উপাদান নয়। এই যেমন,

This was the day when Satyavan must die.[২]

লাইনটিকে আমি আদৌ স্থানচ্যুত করব না; সেজন্য তুমি যদি আমাকে রাজমুকুট পরাও, কবিসম্রাটের সম্মান ও সম্পদ দাও, তবুও না। এখানে যদি আমি পরিবর্তন করে থাকি তার কারণ এর চারিদিককার পরিবর্তন একে তার সন্নিহিত আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্যে রাখেনি।

আদৌ নয় ("নগ্নতার জন্য নগ্নতা")। এ নগ্নতার উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্য, সম্পূর্ণ অন্য জিনিস তা।...এরকমটি যথাযোগ্য (juste) হয়েছিল বিশেষ স্থানে আমি যা বলতে চাই তা প্রকাশ করে ধরবার জন্য। স্থানটি যখন পরিবর্তিত হয়ে গেল—অর্থের দিক দিয়ে, ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে, আবহাওয়ার দিক দিয়ে—তখন আর তা যথাযোগ্য রইল না ওই স্থানে। নূতন একটা ঘরে তার যদি অনধিকার প্রবেশ হয়ে থাকে তা প্রমাণ করে না যে পুরাতন ঘরটিতেও তার হয়েছিল অনধিকার-প্রবেশ। বর্ণ যখন গাঢ় হয়েছে, অবকাশ যখন বৃদ্ধি পেয়েছে তখন পুরাতন গড়নে যে রং যথাযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় ছিল নূতন গড়নে তা আর থাকতে পারে না। প্রশ্নটি হল গঠনধারায়; একটা লাইন বা ছত্র দেখতে হবে তার বিচ্ছিন্ন পৃথক নিজস্ব মূল্য

১ জ্যোতির অঙ্গুলি-নির্দেশ এক চালিয়ে নিয়েছে তাকে তার অন্তরাত্মার অনির্দিষ্ট মহাকাশের পারান্তরে।

২ এল দিন—আজ হবে মৃত্যু সত্যবানের।

হিসাবে নয়, সমগ্রটির মাঝখানে সে যথাযোগ্য স্থানে কি না।

—১৯৩৭

* * *

রাজার যোগসাধনা বিষয়ে তিনটি সর্গের যে শিরোনামা[১] দেওয়া হয়েছে তাতে 'যোগ' কথাটি ইচ্ছাক্রমে পুনরুক্ত হয়েছে এই কথাটি ব্যক্ত করে এবং জোর দিয়ে বলবার জন্য যে, অশ্বপতির আধ্যাত্মিক বিকাশে এই অংশটির রয়েছে দুটি সাধনার ধারা—এক হল অন্তরাত্মার আর আত্মার যুগ্মাশ্রয়ে রূপান্তর, আর একটি হল বৃহত্তর আধ্যাত্মিক রূপান্তর যার অর্থ পরমা এক শক্তির মধ্যে উত্তরণ। তুমি যে অংশটি বাদ দিতে বলেছ তার ফলে এ অংশটি নষ্ট হয়ে যাবে, থাকবে শুধু একটা কায়াহীন তত্ত্ব কিছু। এই তিনটি সর্গের দ্বিতীয়টিতে পূর্বোক্ত দুটি ধারার মাঝখানে রয়েছে একটা যতি, সেখানে দেওয়া হয়েছে গুপ্তজ্ঞানের রহস্য, রয়েছে একটা গুপ্তজ্ঞানের বিবরণ, অশ্বপতি চালিত হয়েছে সেই দিকে এবং তারই ফল বিবৃত করা হয়েছে শেষ সর্গে। যোগসাধনার বিশদ বিবরণ কিছু দেওয়া হয়নি, বা সেই জ্ঞানার্জনের ধাপগুলিও নির্দেশ করা হয়নি, তা শুধু ইঙ্গিতে বলা হয়েছে, বিবৃত করা হয়নি। সুতরাং এই সর্গটিকে 'রাজার যোগসাধনা' নাম দিলে ঠিক যুক্তিযুক্ত হ'ত না। অশ্বপতির যোগসাধনার তিনটি ক্রম। প্রথম তিনি অর্জন করেছেন নিজের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক আত্মসিদ্ধি এবং তাকেই বলা হয়েছে রাজার যোগসাধনা। তারপর তিনি আরম্ভ করেছেন তাঁর ঊর্ধ্বারোহণ মানবজাতির সার্থক প্রতিনিধি হিসাবে; তাঁর লক্ষ্য চেতনার সকল স্তরের আবিষ্কার এবং অধিকারের সম্ভাবনা অর্জন করা। দ্বিতীয় পর্বে এই কথাটি বিবৃত করা হয়েছে। কিন্তু তবুও এ পর্যন্ত হল ব্যক্তিগত বিজয়। পরিশেষে তাঁর নিজের জন্য আর আস্পৃহা নাই, তাঁর আস্পৃহা সকলের জন্য একটা বিশ্বব্যাপী সিদ্ধির ও নবসৃষ্টির জন্য—এইকথা বলা হয়েছে ভাগবতী জননী পর্বে।

১৯৪৬

১ প্রথম পর্ব, তৃতীয় সর্গ: রাজার যোগসাধনা—অন্তরাত্মার মুক্তিযোগ
চতুর্থ সর্গ: গুপ্ত জ্ঞান
পঞ্চম সর্গ: রাজার যোগসাধনা—আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও মহত্ত্বের যোগসাধনা

* * *

Largior hic campos aether et lumine vestit
Purpureo, solemque suum, sua sidera norunt.

আমি জানি না ("ভর্জিল কোন্ স্তরের কথা বলছেন"), কিন্তু গাঢ় লাল প্রাণস্তরের আলো। হয়তো তিনি কোন একটি প্রাণময় স্বর্গের কথা ভাবছিলেন। প্রাচীনেরা প্রাণময় স্বর্গকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন আর বেশির ভাগ ধর্মবাদেও তাই করেছেন। ভর্জিলের ইঙ্গিতটি দেখানর জন্য প্রয়োজনবোধে আমি আর একটি লাইন যোগ করে দিয়েছি।

And griefless countries under purple suns[২]

—১৯৩৬

* * *

Here too the gracious mighty Angel poured
Her splendour and her swiftness and her thrill,
Hoping to fill this new fair world with her joy.[৩]

না, poured-এর পরিবর্তে pours চলবে না, তাতে "new fair world" বাক্যটির সমস্ত অর্থই লোপ পেয়ে যাবে। এখানে বলা হচ্ছে পৃথিবী যখন সৃষ্ট হয়েছিল তখন প্রাণধারার যে চেষ্টা ছিল পৃথিবীকে জয় করবার জন্য, —ঘটনাটি অতীতকালের যদিও তার রেশ এবং ফল এখনও চলছে।

—১৯৩৬

* * *

মুখোশ (mask) দুবার নয় চারবার পুনরুক্ত হয়েছে আবস্তে এই অংশটিতে। এর উদ্দেশ্য আছে, তা হল সমস্তটির মধ্যে ভাবের যে মূল সংযোগসূত্র রয়েছে তাকে

২ আর গাঢ়-রক্তবর্ণ-সূর্যস্নাত: শোকমুক্ত ভূখণ্ড যত।

৩ এখানেও সেই ব্যোমচারী দেবদূত কৃপাস্তরে ঢেলে দিয়েছে
তার ঔজ্জ্বল্য তার খরবেগ তার শিহরণ,
আশা তার নূতন সুন্দর জগৎ এক ভরে দেবে পরমানন্দে।

তুলে ধরবার জন্য। দেবদূতেরা এই ধূসর মুখোশ ধারণ করেছে, সুতরাং তোমার আপত্তি দাঁড়াতে পারে না, কারণ কোন পৃথক মুখোশের কথা এখানে নেই নূতন একটা ভাবের অংশ হিসাবে; এখানে ফিরে আবার বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয়েছে মূল সুরটিকে, সমস্তের মধ্যে একই প্রভাব রয়ে গিয়েছে দেখানর জন্য এটি যথেচ্ছ পুনরুক্তি নয়, এ হল উদ্দেশ্যমূলক ভঙ্গি, তার রয়েছে একটা আন্তর অর্থ।

—১৯৪৮

* *

And overcast with error, grief and pain
The soul's native will for truth and joy and light.[১]

এই যে যুগল ত্রয়ী তারা ঠিক প্রতিরূপ নয়, joy (আনন্দ) হল grief (শোক) এবং pain (বেদনা) দুয়েরই প্রতিরূপ, আর light (আলো) হল দ্বিতীয় ত্রয়ীতে truth (সত্য) এবং joy (আনন্দ)-এর অনুকূল অবস্থা।

—১৯৪৮

* *

এখানেও আবার একই শব্দ face দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা হয়েছে ছত্রটির শেষে, তবে এ হল নূতন একটা ছেদের অংশ, নূতন একটা ভাবধারার শুরু। তোমার প্রস্তাব আমার মন ভুলায় না; এখানে mien কথাটি স্পষ্টতঃই একটা সাহিত্যিক অলঙ্কার, সহজ সরল সত্যকার দৃষ্টির অংশ নয়: সুতরাং তা অতিমাত্রায় দুর্বল শোনায়। তবে এক কাজ করা যেতে পারে যদি চিত্রটি বদলে দেওয়া হয়, এই যেমন

All evil creeps from that ambiguous source,

কিন্তু এরকমটিও দুর্বল তুলনায়। বরং face কথাটি রেখে আর একটি ছত্র আমি জুড়ে দিতে পারি তার আগে, দুটি face-এর মাঝখানে দূরত্বটি একটুখানি বাড়িয়ে দেবার জন্য:

Its breath is a subtle poison in men's hearts.[২]

—১৯৪৮

১ আর ভ্রান্তি শোক দুঃখ ঘিরে ধরে
আত্মার আপন সংকল্পকে—লক্ষ্য যার সত্য আর আনন্দ আর আলোক।

২ তার নিঃশ্বাস মানুষের হৃদয়ে সূক্ষ্ম হলাহল।

"no man's land" বাক্যটি নিয়ে যে দুটি লাইন সেখানে প্রথম লাইনে কথাটি বড় হরফ দিয়ে আরম্ভ করার প্রয়োজন নেই, কারণ এখানে এটি শুধু বর্ণনা মাত্র। অন্য লাইনে বড় হরফ প্রয়োজন এই জন্য যে বাক্যটি এখানে একটা নাম বা পদবির মর্যাদা লাভ করেছে। হাইফেন (সংযোগরেখা) সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই; ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু ব্যবহার না করাটা হয়তো সুষ্ঠুতর হবে। কারণ তাতে বোঝা যাবে কোন বিশেষ ব্যক্তি এখনও অধিকারী হয়ে ওঠেনি।

—১৯৪৮

* * *

যে মামুলী কথাটায় তোমার আপত্তি···'he quoted Scripture and Law', এখানে দেওয়া হয়েছিল পুরো উদ্দেশ্যে এবং তার প্রয়োজন ছিল আমার লক্ষ্য যা ছিল তা সাধন করবার জন্য, যত সহজ সাধারণ জিনিসটা হতে পারে ততই ভাল হবে বলে। যা হোক, তোমার আপত্তি মেনে নিলাম এবং এইভাবে পরিবর্তন করলাম

He armed untruth with Scripture and the Law[৩],

আমার স্মরণে হয় না কোথাও আমি দেখেছি কিছু এই বাক্যটি সম্বন্ধে—Agreeing on the right to disagree—সংবাদপত্রে বা পুস্তকে কোথাও নয়। কথার ভাষায় বলা হয় বটে আর ঠিক সেই জন্যই বর্তমান অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য তার নেই, সুতরা' আমি পরিবর্তে তার লিখেছি

Only they agreed to differ in Evil's paths.[৪]

—১৯৬৬

* * *

Often a familiar visage studying...
His vision warned by the Spirit's inward eye
Discovered suddenly Hell's trade-mark there,[৫]

৩ অসত্যের হাতে সে দিয়েছে আয়ুধরূপে শাস্ত্র আর ধর্মবিধি।

৪ এই একমত তাদের শুধু, পাপের বিভিন্ন ধারায় চলবে তারা।

৫ প্রায়ই পরিচিত মুখ এক দেখে সে চেয়ে চেয়ে,...
আত্মার আন্তর নয়ন কিন্তু দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তাবে সাবধান করে:
সহসা সে আবিষ্কার করে নরক সর্বত্র রেখেছে সেখানে পদচিহ্ন তার।

প্রাণজগতে যেসব সত্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে এখানে। দেখতে তাদের মানুষী জীবের মত বোধ হয় বটে, কিন্তু একটু নজর করে দেখলে বোঝা যাবে, তারা হল অপশক্তি; প্রায়ই বাহ্যতঃ পরিচিত মুখ ধারণ করে তারা চেষ্টা করে লুব্ধ করতে অথবা হঠাৎ আক্রমণ করতে, তখন বোঝা যায় তাদের স্বরূপ। ইঙ্গিতেও বলা হয়েছে যে পৃথিবীতে নেমে তারা মানুষী দেহ ধারণ করে কিংবা অধিকার করে তাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য।

—১৯৩৬

* * *

Bliss into black coma fallen, insensible[১]

তুমি যে ছন্দ বিশ্লেষণ করেছ তা একটুও খাটে না। ঠিক হবে fallen কথাটি fall'n রূপে লেখা, যেমন মাঝে মাঝে করা হয়। আমার bliss into দেখতে হবে dactyl (দীর্ঘ-হ্রস্ব-হ্রস্ব) হিসাবে।

—১৯৪৮

* * *

Bliss into black coma fallen, insensible,
Coiled back to itself and God's eternal joy
Through a false poignant figure of grief and pain
Still dolorously nailed upon a cross
Fixed in the soil of a dumb insentient world
Where birth was a pang and death an agony,
Lest all too soon should change again to bliss.[২]

খৃষ্টধর্ম অথবা খৃষ্টের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই, তবে ক্রুশের প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে চিরন্তন বিশ্ব-আনন্দে ভ্রান্তির বশে দেখা যায় যে বাহ্যতঃ চিরন্তন বিশ্ব-বেদনা তারই প্রতিভূরূপে। খৃষ্ট নয়, বিশ্বাত্মা এখানে ঝুলে রয়েছে।

—১৯৪৮

* * *

Perform the ritual of her Mysteries.[৩]

Mysteries কথাটা বড় হরফে আরম্ভ, তার অর্থ "গুপ্ত প্রতীক অনুষ্ঠান" যেমন বলা হয়ে থাকে Orphic and Eleusinian "Mysteries"। যখন বড় হরফে লেখা হয় তখন তার অর্থ শুধু নয় প্রচ্ছন্ন রহস্যজনক জিনিস সব, তার হল এই অর্থ, যেমন "Mystery play"।

—১৯৩৬

* * *

নিশ্চেতনা থেকে ক্রম-বিবর্তন বেদনাদায়ক না-ও হতে পারে যদি কোথাও বাধা না থাকে। এ হতে পারে স্বচ্ছন্দ ধীর এবং স্বয়ংপ্রকাশ ভগবানের। সকলেরই চোখে পড়া উচিত বাহ্যপ্রকৃতি কত সুন্দর হতে পারে এবং সত্যই কত সুন্দর, যদিও বাহ্যতঃ দেখায় "নিশ্চেতন"—তবে অন্তর্মুখী প্রকৃতির মধ্যে চেতনার বিকাশের সঙ্গে এতখানি কদর্যতা এতখানি পাপ থাকবে কেন? বাহ্যসৃষ্টির সৌন্দর্যকে নষ্ট করবার জন্য? তার কারণ একটা বিকৃতি সঞ্জাত হয়েছে অজ্ঞান থেকে—যার উদ্ভব হল প্রাণের মধ্যে আর বৃদ্ধি হল মনের মধ্যে—তারই নাম মিথ্যা, সেই পাপ যার জন্ম হয়েছে নিশ্চেতনার নির্বিকল্প সুপ্তি থেকে; ফলে তার ক্রিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তার অন্তরে চিরবিদ্যমান গুপ্ত জ্যোতির্ময় চেতনা থেকে। কিন্তু এরকমটি না-ও হতে পারত যদি পরম ভাগবত ইচ্ছাশক্তির সর্বজয়ী প্রেরণা না থাকত,—নিশ্চেতনার এবং অজ্ঞানের যতকিছু সম্ভাবনা হতে পারে তা ব্যক্ত করে তাদের একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে নিজেদের ব্যক্ত করে ধরবার জন্য তাদের উচ্ছেদসাধনের উদ্দেশ্যে, কারণ সব সম্ভাবনাই কোথাও না কোথাও ব্যক্ত হবেই। ব্যক্ত হবার পরে যখন তার উচ্ছেদ সাধন করা হয়েছে তখন জড়ের মধ্যে ভাবগত অভিব্যক্তি আরও বৃহত্তর হয়ে দেখা দেবে অন্য পথের চেয়ে, কারণ এই কষ্টসাধ্য সৃষ্টিতে যত কিছু সম্ভাবনা থাকবে সব তাতে সংগৃহীত হবে, সৃষ্টির মধ্যে যা সহজসাধ্য এবং স্বল্পতর ক্লেশজাত অংশ, যা স্বাভাবিক, কেবল তা নিয়ে নয়।

—১৯৩৭

অনুবাদ: **শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত**

---

১ আনন্দ বিচ্যুত ঘনকৃষ্ণ অচৈতন্যের মাঝে, অনুভূতিহারা

২ আনন্দ বিচ্যুত ঘনকৃষ্ণ অচৈতন্যের মাঝে, অনুভূতিহারা
কুণ্ডলিত পুনরায় আপনি আপনা মাঝে—পরমের শাশ্বত প্রমোদ
গ্রহণ করেছে দুঃখের বেদনার ভ্রান্ত এক মর্মস্পর্শী মূর্তি—
এই মূক সংজ্ঞাহীন বিশ্বের মৃত্তিকাগর্ভে
নিহিত যুপকাষ্ঠে এখনও আবদ্ধ শোকের প্রতিমা সে;
জন্ম যেখানে যন্ত্রণা, মৃত্যুও যন্ত্রণা—
পাছে কোন বস্তু হঠাৎ আবার পরিণত হয়ে যায় পরম আনন্দে।

৩ পালন করে তার গুপ্তবিদ্যার অনুষ্ঠান।

অচিন পথের পাগল

অমলেশ ভট্টাচার্য

সেই কতকাল আগে
শঙ্খের বুকে সমুদ্রের কল্লোল শুনে
পদ্মের পাতায় পা রেখে
একদল ভিক্ষুক-সম্রাট এই পথ দিয়ে চলে গেছে।
মন্ত্রমাখা গোধূলি বেলায়
মায়ের আকুল ডাকের মত
একে একে দিন চলে যায়···

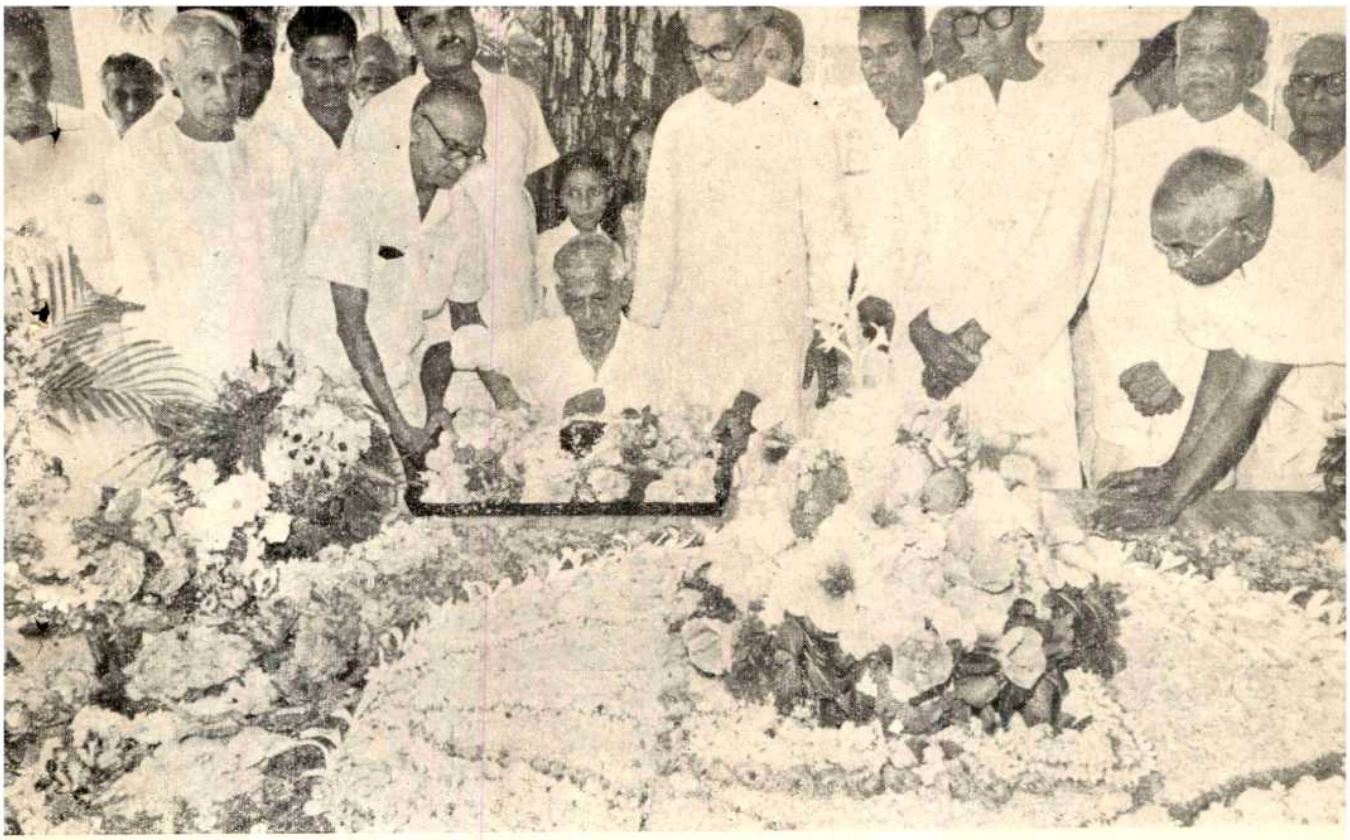
তবু সেই অচিন নদীর পথ ধরে
চিহ্নহীন পথে পদচিহ্ন এঁকে
একদল ঘরছাড়া পাগল
অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে
ক্ষুরের ধারের উপরে পা রেখে···
পিছনে পড়ে রইল ঘরসংসার
মৃত-সন্তানের কবর,
ভ্রূক্ষেপ নেই।
নরকের শ্মশানের শোক ভুলে
এবার তারা বীতশোক হবে।

যদিও এখানে আকাশ নেই
মাটি নেই
নিষ্ঠুর প্রাণের মৃগয়া
অশুচি রক্তের উতরোল—
তবু সেই ঘরছাড়া পাগলের দল
এবার নদী পার হবে।
সে-নদীর জল রক্তের মত গাঢ়

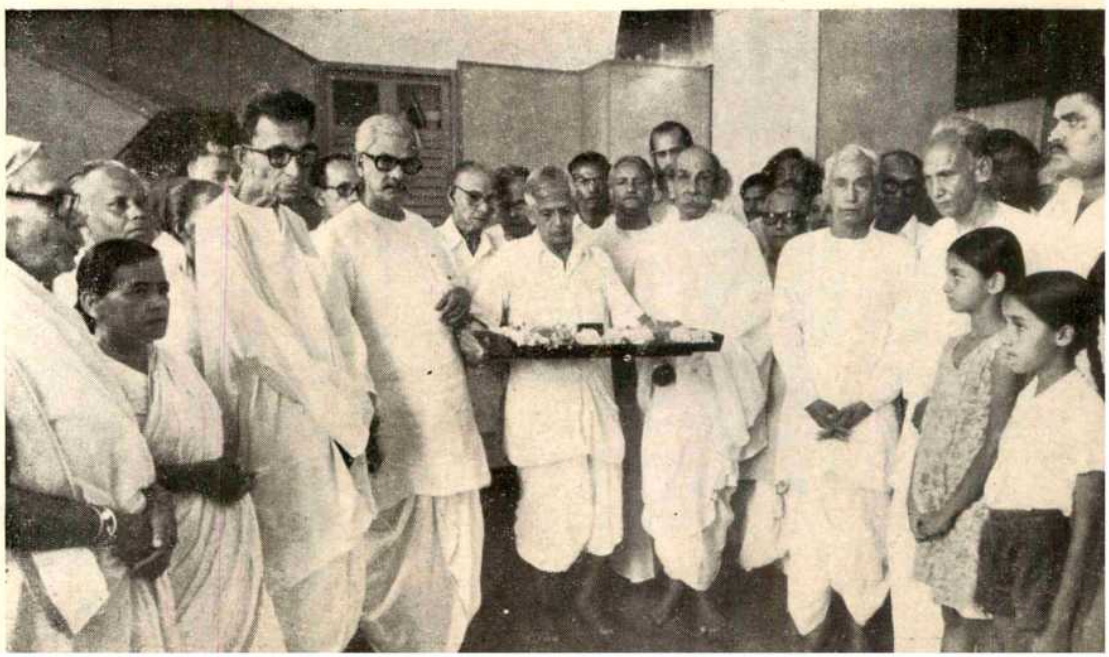
কান্নার মত ভারী—
মরণের নীল নিচোলী দিয়ে ঢাকা।

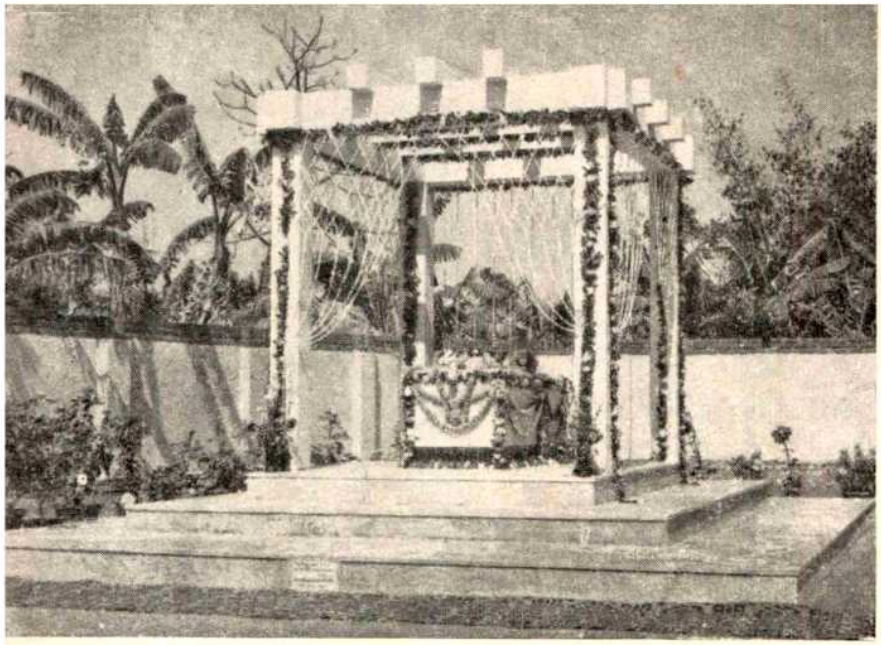
ওই অচিন নদীর পথে
এক শ্মশান-সন্ন্যাসী চলেছে পথ দেখিয়ে
হাড়ের বাঁশি বাজিয়ে···
চারিদিকে ঘর বাড়ী, ভাঙা সাঁকো,
জ্যোৎস্না-ঢালা সুখ
উদাসীন মৃত্যুতে বিলীন।

ওরা এবার নদী পার হবে—
সে-নদীর জল অশ্রুর মত স্বচ্ছ
বিরহের মত গভীর
মায়ের আকুল ডাকের মত অতল ॥



১০.৪.৭৬ তারিখে চব্বিশ পরগণা মালায় শ্রীঅরবিন্দ সাধনপীঠে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহাবশেষ সংস্থাপনার জন্য শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে আনা হচ্ছে।





মেদিনীপুর জেলার বালিচকে ৭.২.১৯৭৬ তারিখে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের প্রাঙ্গনে পবিত্র মর্মর বেদীতে দেহাবশেষ সংস্থাপনা করছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস।









বালিচক শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে এবং মালায় শ্রীঅরবিন্দ সাধনপীঠে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহাবশেষ সংস্থাপনা উৎসবে ভাষণ

মাননীয় রাজ্যপাল, মাননীয়া শ্রীমতী ডায়াস, পূর্তমন্ত্রী শ্রীসেন, জেলাশাসক শ্রীঘোষ এবং সমবেত আমার ভাই ও ভগ্নীগণ, বালিচক শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র দেহাবশেষ নিয়ে আসা হল, বলতে হয়, শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং আপনাদের কাছে এলেন। আপনাদের হৃদয়ের রাজাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। এ এক দিব্য-অভিষেক। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পুরোভাগে আজ পেয়েছি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-প্রধান মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়কে। দিব্য-অভিষেকের এ এক রাজকীয় অনুষ্ঠান। রাজকীয় বলতে আমরা যা বুঝি, এ অনুষ্ঠান তার চেয়েও অনেক বড়। কেননা আমরা কেউ প্রজা নই। যে রাজার রাজা আজ আপনাদের মধ্যে এলেন, আমরা সবাই তাঁরই অংশ, সুতরাং সবাই রাজা। গ্রামের মানুষ, দরিদ্র দুঃখী মানুষ, সাধরণ মানুষ আমরা, কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা আপন গৌরবে অধিষ্ঠিত হই, সেই মুহূর্তেই আমরা প্রত্যেকে হয়ে উঠি অসাধারণ। শ্রীঅরবিন্দের পূত দেহাবশেষ আজ আপনাদের সকলকে সেই গৌরবে অভিষিক্ত করছে। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও কতবার বলেছেন, ভারতবর্ষ মানেই গ্রামীণ-ভারত। ভারতের শক্তি, ভারতের গৌরব, ঘুমিয়ে আছে গ্রামের মাটিতে। গ্রামের মানুষই দেশের রাজা। তাই তিনি বলতেন, গ্রামকে জাগাও, গ্রামের মানুষকে জাগাও। তারা না জাগলে দেশ জাগবে না। শ্রীঅরবিন্দের স্বরাজ হল তাই গ্রামীণ-স্বরাজ—গ্রামই স্বাধীনতার বীজমন্ত্র —"village is the seed of Swaraj"।

প্রায়ই একটা কথা শোনা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ, তাঁর বাণী সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের বোধগম্য নয়, উচ্চ-শিক্ষিত কিছু লোক কেবল তা বুঝতে পারে। এ অত্যন্ত ভুল কথা। সাধারণ ভারতবাসী নিরক্ষর হতে পারে, কিন্তু তারা তাই বলে অশিক্ষিত নয়। ক্ষেতের মাটিতে যেমন থাকে উর্বরাশক্তি, তেমনি এই সব মাটির মানুষের মধ্যেই রয়েছে আবহমান কাল ভারতের ইতিহাসের মর্মবাণী, তার সংস্কৃতি তার ধর্মের তার ত্যাগ-বৈরাগ্যের সহজ অধিকার। আর শ্রীঅরবিন্দ হলেন সেই শাশ্বত ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি। তাই শ্রীঅরবিন্দের বাণী দেশের সাধারণ মানুষ যত সহজে ও যত আপন করে বুঝতে পারবে তেমন করে আর কেউ বুঝবে না। শ্রীঅরবিন্দ অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন, ভগবানকে কোথায় পাব ? ভগবান ধনীর বিলাস-কক্ষে নেই ; তিনি আছেন গরীবের দুঃখীর পতিতের ভগ্ন-কুটিরে। ভগবান বিদ্যা, সম্ভ্রম, লোকমান্যতা, লোকপ্রশংসা, বাহ্যিক স্বচ্ছন্দতা বা শিক্ষা পাণ্ডিত্য দেখেন না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ভগবান দুঃখীর নিকটেই দয়াময়ী মাতৃরূপ প্রকাশ করেন। তাই সেই গ্রামের মানুষের মধ্যে, আপনাদের সকলের মধ্যেই আজ শ্রীঅরবিন্দ আসন করে নিলেন। আপনারা প্রমাণ করে দিলেন তথাকথিত শিক্ষিত শহরের মানুষদের চেয়ে আপনারা শ্রীঅরবিন্দকে অনেক বেশি বুঝেছেন ও অনেক বেশি আপন করে নিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র দেহচিহ্ন বুকে ধারণ করে বালিচকের মাটি আজ পবিত্র হল, পুণ্যভূমি হয়ে উঠল। দেবতার চরণের একটি নির্মাল্য অথবা এক কণা প্রসাদের মধ্যে, আপনারা জানেন, কতখানি আশীর্বাদ ও কৃপা সঞ্চিত থাকে। আর সেখানে আপনারা আজ পেলেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের পূত দেহাবশেষ।—মহাদেব যেমন শিরে স্বর্গের গঙ্গাকে ধারণ করেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দও তেমনি সাধনা করেছিলেন অতিমানস মহাশক্তিকে পৃথিবীর বুকে, মানুষের জীবনে নামিয়ে আনার জন্য। সে এমন এক মহাশক্তি যা পৃথিবী ধারণ করতে সমর্থ ছিল না। মাটির

পাত্রে সোমমদিরা রাখলে পাত্র যেমন চূর্ণ হয়ে যায়, তেমনি সেই অতিমানস শক্তির অবতরণে পৃথিবীও চূর্ণ হয়ে যেত। তাই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনপূত দেহে সেই শক্তির অবতরণ করিয়ে দেহত্যাগ করলেন। আপনারা জানেন, আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে, সাধারণ মানুষের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দেহত্যাগের পরেও শ্রীঅরবিন্দের জ্যোতি-র্মণ্ডিত দেহ থেকে দিব্য আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিল পাঁচদিন ধরে। শ্রীঅরবিন্দের সেই অতিমানস-তেজপুঞ্জ-কলেবরের পূত দেহাবশেষ আজ বালিচকের বেদীতে সংস্থাপিত হল, আমি বিশ্বাস করি, সেই সঙ্গে আপনাদের প্রত্যেকের জীবন, প্রীত্যেকের হৃদয় সেই দিব্য শক্তির, ভগবৎ কৃপার স্পর্শ লাভ করল। একটি সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক নবজীবনের দীক্ষা হল। তাই বলছিলাম, সকলের এ এক দিব্য-অভিষেক।

আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এই মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের আরো কত গৌরবের স্মৃতি। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম প্রথম শ্রীঅরবিন্দ বিভিন্ন জেলায় জেলায় গিয়ে সংগঠনের কাজ পরিচালনা করতেন, সভা সমিতিতে উপস্থিতও থাকতেন কিন্তু বক্তৃতা দিতেন না। সর্বদা তিনি অন্তরালে থেকে কাজ করতেই ভালবাসতেন। একবার এক সভায় বিপিন পাল বক্তৃতা করছেন, জনতা থেকে দাবী উঠতে লাগল, তারা শ্রীঅরবিন্দের বক্তৃতা শুনতে চায়। বিপিন পাল তখন বলেছিলেন, "শ্রীঅরবিন্দ কিছু বলবেন না। তিনি যদি মুখ খোলেন তাহলে দেশে আগুন জ্বলে উঠবে।"

সেই নির্বাক-বহ্নি শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম জনসভায় বক্তৃতা করেন এই মেদিনীপুরের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে। সত্যিই আগুন জ্বলে উঠেছিল। অগ্নিযুগের অগ্নিতরঙ্গ তুলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

মুরারীপুকুর বাগানে তৈরী প্রথম যে ডিনামাইট সেটাও ব্যবহার করা হয় এই মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে।

তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত মহাকালীর অগ্নিসন্তান প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম, সে-ও তো এই মেদিনীপুরেরই ছেলে। তাই খুবই স্বাভাবিক শ্রীঅরবিন্দ আবার আপনাদের মধ্যে আসন করে নিলেন। আবারও তিনি ডাক দিয়েছেন, তাঁর মুক্তির ডাক। কেবল রাজনৈতিক মুক্তি নয়, জীবনের এক সর্বাত্মক আধ্যাত্মিক মুক্তির ডাক। আপনারা সেই ডাকে সাড়া দিয়েছেন, শ্রীঅরবিন্দের কথা শুনেছেন, "humanity in God, of God in humanity"—মানুষের মধ্যেই ভগবান আবার ভগবানের মধ্যেই সকল মানুষ। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা হল মানুষের সেই অন্তরতম ভগবানকে কেবল মন দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে নয়, প্রাণে দেহে ও কর্মে গ্রহণ করা। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, সাধনা করতে হলে কাজের মধ্যে নাম, জীবনের মাটিতে এসে দাঁড়াও। তবেই দুঃখের জীবনের পরিবর্তে গড়ে উঠবে ভাগবত জীবন, আধ্যাত্মিক নবজীবন।

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির বালিচকে যে সাধনার ক্ষেত্র রচনা করল সে সাধনা হল আমাদের সকলের জীবনকে নূতন আকারে নূতন ভাবে পুনর্গঠন করার সাধনা। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এতদিনের যত্ন, শ্রম, আগ্রহ ও আরাধনায় যে কেন্দ্র পড়ে উঠেছে, তাকেই জীবনকেন্দ্র করে আমাদের প্রত্যেকের জীবনও নতুনভাবে গড়ে উঠবে। আদর্শকে বাইরে রূপ দেওয়ার অর্থ হল নিজেদের জীবনকেও নতুন করে রূপ দেওয়া। সব সৃষ্টিই তাই আত্মসৃষ্টি।

১৯৬৮ সালে নভেম্বর মাসে গ্রামের কয়েকজন মিলে যে ক্ষুদ্র পাঠচক্র প্রথম স্থাপিত হয়েছিল ষ্টেশনের ধারে একটা ছোট্ট টিনের চালাঘরে তা আকারে যতই সামান্য হোক তাৎপর্যে কিন্তু সামান্য ছিল না। কেননা তার মধ্যে ছিল এক আন্তরিক বিশ্বাসের জোর। সেই জোরে আপনারাও বল পেয়েছেন আর এই পাঠমন্দিরও ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সকলের জীবন এবং সমস্ত গ্রামই কি বড় হয়ে ওঠেনি? গত বৎসরে পাঠমন্দিরের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রধানবিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, আজ আমাদের সামনে মাননীয় অতিথি হিসাবে এসেছেন মহামান্য রাজ্যপাল, মাননীয়া শ্রীমতী ডায়াস, পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেন, তাছাড়াও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন জেলা-শাসক মহাশয়। এদের উপস্থিতি এখানকার সকলেরআন্তরিক প্রচেষ্টায় এক আশ্বাস ও ভরসাস্বরূপ। এদের শুভেচ্ছা, সাহায্য ও সহযোগিতা আমরা বরাবরই পেয়ে এসেছি। ১৯৭২ সালে যখন শ্রীঅরবিন্দের পূত দেহাবশেষ কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দ ভবনে নিয়ে আসা হয় তখন মাননীয় পূর্তমন্ত্রী

মহাশয়ের সহৃদয় সহযোগিতা ও সাহায্য না পেলে হয়তো সম্ভবই হ'ত না। এবং শ্রীঅরবিন্দ সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের সদা উৎসাহ ও পৃষ্ঠ-পোষকতার জন্যই শ্রীঅরবিন্দ ভবনের পরিচালনা ও তার উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। এবং এও এক আনন্দের কথা যে, শ্রীঅরবিন্দ ভবনে শ্রীঅরবিন্দের পূত দেহাবশেষ তিনিই সংস্থাপন করেছিলেন এবং সেদিনও আমাদের মাননীয়া অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী ডায়াস। আর আজও শ্রীঅরবিন্দের দেহাবশেষ বালিচকে সংস্থাপনা করতে তাঁকে ও শ্রীমতী ডায়াসকে আমরা পেয়েছি। আর আমাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে সফল করবার জন্য যিনি সর্বতোভাবে সকল অবস্থায় সাহায্য করেছেন তিনি আমাদের মাননীয় জেলাশাসক শ্রীদীপক ঘোষ মহাশয়। এমন নির্ভীক আদর্শবান কর্মকুশল জেলা-অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাতে যদি আমরা পেতাম তাহলে সারা বাংলার চেহারা হয়তো অনেক আগেই পালটে যেত বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের নিজেদের আদর্শে যদি নিষ্ঠা থাকে, আন্তরিকভাবে যদি আমরা চাই, তাহলে এঁদের সকলের সাহায্য আমরা যে পাব তাতে আমার কোন সংশয় নেই। কেননা, বালিচক শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরকে সার্থক করতে হলে এখনও কতকগুলি আবশ্যিক কাজ করা বাকী রয়েছে ; যেমন, প্রথমতঃ, একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যাই হল সত্যকার আলো। এই পাঠমন্দির যাতে সারা গ্রামের জীবনে আলো হয়ে ওঠে তারই জন্য চাই একটা লাইব্রেরী, এবং লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিক ও অন্ত দু'একজন কর্মীও। দ্বিতীয়তঃ, সভা ও আলোচনার জন্য পাঠমন্দিরের দ্বিতলে একটি বড় হল ঘর তৈরী করা দরকার। তাছাড়া পাঠমন্দিরের প্রাত্যহিক রক্ষণাবেক্ষণের পরিচর্যার জন্যও দু'একজন কর্মী দরকার। এর একটা নিয়মিত ব্যয় আছে, তা কেবল গ্রামের মানুষের সীমিত অর্থ-সামর্থ্যের উপর নির্ভর করতে পারে না। সেখানে সরকারের একটা কর্তব্য রয়েছে। তৃতীয়তঃ, গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, যারা এখানকার ভবিষ্যৎ, তাদের উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশে গড়ে তোলা একটি প্রয়োজনীয় কাজ। শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, জীবনের ব্যবহারিক ও সামগ্রিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা, শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে মায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুসরণে ছোট্ট ছেলেমেয়েদের জন্য একটা স্কুল এবং খেলাধূলা ও শারীরচর্চার জন্য একটা মাঠ ও উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থা। এমন একটা আদর্শ নিয়ে কাজে নামলে, আমার বিশ্বাস, দেশের সরকারই সবার আগে এগিয়ে আসবেন সাহায্যের জন্য। আজকে দেশের চারিদিকে যে আত্ম-জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে তাতে নিঃসন্দেহে এ আশা করা যায় যে আমাদের সাহায্যের অভাব হবে না।

তাছাড়া যে যেভাবে পারেন, যার যেমন সামর্থ্য, সেই অনুসারে এখানকার সবাই তো এগিয়ে এসেছেন, তাই সকলকেই এই সুযোগে আমার অভিনন্দন জানাই :—সর্বশ্রী মিহির লাল দাস, সত্যচরণ দে, হরিপদ শাসমল, বিষ্ণুপদ শাসমল, অমিয়পদ শাসমল, সুনীলকান্তি প্রধান, বিজনবিহারী পাল, শশাঙ্কশেখর মাইতি, ভবানীশঙ্কর দে, অম্বিকাশঙ্কর দে, ভবতারণ পাত্র, জগবন্ধু দে, তারক পণ্ডিত, অমূল্য সামন্ত, সুনীল কুমার দাস, হরিপদ খাটুয়া, কাশীনাথ পাল, কৃষ্ণপদ মান্না, ডাঃ দেবপ্রসাদ দে, কিশোরী মোহন চৌধুরী, ডাঃ মদন মোহন বেরা, রবীন্দ্রনাথ বেরা, এম. এল. এ, অভয় ঘোষাল, অজিত ভৌমিক, সমর পাত্র, সনৎ দাস প্রমুখ।

এইভাবে আমরা যদি সকলের জন্য সকলে এক হয়ে এগিয়ে আসি তাহলে স্বয়ং ভগবান এসে আমাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করবেন। তারই আহ্বান আর প্রতিশ্রুতি নিয়ে আজ পাঠমন্দিরের এই পবিত্র বেদী স্থাপিত হল।

ওঁ শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমা শরণং মম।

বালিচক
৭.২.১৯৭৬

মালায় শ্রীঅরবিন্দ সাধনপীঠে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহাবশেষ সংস্থাপনা উৎসবে ভাষণ

মাননীয় পূর্তমন্ত্রী শ্রীসেন ও আমার ভাই ভগ্নীগণ, আজ আমরা যে সাধনপীঠে সমবেত হয়েছি তার একটা নীরব মাহাত্ম্য রয়েছে। যাঁকে নিয়ে এই উৎসব, এবং যে স্থানে এই উৎসব, এই দুয়ের যোগাযোগ অনেক কালের। এই

সাধনপীঠ পশ্চিম বাংলার নির্জন গ্রামপ্রান্তরে একটি প্রাচীন পীঠস্থান। সেই ১৯০৫ সালে, যখন শ্রীঅরবিন্দ প্রথম বাংলায় এলেন, তিনি এসে কি দেখলেন এই দেশে? কথায় বলে, ভাবে ভক্তিতে বাঙালী, কিন্তু তখন গোটা একটা পরাধীন জাতি তলিয়ে রয়েছে অশিক্ষা দারিদ্র্য আর হতাশার অন্ধকারে। আলস্য আর দুর্বলতার মধ্যে বাঙালীর ভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে নিছক ভাবালুতা, আর ভক্তি পর্যবসিত হয়েছে ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে। শ্রীঅরবিন্দ বুঝলেন, জাতির অন্তরের ভাব ও ভক্তিকে বলিষ্ঠ স্থায়ী করে ধরতে হলে শক্তি চাই, বলবীর্য চাই। দেশের জীবনকে সার্থক করে গড়ে পিটে তুলতে হলে তাকে তপস্যা দিয়ে ধরতে হবে। নরম মাটির এই দেশকে শক্তির পীঠস্থানে পরিণত করতে হবে। তাই স্বদেশী যুগে এই কথাই জোর দিয়ে বলা হ'ত, সুজলা সুফলা আমাদের দেশ, কিন্তু তাই বলে অনাবাদি জমির উপরে দাঁড়িয়ে কেবল "সুজলাং সুফলাং" গান গাইলেই তো জমিতে ফসল ফলে উঠবে না। তার জন্য পরিশ্রম করা চাই। জমিকে আবাদ করে তবে তো সোনা ফলাতে হবে। এই হল জীবনের অনুশীলন। শ্রীঅরবিন্দের স্বরাজগঠন ও জীবন গঠন তাই একই সাধনা।

শ্রীঅরবিন্দের সেই অনুপ্রেরণা নিয়ে, এই গ্রামেরই একটি আদর্শবান তরুণ, তখনকার দিনে এফ. এ. ক্লাশের ছাত্র চারুদা' একটা পাঠশালা খুললেন। এই ক্ষুদ্র পাঠশালা ক্রমে বড় হয়ে উঠল। যেখানে আদর্শ আর নিষ্ঠা আছে, সেখানেই শক্তি জেগে ওঠে। এবং আলোর মতই তা প্রসারিত হয়ে চলে। পাঠশালা বেড়ে উঠে হল "জনার্দন ইনস্টিটিউশন"। সেখানে কেবল বইপড়া-বিদ্যা নয়, ছেলেমেয়েদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং চরিত্রগঠনই ছিল প্রধান আদর্শ। ছেলেরা স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান, বিদ্বান না হলে দেশের স্বাধীনতা দাঁড়াবে কোথায়? তাই শ্রীঅরবিন্দের স্বরাজ আন্দোলনের গোড়াতেই আমরা দেখি তাঁর শিক্ষা-আন্দোলন, তাঁর জাতীয় শিক্ষা —আদর্শ শিক্ষার প্রবর্তন। তাঁর স্বদেশী তাঁর গ্রামস্বরাজ গ্রামেরই পুনরুজ্জীবন।

এমনি করে শ্রীঅরবিন্দের জীবনসাধনার যে গভীর আদর্শ তা প্রথম থেকে পরিণতি পর্যন্ত একই সূত্রে গাঁথা। কিন্তু ক্রমেই তা তীব্র হয়েছে, দিক পরিবর্তন করেছে, বহুমুখী ও প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু সেই শক্তির ধারা ও লক্ষ্য একই। আর আশ্চর্য, তাঁরই জীবনের গতির সঙ্গে সমতা রেখে এই সাধনপীঠও নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছে। "জনার্দন ইনস্টিটিউশন" থেকে "প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ" তাই থেকে "শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ' এবং সবশেষে নাম নিল "শ্রীঅরবিন্দ সাধনপীঠ"। এ কেবল বিদ্যাপীঠই নয়, এ হল শ্রীঅরবিন্দের সাধন ও শক্তিপীঠ। শুধু মনের ও শরীরের শক্তি নয়, তারও ঊর্ধ্বের ও গভীরের এক আধ্যাত্মিক তপঃশক্তি। স্বদেশীর মধ্য দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ এই তপঃশক্তিরই বোধন চেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন, লাখ লাখ শিষ্য চাই না। খাঁটি আমিত্বশূন্য একশ মানুষ পেলেই গোটা দেশের চেহারাটা বদলে যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের সেই "খাঁটি মানুষ" গড়ার সাধনারই এক নিভৃত কেন্দ্র হল এই সাধনপীঠ। সকল রকম প্রচার বাক্-বাহুল্যতা থেকে দূরে সরে নির্জনে কেবল আত্মগঠনের নিরলস তপস্যা হল এই কেন্দ্রের ব্রত। কেননা সকল সাধনাতেই, শ্রীঅরবিন্দের সাধনাতে তো বিশেষ করে, তত্ত্বের এবং কথার চেয়ে নীরব কর্মের গুরুত্ব অনেক বেশি। মুখের কথা সত্যের কেবল একটু আভাস কিংবা একটু ইঙ্গিত দিতে পারে, কিন্তু সত্যকে লাভ করতে হলে তাকে অন্তর দিয়েই পেতে হবে। নীরব আত্মজাগরণের ভিতর দিয়ে জীবন দিয়ে ফলিয়ে ধরতে হবে। কেননা আমাদের জীবন যা হয়ে আছে, আর যা হতে পারে, এই দুয়ের মধ্যে যে দূরত্ব তা কেবল কথা দিয়ে পূর্ণ করা যায় না। তা কেবল জীবন দিয়েই সার্থক করা যায়। এখানকার অনাড়ম্বর পরিবেশ, নিঃশব্দ কর্ম, চাষবাস শিক্ষা ও জীবনচর্যার মধ্যে সেই কথাই আমাদের বলছে। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহাবশেষ এখানে এল সেই জীবনব্রতে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে। শক্তি ও আশ্রয় হয়ে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত, শ্রীঅরবিন্দের জন্মস্থান কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবন ছাড়া, পশ্চিম বাংলায় আর যে কটি স্থানে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহাবশেষ এসেছে তা সবই হল পল্লীগ্রাম। সাধারণ অশিক্ষিত দরিদ্র সব গ্রামের মানুষের বুকভরা ভালবাসা ও আরাধনা নিয়ে গড়া যে পবিত্র বেদী সেখানেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দিব্য আসন পেতেছেন। এ থেকে কেবল এই কথাই প্রমাণ হয় যে,

যাদের নিয়ে এই দেশ, এই সব দরিদ্র সাধারণ মানুষ, যাদের শ্রীঅরবিন্দ এত ভালবাসতেন, তারাই শ্রীঅরবিন্দকে বেশি করে চেয়েছে, বেশি করে পেয়েওছে। যাদের আর্থিক সম্বল নেই, যারা প্রচার জানে না, বক্তৃতা জানে না, শুধু জানে নীরবে আপন দুঃখকষ্টের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দকে ও মাকে ভালবাসতে, তাদের সেই নিঃসম্বল জীবনের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দ বারবার তাঁর রাজাসন পেতে বসেছেন। এ এক আশ্চর্য করুণা, আপনাদের আশীর্বাদে আমি তা বারে-বারে প্রত্যক্ষ করেছি, শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহাবশেষ নিয়ে পশ্চিমবাংলায় জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে পরিক্রমার সময় দেখেছি সাধারণ মানুষের অশ্রু আপ্লুত নীরব চোখের দৃষ্টিতে সেই দিব্য করুণার ছবি। আজো এখানে তাই দেখছি। আপনাদের সকলের অন্তরে শ্রীঅরবিন্দ মায়ের প্রতি এই যে ভালবাসা তাকে আমি প্রণাম করি।

ওঁ নম শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমা শরণং মম।

মালা

১০.৪.১৯৭৬

—হিমাংশু নিয়োগী

THE COLLECTED WORKS
OF
NOLINI KANTA GUPTA

Volume One
Volume Two
Volume Three
Volume Four
Volume Five

The collected works of SRI NOLINI KANTA GUPTA, shed a new light on the pressing problems of Man and his future. In the context of the present bewildering conditions of the world, they have a special relevance, and it is hoped that they will aid the modern man in his search of new hope for a new life of unity and harmony.

size : Double demy
pp : 406

Cloth Binding with attractive art-paper jacket.

Price Rs. 15·00 Each

Available at :

SRINVANTU
63, College Street
Calcutta-12
Ph : 34-1351

Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-12
Ph : 34-2376

Published by ; Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry-2

—রচনাবলী—

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র বাংলা রচনা-সংগ্রহ একত্রে আটখণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, যোগ, ইত্যাদি জীবনের মর্মসত্যের বাস্তব বিশ্লেষণে এবং শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের জীবন-সাধনার গভীর ভাব-অবগাহনে তা সিদ্ধ-স্নাত।

সুদৃশ্য মনোটাইপে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ডবল-ডিমাই সাইজের পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার প্রতিটি বৃহৎ খণ্ড রেক্সিন ও বোর্ড বাঁধাই, মুদ্রণ ও গ্রন্থণ পারিপাট্যে সৌন্দর্যে চিত্তাকর্ষক।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। মূল্য—২৫·০০ দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ

সম্পূর্ণ রচনাবলীর গ্রন্থসূচী

সাহিত্য ও শিল্পকলা

প্রথম খণ্ড : ১। সাহিত্যিকা, ২। রূপ ও রস, ৩। আধুনিকী, ৪। শিক্ষা ও দীক্ষা, ৫। রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় খণ্ড : ১। শিল্পকথা, ২। কবির্মনীষী-১ম, ৩। কবির্মনীষী-২য়, ৪। কবির্মনীষী-৩য়

তৃতীয় খণ্ড : ১। বাংলার প্রাণ, ২। মৃতের কথোপকথন, ৩। গানের গান, ৪। ফরাসী যোড়শী, ৫। মারিয়ানা (ফরাসী নাটিকা), ৬। তিন্তাজিলের মৃত্যু (ফরাসী নাটিকা) ৭। অনুবাদমালা (কবিতা)

দেশ-সমাজ-রাজনীতি

চতুর্থ খণ্ড : ১। ভারত-রহস্য, ২। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান, ৩। স্বরাজের পথে, ৪। স্বরাজ-গঠনের ধারা, ৫। শ্রীঅরবিন্দ ও বর্তমান যুদ্ধ, ৬। কালের আহ্বান

পঞ্চম খণ্ড : ১। ভাবীসমাজ, ২। বোলশেভিকি, ৩। নীট্‌শের বাণী, ৪। নারীর কথা, ৫। স্মৃতির পাতা-১ম, ৬। স্মৃতির পাতা-২য়

ধর্ম-সাধনা—জ্ঞান-বিজ্ঞান

ষষ্ঠ খণ্ড : ১। ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা, ২। বেদমন্ত্র, ৩। উপনিষদ—কথা ও কাহিনী ৪। নব্যবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান

সপ্তম খণ্ড : ১। পূর্ণযোগ, ২। দেবজন্ম, ৩। সাধকের কথা, ৪। চেতনার অবতরণ, ৫। আলোর পথে-১ম, ৬। আলোর পথে-২য়, ৭। এ যুগের সাধনা, ৮। তিন কাহিনী, ৯। শতাব্দীর প্রণাম, ১০। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'

সম্প্রতি আবিষ্কৃত আদি কালের রচনা সম্ভার

অষ্টম খণ্ড : "আদি লেখা"

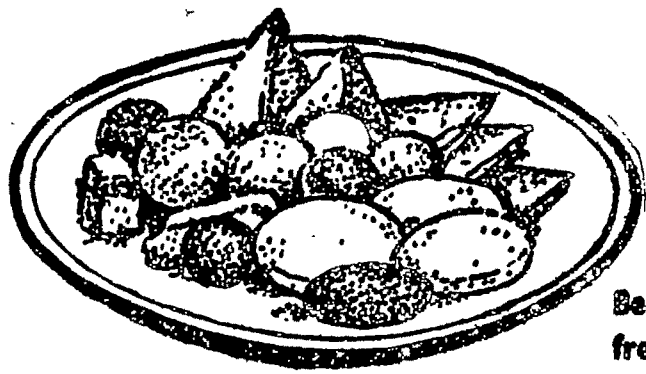
৬৩, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
৩৪-১৩৫১

শৃণ্বন্তু

শ্রীঅরবিন্দ ভবন
৮, শেক্সপীয়র সরণী
কলিকাতা-১৬

Telephone

VANASPATI COOKS A DELICIOUS MEAL— SO WHOLESOME TOO.



Because it's fresh and pure and enriched with Vitamin A and D

Always ask for Telephone Vanaspati. People love its taste. It's a delicious cooking medium. So good for curries, fried foods, western and oriental cooking. It's economical and so pure. Always fresh, it's enriched with Vitamin A and D for extra goodness. Remember to ask for :

Telephone

VANASPATI

cooking medium that's wholesome.



A produce of Swaika Vanaspati Products Ltd.

Give all you have, this is the beginning.
Give all you do, this is the way.
Give all you are, this is the fulfilment.

—The Mother



THE HOOGHLY MILLS CO., LTD.

MANUFACTURERS & EXPORTERS

10 CLIVE ROW,
CALCUTTA-1.

Telegraphic Address
"VICTO" Calcutta

Telephone No
22-5451 (2 Lines)
Codes : Acme & Bentley's
Second Phrase

SRINVANTU PUBLICATIONS

সাবিত্রী—শ্রীঅরবিন্দ	...	৩·০০
মধুময়ী মা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২·০০
মধুময়ী মা (২য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২·৫০
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪·০০
কবির্মনীষী (৩য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪·৫০
Light of Lights—Nolini Kanta Gupta	..	4·00
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	..	১·৫০
শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' উপাখ্যান—শ্রীমণিবিষ্ণু চৌধুরী	...	৩·৫০
আলবার পদাবলী—শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	...	১০·০০
মায়ের অবতরণ কেন ?	...	০·৫০

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র বাংলা রচনাবলী প্রকাশের অপেক্ষায় (৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ)
তন্মধ্যে রচনাবলী : প্রথম খণ্ড : 'সাহিত্যিকা' প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য ২৫ টাকা

SRINVANTU

63, College Street,
Calcutta-12
Phone : 34-1351

Sri Aurobindo Bhavan
8, Shakespeare Sarani
Calcutta-16, Phone : 44-3057

॥ 'শৃণ্বন্তু'-র নিয়মাবলী ॥

বৈশাখ হতে 'শৃণ্বন্তু'-র বর্ষ আরম্ভ। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া চলে। বার্ষিক চাঁদা সডাক দশ টাকা, ষাণ্মাসিক পাঁচ টাকা, প্রতিসংখ্যা এক টাকা। ছয় মাসের কমে গ্রাহক তালিকাভুক্ত করা হয় না।

প্রতি বাংলা মাসের ৯।১০ তারিখে 'শৃণ্বন্তু' প্রকাশিত হয়, যথাসময়ে পত্রিকা না পেলে ১৫ দিনের মধ্যে জানালে ভাল হয়।

ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তন করতে হলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হলে 'শৃণ্বন্তু' অফিসে জানাবেন। চিঠিপত্রাদিতে যোগাযোগের সুবিধার জন্য গ্রাহকগণ যেন তাঁদের নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সর্বদা উল্লেখ করেন।

'শৃণ্বন্তু'-র চাঁদা মনিঅর্ডার যোগে অথবা পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টও গ্রহণ করা হয়। ভি. পি.-তে পত্রিকা পাঠান হয় না।

বাৎসরিক চাঁদা শেষ হয়ে গেলে তিন মাস অপেক্ষা করা হয় এবং কাগজ যথানিয়মিত পাঠান হয়ে থাকে এরই মধ্যে গ্রাহক যদি চাঁদা না পাঠান বা কোন কিছু জ্ঞাত না করান তাহলে পত্রিকা পাঠান সম্ভব নয়।

লেখকদের প্রতি আবেদন, তাঁরা যেন রচনার নকল রেখে পাঠান। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়।

কর্মাধ্যক্ষ : 'শৃণ্বন্তু'

ভগবান আমার একমাত্র আস্পৃহা, প্রতিদিন যেন ক্রমে তোমাকে আরো ভাল করে জানতে পারি, আরো ভাল করে সেবা করতে পারি। বাহিরের অবস্থায় কি এসে যায়? প্রতিদিন মনে হয় তা যেন ক্রমে আরো নিরর্থক আরো মায়াময় হয়ে চলেছে। বাহিরে যা ঘটে তার উপর আমার মনোযোগ ক্রমেই কমে আসছে; কিন্তু যে জিনিষটির মূল্য আমার কাছে বেড়ে চলেছে, যার উপর আমার মনোযোগ তীব্র হয়ে উঠেছে—তা হল, তোমাকে ভাল করে জানা, যাতে ভাল করে তোমাব সেবা করতে পারি। সকল বাহ্য ঘটনা এই লক্ষ্যের দিকে একমুখী হবে, শুধু এই লক্ষ্যেরই দিকে—আর তা নির্ভর করে কি চক্ষে সে-সব ঘটনা আমরা দেখি তার উপর। সকল জিনিষের মধ্যে নিরন্তর তোমাকে আবিষ্কার করবার, সকল অবস্থার মধ্যে ক্রমে সুষ্ঠুতর তোমাকে প্রকাশ করবার সঙ্কল্প—এই মনোভাবের মধ্যেই রয়েছে পরমা শান্তি, পরিপূর্ণ প্রসন্নতা, সত্যকার তৃপ্তি। তাকেই ধরে জীবন প্রস্ফুটিত হয়, বিস্তৃত হয়, প্রসারিত হয় এমন মহৈশ্বর্য্য নিয়ে এমন পরিপ্লাবনের মহিমা নিয়ে যে কোন ঝঞ্ঝাবাত্যাই তাকে আর বিক্ষুব্ধ করতে পারে না।

ভগবান, তুমি আমাদের রক্ষাকবচ, আমাদের একমাত্র সুখ তুমি; আমাদের প্রোজ্জ্বল জ্যোতি, বিশুদ্ধ প্রেম, আমাদের আশা, আমাদের শক্তি, তুমি আমাদের জীবন, আমাদের সত্তার সদ্‌বস্তু।

শ্রদ্ধায় পুলকে পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে তোমায় অর্চ্চনা করি, প্রণাম করি।

মার্চ্চ ১২, ১৯১৪ —শ্রীমা

★

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের

প্রতি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

—লীনা

—রীমা

The National Tape Loom Co

Manufacturers of SILK, COTTON & GLASS TAPES

7, LYONS RANGE

3rd Floor, Room No. 2

Calcutta-1

Phone : Office : 22-3718/5066

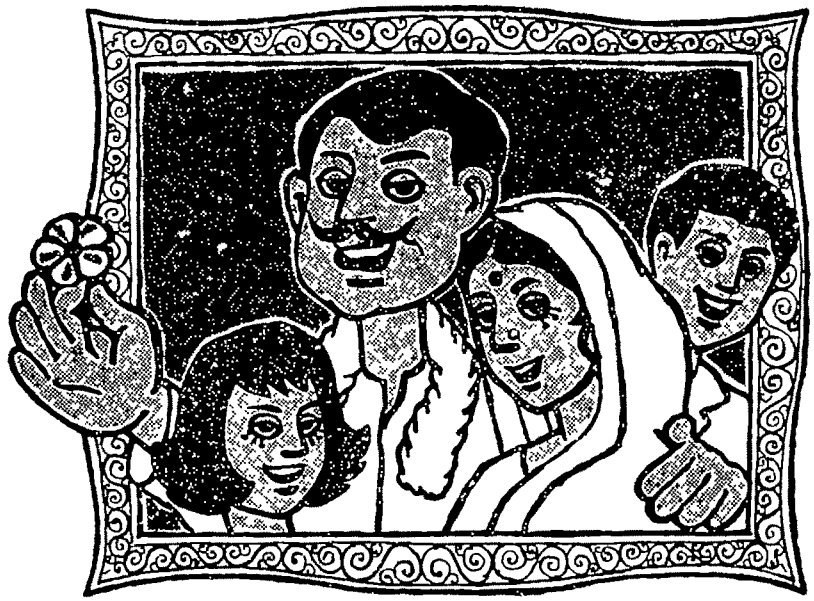
Love of God, charity towards men is the first step towards Perfect wisdom.

—Sri Aurobindo

★

Cargo Surveyors
Analytical Chemists
Gram : JUTASPECTA
Telex : NOPROB CA 2414
Phone : 240046/47

ESKAPS (INDIA) PRIVATE LTD.
30, Chowringhee Road
Calcutta-700016



মাসিক সঞ্চয়ের সহজ পথ, গড়বে সুখের ভবিষ্যৎ

১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদী

ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট

★প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে, ২৫ বছর পরে পাবেন ১,৩৩,৮০০ টাকা

প্রতিমাসে সঞ্চয় তো করবেনই কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। ভেবে দেখুন কি ভাবে ও কতটা সঞ্চয় করলে আপনার ও আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটতে পারে আর আপনিও নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

॥ মাসিক সঞ্চয় ও আয়ের তালিকা ॥

মাসিক সঞ্চয়	১০ বছর পরে পাবেন	১৫ বছর পরে পাবেন	২০ বছর পরে পাবেন	২৫ বছর পরে পাবেন
১০৲	২০৬৬৲	৪১৮০৲	৭৬৬০৲	১৩,৩৮০৲
২০৲	৪১৩২৲	৮৩৬০৲	১৫,৩২০৲	২৬,৭৬০৲
৫০৲	১০,৩৩০৲	২০,৯০০৲	৩৮,৩০০৲	৬৬,৯০০৲
১০০৲	২০,৬৬০৲	৪১,৮০০৲	৭৬,৬০০৲	১,৩৩,৮০০৲

প্রতিমাসে-যতটা সম্ভব সঞ্চয় করুন। এই প্রকল্পে আপনার সঞ্চয় থেকে আয় অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১ ✲ ফোন : ২৩-৯৭৮৪-৫-৬,
অথবা যে কোন শাখা অফিস

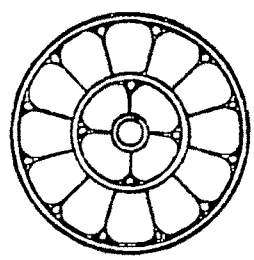
Progressive/UIB 12/73

28 MAY 197

শ্রীঅরবিন্দ

অতীতে মানুষ যা করেছে চিরকাল তারই পুনরাবৃত্তি করে চলা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ হল অভিনব সিদ্ধি, অচিন্ত্যপূর্ব ঈপ্সিতা সব অর্জন করা।

—শ্রীঅরবিন্দ





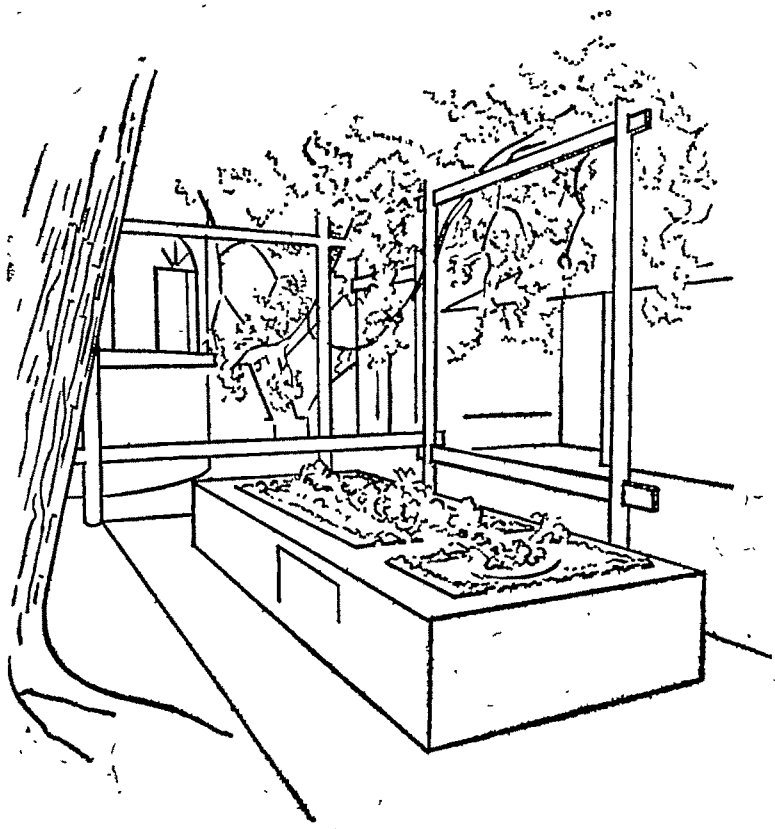
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা :

শ্রী নলিনী কান্ত গুপ্ত

পঞ্চবিংশতি বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • আষাঢ় ১৩৮৩

শুভশ্রী

পঞ্চবিংশতি বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা
আষাঢ় : ১৩৮৩



সূচী—

শ্রীঅরবিন্দ
সাবিত্রী ৯৮
'সাবিত্রী' সম্বন্ধে পত্রাবলী ১০৬
ভবিষ্যতের কবিতা ১১২

শ্রীমা
যোগ-জীবন ১০৫
মায়ের ঘরোয়া কথা ১০৩

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
মার্কসতন্ত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ৯৩

সাহানা দেবী
শ্রীঅরবিন্দের চিঠি ১১০

অনির্বাণ
কাজরী (কবিতা) ১১৭

মণি বাগচি
পণ্ডিচেরী তীর্থে ১১৯

সম্পাদক : অমলেশ ভট্টাচার্য
প্রকাশক ও মুদ্রক : নিখিলকান্ত গুপ্ত
সম্পাদকীয় কার্যালয় : শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮ শেক্সপীয়ার সরণী, কলিকাতা-১৬
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে
মুদ্রিত এবং 'শুভশ্রী' কার্যালয়, ৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
ফোন : ৩৪-১৩৫১

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক সডাক : দশ টাকা

আষাঢ় ১৩৮৩ পঞ্চবিংশতি বর্ষ ৩ তৃতীয় সংখ্যা

আদি লেখা

মার্কসতন্ত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

['উত্তরা' শারদীয়া ১৩৫৩, তৃতীয় সংখ্যা]

যে মতবাদ আধুনিক মনকে অধিকার করেছে, যাকে আশ্রয় করে আজকালকার মানুষ সমাজকে,রাষ্ট্রকে দেখতে ও চালাতে চেষ্টা করছে সে মার্কসীয় নীতির প্রতিষ্ঠা বা কয়েকটি মূলসূত্রের কথা আজ বলতে চাই। মার্কসপন্থীরা সমাজ-গঠন ধারাকে, তার ঐতিহাসিক পরিণতিকে দেখেছেন একটা বিশেষ ভঙ্গিতে, একটা বিশেষ দিক দিয়ে। আমাদের দেশে সমাজকে যেমন দেখা হয় বর্ণ ও আশ্রম হিসাবে—বৃত্তির অথবা স্বভাব ও প্রকৃতিগত আদর্শের ছাঁচে, ইউরোপে দেখা হয় শ্রেণী হিসাবে, যথা—রাজা-রাজপরিষদ, অভিজাত-শ্রেণী, যাজকশ্রেণী. মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণী—অর্থাৎ ক্রিয়া-কর্মের মান-মর্যাদা, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির প্রকার ও মাত্রা হিসাবে। মার্কসপন্থীরাও এই শ্রেণী-বিভাগের উপর জোর দিয়েছেন—তবে এ শ্রেণী বিভাগের আবার একটা বিশেষ দিকের উপর, অর্থশক্তির উপর।

তাই বলা হয়, সমাজে যে রূপ বদলায় তার একমাত্র যদি না-ই হয় তবু প্রধান হেতু আর্থিক ভারসাম্যের পরিবর্তন। "জগৎটা কার বশ?—জগৎ টাকার বশ" এই হল মার্কসীয় সূত্র। এক এক যুগে এক শ্রেণী অর্থবান হয়ে ওঠে,—অর্থ উপার্জন হয় একটা বিশেষ উপায়ে, সমাজের সমস্ত কাঠামো তৈরী এই বিশেষ উপায়ের প্রয়োজন ও তাগিদে—তারাই হয় সমাজের মাথা, সমাজের গঠন বৈশিষ্ট্য দেয় তারা, তাদেরই শিক্ষা দীক্ষার ভঙ্গিতে জীবন গড়ে ওঠে, সাহিত্য শিল্প ধর্ম পর্যন্ত বিশেষ রূপ নেয়। এক সময়ে রাজারা, তারপরে অভিজাতেরা এই রকমে রাজত্ব করেছে, আর এক সময়ে যাজকেরা, এ হল ফরাসী বিপ্লবের আগের কথা। ফরাসী বিপ্লবের পরে, রাজা, গজা, অভিজাতশ্রেণী ধ্বংস লাভ করবার পরে অর্থ সম্পদ গেল একদল বুদ্ধিমান, সাবধানী চতুর সঞ্চয়ী শ্রেণীর হাতে—তারাই হল মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্তদের যুগ শেষ হয়েছে, এখন আসছে গণরাজ্য, শ্রমিক কর্তৃত্ব।

মার্কসবাদ এখানে বলছে এই যে ক্রমপরিবর্তন এটা চলেছে যন্ত্রের মত—একটা অব্যর্থ নিয়ম অনুসরণ করে এবং

সে নিয়ম তাঁরা আবিষ্কার করেছেন—তাই হল dialectics ব্যতিরেকী ক্রিয়া, গতি-বৈপরীত্য। জিনিস যে মুহূর্তে জন্মেছে সেই মুহূর্তেই মৃত্যুকেও সে ডেকেছে। জিনিস যেমন পুষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে, ততই পতনের সম্মুখীন হয়ে চলেছে। সমাজের বিশেষ ব্যবস্থা যে নষ্ট হয় তা বাহিরের কোন আক্রমণের বা শক্তির ক্রিয়ার ফলে নয়—তার ভিতরের শক্তির ক্রমবর্ধমান চাপেই সে ফেটে পড়ে—Ruat mole sua, ঈসপের মণ্ডুকের মত। রাজশক্তির অভিজাতশক্তির ঠিক এই রকমেই পতন হয়েছে। তারপর উঠেছে, বলেছি, মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শক্তি—এ শক্তির চরম প্রকাশ হল মহাজনীদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব—আজ যা হয়েছে। এই প্রভুত্বের বিপুলত্ব আপনার মধ্যে ইতিমধ্যে আপনার থেকেই ফাটল সৃষ্টি করেছে এবং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাকে সরিয়ে তার স্থানে আর এক নব শক্তির অভ্যুদয়—গণশক্তি, দীন দরিদ্র কায়িক শ্রমীদের রিক্তদের নিঃস্বদের শক্তি। এর মধ্যে আকস্মিক আগন্তুক আরোপ কিছু নাই—সিদ্ধান্ত থেকে সিদ্ধান্তের অব্যর্থ অনিবার্য অনুগমন এ ধারাবাহিকতা।

মার্কসবাদের প্রত্যুত্তরে, বলা বাহুল্য, প্রথম কথা হল, সমাজে যে পরিবর্তন বা ক্রমপরিণতি হয় তার হেতু একমাত্র বা প্রধানতঃ অর্থনীতিক নয়। বহুল কারণের মধ্যে অর্থনীতিক কারণ একটি হতে পারে, এমনকি কারণ না হয়ে কেবল লক্ষণও হতে পারে।

শরীরের ব্যাধির কারণ কি? চিকিৎসা বিদ্যার যখন শৈশব তখন রোগকে একান্ত স্থূল চোখে দেখা হত, শরীরের বাহিরকার একটা ব্যাপার বলে ধরা হত—রোগের প্রতিকার তখন ছিল তাই পোড়ান দাগান রক্তবহিষ্করণ। কিন্তু ক্রমে আবিষ্কার হতে লাগল ব্যাধি একান্তই স্থূল বা বাহ্যশরীরগত নয়—শরীরের মধ্যে যে স্থূল বিপর্যয় এসে পড়ে তা হচ্ছে একটা চিহ্ন বা লক্ষণ মাত্র, তা ইঙ্গিত করে ভিতরের একটা বিপর্যয়। এখন বলতে শুরু করা হয়েছে সে ব্যাধির মূলে আসল কারণে পৌঁছিতে হলে যেতে হবে হয়তো স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে। আরও ভিতরেও কিন্তু পৌঁছান যায়, কিন্তু সে কথা আলাদা।

আমরা স্পষ্টই দেখি মানুষের মধ্যে রয়েছে তার প্রাণ, তার মন এবং যা দেখি না, তার অন্তরাত্মা। প্রাচীর প্রাচীন উপনিষদ এ সম্পর্কে চরম কথা বলে গিয়েছে। দেহকে চাই—দেহও সত্য দেহও ব্রহ্ম—তাই অন্নজ্ঞা, অন্নং বহু কুর্বীত। কিন্তু দেহের পিছনে দেহকে ধরে অনুপ্রাণিত রয়েছে প্রাণ, প্রাণকেও চাই—প্রাণও ব্রহ্ম—প্রাণই জীবনী শক্তি, প্রাণই বলবীর্য। কিন্তু প্রাণের অন্তরেও ছেয়ে রয়েছে, প্রাণকে ধরে প্রদীপ্ত করে রয়েছে মন। মনকেও চাই, মনও ব্রহ্ম। বিচারশক্তি বুদ্ধি মেধা মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের এ হল তৃতীয় পদ। তার উপরে বিজ্ঞানময় বা শুদ্ধ চিন্ময় সত্তা—ব্রহ্মের এই তুরীয় পদে মানুষের সত্যকার চেতনা, শক্তি, সৃষ্টির অনুপ্রেরণা। মানুষ মন প্রাণ দেহের গঠন, পরিবর্তন, তার ক্ষেত্র কর্ম আয়তনের নবব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে ঐ ঊর্ধ্বতর স্তর থেকে আসে যে ভাব যে প্রেরণা তাদের সহায়ে।

মার্কসতন্ত্র প্রথমতঃ মানুষকে, তার সমাজকে খণ্ডিত সঙ্কীর্ণ করেছে দেহের পাকস্থলীকে সর্বস্ব ও সর্বপ্রধান করে। যাকে বড় কথায় বলা হয় ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা তার সাদা কথায় অর্থ এ ছাড়া আর কি? আধুনিক কবির ভাষায় man is what he eats (Renald Bottrall)।

মার্কসতন্ত্র অনুসারে বলতে হয় শরীরের ছাপ ছাড়া প্রাণের উপর আর কোন ছাপ নাই, মনের এই প্রাণের ছাড়া আর কোন ছাপ নাই, যদি আত্মা থাকে তার উপর এক মনের ছাপ ছাড়া আর কোন ছাপ নাই। আর এক দিক দিয়ে ফ্রয়েড যেমন বলছেন মানুষের সব বৃত্তি সব সৃষ্টি—সর্ব নিম্ন হতে সর্বোচ্চ পর্যন্ত সব—হল কামাবেগের রকমফের; মানুষের সাহিত্য শিল্প, মানুষের শৌর্য বীর্য, মানুষের ধর্ম প্রেরণা, অধ্যাত্ম সাধনা সব হল কামাবেগের রূপান্তর মাত্র। মার্কসতন্ত্র অনুরূপ প্রণালীতে সিদ্ধান্ত করেছে যে আহারবৃত্তি—অর্থাৎ কি রকমে মানুষ আহার্য উৎপাদন করে (অশন, আর তাতে বসনও যোগ করা চলে), এবং কতখানি তা নিজের কাজে ব্যবহারে লাগতে পারে তার উপর নির্ভর করে মানুষের অন্যান্য কৃতিত্বের মাহাত্ম্য, স্বরূপ, ধরন-ধারণ।

তবে স্বীকার করা যেতে পারে—প্রাচীনতর কালে এই অর্থনীতিক দিকটা লোকের নজরে তেমন পড়ে নাই, ভিতরে ভিতরে এই শক্তিটি যতখানি কাজ করে চলেছে, তার যথাযথ মূল্য দেওয়া হয়নি। সমাজের অন্যান্য বা ধারার উপর যে পরিমাণ সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে—যেমন রাজ

নীতিক বা সমাজনীতিক—অর্থনীতিক দিক তত জাগ্রত করে দেখা হয়নি। এক হিসাবে দেখা যেতে পারে এই অর্থনীতিক দিকটা যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মানুষের সভ্যতা, জীবন-ব্যবস্থা তত এগিয়ে গিয়েছে, উন্নত হয়ে চলেছে। সেই জন্য অন্যান্য যুগ সভ্যতার নিম্নতম পৈঠায় রয়ে গিয়েছে বলতে হয়; আজকাল মার্কসীয় দীক্ষায় অনুপ্রাণিত জ্ঞানদীপ্ত মানুষ বিবর্তনের উচ্চতর স্তরে উঠে গিয়েছে। পূর্বতন যুগে মানব সমাজের ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র মাথায় উঠে বাকী অধিকাংশের উপর আপন প্রভুত্ব ও কৃতিত্ব ফলিয়েছে—সুতরাং সে সব হল ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত স্বার্থের আদর্শ—আজ যে আদর্শ তা মানব-জাতির অধিকাংশের আদর্শ। একথা সত্য মানবজাতির অধিকাংশই অশন বসন নিয়ে ব্যাপৃত—অন্নময় পুরুষই তাদের প্রায় সবখানি। কিন্তু সংখ্যাধিক্য কি আদর্শের মহত্ত্ব নির্ণয় করে?

আমরা বলতে চাই ঠিক বিপরীত কথা। মানুষের জীবনরহস্য যেমন তার দেহের মধ্যে নেই, সে রহস্য তার অন্তরাত্মার মধ্যে—তেমনি সামাজিক জীবনের আদর্শও অর্থনীতির মধ্যে নেই, সে রহস্য সমাজের অন্তঃপুরুষের মধ্যে। দেহ মূল নয়, মূল হল আত্মা—প্রাণ-মন দেহ হল শাখা-প্রশাখা, ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ—মাটির নীচে নয়, ঊর্ধ্বে ব্যোমরাজ্যে সৃষ্টির ব্যষ্টির গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা। অর্থনীতিক ব্যবস্থা মানুষের সৃষ্টিকে সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এ হল ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়া—সহজ স্বাভাবিক সত্য হল মানুষের নিভৃত সত্তার চেতনার ধর্ম ও প্রয়োজন তার আর সকল ক্ষেত্র সৃষ্টি করে নিয়ন্ত্রিত করে।

মার্কসবাদ বা এই জাতীয় মতবাদ এই রকম কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্ত এবং সন্দেহজনক স্বতঃসিদ্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটা হল, শাসক বা শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন হলেই রাষ্ট্রের ও সমাজের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধরনও পরিবর্তিত হবে। দ্বিতীয়তঃ সংখ্যাধিক্যই অধিকারের মাত্রা নির্ণয় করে।

প্রথমটি সম্বন্ধে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমাদের সন্দেহ জেগে ওঠে। আমরা দেখেছি যুদ্ধবিগ্রহ করে, সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তার করে কেবল সেই রাষ্ট্রই নয় যার মাথায় একজন একচ্ছত্র অধিপতি—রাজা বা Imperator, বা Consul বা Fuhrer বা Duce. একটি গোষ্ঠী বা দল (ধনের বা মানের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক) সেই একই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। শুধু তাই নয়, যাকে বলা হয় গণতন্ত্র—সর্বসাধারণের কর্তৃত্ব যেখানে—সেখানেও দেখি ঐ একই ধর্ম দেখা দিয়েছে। মনে হয় প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটা লিপ্সা আছে এবং সেই রাষ্ট্রের মধ্যে যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শক্তিলাভ করেছে সেই সে রাষ্ট্রধর্মের দাস ও সেবক হয়ে গিয়েছে—লঙ্কায় গিয়ে সবাই রাবণ। তাই দেখি এক একটি দেশে শাসনযন্ত্র কত রকমে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে কিন্তু সে সকলের ভিতর দিয়ে বরাবর সমানে একই রাষ্ট্রনীতি—ধর্ম—কাজ করে চলেছে। স্ট্যালিনকে যদি বলি পূর্বতন "জার"—মাত্র কার্যতঃ, তাতে অনেকে চমৎকৃত হতে পারেন, কিন্তু কথাটা বিচার্য। জার যা করতেন স্ট্যালিন তাই করছেন তবে তাঁর যন্ত্র বা বল ভিন্ন সমাজের ভিন্ন স্তরের লোক এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু ভিতরের প্রেরণা ও প্রবৃত্তি, প্রাণশক্তির গুণ ও ধারা উভয়ত্র একই প্রকারের।

শাসন তথাকথিত প্রোলেটেরিয়নদের হোক্ (রুশ), অথবা বুর্জোয়াদের হোক (জর্মনী ও ইতালি) অথবা টাকাওয়ালাদের হোক (আমেরিকা) কিংবা ক্ষত্রিয়দের (জাপান...এখন বলতে হয় ভূতপূর্ব জাপান) হোক সর্বত্রই দেখি বর্তমান জগতে সকলের কাজকর্ম ধর্মনীতি সব ন্যূনাধিক এক ছাঁচে ঢালা। তারা বাহ্যতঃ ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন রূপে—কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় সকলেই সমানার্থক। আসল প্রয়োজন তাই বাহ্য-ব্যবস্থার নয়, যতি বা ঝোঁকের স্থান পরিবর্তন নয়, প্রয়োজন যে ক্ষেত্রে এই সব যতি বা ঝোঁকের খেলা চলছে, তা থেকে অন্যত্র গভীর বা ঊর্ধ্বে আর একটা ক্ষেত্রে চেতনাকে তুলে ধরা, আর একটা সম্পূর্ণ নূতন ছন্দের দোল নামিয়ে আনা।

তারপর সংখ্যাধিক্যের কথা। সংখ্যায় অধিক হলেই অধিকারের মাত্রা বেশি হবে আজকাল এ হল চলিত মতবাদ, কিন্তু এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ তুলবার দিন এসেছে। প্রথমতঃ বাস্তব জগতে উক্ত মতবাদের সমর্থন দেখি না। অন্যান্য শাসনতন্ত্রের কথা ছেড়েই দিলাম, যে সব রাষ্ট্র গণতন্ত্র বলে বিবেচিত—নানা মাত্রায়—ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী (প্রাচী, এখন বলতে হয়) এসব স্থানে বাস্তবিক কি দেখি? কয়েকজন প্রধানের কর্তৃত্ব, অধিকাংশ

অর্থ বলের জন্য প্রধান, অল্প কয়েকজন চরিত্রবল এবং আদর্শ বলের জন্য প্রধান। এদেরই অনুসরণ করে সমর্থন করে কোন রকমে প্রভাবান্বিত বশীভূত হয় দলে দলে লোক সব। রুশিয়াতেও এ বাস্তব সত্যের ব্যতিক্রম নয়। বলা যেতে পারে, বিপ্লব ঘটে ঠিক এই কারণে এবং এই পথেই—প্রধান হয়ে উঠে—যখন কেবল আপনার নিজের বা পার্শ্বচরের একান্ত স্বার্থ সাধনের জন্য ; কিন্তু প্রাধান্যের লক্ষ্য যখন সর্বজনের সেবা তখন তার রূপ আর অর্থ অন্য রকম।

আমরাও তাই বলি সংখ্যাধিক্যের নিজস্ব কোন মূল্য বা মর্যাদা নাই—তার মূল্য মর্যাদা আসে যখন তা একজনের বা এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মূল্য মর্যাদা প্রতিফলিত করে সংখ্যাধিক্যের ; সকলের অশন বসন বেঁচে-বর্তে থাকবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একটা সমাজের জীবনের আদর্শ কেবল ওই পর্যন্ত নয়—অন্য রকম কৃতিত্ব, মহত্তর কর্ম শিক্ষাদীক্ষা সমুন্নতি দেখাতে হবে। কেবল অন্নপ্রাণময় প্রাণী হয়ে থাকলে চলবে না—তাকে মনোময় মানুষের যথাসম্ভব সুষ্ঠুতম পরিচয় দিতে হবে।

আর শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ সম্ভব একটা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী একটা বিশেষ শ্রেণীরই মধ্যে। এ রকম অন্যায় আবদার করলে চলবে না যে, সকলেরই সমানভাবে সংস্কৃতির শিক্ষাদীক্ষার অংশীদার হতে হবে। সকলের প্রয়োজন একটা কিছু সংস্কৃতি শিক্ষাদীক্ষার অংশীদার হওয়া নিশ্চয়ই—সকলের পক্ষে রাস্তা পরিষ্কার থাকা উচিতও নিশ্চয় কিন্তু তাই বলে এ ভুল করলে চলবে না যে, সকলেরই সামর্থ্য যোগ্যতা সমান। সর্বত্র সর্বযুগে হয়েছে হবেও এই যে কতিপয় শ্রেষ্ঠরাই সমাজের স্বভাব ও স্বরূপ দিয়ে গড়ে চলবেন।

সকলে অশন বসন লাভ করুক কিন্তু এ কথার অর্থ নয় যে জীবনের উচ্চতর জিনিসগুলির আবশ্যকতা নেই বা তাদের গৌণ স্থান দিলে চলে। সকলে আপামর সাধারণ শিক্ষাদীক্ষা লাভ করুক, আদর্শ ভাল নিশ্চয়—কিন্তু কাজটি যখন অবিলম্বে সম্পাদন করে ফেলতে ব্যস্ত হই তখন শিক্ষাদীক্ষার আদর্শটা আমাদের বাধ্য হয়ে খাট করতে হয় —Three R-এর কথা বলছি না—সকলেরই অক্ষর পরিচয় হোক আপত্তি নাই, কিন্তু জ্ঞানের পরিবর্তে বাগবৈখরী, মেধার পরিবর্তে তর্ক, প্রণিধান শক্তির পরিবর্তে সমাচার সংগ্রহ হয়ে ওঠে শিক্ষাদীক্ষার স্বরূপ যেখানে বহুল প্রসারই হয় তার মুখ্য লক্ষ্য।

শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে মার্কসীয় দৃষ্টির বিশেষত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয় - তাতে মার্কস-তন্ত্রের স্বরূপ আর এক রকমে স্পষ্ট ভাবে ধরা দেয়, তাই সে বিষয়ে এখানে কিছু আলোচনা করতে চাই। মার্কসীয়-তত্ত্ব বলে আভিজাতিক বা বুর্জোয়া শিল্পসৃষ্টি—তা আভিজাতিক, বুর্জোয়া বলেই তা প্রোলেটরিয়ন নয় বলেই—অসত্য নিরর্থক ও নিকৃষ্ট হতে বাধ্য। আজ আমরা শেক্সপীয়রকে বাতিল করতে চাই, কারণ তিনি রাজা-গজা-বুর্জোয়াদের কথা বলেছেন, তিনি ঐ শ্রেণীর সভাকবি। অবশ্য শেক্সপীয়রে যে অতিসাধারণ হরিজন স্তরের ব্যক্তিদের কথা নাই তা নয়, এবং তাদের জীবন্ত চিত্র যে তিনি দেন নাই তাও বলা চলে না। কিন্তু মার্কসপন্থীরা আপত্তি করেন—শেক্সপীয়র নিজে বুর্জোয়ার বুর্জোয়া ছিলেন, তিনি অতি সাধারণের প্রাণের খবর কি জানেন? বুর্জোয়ারা যখন proletariat-এর কথা লেখেন সে হল amateurish—আসল গণসাহিত্য শিল্প হবে যখন গণ নিজে তার সাহিত্য শিল্প রচনা করবে—গর্কি যেমন পথ দেখিয়েছেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে কতখানি জট রয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। প্রথমতঃ একথা সত্য নয় যে এক গণই গণকে জানে বুঝে, গণের আশা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে, শেক্সপীয়র নিজে বুর্জোয়া ছিলেন, তিনি রাজা রাজপরিষৎ-পার্ষদ, অভিজাতদের মহিষ্ঠদের স্বরূপ স্বভাব সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত করেন নাই? মানুষের কল্পনাশক্তি আছে, আর এমন কল্পনা আছে যা হল একাত্মানুভূতি। গান্ধীজী নিজে হরিজন নন, অথচ তাঁর চেয়ে কোন হরিজন তাদের আশা ভরসা বেশি সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করতে পারে? সেণ্ট ফ্রান্সিস নিজে পতিত ছিলেন না, অথচ পতিতদের সঙ্গে সমচিত্ত তাঁর চেয়ে কার ছিল বেশি? গণজনের নেতা কার্যতঃ দেখা যায় প্রায়ই আসে 'উপরের স্তর' থেকে।

দ্বিতীয় কথা, সত্য সৌন্দর্য মহত্ত্ব কোন গোষ্ঠীরই এক-চেটিয়া নয়—শ্রেণীর, বাহ্য রূপের বা ব্যবহারের উপর ও জিনিস নির্ভর করে না। যদি গভীরে যাওয়া যায় তবে গণের মধ্যে যেমন, বুর্জোয়া অভিজাতের মধ্যেও তেমনি ওদের সন্ধান মেলে—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। মার্কসতন্ত্রীরা

কিন্তু আপত্তি তোলেন—এমন কথাও লেখা হয়েছে দেখেছি যে প্রেম যে কি বস্তু তা অশিক্ষিত সাধারণ লোকই জানে—বুর্জোয়াদের মধ্যে অভিজাতের মধ্যে ও জিনিসটি নানা খাদের সাথে মিশ্রিত থাকে, এক গণের মধ্যেই তার নিজস্ব স্বরূপ নিয়ে ব্যক্ত হয়। এ কথার উত্তর নাই।

তৃতীয় কথা, যদি ধরেই নেওয়া হয় যে অভিজাত আর বুর্জোয়ার দিন চলে গিয়েছে, এখন গণের যুগ, তার অর্থ এমন নয় এ গণ এখন বা বেশির ভাগ গণ যে ধরনের সেই ধরনের হবে বা থেকে যাবে অর্থাৎ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত, অসংস্কৃত অজ্ঞান অসংযত।

প্রাচীনতর যুগে মানুষের সৃষ্টি যে এত মহৎ এত সমুচ্চ ছিল—কি অধ্যাত্ম সাধনায় কি শিল্পে কি কর্মে তার কারণ এই যে তখন সৃষ্টির ভার ছিল মুষ্টিমেয়ের উপর। এবং এই মুষ্টিমেয় শিক্ষায়-দীক্ষায় তাদের কাজের জন্য আপনাদের বিশেষ রকমে তৈরী উপযোগী করে তুলেছিল। ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখি দুটি গুণ মানুষের ক্রম পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। একদিকে ক্রমেই তার বেড়েছে ব্যাপকতা প্রসারতা, অন্যদিকে তেমনি কমে এসেছে উচ্চতা প্রগাঢ়তা। বৈদিক ঋষি যে বলছেন,

যস্য বিশ্বে হিমবন্তো মহিত্বা
অথবা সমুদ্রে যস্য রসামিদাহুঃ

যার মহিমার বলে এই সব হিমগিরি মাথা তুলেছে, ওই সাগরের মধ্যে ডুবে গিয়েছে নদীর জল—

আমি দেখতে চাই আধুনিকের কোন কবি কবি-প্রেরণার এমন সমুচ্চ শিখরে বা গভীর অতলে পৌঁছেছেন। আধুনিক যুগে শিক্ষাদীক্ষা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, জনসাধারণ আপনার সম্বন্ধে সচেতন সজাগ হয়েছে। কিন্তু এই প্রসারের ফলে সব জিনিসেরই ওজন হ্রাস পেয়েছে—তাদের সহজ সুলভ তরল করে দেওয়া হয়েছে। পূর্বতন যুগে তপস্বীরা যে তপস্যা করত, শিল্পীরা যে স্বাধ্যায়রত ছিল, যে আত্ম-সংযম আত্মানুশীলন সব কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠা ছিল আজকাল সে সকল জিনিস প্রয়োজন বোধ হয় না। কলিযুগে নামেই নাকি মুক্তি।

কিন্তু এ হল প্রকৃতিকে প্রবঞ্চনা করবার বৃথা চেষ্টা। গণ-সাধারণ সমাজের মাথা যদি হতে চায় তবে তাকে তদনুরূপ যোগ্যতা আগে অর্জন করতে হবে। নতুবা আমার হাতে কাস্তে বা হাতুড়ি, সুতরাং আমি সমাজের রাজা এ হল অরাজকতার রাজপথ। জনসাধারণের পক্ষে এই যোগ্যতা অর্জন অর্থ কেবল তিনটি R শিক্ষা নয়—কেবল এডুকেশনই নয়—প্রয়োজন স্বভাবের একটা সাধনা, চরিত্রের একটা শুদ্ধি ও সামর্থ্য। অন্য কথায় শূদ্রেরা যখন ব্রাহ্মণ, সত্যকার ব্রাহ্মণ হয়ে উঠতে পারবে, তদনুরূপ প্রকৃতি অর্জন করতে পারবে তখনই গণরাজ্য লাফল্য লাভ করবে তার পূর্বে নয়।

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

২য় পর্ব—বিশ্ব পর্যটক

৬ষ্ঠ সর্গ—বৃহত্তর প্রাণলোকসব এবং তাদের দেববৃন্দ

(৩)

○

প্রত্যেক লোকেই এই মহিমার কাজ সৃষ্টি করা।
পৃথিবী স্বর্গ নরকেও সে মহাশক্তি একই;
প্রতি নির্বন্ধে রয়েছে তারই বিরাট হস্তনির্দেশ।
অগ্নির অধিদেব সে সকল সূর্যকে প্রজ্বলিত করে,
মাহাত্ম্যে শক্তিতে সর্বজয়ী সে ঃ
বাধার উৎপীড়নের মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করে ভগবানের অনুশাসন মান্য ক'রে ঃ
চিন্ময় সত্তা বর্তে রয় অনস্তির প্রতিষ্ঠার পরে,
বিশ্বশক্তি বিশ্বমায়ার অভিঘাত পার হয়ে চলে যায় ঃ
নির্বাক যখন তখন সে মহাবাক্, জড় যখন তখন মহাবল।
এখানে অধঃপতিত, মৃত্যুর অজ্ঞানের দাস,
প্রেরণা তবু তাকে নিয়ে চলে মৃত্যুহীন বস্তুসবের অভিমুখে,
গতি তার লাভ করবে অজ্ঞেয়ের জ্ঞান।
নিশ্চেতন, শূন্যমাত্র, তবু সুপ্তি তার সৃষ্টি করে জগৎ এক।
একান্ত অদৃশ্য যখন তখনই তার বিপুলতম কর্ম;
অণুর অন্তরে নিহিত, সমাহিত মৃত্তিকাখণ্ডে
খরবেগ আবেগ তার বিরত নয় সৃষ্টিকর্মে।
নিশ্চেতনা হল তার সুদীর্ঘ বিপুল বিরাম,
তার বিশ্বগত মূর্ছা বিরাট এক অধ্যায় ঃ
কালসঞ্জাত সে লুকিয়ে রাখে তার অমরত্ব;
মৃত্যু তার শয্যা, জেগে উঠবার সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে সে।
যে আলো পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে তা যখন প্রত্যাহৃত হয়েছে তখনও,
কর্ম সাধনের জন্য প্রয়োজন যে আশা তা যখন অন্তর্হিত তখনও,

তার উজ্জ্বলতম তারকারাজি কালরাত্রির মধ্যে নির্বাপিত যখন তখনও,
দুর্দশা দুর্গতির কোলে পুষ্ট সে,
বেদনা হল তার দেহের ধাত্রী লালন-পালনকারিণী,
নিপীড়িত অদৃশ্য অন্তঃপুরুষ তার চলেছে তবুও
প্রাণপণে অন্ধকারের ভিতরে কর্ম ক'রে, ক্লেশের ভিতর দিয়ে সৃষ্টি ক'রে ;
চলেছে বহন করে আপন বক্ষের পরে ক্রুশবিদ্ধ ভগবানকে।
হিমশীতল অসাড় নিরানন্দের গহ্বরে
অবরুদ্ধ, উৎপীড়িত সে মহাশূন্যের প্রতিরোধতলে ;
অচল সব সেখানে, অনস্তি শুধু সেখানে,
সেখানেও তবু সে স্মরণ করে আবাহন করে সেই দক্ষতা
অঘটনপটীয়ান্-অদ্ভুতকর্মা দিয়েছে তাকে যা জন্মকালে তার,
তাই সে রূপদান করে ঘুমন্ত রূপহারাকে,
ব্যক্ত করে জগৎ এক কিছুই ছিল না যেখানে।
লোক যত আবদ্ধ মৃত্যুর অধোমুখী আবেষ্টনে,
অজ্ঞানের তামস আনন্ত্যের মধ্যে সেখানে
অসাড় নিশ্চেতন পিণ্ডের মধ্যে স্পন্দন এক,
মহাশক্তির স্তব্ধ ঘূর্ণিরাজির মধ্যে বন্দী হয়ে
জড়ের অন্ধ বধির মূক পীড়নের বশে
প্রশান্ত নিস্তব্ধ সে সুপ্তির ধূসর ধূলিকোলে।
তখন, তার বিদ্রোহী জাগরণের দণ্ডরূপে
লভে সেই কঠোর অবস্থাচক্রের দুর্ভোগ—
আপন যাদুসৃষ্ট যান্ত্রিক চাতুর্যের পরিণাম,
গড়ে তোলে দেবোপম আকার সব মৃত্তিকা হতে ;
আদি প্রাণবিন্দুর মধ্যে জাগিয়ে তোলে তার মূক অমর প্রবেগ,
জীবকোষে এনে ধরে চিন্তার শক্তি, বদ্ধ ইন্দ্রিয়ে বোধ-ক্ষমতা,
বিদ্যুৎ চমকের মত দুর্বল স্নায়ুজাল আশ্রয় করে চারিয়ে দেয় তীব্র বাণীসব,
মাংসপিণ্ড হৃদয়ের মধ্যে অপরূপ ভালবাসা তার,
রূঢ় দেহে এনে ধরে অন্তরাত্মা এক, এষণা এক, কণ্ঠ এক।
ডেকে তোলে সে মায়াবীর যাদুদণ্ডে
সত্তা সব রূপ সব দৃশ্য সব সংখ্যাতীত,
মশাল জ্বালিয়ে ঐশ্বর্য তার দীপ্ত করে ধরে তারা দেশের কালের ভিতর দিয়ে।
এ জগৎ হল তার দীর্ঘ যাত্রা রাত্রি অতিক্রম করে,
সূর্য যত গ্রহ-নক্ষত্র যত দীপ তার পথ আলোকিত করে,

আমাদের বুদ্ধি তার চিন্তার বিশ্বস্ত অংশীদার,
আমাদের ইন্দ্রিয়াবলী তার জীবন্ত সাক্ষী সব।
অর্ধসত্য অর্ধমিথ্যা বস্তু থেকে এঁকে তোলে সে নির্দেশ সব,
প্রয়াস তার, হারিয়েছে যে শাশ্বতকে তার স্মৃতির পরিবর্তে
স্বপ্ন সব বাস্তবে স্থাপন করা।
এই হল তার কর্মাবলী বিপুল এই বিশ্ব-অজ্ঞানের মধ্যে :
যতদিন না অবগুণ্ঠন অপসারিত হয়, রাত্রির হয় অবসান,
আলোকে আঁধারে নিরন্তর চলেছে তার অন্বেষণ ;
কাল হল তার অন্তহীন তীর্থযাত্রাপথ।
এক বিপুল প্রবেগ প্রচালিত করে সকল কর্ম তার।
তার চিরন্তন প্রেমিক হল তার কর্মের প্রেরণা ;
তারই জন্য ছুটে সে নেমে এসেছে অদৃশ্য বৃহৎ লোক হতে
সচল হয়ে উঠতে এখানে এই একান্ত নিশ্চেতন জগতে।
এখানকার কর্মাবলী হল তার আদানপ্রদান তার অদৃশ্য অতিথির সঙ্গে,
তারই মতিগতি সে গ্রহণ করে আপন হৃদয়ে আপন হৃদয়াবেগের আধাররূপে,
সুন্দরের মধ্যে সে ধরে রাখে তার প্রিয়ের সূর্যপ্রভ হাসি।
আপনার বিশ্ব-ঐশ্বর্যের দৈন্যে লজ্জিত হয়ে
সে আপনার তুচ্ছ দান সব দিয়ে প্রিয়ের মহিমাকে সমাদর করে,
আপনার রচিত দৃশ্যাবলীর মধ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিফলিত করে প্রিয়ের দৃষ্টি
আর তার আয়ত অক্ষির চিন্তা-পরিক্রমা সব আমন্ত্রণ করে।
আপনার সহস্র আবেগ পূরিত শক্তির রূপাবলীর মধ্যে নিবাসের জন্য।
অবগুণ্ঠিত সঙ্গীকে আকর্ষণে প্রলুব্ধ করবার জন্য,
আপন বিশ্ব-পরিচ্ছদের মধ্যে তার বুকের পরে ঘন আলিঙ্গনে ধরে রাখবার জন্য,—
বাহুবন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে শেষে ফিরে না যায় তার রূপহারা শান্তির মধ্যে—
এই হল তার মর্মগত ব্রত, এই তার একনিষ্ঠ প্রযত্ন।
তবু যখনই তিনি নিকটতম তখনই অনুভব করে সে দূরতম তিনি।
কারণ তার প্রকৃতির বিধানই হল আত্মবিরোধ।
শক্তি চিরকাল পুরুষের অন্তরে, পুরুষও চিরকাল শক্তির অন্তরে,
এই চিরন্তন বন্ধন শক্তির অজ্ঞাত যেন ;
তাই তার সঙ্কল্প আপন কর্মচক্রে ভগবানকে অবরুদ্ধ করে রাখা,
ধরে রাখা আপনার প্রিয় বন্দীরূপে
বিচ্ছেদ হয় না যেন তাদের আর কখনও কালক্রমে।
চিৎপুরুষের সুপ্তির জন্য বিলাসভূয়িষ্ঠ কক্ষ এক

প্রথমে গড়ে দিল সে অন্তরের গভীর কোণে,
আত্মাপুরুষ সুপ্ত যেখানে বিস্মৃত অতিথি যেন।
এখন শক্তি কিন্তু ফিরেছে এই বিস্মৃতির মায়া ভেঙে দেবে,
সুপ্ত ছিল যে জেগেছে সে প্রস্তরের খচিত-শয্যাপরে ;
এখন সে দেখে পুনরায় সে-আত্মাপুরুষ জাগ্রত রূপের মধ্যে ;
পুরুষের এই জাগরণের আলোকে শক্তিও ফিরে পায় পুনরায়
অর্থ এক মহাকালের এই ব্যস্ততা ও কষ্টকৃত গতিধারার মধ্যে,
আর এই যে মন অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করেছিল একদিন
তার ভিতর দিয়ে চলে যায় অদৃশ্য দেবতার আভা এক।
চিন্ময় আকাশে জ্যোতিষ্মান স্বপ্ন অতিক্রম করে
সৃষ্টি করে সে জগৎ এক রামধনুর সেতু যেন
আদিম নীরবতা আর মহাশূন্যের মাঝে
চলমান বিশ্ব হয়ে ওঠে জাল যেন ;
বুনে চলে সে পাশ এক সচেতন অনন্তকে বেঁধে রাখবে বলে।
জ্ঞান তার রয়েছে গোপন রাখে যা আপন পদক্ষেপ,
মনে হয় এ যেন এক মূক অজ্ঞান সর্বশক্তিময়।
তার কাছে রয়েছে এমন শক্তি যাতে অত্যাশ্চর্য সত্য হয়ে ওঠে ;
অবিশ্বাস্য হল তার নিত্যনৈমিত্তিকের উপাদান।
তার উদ্দেশ্য, তার কর্মাবলী রহস্যময় হয়ে ওঠে ;
পরীক্ষা কর, তারা ছিল যা হয়ে উঠবে অন্য জিনিস,
ব্যাখ্যা কর, তারা হয়ে পড়ে অনির্বচনীয়।
এই আমাদের জগতেই একটা রহস্য রাজত্ব করে এসেছে,
তাকে ঢেকে রেখেছে তুচ্ছ সাধারণের চতুর পার্থিব যবনিকা ;
তার ঊর্ধ্বতর স্তরগুলি যাদুমন্ত্র দিয়ে গড়া।
সেখানেই রহস্য ব্যক্ত করে ধরে তার সমুজ্জ্বল আদি উপাদান,
সেখানে নাই কোন সাধারণ্যের গভীর ছদ্মবেশ ;
সব অভিজ্ঞতাই সেখানে নেপথ্যের তলা হতে,
নিত্য নব আশ্চর্য সব, দিব্য সব অলৌকিক ঘটনা।
অবগুণ্ঠনে ঢাকা রয়েছে এক সত্যের ভার, একটা রহস্যময় স্পর্শ,
রয়েছে সেখানে লুক্কায়িত ইন্দ্রিয়ের গুপ্ত তথ্য।
মাটির মুখোশের কোন ভার নাই তার মুখ পরে,
তবু আপনার মধ্যে আপনার দৃষ্টি হতে সে পালিয়ে যায়।
সব রূপাবলী হল এক অবগুণ্ঠিত ভাবনার ছায়াচিহ্ন

তার দুর্লক্ষ্য উদ্দেশ্য মনের অনুসরণ পরিহার করে যায়,
তবুও তাই হল বিপুল পরিণামধারার আশ্রয়জঠর।
প্রতি চিন্তা প্রতি অনুভব বাস্তব সেখানে,
প্রতি ক্রিয়া প্রতীক একটা, একটা নিদর্শন,
প্রত্যেক প্রতীক লুকিয়ে ধরে রেখেছে জীবন্ত সামর্থ্য এক।
এই শক্তিময়ী একটা বিশ্বসৃষ্টি রচনা করে বহুল সত্য আর
কল্পকাহিনী থেকে,
কিন্তু একান্ত প্রয়োজন তার যে বস্তু সেটি সে গড়তে পারে না;
যা কিছু দেখান হয় সবই হল সত্যের মূর্তি বা প্রতিমূর্তি,
কিন্তু সদ্বস্তু তার নিজের অলৌকিক মুখমণ্ডল লুকিয়ে রাখে
শক্তিময়ীর কাছ থেকে।
সবই তার লভ্য, শাশ্বত অলব্ধ;
অন্বেষণে সবই ব্যক্ত হয়েছে, অব্যক্ত রয়ে গেছে অনন্ত।

অনুবাদ : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

মায়ের ঘরোয়া কথা

বুধবার, ৮.১১.৫৩

আজ ব্যালকনি সকাল দশটা-দশ একটু সকাল সকালই হল। তারপর মা আমাকে একটি খুব বড় গোলাপ দিলেন। আমার হর্ষ উচ্ছ্বাসটি অনুকরণ করে, তিনিও সমস্বরে শব্দ করলেন, "আঃ"। অনুভব করলাম যে এই করুণা গত-কালের আঁতে-ঘা-লাগাটি কাটাবার সুযোগ দান। সামান্য ব্যাপারেও এই অসামান্য সুযোগ দান, তাঁরই করুণার নিদর্শন।

* * *

সোমবার, ৯.১১.৫৩

আজ "early Monday"। সকাল থেকেই দেখা গেল মা ব্যালকনির জন্যে তৈরী। অবশ্য আসতে তাঁর সেই এগারটা বাজল। তারপর সরাসরি ব্যালকনিতে যেতে গিয়েও পারলেন না। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুরস্কার দেবার জন্যে সব বই এসে গেছে। সেগুলি তাঁকে দেখাবার জন্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, পবিত্রর শোবার খাটের উপর। মা ব্যালকনিতে যাবার আগে সেগুলির কিছু কিছু দেখতে আরম্ভ কবলেন। এতই মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন যে পবিত্র সাহস করে একটি চেয়ার এগিয়ে নিয়ে এল এবং মা বিনা প্রতিবাদে তাতে বসে দিব্যি গল্পের বই পড়তে লেগে গেলেন। "Nouvelles Aventures de Massa Kokari" এইটির প্রতিই মায়ের বেশি আগ্রহ ছিল। তার কারণ, শিশুদের গল্পের ক্লাশে তিনি ইতিপূর্বে তিন চার খেপে "মাসা কোকারীর কাহিনী" শেষ করেছেন। তাই নতুন আবার কি তার গল্প তা পড়তে লেগে গেলেন, এবং শেষ পর্যন্ত বইখানি নিজের জন্যেই রাখলেন। অর্থাৎ সেটি শিশুদের ক্লাশে পড়ে শোনাবেন। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ১১-৪০ হযে গেছে, তাই ব্যালকনি দর্শনের পরে আর বেশি কথাবার্তা হল না আজ।

* * *

মঙ্গলবার, ১০.১১.৫৩

আজ "Blessings Day"। তাই অন্যদিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি হবে ব্যালকনি, এ তো জানাই কথা। মা এলেন প্রায় সাড়ে-দশটায়। সুতরাং অত্যন্ত দেরি হয়েছে বলতেই হবে।

ব্যালকনিতে যাবার ঠিক আগে পবিত্রর বিছানায় পাতা নতুন বেডকভার দেখে খুব তারিফ করলেন। অবশ্য সেটি মায়েরই দেওয়া। তারপর তার window-curtain-এর দুরবস্থা দেখে বললেন, সেগুলি বদলান দরকার। হঠাৎ ব্যালকনিতে লাগান নীল পর্দাটি দেখে, একজনের দিকে চেয়ে মা বললেন, "বলতে পার, কেন তুমি আমার চোখের আড়াল করতে এই পর্দাটি টাঙাও? এখন আমি এত দেরিতে আসি যে সূর্য কোন্ কালে মাথার ওপর উঠে গেছে। এখন তো আর পাশ থেকে চোখে আলো পড়ার সম্ভাবনা নেই!"

সে তখন মাকে বলল যে অদূরে সমুদ্রের দিকে চাইলে মায়ের চোখে আলোর ঝলক লাগবে বলেই সে ইচ্ছা করে পর্দাটি টাঙায়। মা হেসে ব্যালকনিতে চলে গেলেন। সে বুঝল আগামী কাল থেকে তার কাজ কমল, পর্দাটা তুলে নিতে হবে।

* * *

বুধবার, ১১.১১.৫৩

ব্যালকনির পর মা পবিত্রর জানলায় পর্দার দারিদ্র্য দেখে কৌতুক করে বললেন, রোজই একবার করে এই ছেঁড়া অংশটার প্রতি আমার চোখ পড়ে।

পবিত্র বলল, তুমি যে বলেছিলে হুমায়ানকে বলতে।

মা বললেন, "না না তাকে বললে হবে না। তার পক্ষে পর্দা দেওয়ার অনেক অসুবিধা আছে।"

আমাদের একজন কৌতুক করে বলল, ওটা তুমিই দিয়েছিলে, ১৯৪৬ সালে। তখন গভর্নর আসত এই ঘরে পবিত্রর সঙ্গে দেখা করতে। মা কৌতুক বোধ করলেন ইতিহাসের তারিখ শুনে।

পবিত্র টিপ্পনী কেটে বলল, ওর স্মরণ শক্তি অদ্ভুত, মাস, বছর, দিন পর্যন্ত বলে দিতে পারে, কবে কি ঘটেছে। মা খুব কৌতুক ভরে হাসলেন।

একজন মাকে উপহার দিল শুকনো একটি ফুল, ও দেশের শীতের ফুল। মা হাতে নিয়ে খুব তারিফ করে ওর দিদিকে বললেন, "এখনই এটি একটি নীলাভ কাগজের উপর ফিতে দিয়ে এটে দাও আমাকে।" সে তাই করে দিল।

* * *

তখন রাত প্রায় সাড়ে-এগারটা। হঠাৎ মা উপস্থিত পবিত্রর সঙ্গে কথা বলতে আমি গমনোদ্যত। যেটুকু শুনলাম, তা এই : বিষয়টি জনকয়েক ছাত্র ছাত্রীর সম্বন্ধে। পবিত্রর কাছে পরীক্ষায় তাদের মনোমত নম্বর না পাওয়ায় তারা দু:খিত হয়েছে এবং মাকে জানিয়েছে প্রতিবাদ করে। ছাত্রীদের মধ্যে একজনের আবার সকলের বেশি নম্বর না পেলে একেবারেই পড়াশুনায় উৎসাহ কমে যায়। ছাত্রদেরও একজন অনুযোগ করেছে যে, তাকে কম নম্বর দেওয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে পবিত্রর ব্যবহারও আগের মত স্নেহপ্রবণ নয়।

সকলদিকের অভিযোগ শুনে মা যা বলতে লাগলেন তার অংশ বিশেষ এই :

"অমুক নম্বর বেশি না পেলে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে পড়াশুনায়। এর চেয়ে বদ অভ্যাস আর কিছু হতে পারে না। পরীক্ষা একবার দেওয়াই তো কথা নয়। সারা জীবনই পরীক্ষা দিয়ে চলতে হবে মানুষকে।

"তোমার (পবিত্রর) সূক্ষ্ম বিচার ও বোধ বড়ই কম। তাই এই সব গণ্ডগোল বাধে। যে-নিয়মটা ছাত্রদের পালন করতে হবে সেটার উপর গোড়া থেকেই জোর দিতে হবে। সেখানে আলগা দিলেই পরে গোল বাধে। শিক্ষক অমুকের কথা বিশ্বাস যোগ্য নয়। তার কারণ, তার নামের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি। কিছুদিন আগে সে আমার সঙ্গে দেখা করে নিজে এই কথা আমাকে বলে, এবং আমার সাহায্য চায়, যাতে এই ব্যাধি থেকে সে মুক্ত হতে পারে।"

[জনৈক সাধকের ডাইরি থেকে]

যোগ-জীবন
প্রশ্নোত্তরে শ্রীমা

১৯৫১ সালের ১২ই মার্চ শ্রীমা বলছেন মনের বদ্ধমূল ধারণাগুলির কারণ সম্বন্ধে। কেমন করে কায়েমী হয় সেগুলি। শেষে বলি, "আমি জানি, ওরা কিছু জানে না," ইত্যাদি কত কথা। এসবের কারণ বোঝাচ্ছিলেন শ্রীমা। বলছেন :

এটি বেশ অদ্ভুত ব্যাপার যে, যার মানসিক ক্রিয়া যত বেশি সে তত বেশি এই ছোট খেলাটিকে প্রশ্রয় দেয়। আর আছে বদ্ধমূল সব ধারণা যেগুলিকে সে আঁকড়ে ধরে থাকে। তাদের সঙ্গে এমন বঁড়সী-গাঁথা হয়ে পড়ে যে মনে হয় তাদের সমস্ত জীবন নির্ভর করছে ওগুলির উপর। আমি এমন লোক জানি যাদের একটি মূল ধারণা আছে, আর তাদের বলতে শুনেছি, "সব কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে যাক, ক্ষতি নেই, কেবল এই ধারণাটি থাকবে টিকে, এটিই সত্য।" কিন্তু যখন তারা যোগের পথে আসে, (মজার ব্যাপার) তাদের এই ধারণাটি আঘাতে জর্জরিত হয় ক্রমাগত সর্বক্ষণ। সব ঘটনা, সব অবস্থা এসে আঘাত করে চলে যতক্ষণ না সেটি টলমল করে ওঠে, শেষে একদিন তারা হতাশ হয়ে বলে, "আমার ধারণাটি হারিয়ে গেল।"

কে একজন প্রায় কবির ভাষায় বলেছিল : "সব কিছুর জন্য সব হারাতে হয়।" কথাটি সত্য, বিশেষ করে মনের পক্ষে, কেননা, যদি তুমি সব হারাতে না জান, কিছুই তুমি পাবে না।

২৬শে মার্চ প্রশ্নটি আবার উঠল :

"সব সময় সব হারাতে জানতে হবে, সব কিছু পাবার জন্য।" এর মানে কি?

শ্রীমা উত্তরে বলছেন :

আমরা তো আগে এ বিষয় আলোচনা করেছি। আমরা যখন যোগের পথে আসি তখন আমাদের প্রিয়জনরা আমাদের ছেড়ে যায় কেন? একজন যে সমস্ত পার্থিব মালিকানা ত্যাগ করল হারাল সব আসক্তি, ছাড়ল তার মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা, কি পাবার জন্য?—সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেই জিনিস একটি মাত্র বস্তু যা মহামূল্য দিব্য চেতনা। আর এটি পাবার জন্য একজনকে হারাতে জানতে হবে পৃথিবীর সমস্ত কিছু, ছেড়ে দিতে হবে নিজের সব অধিকার সব বাসনা-কামনা, সব আসক্তি, সব পরিতুষ্টি। সব ছাড়তে হবে। শিখতে হবে তাকে সে যদি পেতে চায় সেই দিব্য চেতনাকে।

মনের কাছে এসব একটু ধাঁধা লাগায় বইকি।

অনুবাদ : **অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়**

---

* *Questions & Answers*, 1950-51-এর ১৮১ এবং ২২০পৃষ্ঠার অনুবাদ।

'সাবিত্রী' সম্বন্ধে পত্রাবলী

শ্রীঅরবিন্দ

(১২)

"সৌন্দর্য হতে মহত্তর সৌন্দর্যে, আনন্দ হতে তীব্রতর আনন্দে, ইন্দ্রিয়রাজিব একটা বিশেষ বিধিব্যবস্থার ফলে"— নিশ্চয়, এই হবে জড়েব মধ্যে ভাগবত অভিব্যক্তির স্বাভাবিক ধারা, যতই তা ধীর পদক্ষেপে হোক না! "কর্কশ ধ্বনি এবং অপ্রীতিকর গন্ধ" হল চেতনার এবং প্রকৃতির মধ্যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি, তাদের নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। মুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ চেতনায তাদেব স্থান নেই কারণ তা সেখানে পরধর্মী ; যে আত্মা এবং প্রকৃতি যথাযোগ্যভাবে সামঞ্জস্য ধরে বিকশিত হয়ে চলেছে তাদের পক্ষে তা দুঃখ-জনক নয়। এমনকি "ধূমোদ্গারী আগ্নেয়গিরি, প্রলয়ঙ্কর ঝড়ঝঞ্ঝা ও ধাবমান ঘূর্ণিবায়ু" নিজের দিক থেকে তারা মহিমময় সৌন্দর্যপূর্ণ বস্তু সব ; তারা ক্ষতি আনে, বিপদ আনে সেই চেতনায় যা তাদের স্পর্শ সহ্য করতে পারে না, কি রকমে তাদের সম্মুখীন হতে হয় জানে না, জানে না মরুৎ ও হুতাশন দেবতাদের সঙ্গে মিতালি করতে। তুমি ধরে নিয়েছ নিশ্চেতনা থেকে ক্রমবিকাশ হবেই যেমনটি এখানে এবং বর্তমানে, ভিন্নরকমের জড়জগতের সম্ভাব্যতা নেই। কিন্তু জড়প্রকৃতির নিজের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রয়েছে তাতেই দেখিয়ে দেয় যে, সৃষ্টিকে যে হতেই হবে একটা দ্বন্দ্বপূর্ণ, পাপময়, কেবলই উত্তাল চাঞ্চল্যপূর্ণ বেদনাকীর্ণ, তা নয়। অন্তঃপুরুষকে যদি অভিব্যক্তির পথ করে দেওয়া যায় প্রথম থেকে প্রাণধারায় এবং মানসসত্তার ক্রমবিবর্তনধারার দিশারী হয়ে যবনিকা অন্তরালে তাকে বন্দী করে না রেখে তবে বাহিরে অবধি সামঞ্জস্যের মুক্ত প্রবাহ ধরে সে চলতে পারত; তবে যারাই নিজের মধ্যে অন্তঃপুরুষকে অনুভব করেছে কাজ করে চলতে, প্রাণস্তর থেকে কোন হস্তক্ষেপ আসেনি তার উপব, তারাই দেখতে পাবে যে তাব ফল হবে এই কারণ এখানে থাকবে নির্ভুল অনুভূতি, সত্যকার বিবেচনা আব সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম। এরকমটি বাস্তবে যদি ঘটে না থাকে তবে তাব কারণ অপশক্তিবা জীবনকে বানিয়েছে দাবিদার, তাঁবেদাব নয। অপশক্তিরা যে কত সত্য, তাদের কর্মের যে কি ধারা, তাদের প্রযাসের গতি কি তা সন্দেহাতীত ; যাদেবই মধ্যে খুলেছে একটা আন্তরদৃষ্টি তাবাই পেয়েছে এদের অপ্রীতিকর পরিচয়।

—১৯৩৭

* * *

And the articles of the bound soul's contract.[১]

শেষ পদটি নিয়ে আজকাল অনেকখানি স্বাধীনতা গ্রহণ করা হয আমিও এখানে সেই স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি। বহুপূর্বে আমাব প্রথম যুগের কবিতায এই স্বাধীনতা গ্রহণ কবেছিলাম।

—১৯৪৮

* * *

এরা সব স্বর্গ হ'ত না যদি বাধামুক্ত না হ'ত। যে স্বর্গে রয়েছে ভয় তা স্বর্গ নয়। স্বর্গীয় জীবন পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রাণময় নরক যেমন করে, তবে এব অর্থ নয় যে তারা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের রাজ্যে শুধু। অধিমানস পৃথিবীকে প্রভাবান্বিত কবে, অপশক্তিরাও তা করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ নয় যে

১ মুছে দেয় বন্ধ অন্তরাত্মার আদানপ্রদান-বিধি যত।

('সাবিত্রী', ২য় পর্ব, ৮ম সর্গ)

অপশক্তিরা অধিমানসে প্রবেশ করতে পারে—তা তারা পারে না। তারা নষ্ট করতে পারে শুধু সেইটুকু যা অধিমানস পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পারে। ভগবানের প্রতিটি শক্তির (প্রাণ যেমন মন এবং জড়সত্তার মত ভগবানেরই শক্তি) নিজস্ব সামঞ্জস্য রয়েছে তার আপন বিশুদ্ধ তত্ত্বের মধ্যে—বিশৃঙ্খলা এসে যায় তখনই যখন সেই তত্ত্ব বিঘ্নিত বা বিকৃত হয়ে পড়ে। এই হল আর একটি হেতু যার দরুন ক্রমবিকাশ চলতে পারত একটা ধারাবাহিক সামঞ্জস্যের ফলে তা হ'ত না একটা বিসংবাদের ধারা যার ভিতর দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে সামঞ্জস্যকে তার বিক্ষতদেহে অনিশ্চিতভাবে এগিয়ে, চলতে হয়; কারণ ভাগবত তত্ত্ব অন্তরে রয়েছে সর্বদা। প্রত্যেক লোকের রয়েছে আপন আপন স্বর্গ : সূক্ষ্ম জড়ের স্বর্গ, প্রাণময় স্বর্গ, মানস স্বর্গ। যদি বিসংবাদের শক্তি তার মধ্যে প্রবেশ করে তবে তা আর স্বর্গ হবে না।

—১৯৩৭

* * *

There Love fulfilled her gold and roseate dreams
And Strength her crowned and mighty reveries.[২]

"gold and roseate dreams" (সোনালী আর গোলাপী স্বপ্ন সব) পরিবর্তন করা চলে না। "muse" কথাটি দিলে সবটি কৃত্রিম হয়ে উঠবে, এক মাত্র "dreams" কথাটিই যথাযুক্ত এখানে। "reveries" (জল্পনারাজি) কথাটিও পরিবর্তন করা চলে না, কারণ এখানে বিশেষভাবে একটি জল্পনার উল্লেখ করা হয়নি, তারপরে স্বপ্ন পরবর্তী একটা ছত্রের[৩] আরম্ভে চলে গিয়েছে আর-একটি ভাবের মধ্যে এবং সেখানে যথোপযুক্তই হয়েছে। এই ইচ্ছাকৃত পুনরুক্তি আমার কাছে আপত্তিজনক নয়। যাই হোক ছত্রটি পরিবর্তন করা চলবে না। শুধু স্বীকার করতে পারি প্রথম ছত্রটি[৪] সম্বন্ধে এখানে পরিবর্তন করতে পার।

—১৯৪৮

* * *

All reeled into a world of Kali's dance.[৫]

কথাটা world (জগৎ), whirl (ঘূর্ণি) নয়। মানে হল সব একটা সংঘর্ষ এবং বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ঘূর্ণিপাকে চলেছে, এই জগৎ হল কালীর নৃত্য।

—১৯৪৮

* * *

Knowledge was rebuilt from cells of inference
Into a fixed body flasque and perishable,[৬]

"Flasque" কথাটি ফরাসী ভাষা,—শ্লথ, শিথিল গলিতপ্রায়। আমি একাধিকবার চেষ্টা করেছি এ রকমে একটা ফরাসী কথা ঢুকিয়ে দিতে, এই যেমন a harlot empress in a bouge—রূপোপজীবিনী মহারাণী যেন কর্দমের তলে—কতকটা Eliot এবং Ezra Pound-এর ধারায়।

—১৯৪৬

* * *

For Truth is wider greater than her forms.
A thousand icons they have made of her
And find her in the idols they adore ;
But she remains herself and infinite.[৭]

Depths (যত গভীরতা) কথাটা চলবে না, কারণ অর্থ এই নয় যে গভীর থেকে যা উঠে এসেছে তার সঙ্গে কোন সংযোগ নেই, অর্থ হল সংযোগ রয়েছে যা কিছু

২ প্রেমের সেখানে সার্থক হয় সোনালী গোলাপী স্বপ্ন সব,
শক্তি পরিধান করে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার রাজমুকুট।
('সাবিত্রী,' ২য় পর্ব, ৯ম সর্গ)

৩ Dream walked along the highway of the stars
স্বপ্ন বিচরণ করে তারকামালার রাজসরণী বেয়ে।
('সাবিত্রী,' ২য় পর্ব, ৯ম সর্গ)।

৪ Adoring blue heaven with their happy *hymn*.
(*dreams*-এর স্থলে)
পূজা করে চলে নীল নীলিমায় পুণ্যমন্ত্রে তাদের।
('সাবিত্রী,' ২য় পর্ব, ৯ম সর্গ)

৫। মহাকালীর তাণ্ডবে মেতে গেল বিশ্বসৃষ্টি।
('সাবিত্রী', ২য় পর্ব, ১০ম সর্গ)

৬। জ্ঞান তার নূতন করে গড়া হয়েছে অনুমানের কোষ থেকে
ঢেলে দেওয়া হয়েছে রূপের মধ্যে—স্থিরবদ্ধ দেহ এক হীনবল নশ্বর।
('সাবিত্রী', ২য় পর্ব, ১১শ সর্গ)

৭। সত্য তার রূপাবলী অপেক্ষা বৃহত্তর মহত্তর।
সহস্র বিগ্রহ তার মানুষে গড়ে দেয়,
যে মূর্তিসব তারা পূজা করে তাদেরই মধ্যে দেখে তারে ;
সে নিজে কিন্তু রয়ে যায় নিজেই—অন্তহীন।
(সাবিত্রী', ২য়, পর্ব, ১১শ সর্গ)

আসে ভাসা-ভাসা স্তর থেকে। তোমার কথাটা হবে একটা বাগাড়ম্বর, সত্যকার অর্থটি উড়িয়ে দেবে। দুটি it একসঙ্গে যে আছে তা অনেকরকমে পরিহার করা যেতে পারে, তবে এতে রয়েছে যে সাক্ষাৎ জোর একটা তা নষ্ট হবে। আমার মনে হয় it-এর পরে একটা 'কমা' দিলে, আর একটু যতি পঠনের সময়, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এই যেমন লেখা যেতে পারত : no part it took, 'it took no part'-এর পরিবর্তে, কিন্তু বাক্যের সহজ জোর নষ্ট হয়ে যেত তাতে।

—১৯৪৮

* * *

Travestied with a fortuitous sovereignty.[৮]

তোমার সমালোচনা বুঝতে আমি অক্ষম। বাক্যটির মধ্যে এমন তো কিছু বহ্বাড়ম্বর বা বাক্-বৈখরী দেখছি না যদি-না তোমার এই ধারণা হয়ে থাকে fortuitous বাক্যটি আর t বর্ণটির বহুল জমাট সংগ্রহ হেতু। কিন্তু fortuitous কথাটিকে তো বলি দেওয়া যায় না, কারণ ঠিক এই অর্থটিই যে আমার বক্তব্য। তাছাড়া আমি দেখতে পাচ্ছি না এর মধ্যে কেবল তাত্ত্বিক এবং বিশেষভাবে মানসিক কি রয়েছে। মায়া-বেশ অথবা রাজমহিমা আদৌ তাত্ত্বিক জিনিস নয়, এসবই তো বস্তুগত চিত্র, যেমনটি প্রয়োজন আন্তরদৃষ্টির সূক্ষ্ম জিনিস সম্বন্ধেও যে বাস্তবতা তা প্রকাশ করবার জন্য। অবশ্য সমস্ত অংশটি মানসিক শক্তি এবং মানসিক গতিবিধি নিয়ে, সুতরাং বুদ্ধির কাছে তা হল তত্ত্বমাত্র কিন্তু আন্তরদৃষ্টি তাকে সেভাবে অনুভব করে না। আন্তরদৃষ্টিতে মনও একটি বস্তু, তারও রয়েছে ক্রিয়াধারা এবং সে ক্রিয়াবলী একান্তভাবে বাস্তব এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অবশ্য এখানে একটা শ্লেষের ভাব রয়েছে অজ্ঞানের উদ্দেশ্যে, যে অজ্ঞান তার রাজমহিমাকে সত্যকার সত্য বলে বিশ্বাস করে, তাকে ব্যঙ্গ করে ধরেছে "সংশয়ের কিরণ-লেখা" অহেতুক এবং অবাস্তব বলে।

—১৯৪৮

That clasped him in from day and night's pursuit.[৯]

'stickiness' (তৈলাক্ততা) বলতে তুমি কি বোঝ আমি জানি না, কারণ এখানে রয়েছে দুটিমাত্র কঠিন ওষ্ঠ্যবর্ণ এবং কয়টি অনুনাসিক, এই যে ক্রমিক ধারা এর ফলেই কি তুমি তৈলাক্ত অনুভব কর? আর যদি কয়েকটি কঠিন দন্ত্যবর্ণ যোগ করে দেওয়া হয় তাতে কি সুবিধে হবে? সে যাই হোক, তৈলাক্ত হোক বা না-হোক আমি কিছুই পরিবর্তন করতে চাই না। পরিবর্তনে day's and night's দিতে চাই না; কথাটা হয়ে ওঠে ভারী এবং অনাবশ্যক। পাঠকের কাছে কথাটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে day and night কথা দুটি এখানে দ্বৈতসত্তা অথবা দুটি কুকুর একই দড়িতে বাঁধা একই শিকারের অনুসরণে চলেছে।

—১৯৪৮

* * *

Lulling (ঘুম পাড়ান) চলবে না। কথাটা অতিরিক্ত আলঙ্কারিক, ভাবালু এবং কোমল, সুতরাং তার পরিবর্তে আমি দিয়েছি slumber।

* * *

A Panergy that harmonised all life.[১০]

আমি মনে করি না panergy কথাটা তার অর্থের জন্য নির্ভর করে পূর্ববর্তী ছত্রের "energies" কথাটির উপর। যে panergy-কে লক্ষ্য করা হয়েছে তা হল একটা স্বয়ম্ভু সামগ্রিক শক্তি। তা বহন করতে পারে বিশ্বের যাবতীয় শক্তিধারাকে এবং তাদের হেতুও বটে কিন্তু সেই সব দিয়েই গঠিত নয়।

— ১৯৪৮

* * *

All he had been and all that now he was

৮। অহেতুক মহিমা এক পরিধে দিল তাকে মায়া-রাজপোশাক।
('সাবিত্রী,' ২য় পর্ব, ১৩শ সর্গ)

৯। তাকে আলিঙ্গনে ধরে রেখেছে রাত্রি ও দিনের অনুধাবন থেকে রক্ষা করে।
('সাবিত্রী'. ২য় পর্ব, ১৪শ সর্গ)

১০। একটা বিশ্ব-ঊর্জতা সমস্ত জীবনকে সামঞ্জস্যে ধরে রেখেছে।
('সাবিত্রী', ২য় পর্ব, ১৫শ সর্গ)

লাইনটির মধ্যে তুমি যে অনুভব করছ কবিত্ব মাঠে মারা গিয়েছে, আমি তা কিছুমাত্র বোধ করি না। অবশ্য এখানে শব্দচয়ন অতি সরল সহজ অলঙ্কারবর্জিত কিন্তু একথা তো কাব্যের অসংখ্য সুন্দর লাইন সম্বন্ধেই বলা যেতে পারে, এমনকি অনেক উচ্চ স্তরের ছত্র সম্বন্ধেও। যদি একটা বিশিষ্ট গঠনরীতি থাকে, যদি থাকে সুসম ছন্দ (মিল দরকার হয় না) আর সুসম ভাষা এবং অর্থ (এই দুটি উপাদান মিলেই সর্বদা গড়ে দেয় সুষ্ঠু রীতি) আর যে ছত্রে এবং অংশে এটি রয়েছে তার থাকে একটা সমুচ্চ ভাব বা গভীরতা বা যে অর্থ প্রকাশ করে তার থাকে একটা কাব্যগত গুণ তবে সেখানে কোন কবিত্ব মাঠে মারা যায় না। এরকম ধরনের কোন ছত্রই গদ্যমাত্র বলে সরিয়ে দেওয়া চলে না। —১৯৪৬

* * *

All he had been and all that now he was

লাইনটি সম্বন্ধে তোমার নূতন আপত্তিটি কতকটা স্ববিরোধী। একটা লাইনের যদি ছন্দ থাকে এবং প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকে যা কবিত্বময় তবে তো তা সার্থক কবিতা হবেই। তবে হয়তো তুমি বলছ উচ্চস্তরের এবং সূক্ষ্মস্তরের কবিতার কথা। আমি বলি, আমার লাইনটি সুন্দর কবিতা এবং তা উন্নীত স্তরে উঠে গিয়েছে পরবর্তী বক্তব্যের দিকে ঊর্ধ্বায়নে—তাতে দিয়েছে সমগ্র কাব্যগত অর্থ এবং ব্যঞ্জনা : আন্তরসত্তার ক্রমবিকাশ এবং যা কিছু সম্পন্ন হয়েছে তার আকস্মিক অবসান বা ব্যর্থতা যদি-না তা আবার তেমনি আকস্মিক ভাবে আপনাকে অতিক্রম করে যায় এবং হয়ে ওঠে একটা মহত্তর কিছু। আমি মনে করি না এই লাইনটি যে প্রসঙ্গে স্থান পেয়েছে সেখানে তা কেবলই চলনসই, যদিও আমি স্বীকার করি যে, যা পূর্বে রয়েছে এবং পার এসেছে তাদের থেকে তা নিম্নতর স্তরের এবং তীব্রতার মাত্রায় কম। এই ধারা কি রকমে পরিহার করা যায় সমগ্র বিবরণটির পূর্ণ অর্থ খণ্ডিত না করে, কারণ তাতে বাদ পড়ে যায় এমন জিনিস যা এর ক্রমবিকাশের পক্ষে প্রয়োজন অথবা প্রকাশের ভাষা উচ্চকণ্ঠে তুলে ধরা, যেখানে প্রয়োজন সরল স্বচ্ছ নিরলঙ্কার পরিচ্ছন্নতা। সে যাই হোক, পরের যে পরিবর্ধিত রূপটি—All he had been and all towards which he grew—লাইনটির কেবলমাত্র চলনসই হয়ে উঠবার সম্ভাবনাকে মুক্ত করে; কারণ এখানে ভাব এবং কথা উচ্চস্তরে যেন উঠে গিয়েছে ছবিটির প্রত্যক্ষতার কল্যাণে, তার ফলে আমাদের চিন্তায় শুধু নয় অনুভবে পর্যন্ত ধরা দেয় অশ্বপতির আন্তরসত্তার জীবন্ত ক্রমোত্তরণ। —১৯৪৬

অনুবাদ : **শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত**

পথ যত দীর্ঘ হোক, পথিক যত মহান হোন, পরিণামে ভগবৎ কৃপারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়।

—শ্রীমা

শ্রীঅরবিন্দের চিঠি

সাহানা দেবী

গান ও কবিতায় প্রভেদ আছে। যদিও গান কবিতার মতই ছন্দে ও মিলে একই ভাবে লেখা হয়ে থাকে। তবু গান আলাদা, কবিতা আলাদা—একথা অনেকের রচিত গান গাইতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে বারবারই। অনেককাল আগে কারো মুখে যেন শুনেছিলাম "কবিতা মন দিয়ে বুঝবার জিনিস, গান অন্তর দিয়ে অনুভব করবার।" গান যে অনুভবের বস্তু তা অবশ্য আমার অভিজ্ঞতাও বলে। কবিতা মন দিয়ে বুঝবার জিনিস—এ ধারণাটা আমার মধ্যে থেকে গিয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন করেছিলাম—"গান এবং কবিতায় কি প্রভেদ, কবিতা মন দিয়ে বুঝবার জিনিস, গান অনুভূতির—তাই কি? গান কি কবিতার পর্যায়ে পড়ে?" শ্রীঅরবিন্দের কাছে যখন যা জানতে চাইতাম। প্রশ্ন করতাম, প্রত্যেকটির উত্তর দিতেন তিনি অতি যত্ন সহকারে বিস্তারিত ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। প্রতিটি সূত্র, প্রতিটি পয়েন্ট ধরে ধরে কি সুন্দর করে যে বুঝিয়ে দিতেন! আমাদের প্রশ্ন যেমনই হোক না কেন তিনি তাকে মূল্যবান করে তুলতেন তাঁর উত্তরে।

সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমায় এই চিঠিখানা লেখেন। এখানে তার মূল ইংরেজীর অনুবাদ দেওয়া হল:

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর: "না, গান কোন রকম কবিতা নয়—বা তা হবার দরকার নেই। অনেক খুব ভাল ভাল গান আছে যা মোটে কবিতাই নয়। ইউরোপে গীত রচয়িতাদের ও বড় বড় অপেরার 'লিব্রেটো'দের লেখকদের কবি পর্যায়ভুক্ত করা হয় না। সাঙ্গীতীক গুণের সঙ্গে কাব্য মূল্যের সংমিশ্রণের একটা প্রয়াস এশিয়াতেই বেশি প্রচলিত, তবে তা আবশ্যিক নয়। প্রাচীন গ্রীসেও গীতিধর্মী ('লিরিক') কবিতা প্রায়ই এমন ভাবে লেখা হ'ত যাতে সুরসংযোগ করা যেত। কিন্তু তাহলেও কবিতা এবং গান লেখা, যদিও এক করা যায়, দুটি ভিন্ন আর্ট।

এদের পার্থক্য এ নয় যে কবিতা বুঝবার জিনিস, গান অনুভূতির। তুমি যদি কোন কবিতার বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তু, তার কথা এবং ভাবই শুধু বোঝ তাহলে কবিতাটির বাস্তবিকই তুমি কিছুই রসগ্রহণ করতে পারনি এবং যে কবিতার ভিতর শুধু তাই থাকে, আর কিছুই থাকে না, সে কবিতা প্রকৃত কবিতাই নয়। সত্যিকারের কবিতার মধ্যে রয়েছে আরো অন্য এমন কিছু যা অনুভব করা যায় ঠিক যেমন গানে তুমি কর এবং সেইটিই তার বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য অংশ। তার আছে, প্রথমতঃ, একটা ছন্দ, ঠিক যেমন সঙ্গীতের আছে, যদিও ভিন্ন প্রকারের, এবং ছন্দই কথার মাধ্যমে এই "আরো অন্য কিছু"-কে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। শুধু কথাই তার বাহন নয় বা সম্পূর্ণ রূপে তাকে প্রকাশ করতে পারে না, এবং তা এতেই প্রমাণ হয় যে একই কথা যদি ভিন্নক্রমে এবং ছন্দ ছাড়া বা যোগ্য ছন্দ ছাড়া লেখা যায়, তাহলে তা তোমাকে কিছুতেই ঠিক সেই ভাবে স্পর্শ বা অভিভূত করবে না। সেই "আরো অন্য কিছু"-টি হল একটি আন্তর বস্তু বা ব্যঞ্জনা, একটি আত্মিক-অনুভূতি বা আত্মিক-অভিজ্ঞতা একটি প্রাণিক-অনুভূতি বা প্রাণিক-অভিজ্ঞতা। একটি মানসিক আবেগ, দৃষ্টি বা অভিজ্ঞতা (শুধু মাত্র ধারণা নয়), এবং শুধু সেইটিকে যদি তুমি ধরতে পার ও নিজের মধ্যে তাকে অনুভব কর, তাহলেই কবিতা যা দিতে পারে তা তুমি পেলে, অন্য কোন ভাবে নয়।

কবিতা ও গানের মধ্যে আসল প্রভেদ এই যে গান

লেখা হয় সাঙ্গীতীক ছন্দে বসাবার উদ্দেশ্যে, পদ্য লেখা হয় কাব্যছন্দে বা সঙ্গীতময় ধ্বনিকে লক্ষ্য করে। এই দুই ছন্দ একেবারে আলাদা। সেই জন্যেই কবিতায় সুর দেওয়া যায় না যদি না তা লেখা হয়ে থাকে উভয়ছন্দের দিকে দৃষ্টি রেখে, কিংবা (ইচ্ছাকৃত না হলেও) তার এমন একটা গতি বা দোল থাকে যাতে করে তাতে সুর দেওয়া সহজ হয়, অন্ততঃ সম্ভব হয়। এটা প্রায়ই হয় গীতিধর্মী কবিতার ক্ষেত্রে, কম হয় অন্য জাতের কবিতায়। গানের সাধারণ স্বরূপ এই যে সে খুব সরল সহজ বস্তু নিয়ে তৃপ্ত থাকে, প্রকাশ করে কেবল একটি ভাবকে বা ধারণাকে এবং সুরকে ছেড়ে দেয় তাকে বিকশিত করে তুলতে। তবে সব সময় তা হয় না।"

৪. ৭. ৯৩১

স্থির হয়ে অপেক্ষা করা অর্থ সময়ের অপব্যবহার না করা।

—শ্রীমা

ভবিষ্যতের কবিতা

শ্রীঅরবিন্দ

তৃতীয় অধ্যায়

ছন্দঃস্পন্দন ও গতিপ্রবাহ

গভীরতম আধ্যাত্মিক সত্যের কাব্যিক প্রকাশ যে মন্ত্র, সেই মন্ত্রের সৃষ্টি কেবল তখনই সম্ভব যখন কাব্যবাণীর তিন সর্বোচ্চ তীব্রতা একত্র মিলিত হয়ে অবিচ্ছেদ্যভাবে এক হয়ে যায়। এই ত্রিবিধ তীব্রতা হল: ছন্দোময় গতিপ্রবাহের সর্বাধিক তীব্রতা, বাণীরূপ ও চিন্তাবস্তুর এবং রচনাশৈলীর সর্বাধিক তীব্রতা এবং আত্মার সত্য-দর্শনের সর্বাধিক তীব্রতা। সমস্ত মহৎকাব্যের জন্ম এই তিন উপাদানের ঐক্যতান থেকে। এদের মধ্যে যে-কোন একটির ঘাটতি হলে এমনকি মহত্তম কবিদের শিল্পকর্মেও অসাম্য দেখা দেয়। যে কোন একটি উপাদানের ব্যর্থতাই তাঁদের স্খলনের, তাঁদের সৃষ্টিতে খাদ-মিশ্রণের এবং তাঁদের চন্দ্রের বুকে কলঙ্কের কারণ হতে পারে। অন্যপক্ষে, এই ত্রিবিধ তীব্রতা যখন দ্রবীভূত একীভূত হয়ে কোন এক উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়, কেবল তখনি তা থেকে মন্ত্রের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিক গুরুত্ব হল ছন্দঃস্পন্দনেরই, কাব্যের গতিপ্রবাহেরই। কারণ সেইটাই হল প্রাথমিক মৌলিক অপরিহার্য উপাদান যেটি ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলিই কাব্যলক্ষ্মীর কাছে বর্জনীয় হয়ে পড়ে, এমনিতে তাদের মূল্য যা-ই হোক না কেন। এমনকি, যে সৃষ্টিতে কবির সূক্ষ্মদর্শন খুবই কম এবং রচনাশৈলীর উচ্চতর তীব্রতা থেকে যা বহুদূরে, নিখুঁত ছন্দঃস্পন্দন সেই সৃষ্টিকেও প্রায় অমরত্ব দান করতে পারে। কিন্তু যখন আমরা কাব্যের গতিপ্রবাহের কথা বলি, তখন শুধু পদ্যবন্ধের যান্ত্রিক ছন্দঃস্পন্দনকেই বোঝাতে চাই না, এমনকি তার নিখুঁত আঙ্গিকগত চমৎকারিত্ব থাকলেও না। সেই পারিপাট্য হল শুধু প্রথম ধাপ, শুধু স্থূল ভিত্তি। এর উপরে থাকা চাই এক গভীরতর সূক্ষ্মতর সঙ্গীত, এক ছন্দিত আত্মিক গতি, যা ছন্দের যান্ত্রিক কাঠামোয় প্রবেশ করে এবং তাকে ছাপিয়ে যায়। তার পরে আসে কাব্যের সত্যকার সিদ্ধি। ছন্দোযন্ত্রের চমৎকারিত্ব—তা যতই সূক্ষ্ম, সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হোক না কেন, তা আমাদের স্থূল কর্ণকে যতই পরিতৃপ্তি দিক না কেন—তা সৃষ্টি-প্রতিভার গভীরতর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না। কারণ, আমাদের ভিতরের একটি কান আছে, যার দাবি আরো অনেক বড়। সেই ভেতরের কানের কাছে পৌঁছান এবং তাকে তৃপ্ত করাই হল সঙ্গীতকার ও সুষমা-স্রষ্টার সত্যকার উদ্দেশ্য।

যা-ই হোক, ছন্দোবন্ধ—যার দ্বারা আমরা ধ্বনির নির্দিষ্ট ও সুষম মাত্রা-বিধান বুঝে থাকি, তা—শুধুই একটা প্রথাগত ব্যাপার নয়, বরং তা-ই হল কাব্যের গতিপ্রবাহের যথার্থ স্থূলভিত্তি। সাম্প্রতিক কালে একটি আধুনিক প্রবণতা—যা থেকে হুইটম্যান্ ও কার্পেন্টারের কবিতার জন্ম এবং ফ্রান্স ও ইটালীতে মুক্তছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তা—এই প্রথাকে অস্বীকার করে এবং ছন্দোবন্ধকে একটা সীমার বন্ধন, এমনকি হয়তো-বা একটি চটুল ভণ্ডামি বা প্রকৃত স্বচ্ছন্দ ও নৈসর্গিক কাব্যস্পন্দনের ভ্রান্তরূপায়ণ হিসাবে দূরে সরিয়ে রাখে। তার অর্থ, আমার মনে হয়, এ হল এমন এক দৃষ্টিকোণ যা শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। কারণ টিকে থাকবার যোগ্যতা তার নেই। কিছুতেই তার জয় হতে পারে না, যদি না সে

ছন্দঃস্পন্দন সৃষ্টিতে এমন সর্বোচ্চ সাফল্যের দ্বারা আত্ম-পক্ষ সমর্থন করতে পারে যার পাশে অতীতের কাব্য-সুষমার মহান স্রষ্টাদের মহত্তম সৃষ্টিগুলি সুস্পষ্টভাবে হীনতর প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু তা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে, মুক্তচ্ছন্দের সর্বোচ্চ কীর্তি তো সেইখানে, যেখানে তা একরকমের কাব্যধর্মী গদ্য আবৃত্তি করার মধ্যেই নিজের ছন্দঃস্পন্দন সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সীমায়িত করে রেখেছে, অথবা, কোথাও-বা এমন এক ধরনের অনিয়মিত ও জটিল ছন্দোবন্ধের গতির উপরেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যা বাহ্যরূপে না হলেও অন্তরের বিধানে গ্রীক সমবেত কবিতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

যে মিত্রাক্ষরকে মিল্টন নিজেই তাঁর গোড়ার দিকের অপেক্ষাকৃত অল্প মহিমময় অথচ অধিকতর সুন্দর কবিতা-গুলিতে এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন, সেই মিত্রাক্ষরকেই তিনি নিন্দা করেছেন। বিস্মৃত হয়েছেন কিংবা উপেক্ষাই করেছেন তার অধ্যাত্মমূল্য। ভুলে গিয়েছেন যে, কাব্যের পরিমিত গতিপ্রবাহে যেটি মুখ্য উপাদান সেই সঙ্গীতময় বা সুষমাময় পুনরাবৃত্তির আবেদনকে বলিষ্ঠ এবং সুদৃঢ় করার একটি শক্তি মিত্রাক্ষরের আছে, প্রেরণার রুদ্ধ দুয়ারটি উন্মুক্ত করায় মিত্রাক্ষরই অভ্যস্ত; আমাদের ভিতরের বুদ্ধির অতীত এমন একটা কোন জিনিস, যাকে জাগ্রত করার শক্তি সঙ্গীতের আছে, সেই জিনিসের কাছে সুন্দরকে ব্যঞ্জিত ও ব্যক্ত করে দেওয়ার ক্ষমতা মিত্রাক্ষরেরই আছে। হুইট্‌ম্যানের আঙ্গিকও এক অনুরূপ অথচ ব্যাপকতর ভ্রান্তিতে পতিত। মানুষ যখন দেখতে পেল যে, ধ্বনিমাত্রার সুনির্দিষ্ট ও পুনরাবৃত্ত কাঠামোর বিন্যস্ত চিন্তা ও অনুভূতির শক্তি আমাদের মন ও আত্মাকে অভিভূত করতে পারে, তাকে অধিকার করতে পারে, তখন সে শুধু যে একটা শৈল্পিক কৌশলই আবিষ্কার করেছিল তা নয়, বরং এমন এক সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক সত্য সে উদ্‌ঘাটন করে-ছিল যার সচেতন তত্ত্ব সংরক্ষিত রয়েছে বৈদিক ঐতিহ্যের মধ্যে। প্রাচীন ভারতীয়রা যা-কিছুকেই স্থায়ী রূপ দিতে চেয়েছেন—এমনকি দর্শন, বিজ্ঞান, আইনও—তাকেই যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ করার জন্যে ছন্দোবন্ধই বেছে নিয়েছেন, তখন তাঁরা শুধু স্মৃতিশক্তিকে সাহায্য করার জন্যে যে তা করেছেন, এমন নয়। তাঁরা তো ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের বিপুল গদ্যরচনাকেও ঠিক সেই রকমই মনে রাখতে পারতেন, যেমন তাঁরা পারতেন বৈদিক সূক্ত এবং ছন্দোবন্ধ উপনিষদ-গুলিকে। বরং ছন্দোবন্ধ তাঁরা যে বেছে নিয়েছেন তার কারণ, তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, ছন্দোবন্ধ বাক্যের শুধু নিজস্ব একটা অনায়াস স্থায়িত্বই নেই, উপরন্তু আছে ছন্দোহীন রচনার চেয়ে বলিষ্ঠতর একটা প্রকৃতিদত্ত শক্তি; শুধুই একটা তীব্রতর ধ্বনিমূল্যই নেই, বরং আছে ভাষা ও অর্থকে এমন একটা উঁচু সুরে বেঁধে দেবার ক্ষমতা যাতে এই ভাষা ও অর্থ ছন্দের নিখুঁত ছাঁদে ঠিক খাপে খাপে বসে যেতে পারে। এই বৈদিক ধারণার মধ্যে বোধহয় একটি সত্য আছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা সমগ্র বিশ্বপ্রবাহ রচনা করেছিলেন ছন্দের সাহায্যে, বাণীরূপের নির্দিষ্ট ছন্দঃস্পন্দনের মধ্যে। এবং এসব ছন্দস্পন্দন বিশ্বছন্দের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা বলে এগুলিতে মূল বিশ্বপ্রবাহ অপরিবর্তিতভাবে স্থায়ী রূপ লাভ করে। সূক্ষ্ম পুনরাবৃত্তির নিয়মের দ্বারা একটি যে সুষম-সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়, তা-ই হল সর্বভূতের অমরত্বের প্রতিষ্ঠা, আর বস্তুকে অমরত্ব দান করার এই যে গূঢ় শক্তি, তার সম্পর্কে সচেতনতা থেকে যে-সব সৃষ্টিশীল ধ্বনির জন্ম হয় তাদের বিন্যাসই তো হল ছন্দোময় গতিপ্রবাহ।

তবু এই শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানা উচ্চ-নীচতা ও স্তর-পরম্পরা রয়েছে। সাধারণ বিবেচনায় অবশ্য ওজস্বী এবং আকর্ষণীয় ছন্দোরূপে বিন্যস্ত এবং আবেদন-সৃষ্টিতে সমর্থ যে-কোন ভাষারূপকেই কাব্য নাম দেওয়া হয়ে থাকে। এই সংজ্ঞার ব্যপ্তি এত বেশি যে এতে এমনকি মেকলে এবং কিপ্‌লিঙ্‌রাও অত্যাশ্চর্যভাবে কাব্য-সিংহাসনে আরোহণ করতে পেরেছেন। আমি আপত্তি করব না, উদারতা সর্বদাই একটি গুণ। তা সত্ত্বেও শুধু ভাষার শক্তির সঙ্গে ছন্দোযন্ত্রের টুং-টাং ধ্বনির যাদু এসে মিলিত হলেই যে তা কাব্যের মহত্তর পরিচয় বহন করবে, তা তো নয়। কাব্যের রূপ বা ছায়া তার থাকতে পারে, কিন্তু কাব্যের আত্মা তার নেই। এমন বিপুল কাব্যসম্ভার রয়েছে—ফরাসী ভাষার ছন্দোবন্ধ রোমান্সগুলি এবং মধ্যযুগের অধিকাংশ গাথাকাব্যকে উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে—যেগুলি তাদের ছন্দঃস্পন্দনের জন্যে ছন্দোযন্ত্রের তালের উপরে নির্ভর করে এবং তাদের রচনাশৈলীর জন্যে নির্ভর

করে নিম্নমানের একটা প্রকাশভঙ্গির উপর। সেই প্রকাশ-ভঙ্গি এতই নিম্নমানের যে, তাকে বড জোর কোনরকমে সহ্য করা যেতে পারে। একরম একটা পংক্তি সেখানে খুব কমই আছে, যার ছন্দঃস্পন্দন আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে অথবা যার প্রকাশভঙ্গি অন্তরের গভীরে আবেদন সৃষ্টি করে। এমনকি পরবর্তীকালের ইউরোপীয় কাব্যেও—যদিও সেখানে পদ্যবন্ধ এবং ভাষা-শিল্প আরো ভালভাবে আয়ত্ত করা হয়েছে—মূলতঃ সেই একই পদ্ধতি টিকে থেকেছে, এবং যেসব কবি সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন তাঁরা শুধু জন-সমর্থনই পেয়েছেন তা নয়, উপরন্তু সমালোচকদের প্রশংসাও পেয়েছেন। তবু তাঁদের কাব্য-সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, এসব কাব্য কল্পনার পক্ষিরাজ ঘোড়ার দ্রুতচালের জোরাল ঝাঁকুনি কিংবা আরামপ্রদ দুল্‌কি চাল বা চোখ-ধাঁধান প্লুতগতি ছাড়া আর কিছুই নয়। টিকে থাকবার শক্তি এ-কাব্যের খুব আছে; একবার সূচিত হলে এ-কাব্য কেন যে চিরকাল এগিয়ে যাবে না, আমি তার কোন কারণও দেখি না; এ-কাব্য কবিকে তার নিজস্ব ক্ষেত্রে অনায়াসে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে; কিন্তু সেইটুকুই, তার বেশি কিছু নয়। একথা নিশ্চিত যে কোন সার্থক আত্মিক গতিকে সহজে এই ছাঁদে ঢালা যাবে না। তার নিজস্ব গুণ ও শক্তি রয়েছে; এক ধরনের ছন্দোবদ্ধ রোমান্সের পক্ষে, যুদ্ধের কবিতা এবং জনপ্রিয় দেশপ্রীতি-মূলক কাব্যের পক্ষে, কিংবা সম্ভবতঃ যে-কোন কাব্য—যা 'জীবনের প্রতিধ্বনি' হতে চায়—তার জন্যে এগুলি নিশ্চয়ই ভাল। এ কাব্য আমাদের আত্মাকে নয়, আমাদের প্রাণ-সত্তাকে হয় উদ্বুদ্ধ করে, যেমন রণভেরী করে থাকে, নয় তাকে উত্তেজিত করে যেমন ঢক্কা-নিনাদ করে থাকে। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত ঢক্কা-নিনাদ কিংবা রণভেরী সঙ্গীতের পথে খুব বেশি দূর আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় না।

কিন্তু এই স্তরের অনেক উর্ধ্বে উঠে এলেও সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেই মহত্তর ধ্বনিপ্রবাহকে পাই না যার কথা আমরা বলছি। বেশ শক্তিশালী কবিরা, কখনো-কখনো মহত্তম কবিরাও, সাধারণতঃ এমন বাঁধা-ধরা সুষমা বা সঙ্গীতেই তৃপ্ত থাকেন যা স্থূল কর্ণের কাছে খুবই তৃপ্তিদায়ক, যা আমাদের রস-বোধকে এক রকমের নিম্নস্তরের বৈচিত্র্যহীন, বৈশিষ্ট্যহীন সুখের মধ্যে নামিয়ে নিয়ে যায়। সুলভ সঙ্গীত ও সুষমার এই ছাঁদে তাঁরা তাঁদের ফলবতী বা বেগবতী কল্পনাকে অবাধে অনায়াসে ঢেলে দেন, তীব্রতর কোন উচ্চ-গ্রামের কিংবা গভীরতর কোন আবেদনের প্রয়োজন বোধ করেন না। এ হল সুন্দর কাব্য; সৌন্দর্যবোধ কল্পনা ও শ্রুতিকে এ-কাব্য তৃপ্তিদান করে; কিন্তু সেইটুকুতেই তার আকর্ষণের পরিসমাপ্তি। একবার তার ছন্দঃস্পন্দনটুকু আমাদের শোনা হয়ে গেলে আর নতুন কিছু আমাদের প্রত্যাশা করবার থাকে না; আমাদের ভেতরের যে কান তার কাছে কোন চমক সে সৃষ্টি করে না; আমাদের আত্মাকে তা যে হঠাৎ মন্ত্রমুগ্ধ করে অজানা গভীরতায় নিয়ে চলে যাবে, সে-সব বালাই তার নেই। তবে এটা নিশ্চিত যে, প্রবহমান স্রোতের উপরিতলে এ যেন সমান্তরালভাবে ভেসে যেতে পারে। কখনো-কখনো এ হল প্রবহমান স্রোত ততটা নয়, যতটা একটা ধীর স্থির কিংবা অন্য কোন সমানগতি। এটা খুব বেশি দেখা যায় সেই কবিদের মধ্যে যাঁরা শ্রুতির চেয়ে চিন্তাশক্তির কাছে বেশি আবেদন সৃষ্টি করেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্য বিষয় নিয়েই বেশি মাথা ঘামান, এবং এমন যদি কোন উপযুক্ত ছন্দিত কাঠামো পেয়ে যান যাতে তাঁদের বক্তব্য বিষয়কে আর কোন চিন্তা না করেই ঢেলে দিতে পারেন, তবে তাতেই তাঁরা খুশি।

ছন্দোবন্ধের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে আমাদের খুব বেশি মনোযোগ এবং নৈপুণ্য আর ছন্দঃ-স্পন্দনের আবর্তন, কলা-কৌশল, স্বর-নিয়ন্ত্রণ ও বৈচিত্র্যের নিত্য-নতুন আবিষ্কার বড়জোর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে তুষ্ট করতে পারে, আমাদের শ্রুতিকে অধিকার করতে পারে এবং তার সতর্ক আগ্রহকে ধরে রাখতে পারে; কিন্তু তা আমাদের ইপ্সিত সিদ্ধির উচ্চতর বিন্দুতে পৌঁছে দিতে পারে না। সাহিত্যে এমন সময় আসে যখন এই ধরনের নৈপুণ্যের কর্ষণা অনেকদূর এগিয়ে যায়। ভিক্টোরীয় যুগের কাব্যের ছন্দঃস্পন্দন আমার কাছে এই রকমই মনে হয়। সেগুলিতে কখনো শিল্পীর, কখনো ক্লাসিক বা রোমান্টিক কলা-কুশলীর কখনো গৌরবান্বিত সঙ্গীত-শিল্পীর বা সুষমা স্রষ্টার নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কখনো-বা ওজস্বী কারিগর কখনো বা প্রচণ্ড ছন্দোযাদুকরের শক্তির পরিচয় মেলে। সেখানে সব রকমের যান্ত্রিক শক্তি সক্রিয়, কিন্তু

বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত বা প্রেরণার সংক্ষিপ্ত সময় ছাড়া অন্য সব সময়েই যে একটি জিনিসের অভাব থেকে গেছে, তা হল অন্তরের সেই আত্মা, যে তার নিজস্ব মহত্তর গতিপ্রবাহ নিজেই সৃষ্টি করে, নিজেই শ্রবণ করে।

কাব্যের ছন্দঃস্পন্দন তার সর্বোচ্চ স্তরে তখনি উপনীত হতে আরম্ভ করে, মহত্তর কাব্য প্রবাহ তখনি সম্ভব হতে পারে, যখন আত্মা এসব কলা-শক্তির যে-কোন একটি থেকে উঠে তাকে অতিক্রম করে গিয়ে তার নিজের দাবি সোজাসুজি পেশ করতে আরম্ভ করে এবং একটা গভীরতর পরিতৃপ্তি লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কাব্যের সত্যকার ছন্দঃস্পন্দনের স্ফুরণ কেবল তখনি সম্ভব হয় যখন আমাদের অন্তরের কান শুনতে আরম্ভ করে। পারিভাষিক-ভাবে বলতে পারি, এই সত্যকার ছন্দঃস্পন্দনের আবির্ভাব তখনি হয় যখন, কীটসের ভাষায়, কবি হয়ে উঠেন অক্ষর ব্যবহারে মিতব্যয়ী, প্রকরণ প্রয়োগে হিসাবী। এই মিতব্যয়িতার অর্থ অবশ্য ব্যয় সম্পর্কে কার্পণ্য নয়, এর অর্থ হল ধ্বনির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার শ্রেষ্ঠতম সদ্ব্যবহার। এইটি যখন হয় তখনি কাব্য গদ্যচ্ছন্দের পদ্ধতি থেকে সব চেয়ে দূরে সরে যায়। গদ্যচ্ছন্দের স্বভাবগত লক্ষ্য হল একটা সাধারণ সৌষম্য লাভ করা যার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে নিজস্ব প্রাধান্য না দিয়ে সব মিলিয়ে একটা সামগ্রিক আবেদনের সুর তোলা যায়; এমনকি, যেসব ধ্বনি শুধু অবলম্বন যোগায় কিংবা অবকাশ সৃষ্টি করে তাদেরও নিজেদের অনেকখানি নিশ্চিহ্ন করে দিতে দেখা যায় যাতে গদ্যের সামগ্রিক লক্ষ্যস্বরূপ সাধারণ সৌষম্যকে তারা তাদের নিজস্ব বলিষ্ঠ প্রভাবের দ্বারা বিক্ষুব্ধ না করে। পক্ষান্তরে, কাব্য তার তাল ও মাত্রাকে যথেষ্ট কাজে লাগায়; সুনির্দিষ্ট ও অচ্ছেদ্য ছন্দঃস্পন্দন চায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেখানে কোন উন্নততর ছন্দঃস্পন্দনের তীব্রতা আনার চেষ্টা করা হয়নি, সেখানে শুধু সামগ্রিক আবেদনই প্রাধান্য লাভ করে এবং অবশিষ্টগুলি তার কাছে থাকে অপ্রধান হয়ে। কিন্তু কাব্যের সেই সব মহত্তম তীব্রতম ছন্দঃস্পন্দনে প্রত্যেক ধ্বনির সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করা হয়—সেই সদ্ব্যবহার তার অবদমনের দ্বারাও হতে পারে, তার কূলপ্লাবী পরিবৃদ্ধির দ্বারাও হতে পারে, তার সঙ্কীর্ণতায় হতে পারে, তার মুক্ত ব্যাপ্তিতেও হতে পারে। তার উদ্দেশ্য হল একটা সম্মিলিত আবেদনের দিক থেকে এমন একটা কিছু লাভ করা যা কাব্যের সাধারণ প্রবাহ আমাদের দিতে পারে না।

কিন্তু এ হল শুধু প্রযুক্তির দিক, আবেদন সৃষ্টির স্থূল উপায়। সব চেয়ে বেশি যার কাজ সে কিন্তু শিল্প-বুদ্ধি নয় অথবা স্থূল শ্রুতিও নয়, সে হল বরং অন্তরের এমন একটা কিছু যা ভিতরের সংগুপ্ত সুষমার একটা প্রতিধ্বনি এনে ধরতে চাইছে, আমাদের অন্তর্লোকের ছন্দিত অসীমতার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছে। একে কবির অর্জিত কুশলী বুদ্ধির বা সৌন্দর্যবোধের কষ্ট-সাধনা বলা যায় না, এ হল চিরন্তন গহন রাজ্য থেকে উৎসৃত বস্তুকে রূপদানের জন্যে আত্মার অন্তরীণ তপস্যা। তাতে অন্য সব শক্তি তো রয়েছেই তাদের নিজের-নিজের স্থানে, কিন্তু এসবের মধ্যে ঐকতান সঙ্গীতের পরিচালক যিনি, তিনি হলেন এই অন্তরের আত্মা, তিনি এগিয়ে এসে তাঁর নিজের উন্নততর পদ্ধতিতে আপন ব্রত উদ্‌যাপন করেন। তাঁর এই পদ্ধতি সমস্ত বিশ্লেষণের অতীত। কথাযুক্ত সঙ্গীত কথাহীন সঙ্গীতের দিকে এগিয়ে গেলে যে ফল পাই, এ-কাব্যের ফলশ্রুতি কতকটা সেই রকমের। তাতে থাকে সেই সঙ্গীতের মতই আত্মিক প্রাণ, আত্মিক আবেগ এবং বুদ্ধির অতীত এক গভীরতর অর্থের শক্তি। এই উচ্চতর সুষমা ও সঙ্গীতে ছন্দোবন্ধের যে স্পন্দন তার পাণিগ্রহণ করে আত্মার স্পন্দন। এর আধারে কানায়-কানায় ভরে উঠে সঙ্গীত, কখনো-বা মনে হয়, এ-কাব্য গড়িয়ে গিয়ে হারিয়ে গেল সেই সঙ্গীতেরই মধ্যে, প্রকৃত পক্ষে যে সঙ্গীতের গতিপ্রবাহের ভিন্নতর একটি আধ্যাত্মিক রহস্য রয়েছে।

এই হল কাব্যের গতিপ্রবাহের তীব্রতা যা-থেকে কাব্যিক প্রকাশভঙ্গির মহত্তম সম্ভাবনার সূচনা হয়। ছন্দোবন্ধের প্রবাহ যেখানে ভিত্তি রচনা করে, অথচ এমন একটা মহত্তর সঙ্গীতকে সে বক্ষে লালন ও ধারণ করে কিংবা সেই সঙ্গীতেরই দ্বারা বিধৃত হয়ে থাকে এবং তারই উপাদানে পরিপ্লাবিত হয়, যে-সঙ্গীত সেই ছন্দঃপ্রবাহকে অতিক্রম করে যায় এবং তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত করে ধরে, সেইখানেই কাব্যের মধ্যে মন্ত্রোপ-যোগী সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে উঠে। এ হল দেহযন্ত্রের বিঘ্ন ও

সীমার উপরে আত্মার বিজয়। মনে হয় সেই মন্ত্র-সামের শ্রোতা সেই অমর আত্মা উপনিষদ যাকে বলেন শ্রুতির শ্রুতি, যিনি সমস্ত শ্রবণকেই শুনে থাকেন এবং সমস্ত 'শব্দ ও ভাষার অনিশ্চয়তার নেপথ্যে' তাঁর নিজেরই চিন্তা ও সূক্ষ্মদর্শনের অব্যর্থ সুষমার প্রতি যিনি কান পেতে আছেন। [ক্রমশ]

অনুবাদক : **রামেশ্বর শ'**

পরকে শাসন করতে চাও, আগে নিজেকে শাসন করতে শেখ।
নিজের উপর কঠোর হও, পরের উপরে কঠোর হবার আগে।
যে শাসন মানতে জানে না, সে শাসন করতেও পারে না।

—শ্রীমা

কাজরী

অনির্বাণ

হৈমবতী,
তুষারকন্যাই শুধু নও,
'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং' সন্নিপাতে রচিতা
মৃন্ময়ী শ্যামার তুমি চিন্ময়ী সত্ত্বতনু।
কূর্মাচলে কোশী-উপত্যকার প্রান্তে দাঁড়িয়ে
কতবার দেখেছি তোমার আশ্চর্য আবির্ভাবঃ
গ্রীষ্মের খরসন্তাপে ধূসর বিশীর্ণ গমের শিশু
একরাত্রির বর্ষণে
শিহরিত উচ্চকিত হয়ে উঠেছে কাজল তারুণ্যে,
পার্বতীর ময়ূরকণ্ঠী-শাড়ীর আঁচল
কদলীগর্ভপত্রের আপাণ্ডুর শ্যামলিমায়
দিগ্‌দাহের তৃষিত রুক্ষতাকে করেছে স্নিগ্ধ-মেদুর।
কৈশোরের বসন্ত কবে শেষ হয়ে গেছে।
গ্রীষ্মের তপশ্চর্যার উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছ
তারুণ্য আর যৌবনের বয়ঃসন্ধিতে।
চোখের দীর্ঘপক্ষ্ম আনত পল্লবে
উশতী জায়ার মধুক্ষরা তন্ময়তা,
উন্নমিত হৃদয়ের হিল্লোলে সুবিস্রব্ধ বাসর-শয্যার আকম্প্র আমন্ত্রণ,
বরারোহের বর্তুল পীনতায় সুরমা আকুতির তরঙ্গায়ণ,
চরণের পদ্মরাগে উর্বশী উষার আচপল লাস্যের ইশারা।

অষ্টাদশী ভুবনেশ্বরী তুমি—যেন
অনাগতের অমানবী কল্পপ্রতিমা।
আবার মর্ত্যে অবতীর্ণা বিদর্ভদুহিতা ব্যঞ্জৎস্তন্নী রুক্মিণীর তুমি
নিগূঢ় কামনার অশ্রুসজল বাষ্পলেখা।

আজ উত্তরায়ণের চরমবিন্দু—
ধর্মচক্রপ্রবর্তনের বরেণ্য তিথি।
পর্জন্যের ধারাসারে আপ্লুত অনুষিক্ত
রজস্বল পৃথিবীর রোমহর্ষণ অন্তঃসত্ত্বতার সোম্যমুহূর্ত।
সাধারণী নয়, সমঞ্জসা নয়, বুঝি
সমর্থা রতির আশ্বাস নিয়ে একটা যুগের প্রভাত হল, কাজরী॥

পণ্ডিচেরী তীর্থে

মণি বাগচি

সেদিনের কথা স্মরণ করলে আজো শরীর ও মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, একটা দিব্য আনন্দের শিহরণ তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে আমার অস্তিত্বের সর্বস্তরে—অনুভূতির প্রত্যেকটি অণু ও পরমাণুতে। চল্লিশ বছর আগে দিব্য জীবনের দিশারী ও পূর্ণযোগ বিজ্ঞানের প্রবক্তা শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন ও প্রণাম করতে গিয়েছিলাম পণ্ডিচেরী তীর্থে। সেদিনের সেই স্মৃতি -আমার জীবনের সেই স্বর্ণপ্রভ অভিজ্ঞতার কথা আজ উপহার দিলাম 'শৃঙ্খল'-র পাঠক-পাঠিকাদের যাঁদের কাছে শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গ অমৃত সমান। অনেক সাধু মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছি জীবনে, তাঁদের প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক মহিমা ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর কাছে শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে আছে, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করে আমার মনে হয়েছিল—ইনি যেন মানবজীবনে দীর্ঘকালের প্রত্যাশিত দিব্য জ্যোতির্ময় এক বিগ্রহ মূর্তি ; মনে হয়েছিল —পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মরমীয়াদের (mystic) মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ।

এই দর্শনের নেপথ্য ইতিহাসটা আগে একটু বলি। ১৯৩৩ সাল। আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করি। কলেজ স্ট্রীটে আর্য পাবলিশিং হাউসে আমাদের একটা বৈকালিক আড্ডা বসত, প্রচলিত অর্থে আড্ডা নয়—সেখানে আলোচনার বিষয় ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর দর্শন। তাঁরই জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হ'ত। প্রেসীডেন্সি কলেজে ক্লাশ শেষ করে অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রায় প্রতিদিন সেখানে আসতেন—তিনিই ছিলেন আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিজ্ঞতম ব্যক্তি। অতি সৌম্যদর্শন মানুষ ছিলেন তিনি, তেমনি সুপণ্ডিত ও সুবক্তা। ১৯৩৩ সালে আর্য পাবলিশিং থেকে শ্রীঅরবিন্দের একটি নতুন বই প্রকাশিত হয় ; সেই বইটির নাম : *The Riddle of the World*—শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে তাঁর শিষ্য ও আগ্রহী ভক্তগণ যেসব প্রশ্ন করতেন, সেসবের উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন লিখিত ভাবে, সেই উত্তরগুলিই একত্র করে এই বইটিতে গ্রথিত হয়। একশো নয় পৃষ্ঠার এই বইটিতে বিধৃত এই মহাযোগীর বক্তব্য একটি মাত্র বিষয়কেই কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয়েছে। এই বিশ্বের প্রহেলিকার একটি সার্থক বিশ্লেষণ আছে এখানে।

আর্য পাবলিশিং থেকে সমালোচনা করার জন্য আমাকে একটা বই দেওয়া হয়েছিল। অনেক দিন বাদে শ্রীঅরবিন্দের বই বেরুল, তাই অনেকেই সেটি আগ্রহ সহকারে পাঠ করেছিলেন। আমি ইংরেজিতে বইটির একটি সমালোচনা লিখে, অনুমোদনের জন্য সেটি পণ্ডিচেরীতে শ্রদ্ধেয় নলিনীদা'র (শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত) কাছে পাঠিয়ে দিই। লিখেছিলাম এটি যদি শ্রীঅরবিন্দ অনুমোদন করেন তবেই ছাপতে দেব, নইলে নয়। দিন-পনের বাদে উত্তর এল : 'Sri Aurobindo has read your review ; you can publish it'। আমার চিঠিতে আরো একটা নিবেদন ছিল—দর্শনের জন্য অনুমতি। ১৫ই আগস্ট-এর দর্শনের জন্য প্রার্থীদিগকে শ্রীঅরবিন্দ নিজে অনুমতি দিতেন ; তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে পণ্ডিচেরী যাওয়া যেত না। চিঠিতে ঐ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত ছিল না। জানি, এসব জিনিস সময় সাপেক্ষ, তাই দুঃখ বোধ করিনি তখন।

যথা সময়ে আমার সমালোচনাটি 'নিউ ফরওয়ার্ড' দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কলকাতায় তখনকার দিনের শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী মহলে এই লেখাটি বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। সমালোচনাটি একটু দীর্ঘ ছিল এবং একটি বিষয়ে আমি শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে

পারিনি। বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। তিনি একান্তভাবেই ছিলেন নিরাত্মনবাদী—এই রকম একটা মত এই বইতে এক জায়গায় আছে। সমালোচনায় আমি লিখেছিলাম, পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রে এর বিপরীত উক্তি আছে ও তিনি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কিছুদিন পরের ঘটনা। মহাবোধি সোসাইটিতে গেছি সেদিন বিকেলে। নীচের যে হলটিতে সভা-সমিতি হয়, তারই এক কোণে একটি টেবিলে নানা রকম পত্র-পত্রিকার মধ্যে *Aryan Path* নামে একটি পত্রিকা চোখে পড়ল। সেটি হাতে তুলে নিয়ে পাতা উল্টোতে লাগলাম। পত্রিকাটির পুস্তক সমালোচনা বিভাগে *The Riddle of the World* বইটির একটি দীর্ঘ সমালোচনা রয়েছে। সমালোচনাটি মন দিয়ে পড়লাম। এক কথায় অপূর্ব। আমার সঙ্গে এক জায়গায় মিল দেখে খুব আশ্চর্য বোধ করলাম। সমালোচক লিখেছেন বুদ্ধদেব সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের উক্তি বিচার্য; কারণ তিনি অদৌ নাস্তিক ছিলেন না—তিনি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। যিনি জগজ্জ্যোতি, তিনি কেন নিরাত্মনবাদী হবেন? পালি ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করেই আমি শ্রীঅরবিন্দের উক্তির প্রতিবাদ করছি।'

লেখাটির সঙ্গে সমালোচকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া ছিল। সেটি পড়ে তাঁর সম্বন্ধে আমার যেমন কৌতূহল হল তেমনি আগ্রহের সৃষ্টি হল মনের মধ্যে। এই সমালোচক রোনাল্ড নিক্সন (Ronald Nixon) উত্তরকালে যিনি 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম' এই নামে ভারতের সাধুসন্ত সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সেই সঙ্গে বহুজনের শ্রদ্ধা। ঐ পরিচিতির সঙ্গে ঠিকানাও ছিল। তখন আমার প্রথম লেখা জীবনীগ্রন্থ 'ভারতের সাধনা ও বিজয়কৃষ্ণ' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকে একটি চিঠি লিখলাম এবং আমার লেখা একখানি 'বিজয়কৃষ্ণ' ও নিউ ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার একটি cutting-ও পাঠিয়ে দিলাম। তখন জানতাম না যে তিনি একজন যোগী ও পরম ভাগবত বৈষ্ণব—গৌড়ীয় বৈষ্ণব। অল্পদিন পরেই আলমোড়া উত্তর বৃন্দাবন থেকে চিঠির উত্তর এল শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের নিজের হাতে লেখা। জানালেন 'বিজয়কৃষ্ণ' বইটি তাঁর ভাল লেগেছে (তিনি খুব ভাল বাংলা শিখেছিলেন —বলতে ও পড়তে পারতেন।), ভাল লেগেছে সমালোচনাটি। চিঠির শেষে ছিল তাঁর ইষ্ট যশোদা মাতার আশীর্বাদ এবং সাদর আমন্ত্রণ তাঁদের আশ্রমে যাওয়ার জন্য। চিঠির তলায় স্বাক্ষর ছিল কৃষ্ণপ্রেম নয়—'গোপালদা'। অন্তরঙ্গ ও ভক্ত মহলে তিনি ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন।

আলমোড়ায় গেলাম যশোদা মাতার আশ্রমে। এঁর কথা আগে কিছুই জানতাম না। এখানে এসে তাঁর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলাম। হিমালয়ের কোলে, শান্ত নির্জন পরিবেশের মধ্যে আশ্রমটি ভারি ভাল লাগল। ভাল লাগল শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকে। গৈরিক পরিহিত এ্যাপোলো সদৃশ সেই প্রিয়দর্শন বৈষ্ণব সাধককে দেখে আমি তাঁর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হলাম। সেই আকর্ষণ চিরকাল ছিল আমার মধ্যে। একদিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণপ্রেম আমাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন আমি শ্রীঅরবিন্দের *Essays on the Gita* পড়েছি কিনা? উত্তর বললাম, হ্যাঁ, পড়েছি। 'This is the best commentary on the Gita I have so far read. This comes from the pen of the man of the Gita himself.' অবাক হয়েছিলাম এই মন্তব্যটি শুনে, তারপর কৃষ্ণপ্রেমই আমাকে বলেছিলেন—'go to him and you will get the substance'। তাঁর কাছেই যাও, বস্তুলাভ হবে।

'তাঁর কাছেই যাও, বস্তুলাভ হবে'—এই একটি কথা আমার মনকে সেদিন টেনে নিয়ে গিয়েছিল পণ্ডিচেরী তীর্থে। হ্যাঁ, তীর্থই বটে! আধুনিক ভারতবর্ষের নতুন তীর্থ দুটি—একটি দক্ষিণেশ্বর, অপরটি পণ্ডিচেরী। একটির দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ, অপরটির শ্রীঅরবিন্দ। আকর্ষণ আরো তীব্র হল। আমি লিখলাম চিঠি শ্রীঅরবিন্দকে দর্শনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। উত্তর এল নলিনীদা'র স্বাক্ষরে: yon can have the darshan on the 15th August, but you will have to make your own arrangement for staying here.' আমি উত্তরে জানালাম: 'আশ্রমের পরিবেশের মধ্যে না থাকতে পারলে, আমার এই তীর্থযাত্রা বৃথা হবে'। তখন ওদিক থেকে চিঠি এল: 'আশ্রমেই থাকার ব্যবস্থা হবে এক মাসের জন্য।'

১৯৩৬। ২৯শে জুলাই মাদ্রাজ মেলে যাত্রা করলাম পণ্ডিচেরীর উদ্দেশে। ৩১শে জুলাই মাদ্রাজ পৌঁছলাম। সেখান থেকে ব্রাঞ্চ লাইনে অন্য গাড়িতে পণ্ডিচেরী যেতে হয়। অপরাহ্ণবেলায় ট্রেন পৌঁছল পণ্ডিচেরী স্টেশনে। আমাদের নিতে এসেছিলেন আশ্রম থেকে দুজন। আমাদের মানে আমাকে ও আমার সহযাত্রী প্রমোদকুমার সেনকে। প্রমোদবাবু তখন 'য়্যাডভ্যান্স' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অমন মিষ্টভাষী, মিতবাক ও ধর্মপ্রাণ মানুষ আমি কমই দেখেছি। শ্রীঅরবিন্দ যেন তাঁর প্রাণের জিনিস ছিলেন। সুদক্ষ সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। আমার সাংবাদিক বন্ধুদের মধ্যে প্রমোদ বাবু খুব শ্রদ্ধেয় ছিলেন। পণ্ডিচেরী থেকে ফিরে আসার পর তাঁর অনুরোধে 'The Saint of Pondicherry' নাম দিয়ে 'য়্যাডভান্স' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধটি পাঠ করার পর প্রমোদবাবু আমাকে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে বাংলায় একটা বিস্তারিত জীবনী লিখবার কথা বলেছিলেন। তখন লিখেছিলাম 'ছোটদের শ্রীঅরবিন্দ'। বড় বই 'যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ' লিখি এর অনেক পরে একেবারে শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে।

ষ্টেশন থেকে একটা রিক্সায় চেপে আশ্রমে এলাম। আমি যখন এখানে আসি তখন অধ্যাপক সরকার আমাকে বলেছিলেন: 'মণি বাবু, সমস্ত জিনিস বেশ critically observe করে আসবেন।' আমি তাই একটা প্রচ্ছন্ন mental challenge নিয়েই গিয়েছিলাম পণ্ডিচেরী তীর্থে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতে। আমার সেই বিমূঢ়তার কথা মনে পড়লে আমি এখন অনুতপ্ত হই, লজ্জা বোধ করি। সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখার মত কিছু নেই এখানে। যা কিছু দেখেছিলাম তা সমর্পিত চিত্তের অনুরাগ নিয়েই দেখেছিলাম, যদিও আমার সমর্পণ বা surrender সম্পূর্ণ ছিল না।

আশ্রমের দ্বারপথে আমাদের দুজনকে স্বাগত জানাবার জন্য হাস্যমুখে দাঁড়িয়েছিলেন আশ্রম-সচিব শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। নলিনীদা জানালেন যে, আমাদের থাকার জন্য আশ্রমের মধ্যেই দুখানা ঘর নির্দিষ্ট হয়েছে। তখন আশ্রমের inmates-দের মধ্যে ছিলেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, অমলকুমার শেঠনা, প্রভৃতি। এঁরা তিন জনই কবি; দিলীপবাবু শুধু কবি নন, তিনি একজন সুরসাধক ও সুকণ্ঠ গায়ক। এঁদের তিনজনের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হয়। ভারত মহাসাগরের তীরে ফরাসী সরকারের শাসনাধীনে পণ্ডিচেরী একটি মনোরম ফরাসী উপনিবেশ সাধনার উপযোগী স্থান। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম বিধাতা-নির্দিষ্ট ছিল; তাঁর তপস্যার ক্ষেত্র হিসাবে এই স্থানটি যে ঈশ্বর স্বয়ং ঠিক করে রেখেছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যেমন বিশ্বজননী ঠিক করে রেখেছিলেন গঙ্গার তীরে কূর্মপৃষ্ঠবৎ স্থান দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যার ক্ষেত্র হিসাবে।

দর্শনের তখনো এক সপ্তাহ দেরী ছিল। পণ্ডিচেরী আমার প্রথম সপ্তাহ কেটে গেল আশ্রমবাসী সাধক-সাধিকাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে। সে বছর বাঙালী দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন ছিল; আশ্রমের স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা ছিল তখন প্রায় দু'শো; এঁদের বাদ দিয়ে বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিল তাদের সংখ্যা ছিল শ'দেড়েক। সব মিলিয়ে প্রায় দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল সাড়ে-তিনশো। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ-ভারত থেকেই তখন বেশি লোক আসত শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে দর্শন করতে। শ্রীমায়ের দর্শন সুলভ ছিল, কারণ তিনিই ছিলেন আশ্রম-পরিচালিকা এবং সেইজন্য সকলেই তাঁকে দেখতে পেত, দরকার হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারত। কিন্তু বছরে তিনটি দিন ছাড়া (এর মধ্যে তাঁর জন্মদিন ১৫ই আগস্টের দর্শনের দিনটি দর্শনার্থীর ভীড় বেশি হত) শ্রীঅরবিন্দকে কেউ দেখতে পেত না—এমনকি আশ্রমের স্থায়ী বাসিন্দারাও নন।

যা বলছিলাম—দর্শনের তখনো এক সপ্তাহ দেরী ছিল। সেই সাতদিন আমি তিন-চারখানা চিঠি লিখেছিলাম শ্রীঅরবিন্দকে। চিঠি তাঁকে সবাই লিখতে পারত আর অধিকাংশ পত্র-লেখকের চিঠির জবাব তিনি নিজের হাতেই দিতেন। চিঠি লিখে আশ্রম সচিবের হাতে দিতে হ'ত। তিনি সেইসব চিঠি একসঙ্গে ওপরে শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন সমাগত ভক্ত ও ধর্মপিপাসুদের সঙ্গে অনর্গল আলাপ করতেন এবং দিন-রাতের মধ্যে পনর-ষোল ঘণ্টা একনাগাড়ে কথা বলতেন ক্লান্তিহীনভাবে এবং দীর্ঘকাল এই ধারা চলেছিল দক্ষিণেশ্বরে ও কলকাতায়, তেমনি শ্রীঅরবিন্দ, (যিনি নৈঃশব্দ্যের রাজ্যে

বাস করতেন, যিনি বলতেন 'নীরবতাই সব') প্রতিদিন যে কত চিঠির জবাব দিতেন (সেগুলির বেশিরভাগই থাকত তাঁর নিজের হাতে লেখা) তা বোধহয় শুনে শেষ করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় ছিল মুখ, শ্রীঅরবিন্দের লীলায় মুখের স্থান নিয়েছিল লেখনী।

আমার প্রথম চিঠিতে ছিল তাঁরই লেখার ভিত্তিতে দুটি প্রশ্ন। আলিপুর আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসে, সকলেই জানেন, শ্রীঅরবিন্দ নতুন দুখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করেছিলেন; এর একটি ছিল ইংরেজী 'কর্মযোগিন্' আর বাংলা 'ধর্ম'। কর্মযোগিন্ পত্রিকার একটি নিবন্ধের নাম ছিল 'In Either Case'; এই প্রবন্ধটির সর্বশেষ প্যারাগ্রাফে তিনি লিখেছিলেন: 'The work that was begun at Dakshineswar is far from finished, it is not even understood. That which Vivekananda received and strove to develop, has not yet materialised. The truth of the future that Bijoy Gowamy hid within himself, has not yet been revealed utterly to his disciples.' বাংলা ছেড়ে পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ার অনেককাল পরে কর্মযোগিন্ পত্রিকার দশটি নিবন্ধ *The Ideal of the Karmayogin* এই নাম দিয়ে যখন আর্য পাবলিশিং হাউজ থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখনই আমি এইটি পড়ি ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বিজয়কৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের এই মন্তব্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রামকৃষ্ণ মিশন বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যদের কাছে এই বিষয়ে চিঠি লিখে কোন সদুত্তর পাইনি।

সেই সদুত্তর পাব এই আশা করেই প্রথম চিঠিতে তাঁর রচনাটি উদ্ধৃত করে শ্রীঅরবিন্দের কাছে বিনীত প্রশ্ন রেখেছিলাম: 'আপনি কি ভেবে এই মন্তব্যটি করেছিলেন বাংলার এই তিনজন মহাপুরুষ সম্পর্কে তা জানতে খুব কৌতূহল হয়; কারণ এঁদের সম্পর্কে এর আগে আর কেউ ঠিক এইভাবে কখনো মন্তব্য করেননি।' পঁচিশ বছর পরে তাঁকে কেউ তাঁর কর্মযোগিনের লেখা সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করবে, বোধ করি শ্রীঅরবিন্দ নিজেও তা কখনো ভাবেন নি। চিঠিখানি নলিনীদার হাতে দিয়ে এসেছিলাম একটি খামের মধ্যে করে। ঠিক দু'দিন পরেই সকালে ব্রেকফাস্টের পর নিজের ঘরটিতে বসে শ্রীঅরবিন্দের 'এসেজ অন দি গীতা' বইটি পড়ছিলাম (যে একমাস কাল ওখানে ছিলাম) ঐ সময়ে আমি শুধু এই বইটাই পাঠ করেছিলাম নিবিষ্টচিত্তে), এমন সময়ে নলিনীদা ঘরের মধ্যে ঢুকে তাঁর হাতে ঝোলানো সাদা থলেটির ভিতর থেকে একটি ছোট্ট খাম বের করে আমার হাতে দিয়ে সহাস্য বদনে বললেন, 'মণি, এই নাও তোমায় চিঠির উত্তর। তোমার চিঠিখানা খুব interesting ছিল।'

ভাবতেই পারিনি শ্রীঅরবিন্দ আমার এই চিঠির উত্তর দেবেন। ওখান থেকে ফিরে এসে কলকাতায় মহেন্দ্রবাবু ও আরো অনেককে সেটি দেখিয়েছিলাম; প্রমোদবাবু চিঠিখানা 'য়্যাডভ্যান্স' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। মহেন্দ্রবাবু সেটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন, আর ফেরৎ পাইনি। যতদূর মনে আছে উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: শ্রীরামকৃষ্ণই এ-যুগে এই সাধনার (পূর্ণযোগ) পথ দেখিয়ে গেছেন—তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জগন্মাতার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, জগন্মাতাই তাঁর হয়ে তাঁর মধ্যে অতি অল্প সময়ে সকল সাধনা করে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের এই সত্যটা অনেকে উপলব্ধি করতে পারেননি—দক্ষিণেশ্বরে যে দিব্য ও অলৌকিক সাধনার সূত্রপাত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণতা লাভ করেনি—পূর্ণযোগের পথে পদক্ষেপ করা ভিন্ন এজিনিস সম্ভব নয়। তাঁর উত্তরসাধক হিসাবে বিবেকানন্দ এই জিনিস লাভ করেছিলেন; তার বিকাশ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু বিবেকানন্দের সাধনার দৃষ্টান্ত থেকে খুব কম জনই অনুপ্রাণিত হতে পেরেছে। তিনিও পূর্ণযোগমার্গের পথিক ছিলেন। বিজয় গোস্বামীও তাঁর আশ্চর্য তপস্যা-প্রভাবে পূর্ণযোগের সত্যকেই লাভ করেছিলেন; ভবিষ্যতের সাধনা এই পথেই—এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্যদের কাছে এই সত্য আজো সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়নি।'

অবশেষে এল ১৫ই আগষ্ট। শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য জন্মতিথি। সকাল থেকেই আশ্রমের পরিবেশ যেন অন্যরূপ ধারণ করল। আজ শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করে সবাই কৃতার্থ হবেন। আশ্রমের প্রধান ভবনের যেখানে সমবেত প্রার্থনা হয় ঠিক তারই উপরে শ্রীঅরবিন্দ থাকেন—সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে সেখানে গিয়ে তাঁকে দর্শন করার নিয়ম।

জানতাম না খালি হাতে দর্শন করতে নেই। একজন আশ্রমবাসী আমাকে বললেন, দু ছড়া মালা নিয়ে গিয়ে প্রণাম করবেন। একটি মালা শ্রীঅরবিন্দকে ও অপরটি শ্রীমাকে দিয়ে প্রণাম করবেন। আশ্রম-বাগানের ফুলে তৈরি দু গাছা মালা (garland of purity) আডাই টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। আমার দর্শনের পালা যখন এল তখন বেলা এগারোটা বেজে গেছে। দিলীপবাবুর পরেই আমার পালা ছিল।

উপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, আমি যেন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে প্রণাম করে পাশের ঘরটি দিয়ে বেরিয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসি। আমি অবশ্য এই নির্দেশ মানিনি। একটি সোফায় আসিন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের হাতে মালা দিয়ে তাঁদের পায়ের তলায় বসেছিলাম এক মিনিট কি দু'মিনিট। মনে আছে ঘরে ঢুকতেই তাঁর পাশে একটি স্ট্যাণ্ডে বিলম্বিত টাইপ করা ফুল স্কেপ কাগজটির দিকে শ্রীঅরবিন্দ একবার তাকালেন। ঠিক এমনি জিনিস সিঁড়ির নীচেও ছিল। কে দর্শন করতে আসছে, এটা তিনি এইভাবে দেখে নিতেন। জিজ্ঞাসা করার দরকার হ'ত না। নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম শ্রীঅরবিন্দের জ্যোতির্ময় আননের প্রতি। তাঁর দুই চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আজো যেন আমার স্মৃতিতে সমুদ্ভাসিত রয়েছে। মনে হয়েছিল: এই তো আমার সামনে দিব্যমানব—সিদ্ধ পুরুষ, শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার যিনি মানবজাতির ভবিষ্যত বিবর্তনের নিগূঢ় সত্য উদ্ঘাটন করে পৃথিবীতে এক নবযুগের সূচনা করেছেন। মনে হয়েছিল ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের পর এত বড় অবতার পুরুষ আর কখনো আসেননি। যোগের সঙ্গে মানুষকে তিনি মিলিয়েছেন।

সেই সঙ্গে চকিতে মনে পড়েছিল শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সেই আলোকময়ী উক্তি। ১৯২৮ সালে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে কবি এসেছিলেন পণ্ডিচেরী আশ্রমে। দর্শনের পর কবি লিখেছিলেন: 'প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে: ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন।...মনে হল তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত।' রাজরাজেশ্বর ও রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতেই দেখেছিলাম সেদিন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে। শরীর ও মনের সমস্ত অণুপরমাণু তাঁদের দুজনকে দর্শন করে যেন সত্য হয়ে উঠেছিল সেই আনন্দ মুহূর্তটিতে। শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর নিভৃত আসনে দেখে সেদিন মনের মধ্যে যেন চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল উপনিষদের সেই শ্লোকটি:

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষো ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥
(মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৪)

ভগবান আমার একমাত্র আস্পৃহা, প্রতিদিন যেন ক্রমে তোমাকে আরো ভাল করে জানতে পারি, আরো ভাল করে সেবা করতে পারি। বাহিরের অবস্থায় কি এসে যায়? প্রতিদিন মনে হয় তা যেন ক্রমে আরো নিরর্থক আরো মায়াময় হয়ে চলেছে। বাহিরে যা ঘটে তার উপর আমার মনোযোগ ক্রমেই কমে আসছে; কিন্তু যে জিনিষটির মূল্য আমার কাছে বেড়ে চলেছে, যার উপর আমার মনোযোগ তীব্র হয়ে উঠেছে—তা হল, তোমাকে ভাল করে জানা, যাতে ভাল করে তোমার সেবা করতে পারি। সকল বাহ্য ঘটনা এই লক্ষ্যের দিকে একমুখী হবে, শুধু এই লক্ষ্যেরই দিকে—আর তা নির্ভর করে কি চক্ষে সে-সব ঘটনা আমরা দেখি তার উপর। সকল জিনিষের মধ্যে নিরন্তর তোমাকে আবিষ্কার করবার, সকল অবস্থার মধ্যে ক্রমে সুষ্ঠুতর তোমাকে প্রকাশ করবার সঙ্কল্প—এই মনোভাবের মধ্যেই রয়েছে পরমা শান্তি, পরিপূর্ণ প্রসন্নতা, সত্যকার তৃপ্তি। তাকেই ধরে জীবন প্রস্ফুটিত হয়, বিস্তৃত হয়, প্রসারিত হয় এমন মহৈশ্বর্য্য নিয়ে এমন পরিপ্লাবনের মহিমা নিয়ে যে কোন ঝঞ্ঝাবাত্যাই তাকে আর বিক্ষুব্ধ করতে পারে না।

ভগবান, তুমি আমাদের রক্ষাকবচ, আমাদের একমাত্র সুখ তুমি; আমাদের প্রোজ্জ্বল জ্যোতি, বিশুদ্ধ প্রেম, আমাদের আশা, আমাদের শক্তি, তুমি আমাদের জীবন, আমাদের সত্তার সদ্‌বস্তু।

শ্রদ্ধায় পুলকে পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে তোমায় অর্চ্চনা করি, প্রণাম করি।

মার্চ্চ ১২, ১৯১৪ —শ্রীমা

★

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের

প্রতি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

—নীনা

—রীমা

THE COLLECTED WORKS
OF
NOLINI KANTA GUPTA

Volume One
Volume Two
Volume Three
Volume Four
Volume Five

The collected works of SRI NOLINI KANTA GUPTA, shed a new light on the pressing problems of Man and his future. In the context of the present bewildering conditions of the world, they have a special relevance, and it is hoped that they will aid the modern man in his search of new hope for a new life of unity and harmony.

size : Double demy
pp : 406

Cloth Binding with attractive art-paper jacket.

Price Rs. 15·00 Each

Available at :

SRINVANTU
63, College Street
Calcutta-12
Ph : 34-1351

Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-12
Ph : 34-2376

Published by : Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry-2

—রচনাবলী—

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র:বাংলা রচনা-সংগ্রহ একত্রে আটখণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, যোগ, ইত্যাদি জীবনের মর্মসত্যের বাস্তব বিশ্লেষণে এবং শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের জীবন-সাধনার গভীর ভাব-অবগাহনে তা সিদ্ধ-স্নাত।

সুদৃশ্য মনোটাইপে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ডবল-ডিমাই সাইজের পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার প্রতিটি বৃহৎ খণ্ড রেক্সিন ও বোর্ড বাঁধাই, মুদ্রণ ও গ্রন্থণ পারিপাট্যে সৌন্দর্যে চিত্তাকর্ষক।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। মূল্য—২৫·০০ দ্বিতীয় খণ্ড আগামী মাসে প্রকাশিত হবে

সম্পূর্ণ রচনাবলীর গ্রন্থসূচী

সাহিত্য ও শিল্পকলা

প্রথম খণ্ড : ১। সাহিত্যিকা, ২। রূপ ও রস, ৩। আধুনিকী, ৪। শিক্ষা ও দীক্ষা, ৫। রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় খণ্ড : ১। শিল্পকথা, ২। কবির্মনীষী-১ম, ৩। কবির্মনীষী-২য়, ৪। কবির্মনীষী-৩য়

তৃতীয় খণ্ড : ১। বাংলার প্রাণ, ২। মৃতের কথোপকথন, ৩। গানের গান, ৪। ফরাসী ষোড়শী, ৫। মারিয়ানা (ফরাসী নাটিকা), ৬। তিন্তাজিলের মৃত্যু (ফরাসী নাটিকা) ৭। অনুবাদমালা (কবিতা)

দেশ-সমাজ-রাজনীতি

চতুর্থ খণ্ড : ১। ভারত-রহস্য, ২। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান, ৩। স্বরাজের পথে, ৪। স্বরাজ-গঠনের ধারা, ৫। শ্রীঅরবিন্দ ও বর্তমান যুদ্ধ, ৬। কালের আহ্বান

পঞ্চম খণ্ড : ১। ভাবীসমাজ, ২। বোলশেভিকি, ৩। নীট্‌শের বাণী, ৪। নারীর কথা, ৫। স্মৃতির পাতা-১ম, ৬। স্মৃতির পাতা-২য়

ধর্ম-সাধনা—জ্ঞান-বিজ্ঞান

ষষ্ঠ খণ্ড : ১। ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা, ২। বেদমন্ত্র, ৩। উপনিষদ—কথা ও কাহিনী ৪। নব্যবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান

সপ্তম খণ্ড : ১। পূর্ণযোগ, ২। দেবজন্ম, ৩। সাধকের কথা, ৪। চেতনার অবতরণ, ৫। আলোর পথে-১ম, ৬। আলোর পথে-২য়, ৭। এ যুগের সাধনা, ৮। তিন কাহিনী, ৯। শতাব্দীর প্রণাম, ১০। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'

সম্প্রতি আবিষ্কৃত আদি কালের রচনা সম্ভার

অষ্টম খণ্ড : "আদি লেখা"

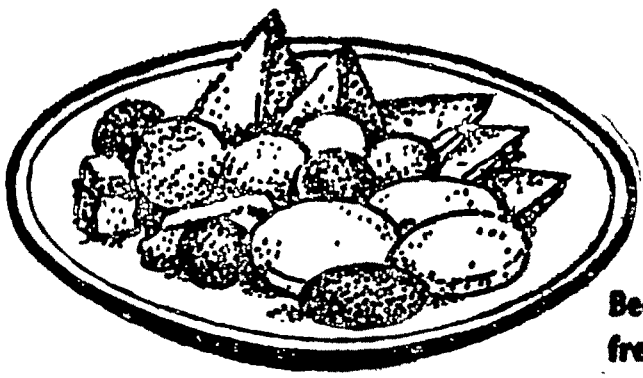
৬৩, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
৩৪-১৩৫১

শৃণ্বন্তু

শ্রীঅরবিন্দ ভবন
৮, শেক্সপীয়র সরণী
কলিকাতা-১৬

Telephone

VANASPATI COOKS A DELICIOUS MEAL— SO WHOLESOME TOO.



Because it's fresh and pure and enriched with Vitamin A and D

Always ask for Telephone Vanaspati. People love its taste. It's a delicious cooking medium. So good for curries, fried foods, western and oriental cooking. It's economical and so pure. Always fresh, it's enriched with Vitamin A and D for extra goodness. Remember to ask for :

Telephone

VANASPATI

cooking medium that's wholesome.



A produce of Swalka Vanaspati Products Ltd.

Open yourself to the New Light that has dawned upon earth and a luminous path will spread in front of you.

—THE MOTHER



THE HOOGHLY MILLS CO., LTD.

MANUFACTURERS & EXPORTERS

10 CLIVE ROW,
CALCUTTA-1.

Telegraphic Address
"VICTO" Calcutta

Telephone No
22-5451 (2 Lines)
Codes : Acme & Bentley's
Second Phase

SRINVANTU PUBLICATIONS

সাবিত্রী—শ্রীঅরবিন্দ	...	৩'০০
মধুময়ী মা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২'০০
মধুময়ী মা (২য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২'৫০
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪'০০
কবির্মনীষী (৩য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪'৫০
Light of Light—Nolini Kanta Gupta	...	4'00
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	..	১'৫০
শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' উপাখ্যান—শ্রীমণিবিষ্ণু চৌধুরী	...	৩'৫০
আলবার পদাবলী—শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	...	১০'০০
মায়ের অবতরণ কেন ?	...	০'৫০

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র বাংলা রচনাবলী প্রকাশের অপেক্ষায় (৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ)
তন্মধ্যে রচনাবলী : প্রথম খণ্ড : 'সাহিত্যিকা' প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য ২৫ টাকা

SRINVANTU

63, College Street,
Calcutta-12
Phone : 34-1351

Sri Aurobindo Bhavan
8, Shakespeare Sarani
Calcutta-16, Phone : 44-3057

॥ 'শৃঙ্খল'-র নিয়মাবলী ॥

বৈশাখ হতে 'শৃঙ্খল'-র বর্ষ আরম্ভ। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া চলে। বার্ষিক চাঁদা সডাক দশ টাকা, ষাণ্মাসিক পাঁচ টাকা, প্রতিসংখ্যা এক টাকা। ছয় মাসের কমে গ্রাহক তালিকাভুক্ত করা হয় না।

প্রতি বাংলা মাসের ৯।১০ তারিখে 'শৃঙ্খল' প্রকাশিত হয়, যথাসময়ে পত্রিকা না পেলে ১৫ দিনের মধ্যে জানালে ভাল হয়।

ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তন করতে হলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হলে 'শৃঙ্খল' অফিসে জানাবেন। চিঠিপত্রাদিতে যোগাযোগের সুবিধার জন্য গ্রাহকগণ যেন তাঁদের নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সর্বদা উল্লেখ করেন।

'শৃঙ্খল'-র চাঁদা মনিঅর্ডার যোগে অথবা পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টও গ্রহণ করা হয়। ভি. পি.-তে পত্রিকা পাঠান হয় না।

বাৎসরিক চাঁদা শেষ হয়ে গেলে তিন মাস অপেক্ষা করা হয় এবং কাগজ যথানিয়মিত পাঠান হয়ে থাকে এরই মধ্যে গ্রাহক যদি চাঁদা না পাঠান বা কোন কিছু জ্ঞাত না করান তাহলে পত্রিকা পাঠান সম্ভব নয়।

লেখকদের প্রতি আবেদন, তাঁরা যেন রচনার নকল রেখে পাঠান। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়।

কর্মাধ্যক্ষ : 'শৃঙ্খল'

The National Tape Loom Co

Manufacturers of SILK, COTTON & GLASS TAPES

7, LYONS RANGE

3rd Floor, Room No. 2

Calcutta-1

Phone : Office : 22-3718/5066

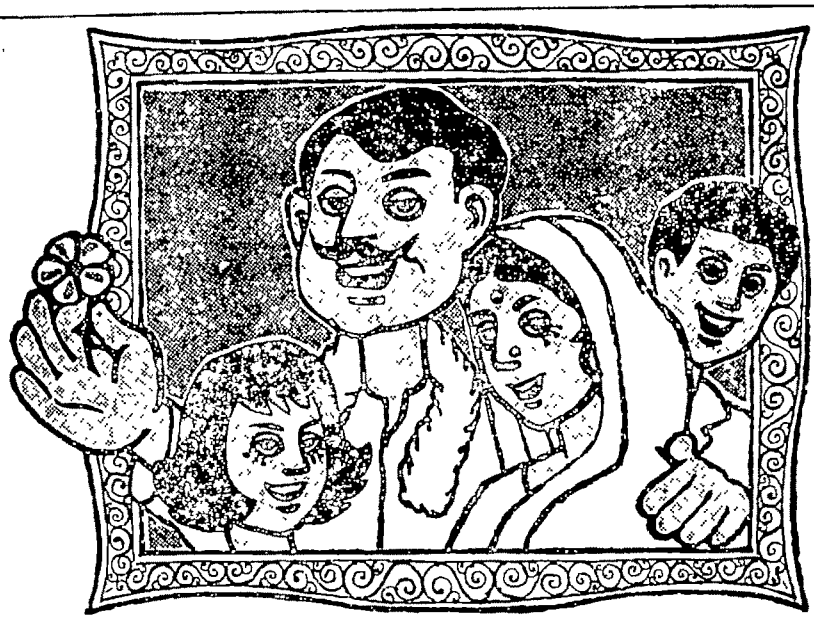
Love of God, charity towards men is the first step towards perfect wisdom.

—Sri Aurobindo

★

Cargo Surveyors
Analytical Chemists
Gram : JUTASPECTA
Telex : NOPROB CA 2414
Phone : 240046/47

ESKAPS (INDIA) PRIVATE LTD.
30, Chowringhee Road
Calcutta-700016



মাসিক সঞ্চয়ের সহজ পথ, গড়বে সুখের ভবিষ্যৎ

১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদী

ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট

★প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে, ২৫ বছর পরে পাবেন ১,৩৩,৮০০ টাকা

প্রতিমাসে সঞ্চয় তো করবেনই কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। ভেবে দেখুন কি ভাবে ও কতটা সঞ্চয় করলে আপনার ও আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটতে পারে আর আপনিও নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

5 JUL 1976

॥ মাসিক সঞ্চয় ও আয়ের তালিকা ॥

মাসিক সঞ্চয়	১০ বছর পরে পাবেন	১৫ বছর পরে পাবেন	২০ বছর পরে পাবেন	২৫ বছর পরে পাবেন
১০৲	২০৬৬৲	৪১৮০৲	৭৬৬০৲	১৩,৩৮০৲
২০৲	৪১৩২৲	৮৩৬০৲	১৫,৩২০৲	২৬,৭৬০৲
৫০৲	১০,৩৩০৲	২০,৯০০৲	৩৮,৩০০৲	৬৬,৯০০৲
১০০৲	২০,৬৬০৲	৪১,৮০০৲	৭৬,৬০০৲	১,৩৩,৮০০৲

প্রতিমাসে যতটা সম্ভব সঞ্চয় করুন। এই প্রকল্পে আপনার সঞ্চয় থেকে আয় অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১ ✱ ফোন : ২৩-৯৭৮৪-৫-৬

অথবা যে কোন শাখা অফিস

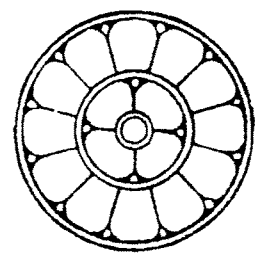
Progressive/UIB 18/75

প্রচ্ছদপট মুদ্রক ॥ কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস ॥ কলিকাতা ৯

পরিচয়

অতীত মানুষ যা করেছে চিরকাল তারই পুনরাবৃত্তি করে চলা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ হল অভিনব সিদ্ধি, অচিন্ত্যপূর্ব ঈপ্সিতা সব অর্জন করা।

—শ্রীঅরবিন্দ



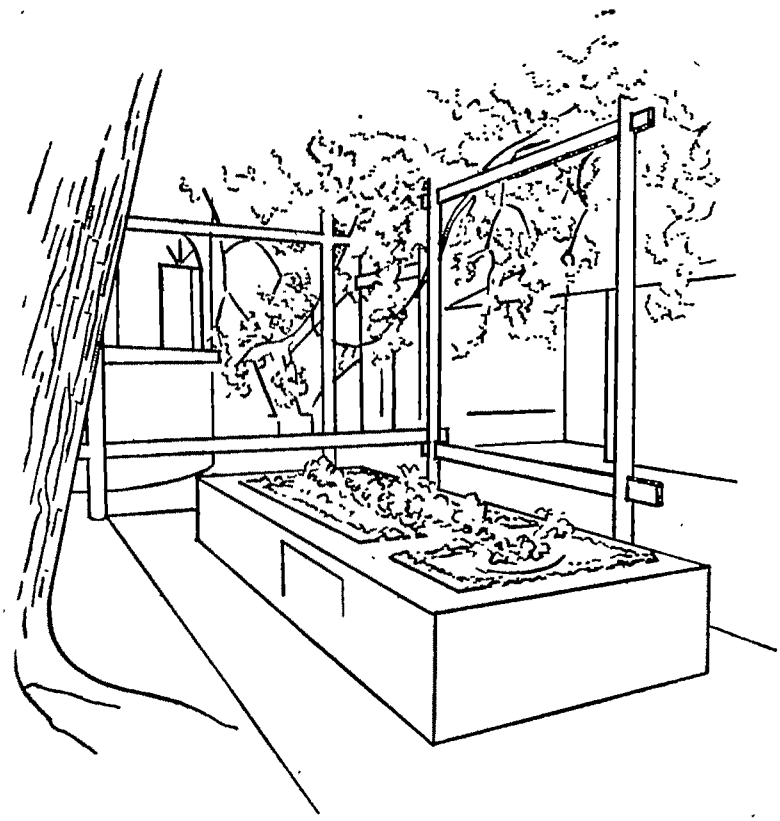
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা :

শ্রী সতীন্দ্র কুমার বসু

পঞ্চবিংশতি বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা • শ্রাবণ ১৩৮৩

শৃঙ্খল

পঞ্চবিংশতি বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা
শ্রাবণ : ১৩৮৩



সূচী—

শ্রীঅরবিন্দ
'সাবিত্রী' ১৩৩
শ্রীঅরবিন্দের অভিভাষণ ১৩৯
ভবিষ্যতের কবিতা ১৪১

শ্রীমা
মায়ের ঘরোয়া কথা ১২৭

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
রামায়ণী শক্তি ১২৫

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত
মা (কবিতা) ১৪৫

অমলেশ ভট্টাচার্য
মায়ের পণ্ডিচেরী আগমন ১৪৬

সার কথা (পুস্তক সমালোচনা) ১৫১

সম্পাদক : **অমলেশ ভট্টাচার্য**
প্রকাশক ও মুদ্রক : **নিখিলকান্ত গুপ্ত**
সম্পাদকীয় কার্যালয় : শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮ শেক্সপীয়ার সরণী, কলিকাতা-১৬
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে
মুদ্রিত এবং 'শৃঙ্খল' কার্যালয়, ৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
ফোন : ৩৪-১৩৫১

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক সডাক : দশ টাকা

শ্রাবণ ১৩৮৩ পঞ্চবিংশতি বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

রামায়ণী শক্তি

['উত্তরা', ৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৭]

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

রামায়ণ কেবল একখানি কাব্য নয়—কবিত্ব হিসাবেও যদ্যপি ইহা অতুলনীয়; রামায়ণ হইতেছে একটা শক্তি।

ভারত-শক্তির একটি প্রধান অঙ্গ, একটি মুখ্য রূপ এই রামায়ণী-শক্তি। ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা ধর্ম-কর্মকে মহান বৈশিষ্ট্য দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে যত মন্ত্রশক্তি তাহাদের মধ্যে বাল্মীকির এই গাথার আছে আবার বিশেষ অবদান।

প্রথম, বেদ ও উপনিষদ; তারপরেই, রামায়ণ ও মহাভারত; তৃতীয় পুরাণ এবং চতুর্থ ধর্ম ও স্মৃতি শাস্ত্র। এই চারি প্রস্থান লইয়া ভারতের সমগ্র শিক্ষা-দীক্ষা; ইহারাই দিয়াছে ভারতীয় জীবন-প্রতিভার আকৃতি ও প্রকৃতি।

বেদ হইতেছে ভারতের আদি মূল মাতৃশক্তি—এইখানেই ভারতের অন্তরাত্মা। অন্য সীমায়, স্মৃতি হইতেছে দৈহিক আয়তনের বিধান; বাহিরের, স্থূল কর্ম-ক্ষেত্রের, ব্যবহারিক জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা। এই দুই-এর, এই আত্মা ও দেহের মাঝে, অন্তঃকরণের পৃথক পৃথক ভূমিকে গড়িয়া তুলিয়াছে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ।

বেদ উপনিষদ ভারত-প্রতিভার বনিয়াদ হইলেও সে বনিয়াদ আছে অনেকখানি ভিতরে, গভীরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। পিছন হইতে গোপনে তাহা সমস্ত ভারত-জীবনকে ধরিয়া আছে, সমস্তের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিতেছে। তাহার সত্য শাশ্বত সনাতন অব্যয় ও স্থানু। বিপরীত দিকে স্মৃতি হইতেছে পত্র প্রশাখা মাত্র, তাহা একান্ত বহিরঙ্গের প্রকাশ—তাহার সত্য দেশকালপাত্রের নিয়মাধীন, নিত্য পরিবর্তনশীল। রামায়ণ-মহাভারত ভারতীয় জীবনের প্রধান কাণ্ড; আর পুরাণগুলি হইতেছে মুখ্য কয়েকটি শাখা।

অন্তরাত্মার সত্যকে—বৈদিক, ঔপনিষদিক সিদ্ধিকে—জীবনে, প্রাণের স্পন্দনে সচল মূর্ত করিয়া ধরিতে চাহিয়াছে রামায়ণ ও মহাভারত; পুরাণ সেই প্রাণ-লীলার বিশদ বিবরণ, ব্যাখ্যান দিয়া আরও স্পষ্ট, আরও নিত্য-নৈমিত্তিকের ব্যাপার করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে। আরণ্যকে সাধকমণ্ডলীর মধ্যে বেদ-শক্তি নিভৃত, একান্তবাসী; সাধারণ সমাজের জীবনে যে শক্তি প্রকট তাহা সাক্ষাৎভাবে

উৎসারিত রামায়ণ মহাভারত হইতে, পুরাণ হইতে। ভারতের চিত্তকে, মূল প্রাণকে—কার্যকরী প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা যাহা তাহাকে—গড়িয়াছে রামায়ণ ও মহাভারত ; পুরাণ সেই চিত্তধর্মকেই আরও গোচর, আরও অলঙ্কৃত করিয়া ধরিয়াছে ; তদনুসারে স্থূলতর মনবুদ্ধিকে ঢালিয়া তৈয়ার করিতে চাহিয়াছে।

রামায়ণ ভারতের চিত্তবৃত্তিকে, প্রাণের ধারাকে স্পর্শ করিয়াছে, গড়িয়া তুলিয়াছে হৃদয়েব অবদানে, সরল সুকুমার অথচ সমর্থ ভাব-শীলতার কল্যাণে। মহাভারত সেই প্রাণকে বাঁধিয়া ধরিয়াছে একটা স্থিরবুদ্ধিপ্রতিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তির সুদৃঢ় মানসিক বলের চাপে। রামায়ণের মূলমন্ত্র বলিতে পারা যায় হইতেছে "সত্য" আর মহাভারতের হইতেছে "ধর্ম"। সত্য হইতেছে সত্তার সহজ স্ফূর্তি ; একটা সহজ বোধ সরল অনুভব তাহাকে ব্যক্ত করিতেছে, আর ধর্ম আসিতেছে সম্যক্-বুদ্ধি হইতে, কর্তব্য জ্ঞান হইতে, আদর্শ-পরায়ণতা হইতে। যাহা ন্যায্য, যাহা যুক্তিযুক্ত সেই বিবেচনাকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম দাঁড়াইতেছে ; সত্য স্বতঃসিদ্ধ, একটা নৈসর্গিক ঔচিত্য লইয়া স্বয়ম্প্রকাশ।

রামায়ণের ব্যক্তিরা—দশরথ রাম সীতা লক্ষ্মণ ভরত হনুমান সুগ্রীব বিভীষণ—সকলেই কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ বা সম্পাদন করিতে গিয়া বিচার বিবেচনার উপর বিশেষ নির্ভর করেন নাই ; মস্তিষ্ক আসিয়া যদি ওজন করিতে চাহিত, তবে ইঁহাদের অনেকেরই একাধিক ক্রিয়া অন্য রকমের হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু ইঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে সহজাত স্বভাবসিদ্ধ বিবেক, ইঁহাদের কর্ম অন্তরের একটা মহত্ত্বের, ঔদার্যের, বিশালতার উন্মুক্ততার পরিপ্লব। এমনকি কৈকেয়ী মন্থরা এবং রাবণ পর্যন্ত তাঁহাদের বিকর্মের পথে চলিয়াছেন যতখানি উৎসাহের প্রবণতার ভরে, ততখানি বুদ্ধি যুক্তি বা মতলবকে আশ্রয় করিয়া নয়। পক্ষান্তরে মহাভারতের বীরগণ—যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন সকলেরই মধ্যে কর্মপ্রবাহ প্রাণ হইতে সোজাসুজি উৎসারিত হইয়া পড়ে নাই, তাহা যেন একবার ঘুরিয়া মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মহাভারতের মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে এই বুদ্ধিযোগই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার গীতার একটা প্রধান মন্ত্রই হইল এই বুদ্ধিযোগ ! শ্রীরাম সরল নির্মল প্রাণের সহজ গতির বিগ্রহ। পাঞ্চালীর প্রতি পদক্ষেপে ফুটিযা উঠিযাছে একটা পরিণত আত্মপ্রতিষ্ঠ মনের স্থির সঙ্কল্প, ইচ্ছাশক্তির পরিকল্পনা। অন্যদিকে সীতার কর্মেব পিছনে রহিয়াছে সরল ভাবগর্ভ প্রাণ—তাহাতে মনের বুদ্ধি বা যুক্তির খাদ নাই।

মহাভারতের যে শক্তি, তাহা হইতে যেন বিচ্ছুরিত হইতেছে তপশ্চর্যার, একটা কৃচ্ছ্রতার তাপ—তাহা গম্ভীর তাহা উদাত্ত তাহা কঠোর। রামায়ণী শক্তিও শক্তিমান, কিন্তু তাহা একটা উদার বৃহৎ প্রসন্ন কান্ত গুণে মণ্ডিত। মহাভারত উত্তুঙ্গ শৈলশিখর, রামায়ণ বিশাল জলধি। মহাভারত ক্ষত্রগুণের আধাব—কৃপ, দ্রোণ ব্রাহ্মণ হইলেও ক্ষত্রিয় ধর্ম ও আচার গ্রহণ করিয়াছেন। রামায়ণের হাবে-ভাবে ব্রহ্মণ্য গুণের পরিচয় বেশি—রামায়ণের নায়ক ক্ষত্রিয় হইলেও, সত্যকার ব্রাহ্মণেরই একটা শম দম শুচি, অন্তরাত্মার একটা সরল শুভ্রতা, প্রাণের একটা সহজ মহত্ত্ব তাঁহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য গড়িয়া দিয়াছে। বাল্মীকির হাতে যে সৃষ্টি রূপ পাইয়াছে, তাহাতে সত্ত্বগুণ রজোগুণকে ছাপাইয়া গিয়াছে। ব্যাসের সৃষ্টিতে সত্ত্ব অপেক্ষা রজো-গুণেরই প্রাধান্য। মহাভারত যদি হয় দিনের খর আলো, তবে রামায়ণ হইতেছে পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না।

ভারতের প্রাণে রামায়ণী শক্তি আনিয়া দিয়াছে তারুণ্য, সৌকুমার্য—সহজ মহানুভবতা, নৈসর্গিক গরিমা—অনায়াস সৌষ্ঠব, অযত্নলব্ধ পারিপাট্য—সারল্য, আর্জব। দ্বাপরের শেষে ব্যাসদেবের আবির্ভাব—কলিযুগের জন্য প্রস্তুত করিতে গিয়া তিনি বোধহয় আমাদিগকে বেশি সজাগ-সতর্ক, বেশি শক্ত, একটুখানি রূঢ় ও রুক্ষই করিয়া গড়িতে চাহিয়া-ছিলেন। কিন্তু সৌম্য-সহাস বাল্মীকির সে প্রয়োজন হয় নাই ; তিনি আমাদের প্রাণে যে সামর্থ্য সঞ্চারিত করিতে-ছেন, তাহাতে কোন জোর কোন প্রয়াস বুদ্ধির কোন সঙ্কল্প নাই ; তাহা হইতেছে বর্ধিষ্ণু শিশুর বা তরুলতার যে অটুট অব্যর্থ অথচ প্রশান্ত গোপনচারী জীবনীশক্তি—তাহার প্রতিষ্ঠা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে।

মহাভারতের প্রয়াস সত্তাকে—গীতার কথায়—"উর্জ্জিত" করিয়া গড়িয়া তোলা ; রামায়ণ চায় সত্তাকে "শ্রীমান" করিয়া বরিতে।

মায়ের ঘরোয়া কথা

বৃহস্পতিবার, ১১.১১.৫৩

বৃদ্ধ ডাক্তার ব্যানার্জি আমাদের শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হতে চান। পবিত্র মাকে সেই কথা বলাতে, মা সকৌতুকে বললেন,

—"এদের বয়সের লোকেদের বলতে হবে, তোমাদের ছাত্র হিসেবে নেওয়া যেতে পারে যদি কয়েকটি পরীক্ষা দাও, যেমন, ফরাসীতে প্রথম দিন পাঠ নেবার পরেই দ্বিতীয় দিন সেসব আবৃত্তি করতে হবে, অন্ততঃ তার কয়েকটি বাক্য। বার কয়েক সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করে এসে তৎক্ষণাৎ পাঠ নিতে হবে।

দেখবে, এই ধরনের পরীক্ষায় ওদের পাশ করা খুব শক্ত হবে।"

* * *

ব্যালকনি দর্শনের পর ঘরে সবাইকে ফুল দিয়ে ও আশীর্বাদ করে মা বললেন, "Au revoir", কিন্তু একজন বাকী ছিল; তাকে দেখে মা হেসে বললেন, "দেখ একবার, ও এখনও বাকী, আর আমি বলছি, সব শেষ হল।"

শনিবার, ১৪.১১.৫৩

মা আজ মেয়েদের শাড়ী বিতরণ করবেন। তিনজনকে ব্যালকনির পরে শাড়ী দেবেন বলে, তিনটি শাড়ী সামনে রাখা ছিল। তাড়াতাড়িতে সেগুলি এদের দিতে প্রায় ভুলে যাচ্ছিলেন বলে A. S. মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে। মা তখন তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলে নিয়ে টপাটপ্ তিনজনকে তিনটি দিয়ে বললেন, "Tous sont pareilles, il n'y a rien à disputer!" —সবগুলিই এক রকমের, তাই ঝগড়া করবার কোনই কারণ ঘটবে না!

পবিত্র আরও একটু কৌতুক করে বলল, "Tous pareilles et tous fines"—সবগুলিই সমান এবং সবগুলিই মিহি।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, মিহি বুঝি?

পবিত্র দেখিয়ে দিল, মিলের ছাপ রয়েছে "FINE"।

মা হেসে বললেন, সত্যিই কাপড়গুলি বেশ মিহি বটে!

সোমবার, ১৬.১১.৫৩

আজ "early Monday" নয়, তথাপি আশা করা গিয়েছিল, মা এগারটা-পনেরর মধ্যেই ব্যালকনিতে আসবেন, কিন্তু এলেন ঠিক বারটায়। ব্যালকনি থেকে ফিরতেই আমাদের একজন তাঁকে একটি কাগজ দেখাল। অস্টিন গাড়ীর কিছু spare parts কিনতে হবে।

মা বললেন, "Mes enfants, si vous voulez de "business" asseyez-vous et je reviens. J'ai encore des gens qui m'attendent."

—"যদি এই সব বাজারের ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাও, তো চুপটি করে খানিকক্ষণ বসে থাক, আমি ঘুরে আসি। এখনও ওদিকে অনেকে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।" এই বলে মা সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন। মিনিট দশেক পরে ফিরে আসতে পবিত্র অন্য কথা পাড়ল: রেমোঁ (Raymond) নতুন ফরাসী যুবক (journalist) দু-এক দিনের মধ্যেই তার রাত্রের ক্লাশ শুরু করবে, স্কুল-বাড়ীতেই উপরে নতুন ঘরে। কিন্তু গোল বেধেছে সদর-দরজার চাবি নিয়ে। দুটি চাবি আছে, তার একটি ব্যবহার করেন ফরাসী মহিলা পদ্মা (Padma), আর অন্যটি করেন ইংরেজ যুবক নরম্যান (Norman)। তাই আর একটি বাড়তি চাবি না হলে রেমোঁর বড়ই অসুবিধা হবে।

মা বললেন, "আরও একটি চাবি করান মানে অপশক্তিদের আরও বেশি সুযোগ দেওয়া। চাবি হারাবে,

গোল বাধবে, পাশের বাড়ীর চাকরটা তোমাদের চাবির সন্ধান পেয়ে যাবে।"

পবিত্র এই নিয়ে কিছু যুক্তিতর্কের অবতারণা করল।

মা বললেন, "কি আর করা যাবে? তোমাদের মতেই আমি সায় দিচ্ছি। আরও একটি চাবি করিয়ে নাও। কিন্তু আমি আগে থেকেই বলে রাখছি যে গোল বাধবেই। গত ত্রিশ বছর ধরে চাবি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি কিছুতেই তোমাদের বাগে আনতে পারলাম না। আমি যেটা করতে বলি সেটা কিছুতেই তোমরা করে উঠতে পার না। এর জন্যে তোমাদের চেতনার পরিবর্তন চাই। অন্তরের পরিবর্তন তোমাদের খানিকটা হয়েছে, কিন্তু বাহ্য ব্যাপারের বেলায় তোমাদের স্বভাব একেবারে প্রস্তরীভূত হয়ে বসে আছে। তাকে বদ্‌লান এক মহাব্যাপার।"

মঙ্গলবার, ১৭.১১.৫৩

সকালে মা যখন শিশুদের বিদায় দিলেন, তাঁকে বললাম, ভারতীদি প্রার্থনা জানিয়েছে, যদি তুমি তাকে আজ শাড়ীটি দাও। গত রবিবার সে আসতে পারেনি। মা বললেন, উপরে তো শাড়ী নেই। দুমানের কাছে গিয়ে একটি চেয়ে আন। বল তাকে, মা চাইছেন, নিচে একজনকে দেবেন।···গেলাম আনতে।

ব্যালকনির পরে বললেন,

"Je suis une heure en retard. Pour pouvoir être à l'heure je me suis levée à quatre heures et demie après m'avoir couché à une heure de la nuit, et tout de même c'est la même chose Il y a sept bonne-fêtes aujourd'hui."

—আজ আমার একটি ঘণ্টা বেশি দেরী হয়ে গেছে। (ব্যালকনি এগারটায় শেষ হল আজ) আজ সাত জনের জন্মদিন। দেরী যাতে না হয় সে জন্যে রাত দেড়টায় শুতে গিয়ে আমি আজ সকালে সাড়ে-চারটায় উঠেছি। তবুও যে-কে-সেই।

বুধবার, ১৮.১১.৫৩

রোজকার মত আজও মায়ের ব্যালকনিতে আসতে অনেক দেরী হল। তবুও প্রশ্ন অনেক ছিল বলে, পবিত্র যে কোন মুহূর্তে একটু সুযোগ পেলেই মাকে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করল এবং মা-ও উত্তর দিতে লাগলেন। সমস্যাপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে লাগল। উত্তর দেওয়া মুশকিল, অথচ না দিলেও কাজ করা যায় না। পবিত্র হাঁটু গেড়ে অর্ধেক-বসা অবস্থায় প্রশ্ন করে যেতে লাগল।

মা কৌতুক করে একটি ফুলের গুচ্ছ নিয়ে তার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করে বললেন, "কিছুতেই ঢোকে না·· Cela n'entre pas!" মায়ের বাক্যটির দুরকম অর্থ হয়: যে উত্তর তিনি নীরবে দিচ্ছেন, তার কথাগুলি শুনে, তা সে কিছুতেই ধরতে পারছে না, কারণ সমস্যার জটিলতায় সে তার অন্তরের সমতা গুলিয়ে ফেলেছে। তাই মাও হাসতে লাগলেন।

পবিত্র জিজ্ঞাসা করল, Ca va?—এমনটা করা চলবে কি?

মা বললেন, "Ca va!" অর্থাৎ চলবে।

হিন্দী, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি শিক্ষা নিয়ে কথা উঠেছিল।

সংস্কৃত সম্বন্ধে মা বললেন, "C'est Kapali Shastri qui a donné des des lecons en Sanscrit."

কাপালী শাস্ত্রী সংস্কৃত পড়াত। পবিত্র বলল, এখন শেখায় পুন্নালাল, কুঞ্জবিহারী আর প্রভাকর মুখোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার, ১৯.১১.৫৩

আজ বারটা-পনের মিনিটে হল ব্যালকনি দর্শন। মা বেশ হাস্যমুখর। বললেন, "Ce soir, Le Sage!" অর্থাৎ আজ বিকেলে তিনি সেই ফরাসী নাটিকাটির অভিনয় দেখবেন। *Le Sage* হল নাটিকাটি। ২রা ডিসেম্বরে আশ্রম বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে এটি ছেলেরা অভিনয় করবে, সেজন্যে তারা তৈরী হচ্ছে।

A. S.-কে লক্ষ্য করে মা বললেন, "তুমি তো আগেই তোমার সঙ্গীটিকে আহত করে রেখেছ!" (কথাটি মা ঠাট্টা করে বললেন, তার কারণ অভিনয়ে ওদের দুজনের মধ্যে তরবারি সঞ্চালন আছে।) তারপর পবিত্রর দিকে মুখ করে মা বললেন,

"জান মজা। অভিনয় তো হবে, এদিকে 'হ' তার চোখে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বসে আছে। (বলতে বলতে মা শিশুর মত হাসতে লাগলেন, আর সবাই তো হেসেই

অস্থির !) মা বলে চললেন, তার নাকের পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট ব্রোণ উঠছিল। নিজে ডাক্তারী করতে গিয়ে সে কিছু একটা দিয়ে তার উপরে কাটা ছেঁড়া করে। এখন সেটা ঠেলে বেরুচ্ছে চোখের উপর দিক দিয়ে। তাই সেটাকে চেপে দিয়ে একটি হাস্যকর ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে।

এদের প্রায়ই একটা-না-একটা লেগেই আছে। এক একজন আছে, যারা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করতে বড়ই নিপুণ। তাদের এই ধরনের বাধা আসবেই। বিশেষ বিশেষ সময়ে এমন ছোটখাটো একটা কিছু কাণ্ড ঘটে বসবে, যার দরুন তাদের সব শৃঙ্খলা ভেঙে যাবে। এ মানুষটিও তাই। আমার মনে পড়ছে সেই লোকটির কথা (বলে হাসতে হাসতে মা বললেন,) সে চলেছে বিয়ে করতে, আর তার এক চোখে প্রকাণ্ড একটি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।" (সবাই হেসে উঠল)

* * *

'সু'-কে এক বোতল গোলাপ জল দিয়ে মা বললেন, এটি তোমার জন্যে। ('সু' মায়ের চোখ ধোবার লোশান তৈরী করে বলে তাকে দিলেন।) তারপর বোতলটির গায়ে আঁটা লেবেলটি পড়লেন : Guaranteed Pure"। পড়ে বললেন, "ফ্রান্সে মদের বোতলের গায়ে লেখা থাকে, Guaranti Pur", Mais cela ne vaut rien। অর্থাৎ ও কথার কোনই মূল্য নেই। যেমন দুধের বোতলের গায়ে থাকে Guaranti Pur (বিশুদ্ধ), কিন্তু তার মানে এ নয় যে তা থেকে সর তুলে নেয়নি। তাই, যদি লেখা থাকে Guaranti pur et non encrémé, বিশুদ্ধ, সর তোলা হয়নি, তবেই বুঝতে হবে যে, সেটা সত্যিই খাঁটি দুধ। নইলে খাঁটি বলতে, জল মেশানো না হতে পারে, কিন্তু তা থেকে সর তুলে নিলেও আইনত কিছু বলার নেই।"

এরপর পবিত্রর কি একটা কথা শুনে মা বললেন, "জানি না সত্য কি মিথ্যা, শুনেছি একজন বড় যোগীকে দুধ বলে এক বাটি চুনের জল খেতে দেওয়া হয়। লোকটা তা পান করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার অন্ননালি দিয়ে তা বের করে দিল, একটুও তার শরীর খারাপ হল না।"

বোকার মতন একজন প্রশ্ন করে বসল, "কিন্তু লোকটা কি টের পেয়েছিল, ওটা দুধ নয়, চুনের জল ?" মা আশ্চর্য বোধ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,

"কি বুদ্ধি তোমার ! মুখের আস্বাদনে কি টের পাবে না, পানীয়টা কি ? আমার তো মনে হয়, নিশ্চয়ই সে টের পেয়েছিল। যে কেউই তা টের পাবে, যদি না সে ঘুমিয়ে পড়ে থাকে..."

* * *

এরপর সে মাকে দেখাল এবং বলল, আজই সকালে এক বন্ধু পাঠিয়েছে, শ্রীঅরবিন্দের বাণী যা তিনি C. R. Das-এর মৃত্যুতে পাঠিয়েছিলেন।

বাণীটি এই : "Chittaranjan's death is a supreme loss. Consummately endowed with political intelligence, constructive imagination, magnetism, a driving force combining a strong will and an uncommon plasticity of mind for vision and tact of the hour, he was the one man after Tilak who could have led India to Swaraj."
June 21 1925.* —Aurobindo Ghose.

—চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু এক নিদারুণ বজ্রাঘাত। রাজনৈতিক সূক্ষ্মবুদ্ধি, সৃজনশীল কল্পনা ও আকর্ষণী শক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। আরও ছিল তাঁর বেগবান পরিচালন সামর্থ্য, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি এবং মনের অনন্যসাধারণ নমনীয়তা। এই সব গুণের দরুন যুগসন্ধিক্ষণে তিনি লাভ করেছিলেন প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টি এবং কূটনীতি। তিলকের পরে একমাত্র তিনিই ভারতবর্ষকে স্বরাজলাভের পথে পরিচালিত করতে পারতেন।
২১শে জুন, ১৯২৫ —অরবিন্দ ঘোষ

তিন চার মিনিট ধরে নিবিষ্ট মনে পড়ে, মা জিজ্ঞাসা করলেন, "Et alors, qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce qu'il faut faire avec ca ?" (এখনকি করতে চাও এটি নিয়ে ?)

সে বলল, তুমি এটা নলিনীদাকে দিও, শিশির মিত্রকে দিতে, কারণ শিশিরদা বহুদিন ধরে এটা চাইছিলেন, তাঁর বইয়ে উল্লেখ করবার জন্যে। মা বললেন, "Moi !

* or June 22 ?

Qu'est-ce que je peux faire ? Donnez ca vous même à Nolini."

—"সে জন্যে আর আমাকে কেন ? তুমি নিজেই নলিনীকে দিও।"

One man after Tilak

Sj. Aurobindo Ghose on Deshbandhu

Bombay, June 22nd, 1925.

In response to a telegram sent by the "*Bombay Chronicle*", the paper has received the following message from Srijut Aurobindo Ghose from Pondicherry, who it will be recalled was defended by Deshbandhu Das in the Alipore Conspiracy Case and was acquitted :

(Text of the Telegram here)

(From Amrita Bazar Patrika, June 24, 1925, p. 4, col.4)

(কলকাতা থেকে, যে বন্ধুটি ১৯৩ সালে এটি জোগাড করে পাঠিয়েছিল, তাকে অনেক মেহনৎ করে এটি উদ্ধাব করতে হয়েছিল। সে কাহিনীটি এখানে উল্লেখযোগ্য। শোনা যায়, এলাহাবাদে তখন বিপিন চন্দ্র পাল একটি কাগজ পরিচালনা কবতেন। তিনিই শ্রীঅরবিন্দের কাছে বাণীটি চেয়ে পাঠান। তাঁর কাগজ থেকে এটি 'বম্বে ক্রনিক্‌লে' ছাপা হয়। বন্ধুটি তার এক বন্ধুকে লেখে বম্বেতে। সে লোকটি Bombay Chronicle office-এ গিয়ে তাদের অনেক অনুরোধ করে, পুরনো ২৮ বছর আগের রেকর্ড বের করিয়ে দেখে, ১৯২৫ সালের বাঁধানো Volume-এ, June মাসের কয়েকটি তারিখের কাগজ নেই, এবং শ্রীঅরবিন্দের telegramme-টি সেগুলির একটির মধ্যেই ছিল। সংবাদটি পেয়ে, তার প্রত্যুৎপন্নমতির কল্যাণে, সে Amirta Bazar Pafrika-র কোন এক বন্ধু-কর্মীকে দিযে তাঁদের অপিস থেকে এটি উদ্ধার করে। মাসখানেকের উপর সময লাগে এটি পেতে।)

শুক্রবার, ২০.১১.৫৩

আজ "blessings-day"। মায়ের নিচে নামার দিন, তবু ব্যালকনিতে আসতে তাঁর অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। এলেন ১১টায়, সাধারণতঃ এ দিনে তিনি ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে শেষ করেন এদিকে।

একজন চার খণ্ড "রবীন্দ্র রচনাবলী" খুলে রেখে ছিল, ছবির পাতাগুলি খুলে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে। ব্যালকনিতে যাবার আগেই, মা জিজ্ঞাসা করলেন, কি এগুলি ? সে বললে, মায়ের ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে দেবার জন্যে।" তার এক কাকিমা পাঠিয়েছেন। সমগ্র রচনাবলী এখনও ছাপা হয়নি। এর আগে এগারো খণ্ড এসেছে।

মা ছবিগুলি বেশ মন দিযে দেখতে লাগলেন। সে তখন মাকে জিজ্ঞাসা করল,—পিয়ার্সনের ছবি দেখে তুমি চিনতে পার কি ? জাপানে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল শুনেছি।

মা বললেন, "হ্যাঁ, আমি জানি।" বেশ কয়েক মিনিট ধরে ছবিগুলি দেখতে লাগলেন। একটিতে "রবীন্দ্রনাথ স্ট্র্যাস্‌বুর্গে ১৯২১" বাংলায় লেখা। তাই পড়ে সে মাকে শোনাল। মা-ও ভাল করে দেখলেন।

আর একটি দেখিয়ে নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, Tagore-এর পাশে ও কে ? সে বাংলাটা পড়ে বলল, লেখা রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়া, অর্থাৎ মাদাম ওকাম্‌পো (তিনি ব্রেজিল বাসিনী স্প্যানিশ্‌ রমণী, রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। কবি তাঁকে 'পুরবী' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন।)

মনে হল মা ফটোগুলি দেখে বেশ খুশি হলেন।

* * *

ব্যালকনি থেকে ঘুরে আসতেই, পবিত্র মাকে বলল, কে একজন এসেছে শহরে, অভিনয় দেখাতে পারে। ডিসেম্বরের ৬ থেকে ৮ তারিখের মধ্যে যে কোন দিন আশ্রমে দেখাতে পারে, যদি মা অনুমতি করেন।

মা যেন একটু বিরক্তভাবে বললেন, "ও সময়ে সম্ভব নয়, বলে দিও।" (ডিসেম্বরের ৫ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত, শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধির সময়।)

শনিবার, ২১.১১.৫৩

আজ ব্যালকনি দর্শন হল বারটা-পনের মিনিটে। তারপর মা একটি ফটো দেখালেন। সেটি ভারতীদি মাকে পাঠিয়েছেন। Group-photo, তাতে (Nicol) নিকোলের ছবি আছে। ভারতীদির বাড়ীতে তোলা।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, নিকোলের পাশে ও কে ?

আমাদের একজন ছবিটি না দেখেই ধাঁ করে বলে দিল- বোধহয় সোমেশ্বর। (কারণ দুদিন আগে সে ভারতীদির বাড়ীতে গিয়েছিল এবং তাঁর কাছেই অন্য দুএকটি ছবিতে Nicol ও Someswar-কে দেখেছিল।)

মা একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "ওটা সোমেশ্বর ? সত্যিই?" তারপর ছবিটির ডাইনে ও বাঁয়ে অজ্ঞাত বস্তুগুলির প্রতিকৃতি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলি কি ? অন্য কেউ বলতে পারল না। আমাদের মধ্যে একজন বলল, একটি হল পাশের দেয়াল, আর অন্যটি জলের কলের পাশে সিমেন্টের তৈরী একটি বস্তু।

A. S. জিজ্ঞাসা করল মাকে, কতকগুলি জিনিস আনতে হবে।

Austine গাড়ির কিছু spare-parts, ঘড়ির springs প্রভৃতি...

মা তার ফর্দর সবগুলি না শুনেই জিজ্ঞাসা করলেন, "আগে বল, কত টাকা চাই ? পঞ্চাশ ? না একশো ? দুশো ? তিনশো ? চারশো ?"

A. S. বললে, তিনশো' পঁচাত্তর টাকা, (আর কত আনা...)

মা হেসে বললেন, বুঝতে পেরেছি, চারশ'র কাছাকাছি!

রবিবার, ২২.১১.৫৩

আজকের কথাগুলি, রাত প্রায় দশটার পরে। খেলার মাঠে Stage-এর উপরে।

শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' থেকে মহড়া হচ্ছে ১লা ডিসেম্বরের উৎসব উপলক্ষে। ("The Triple Soul Forces", Book VII, Canto IV)

দেড় ঘণ্টারও উপর মা বসে বসে শুনলেন, ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তি। তারপর কিছু কিছু দোষ ত্রুটির কথা বলে দিতে লাগলেন। একেবারে শেষের কটি লাইন, যা সাবিত্রীর উক্তি, (অমিতা বলছে), সেইখানটায় কেমন ভাবে বিরাট, ব্যাপক ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে হবে, তা মা বারবার নিজে আবৃত্তি করে দেখাতে লাগলেন :

"Then shall the divine family be born,
There shall be light and peace in all the worlds."

মায়ের অপূর্ব কণ্ঠস্বরে শ্রীঅরবিন্দের এই কথাগুলির মধ্যে থেকে জীবন্ত মন্ত্রধ্বনির স্পন্দন জেগে উঠতে লাগল। মা বললেন,

"Ce n'est pas Anglais parlé. Sri Aurobindo a mis exprès ces mots. Et chaque syllabe est à prononcer de même geste, vaste et vivant. Pas comme quelque chose du loin, mais ici et fort."

এগুলি কথ্য ইংরেজী ভাষা নয়। শ্রীঅরবিন্দ ইচ্ছা করে শব্দ চয়ন করেছেন। প্রতিটি শব্দকে উচ্চারণ করতে হবে একই ভাবে, ব্যাপক বিস্তৃতি এবং জীবন্ত স্পন্দন ফুটিয়ে তুলতে হবে। যেন দূরের কোন বস্তু, এমন ভাবে নয়, কিন্তু এখনই এখানে দৃঢ়তা ব্যঞ্জক ভাবটি হওয়া চাই।

মনোজ্ঞ হল Man of Sorrows। তার আবৃত্তি শুনে মা বললেন,—চমৎকার।

লাইট হল Mother of Night। মা তাকে আরও দৃঢ় এবং জীবন্তভাবে মুখ উঁচু করে আবৃত্তি করতে বললেন।

মোনা হল Dwarf-Titan। তার কণ্ঠে কিছু ত্রুটি রয়েছে, বললেন মা। তার গলা ধরে গেছে ঠাণ্ডা লেগে, তাই আগে সেটা সারাতে বললেন।

আরতি হল Mother of Joy and Peace। তারটিও বেশ হয়েছে, বললেন মা।

রিচার্ড হল, "Sense-shackled human mind", তার সম্বন্ধে বিশেষ দোষ কিছু মা বললেন না।

সোমবার, ২৩. ১১.৫৩

ফরাসী মহিলা, 'প' কেন সাইকোলজি পড়াতে চায় সেই সম্বন্ধে সে আজ সকালে মায়ের কাছে তার কৈফিয়ৎ দিয়েছে। রহস্য করে মা সেই কথা বলতে লাগলেন, ব্যালকনির পরে। তখন বারটার কাছাকাছি।

মা বললেন, নানা রকমের আঁকা ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করা হবে, কিন্তু ও ধরনের প্রশ্নের উত্তর তো আমার পাঁচবছর বয়সের সময় আমি দিতাম। তোমরা বলছ মস্তিষ্কের কথা। ও আর এমন কি কথা। বুড়োদের যদি জিজ্ঞাসা কর, দুটো পাখি সামনাসামনি ঘাড় নিচু করে আলাপ করছে,

অন্য দুটো পাখি একটু দূরে পিছন দিকে ঘাড় কাৎ করে বসে আলাপ করছে। এখন কোন্ দুটো পাখির দূরত্ব, কোন্ দুটো পাখির চেয়ে কম? তাহলে, কিছু না মেপেই বুড়ো বলে দেবে দুটোরই দূরত্ব সমান। শিশু হলে হয়তো মাপতে চেষ্টা করবে। কিন্তু এগুলো শৈশবের খেলার বিষয় হতে পারে, এতে এমন কিছু মনস্তত্ত্বের বিকাশের বা মনোবৃত্তির উৎকর্ষের কিছু নেই।

"faculté de la perception, phénomène de la conscience physique, এই কথাই আমি বল্‌ব।"

[জনৈক সাধকের ডাইরি থেকে]

জোর করে কখনো ভগবৎ-জ্যোতির দিকে কিছু খুলে ধরা যায় না।

*

কঠোর তপস্যার চেয়ে সত্যকার প্রেম ও উৎসর্গই বেশি তাড়াতাড়ি নিয়ে যায় ভগবানের দিকে।

—শ্রীমা

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

২য় পর্ব—বিশ্ব পর্যটক

৬ষ্ঠ সর্গ—বৃহত্তর প্রাণময় লোক এবং তাদের দেবতাবৃন্দ

(৪)

চেতনা এক ঊর্ধ্বতন সত্যে উদ্ভাসিত
অনুভব হল ; আলোক সে দেখেছে তবে সত্যকে নয় :
ধরেছে সে ভাবনা, তা থেকে গড়েছে একটা জগৎ ;
গড়েছে মূর্তি এক, তার নাম দেয় ভগবান।
তবুও সত্য কিছু আন্তর কিছু নিবাস নিয়েছে সেখানে।
এই যে বৃহত্তর প্রাণশক্তির জগৎ তার জীবেরা
একটা বৃহত্তর বায়ুমণ্ডলের মুক্ততর অবকাশের অধিবাসী,
জীবন তাদের দেহের মধ্যে নয় বাহ্যবস্তুর মধ্যে নয় ঃ
একটা গভীরতর জীবনধারা তাদের আত্মা-পুরুষের আসন।
সেই তীব্র অন্তরঙ্গতার রাজ্যে
বস্তুসব বাস করে অন্তরাত্মার সঙ্গীরূপে ;
দেহের কার্যাবলী হল একটা গৌণ লিপি,
আন্তর জীবনের বাহ্য প্রতিরূপ।
সব শক্তি সেখানে হল প্রাণশক্তির অনুচর,
মন ও দেহ তার সঙ্গে চলে সেবিকারূপে।
বিশ্বের বিপুলতা তার জন্য পথ করে দেয় ঃ
সকলে অনুভব করে তাদের কর্মে এই বিশ্বগতি,
সকলই হল তার বিশ্ববলের যন্ত্র,
কিংবা তারা আপন সত্তাকেই বিশ্বরূপে গ্রহণ করে।
উঠে যায় যারা এই বৃহত্তর প্রাণজগতে
অজাতবস্তু সব তাদের কানে কানে কথা বলে যায়,
তাদের চোখে এসে ধরা দেয় ঊর্ধ্বতন সূর্যালোক,

ঊর্ধ্বাকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করে রাজমুকুটের ছবি ঃ
যে বীজ বপন করেছেন তিনি অন্তরে তাকে ফলিয়ে ধরবার জন্যে,
আপনাদের মধ্যে তাঁরই শক্তিকে পূর্ণ করে তোলার জন্যে
তাঁর জীবকুলের জীবনধারা।
প্রত্যেকে এক মূর্ত মহত্ত্ব ঊর্ধ্বস্থ শিখরের দিকে ক্রমবর্ধমান
অথবা আপন আপন আন্তর উৎস হতে উচ্ছলিত হয়ে আসে
মহাসাগর যেন বাহিরের দিকে,
কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির ঊর্মিমালার চক্রাবর্তে
তারা আপন আপন আবেষ্টনকে আকণ্ঠ গ্রাস করে ধরে।
সে বৃহৎ প্রসার থেকে তৈরী করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ সব ;
সঙ্কীর্ণ পরিসরে স্বল্পস্থায়ী দৃশ্যাবলীর মধ্যে অবরুদ্ধ
সুখী তারা জীবনে তাদের ক্ষুদ্র মহিমা কিছু জয় করে।
আপন আপন ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য শাসন করবে তারা,
নিজ নিজ জগতে তারা হবে গণ্যমান্য কেহ,
আপনার চারিদিকের সুখদুঃখ করে তুলবে আপনারি,
তাদের জীবনের প্রেরণা, জীবনের অভাব-অভিযোগ পরিতৃপ্ত করবে—
যথেষ্ট এই কর্তব্যভার তাদের সামর্থ্যের পক্ষে,
হবে যে কর্মাধ্যক্ষ অন্তঃপুরুষের আর তার নিয়তির।
এই হল অবস্থান্তরের সীমানা আর সূত্রপাত,
স্বর্গীয় ভাবের মধ্যে প্রথম অনুপ্রবেশ,
পার হয়ে যায় যারা সেই উজ্জ্বল মণ্ডলে ঃ
এরা হল পার্থিব জীবকুলের স্বজাতি ;
এই রাজ্যই আমাদের মর্ত্য অবস্থার সীমান্তে।
এই বিশালতর জগৎ হল আমাদের বৃহত্তর গতিবিধির দান,
তার বলিষ্ঠ রূপাবলী গড়ে তোলে আমাদের ক্রমবর্ধমান সত্তা সব ;
তার সৃষ্টি জীব যত আমাদেরই উজ্জ্বলতর প্রতিমূর্তি,
পূর্ণ করে ধরে সেইসব আদর্শ ধারা যাদের শুধু আরম্ভ করি আমরা,
তারাই হল পূর্ণপ্রতিষ্ঠ যা-কিছু হয়ে উঠবার প্রয়াস আমাদের।
তারা হল যেন সুচিন্তিত চিরন্তন ব্যক্তি-রূপায়ণ,
অখণ্ড তারা বিভিন্ন স্রোতের টানে বিভক্ত নয় আমরা যেমন,
অদৃশ্য হৃদ্‌গত নেতার অনুসরণে চলে তারা,
জীবন তাদের মেনে চলে অন্তঃপ্রকৃতির বিধান।
রক্ষিত সেখানে মহত্ত্বের ভাণ্ডার, বীরত্বের আধার ;

অন্তরাত্মাই হল তার নিয়তির নিত্যজাগ্রত স্রষ্টা,
কারও চেতনা এখানে উদাসীন নয়, অসাড় নয়;
আপন পক্ষ নির্বাচন করে তারা, চেয়ে দেখে যে-দেবতাকে পূজা করে।
সংগ্রাম চলেছে এখানে সত্যে আর মিথ্যায়,
তীর্থযাত্রা শুরু হয়েছে দিব্যজ্যোতির অভিমুখে।
অজ্ঞান অবধি সেখানে আকাঙ্ক্ষা করে জ্ঞান,
উজ্জ্বল সেই এক দূর নক্ষত্রের প্রভায়;
জ্ঞান রয়েছে এক সেখানে সুপ্তির হৃদয়তলে,
প্রকৃতি এসে ধরা দেয় তাদের কাছে সচেতন শক্তিরূপে।
একটা আদর্শ হল তাদের নেতা তাদের অধিপতি:
চায় তারা সূর্যের রাজতন্ত্র,
আহ্বান করে সত্যকে তাদের সমুচ্চ শাসকরূপে
তাকেই ধারণ করে তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে,
ভরে তোলে তাদের চিন্তাবৃত্তি সব তারই কণ্ঠের অনুপ্রেরণায়,
জীবন তাদের গড়ে তোলে তারই প্রাণবন্ত আকার দিয়ে,
অবশেষে তারই সূর্যস্নাত হিরণ্ময় দেবত্বের ভাগী হবে তারা এই লক্ষ্যে।
অথবা তারা সম্মতি দেয় তমিস্রার সত্যে;
স্বর্গের বা নরকের জন্যে হোক সংগ্রামেই তারা লিপ্ত হবে:
মঙ্গলের যোদ্ধা তারা, উজ্জ্বল ব্রতের সেবক তারা,
অথবা অপশক্তির সৈন্য তারা পাপের বেতনভুক।
মঙ্গল-অমঙ্গলের সমান ভাগ সেখানে,
জ্ঞান সেখানে অজ্ঞানেরই যমজ।
প্রাণশক্তির সকল ধারা উন্মুখী তাদের দেবত্বের অভিমুখে
সেই আকাশের বাতাসের বিপুলতা আর দুঃসাহসের মধ্যে;
প্রত্যেকেই গঠন করে আপন মন্দির, প্রসারিত করে
আপনার পূজা-অনুষ্ঠান,
পাপ অবধি সেখানে হল এক দেবতা।
আপন বিধানের সৌন্দর্য আর ঔজ্জ্বল্যকে প্রচার করে
জীবনকে দাবি করে আপনার স্বভাবসিদ্ধ সাম্রাজ্যরূপে,
আসন গ্রহণ করে জগতের সিংহাসনে
অথবা পরিধান করে মুখ্য পুরোহিতের পরিচ্ছদ:
তার পূজকেরা তার পুণ্য অধিকার ঘোষণা করে।
রক্তবর্ণ মুকুটধারী মিথ্যাকে আরাধনা করে তারা,

পূজা করে কুটিল এক দেবতার ছায়াকে,
স্বাগত করে সেই মস্তিষ্ক-বিকৃতকারী তামস ভাবনাকে
অথবা অন্তরাত্মার হন্ত্রী মহাপাপিনীর সঙ্গে করে সহবাস।
কর্তা-শক্তি এক ধরে রয় প্রস্তরমূর্তির ভঙ্গিমা,
আসুরী আবেগ এক অঙ্কুশাঘাতে নিয়ে চলে উত্তুঙ্গ
চাঞ্চল্যের দিকে :
মহাজ্ঞানের বেদীমূলে তারাই হল রাজা আর পুরোহিত
অথবা তাদের জীবন মহাশক্তির এক বিগ্রহের পায়ে আত্মবলি।
অথবা দিব্য সৌন্দর্য তাদের পরে আলোক ছড়ায় পথচারী এক
নক্ষত্রের মত ;
সুদূর দুরারোহ আলো তার, তবুও অনুসরণ করে তারে
হৃদয়ের আবেগে ;
শিল্পকলা আর জীবনধারায় অধিকার করে তারা
পূর্ণ-সৌন্দর্যের রেখা এক,
তা দিয়ে জগৎকে করে তোলে তাদের সমুজ্জ্বল ভাণ্ডার :
সাধারণ আকার অবধি অপরূপ পোশাকে ভূষিত হয় ;
এক শোভা এক মহত্ত্ব নিবদ্ধ প্রতি মুহূর্তের মধ্যে
জাগিয়ে তোলে সেই পুলক ঘুমন্ত যে সকল সৃষ্ট বস্তুর অন্তরে।
বিপুল বিজয় এক অথবা এক বিশাল পতন,
স্বর্গের সিংহাসন অথবা নরকের গহ্বর,
দ্বৈতশক্তির প্রমাণ দিয়েছে তারা
তাঁরই ভয়াল চিহ্ন অঙ্কিত করেছে তারা তাদের অন্তরাত্মার পরে :
তাদের নিয়ে যা-কিছু করা সাধ্য নিয়তির, সে-সবই তারা
ভোগ করেছে ;
কাজ তারা কিছু করেছে, হয়েছে কিছু তারা, লভেছে জীবন তারা।
জড় সেখানে অন্তরাত্মার কার্য, তার কারণ নয়।
পার্থিব বস্তুজগতের বিপরীত সত্য সেখানকার তুলাদণ্ডে দেখায় :
স্থূলের ওজন কম, সূক্ষ্মের ভার অধিকতর ;
আন্তর মূল্যই বাহিরের কর্মসূচীকে ধরে রাখে।
প্রস্ফুট বাক্য চিন্তাধারায় স্পন্দিত যেমন,
কর্মাবলী উন্মুখী যেমন অন্তরাত্মার আবেগভরে
এ-জগতের বাহ্য স্থূল পরিকল্পনা
সাগ্রহে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে অন্তরের সামর্থ্যের অভিমুখে।

মন সেখানে বাহ্য ইন্দ্রিয় দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়,
রূপায়িত করে সে অন্তশ্চেতনার ভারহারা উপকরণ সব,
জগতের স্পর্শ সব অঙ্কিত হয় বিনা অবলম্বনে,
সাক্ষাৎ পরিণত হয় গিয়ে দেহের সাকার স্পন্দনে
জীবন্ত ক্রিয়াবলী বিদেহী শক্তির এক ;
শক্তিসব এখানে অন্তর্লীন, কর্ম তাদের নেপথ্য হতে
অথবা গুপ্তস্থানে লুকিয়ে অপেক্ষা করে প্রাচীরের আড়ালে যেন,
উঠে আসে অকস্মাৎ সম্মুখে অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিয়ে।
গুপ্ত সেখানে ব্যক্ত হয়ে আসে, প্রকট রেখেছিল ধরে
এক অপ্রকটকে, বহন করে চলেছিল এক অজ্ঞাতকে ;
অদৃশ্য অনুভবে ধরে দেয়, মিশে থাকে দৃশ্যরূপের রূপাবলীর সঙ্গে।
দুটি মনের সাক্ষাৎ সহযোগে
চিন্তা দেখে চিন্তাকে, কথার নেই প্রয়োজন ;
আবেগ আলিঙ্গন করে আবেগকে দুটি হৃদয়ে,
পরস্পরে অনুভব করে শিহরণ-রক্তে মাংসে স্নায়ুধারায়
অথবা উভয়ে মিলে মিশে যায়, হয়ে ওঠে বৃহত্তর
যেন দুটি গৃহ হয় অগ্নিদগ্ধ, আগুন মিশে যায় আগুনের সঙ্গে :
হিংসা হিংসার সাথে করে মল্লযুদ্ধ, প্রেম ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রেমের উপরে,
সংকল্প সংকল্পের সঙ্গে করে ধস্তাধস্তি মানসের অদৃশ্য অঙ্গনে ;
অপরের অনুভব সব পার হয়ে চলে যায় তরঙ্গমালার মত
শিহরিত করে যায় সূক্ষ্ম দেহের আধার,
ক্রোধ তাদের ছুটে চলে তুরঙ্গের মত তীব্র আক্রমণে,
ক্ষুরের আঘাতে যেন বিদ্বিত করে মাটির বক্ষ ;
একে অনুভব করে অপরের শোক প্রবেশ করেছে গিয়ে তার বক্ষতলে,
অপরের আনন্দ উল্লাসে ধেয়ে চলে তার রক্তপ্রবাহে :
হৃদয় কাছে টেনে লয় হৃদয়কে দূরত্ব ভেদ করে,
কণ্ঠ সব আসে সন্নিকটে কথা বলে যারা সুদূর সাগরের পারে।
হৃদয় স্পন্দিত হয় সেখানে জীবন্ত আদানে-প্রদানে :
সত্তা অনুভব করে সত্তাকে দূরান্ত হতে,
চেতনা চেতনারে দেয় প্রত্যুত্তর।
তবু কিন্তু নেই সেখানে পরম একত্ব।
আত্মা আত্মা হতে বিচ্ছিন্ন তবু :
নীরবতার আন্তর প্রাচীর গড়া যায় সেখানে,

সচেতন সামর্থ্য দিয়ে ঘিরে রাখা রক্ষা করা যায় ;
সত্তাকে নির্জনে অবরোধে রাখা যায় ;
আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে আপনার মাঝে রাখা যায়, নিঃসঙ্গ।
একাত্মতা আসেনি সেখানে, মিলনের শান্তিও নয়।
সবই অসম্পূর্ণ তখনও, অর্ধজ্ঞাত, অর্ধসম্পন্ন :
নিশ্চেতনার অত্যাশ্চর্য অতিক্রম করা হয়েছে,
পরাচেতনার অত্যাশ্চর্য এখনও রয়েছে
অজ্ঞাত, আত্মমগ্ন, অননুভূত, অজ্ঞেয়,
ঊর্ধ্ব হতে দৃষ্টিপাত করে সে তাদের পরে, যা-কিছু হয়েছে তারা
মূল উৎস সেসবের।
সকলে তারা এসেছে রূপ নিয়ে অরূপ অনন্ত হতে,
অনামা শাশ্বতের নানা নাম ধরে জীবন লভেছে তারা।
আরম্ভ আর শেষ গুপ্ত রয়েছে সেখানে ,
মাঝের প্রকাশ কাজ করে চলে, ব্যাখ্যা নেই তার, আবির্ভূত অকস্মাৎ :
তারা হল বাক্য শুধু, কথা বলে এক বিপুল নির্বাক সত্যের সঙ্গে,
তারা হল সংখ্যাসংগ্রহ জড় হয়েছে একটা অসম্পূর্ণ যোগফলের জন্যে।
কেউ সত্য করে জানে না নিজেকে অথবা জগৎকে
অথবা সেই সদ্বস্তুকে সেখানেই রয়েছে যে জীবন্ত আন্তর মন্দিরে :
শুধু জানে তারা মানসশক্তি গ্রহণ করে যা, তৈরী করে যা
প্রচ্ছন্ন অতিমানসের বিপুল ভাণ্ডার হতে।
নীচে এক অন্ধকার, ঊর্ধ্বে উজ্জ্বল শূন্য,
অনিশ্চিত তাদের জীবন বিপুল এক আকাশে ঊর্ধ্বগামী ;
রহস্যসব দিয়ে তারা ব্যাখ্যা করে এক মহারহস্যকে,
প্রহেলিময় বস্তুরাজি উপস্থিত শুধু এক প্রহেলিকার সম্মুখে।
চলেছে সে এই দ্বৈধ জীবনধারার প্রসার বেয়ে,
নিজে সে পরিণত হয়েছে এক ধাঁধারূপে নিজের কাছে ;
সবই দেখে সে প্রতীকরূপে, খোঁজে সে তারই অর্থ।

অনুবাদ : **শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত**

শ্রীঅরবিন্দের অভিভাষণ

(জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি)

[১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। তখন তাঁর ছাত্ররা একটি সভায় মিলিত হয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে এবং সেই সভায় ছাত্ররা শ্রীঅরবিন্দের কাছে কিছু শুনতে চায়। তাদের অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ এই নিম্নোক্ত অভিভাষণটি দেন]

আমাকে বলা হয়েছে, তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু উপদেশ শুনতে চাও। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে সাম্প্রতিককালে আমাদের মত বয়স্কদের চেয়ে তোমরা তরুণেরা অনেক ভাল উপদেশ দিতে পার। তোমাদের কার্যাবলী এবং বিশেষ করে আমার প্রতি তোমরা যে ভালবাসা প্রকাশ করেছ তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সে স্মৃতি আমার চিরদিন মনে থাকবে! বাস্তবিকই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তোমরা সবাই জান আমি পদত্যাগ করেছি। সেজন্য গতকাল এক সভায় আমার বর্তমান অসুবিধার কথা ভেবে তোমরা খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করেছ। আমি অবশ্য জানি না আমার এই অবস্থাকে আদৌ অসুবিধা বলব কিনা। কেননা বর্তমানে আমি যে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলেছি তা আমার আশৈশবের লালিত স্বপ্ন। তাই তার সম্মুখীন হতে আমার মনে এতটুকুও দুঃখ নেই। আমি শুধু এইটুকু দেখে নিশ্চিত হতে চাই যে, আমার কষ্টের প্রতি তোমাদের সহানুভূতিটাই যেন শুধু প্রধান হয়ে না থাকে। যে আদর্শের জন্য আমার এই দুঃখের সাধনা, যাকে তোমরা আমার দুঃখ কষ্ট বলছ, সেই আদর্শের প্রতি যেন তোমাদের ভালবাসা থাকে। আমি যদি দেখি দেশের জাগ্রত তরুণ সম্প্রদায় আমার আরব্ধ কর্ম গ্রহণ করেছে—তাহলে আমি যেখানেই যাই না কেন আমার মনে কোন আক্ষেপ থাকবে না, কারণ জানব আমার পিছনে আসছে আমার সঙ্কল্প সাধন করবার উপযুক্ত কর্মীদল। আমি তো মনে করি আজ আমার প্রতি তোমরা যে শ্রদ্ধা জানালে তা আমাকে নয়, বা তোমাদের বিদায়ী অধ্যক্ষকেও নয়, সে শ্রদ্ধার অর্ঘ তোমরা নিবেদন করেছ আমার অন্তরের মাতৃশক্তির প্রতি। কারণ আমি যতটুকু করেছি বা যে সামান্য দুঃখ আজ বরণ করে নিতে চলেছি—তা শুধু আমার স্বদেশজননীর জন্য। তোমাদের অন্তরের সহানুভূতিকে যদি এই ভাবে বিচার কর তাহলে জানবে যদি আমি আমার ব্রতে অসমর্থও হই তবু পশ্চাতে রইবে আরো অনেকে যারা আমার স্বপ্নকে সম্পূর্ণ করবে। বাস্তবিকই আমার আনন্দ হয় যখন দেখি তোমাদের মত দেশের আদর্শের কথা ভেবে সমগ্র দেশবাসী আমার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছেন। একথা ভেবে খুশি না হয়ে পারি না যে দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আমার প্রতি তাঁদের শুধু আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেই কর্তব্য শেষ করেননি, আমার বিচারের সময় তাঁরা আর্থিক সাহায্য করতেও প্রস্তুত ছিলেন। আমি তো নগণ্য মানুষ মাত্র। আর আমার অবদান সেও তো অতি সামান্য। তবু মানুষের কাছ থেকে যে এত ভালবাসা পেয়েছি তার একমাত্র কারণ সমগ্র স্বদেশবাসীর অন্তরের স্বপ্নের রূপায়ণই আমার জীবনসাধনা।

আজ আমি তোমাদের শুধু এই উপদেশই দিতে পারি, যে আদর্শ নিয়ে এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই আদর্শই হোক তোমাদের জীবনের ব্রত। আমার কোন সন্দেহ নেই, সময় হলে তোমরা সেই আদর্শের তাৎপর্য নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবে। আমরা যেদিন এই

জাতীয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলাম সেদিন আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও জীবিকার যাবতীয় সম্ভাবনাকেও সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে এরই সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলাম। কারণ সেদিন আমরা আশা করেছিলাম, এইখানেই গড়ে উঠবে জাতীয়জীবনের প্রাণকেন্দ্রে জাতীয়তার সৌধ। নূতন ভারত তার সকল দুঃখ কষ্টের তিমির রাত্রিকে ভেদ করে মহত্ত্বের ও গৌরবের পথে অগ্রসর হবে। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হবে। আমরা চাই না তোমরা এখান থেকে কেবল কিছু তথ্যমূলক জ্ঞান সংগ্রহ করবে আর জীবনে গড়ে উঠবে কেবল জীবিকা নির্বাহ করবার জন্য। আমরা চাই এখান থেকে গড়ে উঠুক সেই সব সন্তানের দল যারা মাতৃভূমির সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। দেশের জন্য দুঃখ বরণ করবে। এই আদর্শ নিয়েই আমরা একদিন এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। আমি চাই ভবিষ্যতে তোমরা সেই মহান আদর্শেই আত্মনিয়োগ কর। একদিন নিতান্ত সাধারণভাবে এবং বলতে গেলে অসম্পূর্ণভাবেই আমরা যার সূচনা করেছিলাম তোমাদের প্রতি রইল তাকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব। আমি যেদিন ফিরে আসব, সেদিন দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঐশ্বর্যবান হয়েছ কিন্তু সেই সমৃদ্ধি নিয়ে তোমরা কেবল নিজেদের ঐশ্বর্যশালী করনি—সে ঐশ্বর্য নিবেদন করেছ স্বদেশজননীর পূজায়। আমি দেখব তোমাদের মধ্যে অনেকে মহৎ হয়েছ, কিন্তু সে মহত্ত্ব দিয়ে কেবল নিজেকে গৌরবান্বিত করনি, বা আপন জীবনের সম্ভাবনাকেই চরিতার্থ করনি,সেই মহত্ত্ব দিয়ে তোমরা দেশকে গরবিনী করে তুলেছ। ভারতবর্ষকে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে উন্নত করে তুলেছ। যেমন একদিন সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারে আলোকের সন্ধানে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকত আমাদের এই ভারতবর্ষের দিকে। এমনকি যদি তোমাদের মধ্যে কেউ দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতার মধ্যেও পড় তাহলেও তার মধ্যেও তোমরা দেশকেই একমাত্র বলে বরণ করে নিয়েছ। জাতির ইতিহাসে এমন একটা সময় আসে যখন সমগ্র জাতি একই উদ্দেশ্য আত্মোৎসর্গ করে, শুধু তাই নয়, নিজেদের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ যা কিছু মহৎ তা সবই সে উৎসর্গ করে দেশের জন্য। আমাদের মাতৃভূমির সম্মুখে আজ সেই মহালগ্ন সমুপস্থিত। দেশমাতৃকার সেবার চেয়ে প্রিয়তর কাজ আজকে আর কিছুই নেই। আর সকল কর্মের সার্থকতা হল দেশ। আমি আরও বলি, যদি তোমরা উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা কর তাহলে তাও কর কেবল দেশেরই জন্য। তোমরা তোমাদের দেহমন-প্রাণকে সর্বপ্রকারে দেশমাতার সেবার উপযুক্ত করে তোল। তোমরা জীবনে এমন জীবিকা গ্রহণ করবে যার উদ্দেশ্য হবে স্বদেশের সেবা। বিদেশে যদি তোমরা জ্ঞান অর্জন করতে যাও তবে ফিরে এসে সেই জ্ঞান যেন দেশের সেবায় লাগাতে পার। তোমাদের কর্মের ভিতর দিয়ে যেন দেশমাতৃকা সমৃদ্ধশালিনী হয়ে ওঠে। তোমরা দুঃখ বরণ কর স্বদেশ জননীর আনন্দ বিধানের জন্য। আমার সমস্ত উপদেশের সার হচ্ছে এই একটি মাত্র কথা। আর তোমাদের কাছে আমার শেষ নিবেদন এই যে, আমার প্রতি যদি তোমাদের সত্যিই ভালবাসা থাকে তাহলে সে ভালবাসা যেন শুধু আমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি না হয়। আমার আদর্শের আমার কর্মের প্রতি যেন তোমাদের নিষ্ঠা থাকে। আমি দেখতে চাই তোমাদের এই সহানুভূতিকে তোমরা কর্মে রূপায়িত করেছ। অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের অটল চরিত্র এবং গৌরবময় কর্মের দিকে তাকিয়ে আমি যেন গর্বভরে স্মরণ করতে পারি যে এর সূচনা ও প্রস্তুতিতে আমার সামান্য কিছু অবদান অন্ততঃ ছিল।

অনুবাদ : **হেনা চৌধুরী**

ভবিষ্যতের কবিতা

শ্রীঅরবিন্দ

চতুর্থ অধ্যায়

রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু

ছন্দঃস্পন্দন হল কাব্যিক প্রকাশভঙ্গির প্রধান চাহিদা, কারণ ধ্বনিপ্রবাহই তার তরঙ্গ-দোলায় চিন্তাপ্রবাহকে ভাষার মধ্যে বহন করে আনে। সঙ্গীতের ধ্বনি-চিত্রই তো আমাদের চিন্তা, আবেগ ও প্রাণের রেখা-চিত্রে রং ভরে দেয়, তাকে পল্লবিত করে ধরে, সূক্ষ্ম ও গভীর করে তোলে। সঙ্গীতের এই ধ্বনি-চিত্রই অর্থের হাত ধরে নিয়ে যায় তার নিজের সীমার বাইরে—বুদ্ধি যার কাছ থেকে 'নিবর্তিত হয়' অপ্রকাশের ব্যর্থতা নিয়ে, তাকেই প্রকাশ করার দিকে। এই হল চিরকালের সঙ্গীতের নিজস্ব বিশিষ্ট শক্তি। প্রাচীনেরা এই সত্যকে যত সার্থকভাবে সামগ্রিকভাবে বোধগম্য করেছিলেন, কিংবা অন্ততঃ যত সঙ্গতির সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন, আধুনিক মন এবং শ্রুতি ততটা পারেনি। তার কারণ বোধহয় এই যে, তাঁরা তাঁদের কাব্যকে গান করতে, আবৃত্তি করতে এবং তাতে স্বর-সংযোগ করতেই বেশি অভ্যস্ত ছিলেন। আর আমরা আমাদের কাব্যকে পাঠ করেই তৃপ্ত। আমাদের এই পাঠ করার যে অভ্যাস তা কাব্যের বুদ্ধিগত এবং আবেগগত উপাদানটুকুই উদ্‌ঘাটিত করে, কিন্তু অন্যায়ভাবে চাপা দিয়ে দেয় তার ছন্দঃস্পন্দনের মূল্যকে। অন্যদিকে, আধুনিক কাব্য অর্জন করেছে প্রাচীনের চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্মতা, চারুতা এবং ভাব ও ভঙ্গিতে ব্যঞ্জনার গভীরতা। তার সঙ্গে হয়তো তাকে খানিকটা হারাতে হয়েছে শক্তি, উচ্চতা এবং ঋজু বিরাটত্ব। ছন্দঃশক্তিতে দীন যে শ্রুতি, প্রাচীনেরা তাকে আধুনিকদের মত এত সহজে মহাকবির সম্মান দিতে পারতেন না; কিংবা প্রকৃতই মহাকবি যিনি তাঁর মধ্যে ছন্দের পতন, পারিপাট্যের অভাব এবং রূঢ়তাকে তাঁদের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর স্বার্থে ক্ষমা কিংবা উপেক্ষা করতেন না, প্রশংসা তো নয়ই।

আমাদের উদ্দেশ্য হল কাব্যের মধ্যে মন্ত্রের সূচনা করা। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে কাব্যের রচনাশৈলী প্রসঙ্গেও আমাদের ঠিক সেই পার্থক্যটি বুঝে নিতে হবে যা আমরা বুঝে নিয়েছি কাব্যের ছন্দঃস্পন্দন প্রসঙ্গে। কারণ এখানেও আমরা দেখি, যে-কোন লেখারই রচনাশৈলীর মধ্যে কিছু শক্তি আছে এবং যাকেই কোন রকমের একটা ছন্দোরূপ দেওয়া হয়েছে, কার্যতঃ তাকেই কাব্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—কি রকমের শক্তি রয়েছে তার এবং তার সিদ্ধিতে গভীরতাই-বা কতখানি? সাময়িক সুখ্যাতি বা স্থায়ী সুনামের অধিকারী কবিদের স্বাক্ষরিত এমন অনেক কবিতা আছে যাদের আধা-কাব্যের প্রত্যন্ত-দেশেই ফেলে রাখতে আমরা বাধ্য হই; কেননা তাদের শিল্পনীতি গদ্যের শিল্পনীতি থেকে খুব পৃথক নয়। মনে হয়, সেই কাব্য একথা ভুলে গেছে যে, গদ্যশৈলীর প্রথম লক্ষ্য হল একটি বস্তু, ঘটনা, অনুভূতি বা চিন্তাকে বুদ্ধির বিচারশক্তির কাছে সংজ্ঞা দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেওয়া। তাতে সেই মূল লক্ষ্যের সঙ্গে কতকটা স্বচ্ছতা, সাবলীলতা, ঐশ্বর্য এবং উপস্থাপনার অন্যবিধ সৌন্দর্য থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। কিন্তু কাব্যশৈলীর প্রথম উদ্দেশ্যই হল উপস্থাপিত বিষয়কে কল্পনার অন্তর্দৃষ্টির কাছে, অধ্যাত্মবোধের কাছে, আত্মিক উপলব্ধি ও আত্মিক দৃষ্টির কাছে জীবন্ত করে তোলা। যেখানে বিষয়বস্তুকে যথেষ্ট বলিষ্ঠতার সঙ্গে প্রকাশ করার ব্যাপারে কিংবা তাকে হৃদয়ঙ্গম করে তোলার ব্যাপারে একটুও ব্যর্থতা দেখা দেয়, সেখানেই গদ্যের সঙ্গে কাব্যের

পার্থক্যটি প্রকট হয়ে উঠে এবং এরকমের রচনা সম্বন্ধে সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা বলে উঠি —এ তো কাব্য নয়, এ যে পদ্য। কিন্তু যেখানে খানিকটা চিন্তাশক্তি রয়েছে ও বিষয়বস্তুর অন্তর্বিধ গুরুত্ব আছে, আর তার সঙ্গে প্রকাশভঙ্গিতে আছে কিছু শক্তি, সেখানেই আবার ভ্রান্ত মূল্যবোধ আরো সহজেই চালু হয়ে যায় এবং এমনকি সাহিত্যের একটা গোটা যুগই কাব্যের নিজস্ব ভূমিতে প্রবেশ না করে তার প্রান্তসীমাতেই অবস্থান করতে থাকে অথবা এরকমের সৃষ্টিকে অযথা কাব্যগৌরব দিয়ে আধা-কাব্যের ভ্রান্ত মতবাদেই পরিচালিত হতে থাকে।

কাব্য তার সগোত্র শিল্প চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মত মানুষের আত্মার কাছে আবেদন সৃষ্টি করে চিত্রকল্পের মাধ্যমে এবং এই আবেদন সৃষ্টির ব্যাপারে এই চিত্রকল্প মানসিক ও বাচিক, না ভৌতিক, তাতে মূলতঃ কিছু এসে যায় না। কাব্যবাণীর মূল শক্তি হল পাঠককে চিন্তা ও অনুভব করতে উদ্বুদ্ধ করাতে নয়, বরং বস্তু ও বিষয়কে আমাদের কাছে দৃশ্য করে তোলাতে। চিন্তা বা অনুভব এই দৃশ্য থেকেই জন্ম নেবে কিংবা বরং এই দৃশ্যেই লীন হয়ে থাকবে ; কিন্তু কাব্যভাষার প্রাথমিক ফল এবং শক্তিই হল এই দৃশ্যরচনা। কারণ, সচরাচর আমরা বাস করে থাকি আমাদের বাহ্য মন ও ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে, অথচ কবি আমাদের শেখান আত্মার মধ্যে, অন্তর্মানসে বাস করতে। আর তার জন্যে তিনি আমাদের আত্মাকে দিয়ে, আত্মারই আলোতে, অন্তরের দিব্যচক্ষু দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেবেন যা আমরা সাধারণতঃ দেখে থাকি অনেক সঙ্কীর্ণ এবং অনিশ্চিতভাবে আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দিয়ে। প্রাচীনেরা যেমন জেনেছিলেন—কবি হলেন ঋষি, দ্রষ্টা, তিনি শুধু ছন্দের যাদুকর নন, তিনি শুধু বাজিগর, শুধু অসংলগ্ন গানের রচয়িতা কিংবা 'ক্লেবাদুর' কলাকুশলী নন ; তিনি শুধু পংক্তিতে-পংক্তিতে স্তবকে-স্তবকে চিন্তাই করে চলেন না। তাঁর দৃষ্টি বাহ্যমনের সীমার বাইরে চলে যায়, তিনি লাভ করেন দিব্যবাণী—সে বাণী শুধু সমর্থ ও যথাযোগ্য নয়, সে বাণী জ্যোতির্ময় ও জ্যোতির্বিস্তারী, প্রবুদ্ধ এবং অপরিহার্য, সে আমাদের দর্শন করতেও উদ্বুদ্ধ করে। সেই বাণীকে লাভ করার জন্যেই কাব্যশৈলীর সমস্ত সাধনা।

আধুনিক মত অনুসারে কাব্যের স্বধর্ম হল এই যে, তার আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, কল্পনার কাছে। কিন্তু কল্পনা তো কত রকমের আছে : বস্তুগত কল্পনা আছে যা জীবন ও জগতের বাহ্য রূপটি বলিষ্ঠতার সঙ্গে দৃশ্যমান করে তোলে ; আছে আত্মগত কল্পনা যা মনের ও আবেগের ছবিগুলিকে সাবলীলতার সঙ্গে রূপায়িত করে তোলে—এসব ছবি আবার মনের রাজ্যে সেই কল্পনারই জন্ম দিয়ে থাকে। এছাড়াও আছে এমন কল্পনা যার কারবার হল মনের হিজি-বিজি খেলা নিয়ে, যাকে আমরা নাম দিয়েছি কবির খেয়ালী কল্পনা। আর আছে রসাত্মক কল্পনা যার বিলাস হল বাণী ও চিত্রকল্পের সৌন্দর্য নিয়ে—তা নিয়েই সে আত্মতৃপ্ত, আর কোনদিকে দৃষ্টি নেই তার। কাব্যসৃষ্টিতে এসব কিছুরই নিজস্ব স্থান আছে, কিন্তু এসবই কবির হাতে তাঁর উপকরণ যোগায় মাত্র, কাব্যশৈলীর সৃষ্টিতে তারা কেবল প্রাথমিক প্রকরণ। মূল যে কবিকল্পনা তা বাহ্য বা আন্তর উপাদানের এমনকি সূক্ষ্ম প্রতিরূপ উপস্থাপিত করেও নিবৃত্ত হয় না, খেয়ালী কল্পনার সবচেয়ে জাঁকাল বা সবচেয়ে সুচারু ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়ে কিংবা বাণী ও চিত্রকল্পের সুন্দরতম বর্ণালী রচনা করেও সে থেমে যায় না। আসল কবিকল্পনা বাস্তবেরও স্রষ্টা নয়, অবাস্তবেরও স্রষ্টা নয়, সে হল পরাৎপর সত্যের স্রষ্টা। সে দেখে বস্তুর আধ্যাত্মিক সত্যকে,—সেই সত্যেরও নানা স্তর-পরম্পরা আছে ; এই স্তর-পরম্পরার সূচনা-বিন্দু বস্তুগত বা ভাবগত যে কোন রকমই হতে পারে। সমস্ত অকৃত্রিম শিল্পের মত কাব্যেরও লক্ষ্য হল প্রকৃতির প্রতিবিম্ব ফলানো নয় বা তার অন্য কোন রকম বস্তুনিষ্ঠ অনুকরণ করা নয়, কিংবা কল্পনার পালিশ বা রং ফলানো বা তার আসল রূপের কোন আদর্শবাদী পরিবর্ধন সাধন করাও নয়, বরং সেই উদ্দেশ্য হল প্রকৃতি নিজেই তার সৃষ্টির নানা স্তরে যেসব ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে সেইগুলির সাহায্যে তারই রহস্য ব্যাখ্যা করা,—সেই রহস্য সে আমাদের কাছে গোপন করে রাখে বটে, কিন্তু ঠিক পথে তার দ্বারস্থ হলে সে তার রহস্য মেলে ধরতে প্রস্তুত।

এই হল কাব্যের আসল লক্ষ্য, কারণ এর চেয়ে মহান্, এর চেয়ে স্বরূপগত লক্ষ্য তার আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু মানব-চিত্ত এই মহত্তম লক্ষ্যে উপনীত হয় ধাপে-ধাপে, এবং মনে হয় তার প্রথম ধাপটি রয়েছে সেই আসল লক্ষ্য থেকে অনেকটা দূরেই। এই ধাপগুলির সূত্রপাত হয়

একেবারে প্রত্যক্ষ এবং স্থূল ভাব, অনুভূতি এবং বস্তুরাজির ইন্দ্রিয়ানুভবকে পদ্যের সূত্রে গ্রন্থন থেকে—তখন তার ভাষা উপযুক্ত হলেও খুব উচ্চাঙ্গের হয় না। কিন্তু এমনকি সে যখন অধিকতর যথাযোগ্যতা এবং অব্যর্থতা লাভ করে, তখনো প্রায়ই দেখি সেটা প্রাণিক, আবেগগত বা বুদ্ধিগত যথাযোগ্যতা এবং অব্যর্থতার বেশি কিছু নয়। এক রকমের প্রাণ-স্তরের বলিষ্ঠ কবিতা আছে যা আছে আমাদের ইন্দ্রিয়-সংবেদন ও জীবনবোধের কাছে খুব জোরদার আবেদন সৃষ্টি করে, যেমন বায়রনের অনেক কবিতা এবং এলিজাবেথের যুগের সেই নাট্যসম্ভার যার পিছনে দিব্য-প্রেরণা খুব বেশি ছিল না। আর আছে দুর্বার আবেগের কবিতা যা আমাদের অনুভূতিকে জাগ্রত করে এবং আমাদের সামনে জীবনাবেগের আকাঙ্ক্ষা ও তার সক্রিয় চিত্র উপস্থাপিত করে। এছাড়া আছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কবিতা যা আমাদের জীবন এবং তার যান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করে অথবা জীবনের মনস্তাত্ত্বিক বা অন্যবিধ 'সমস্যা'র কথা আলোচনা করে, অথবা আমাদের চিন্তাধারাকে এমন ফলপ্রদ এমন আকর্ষণীয় ঢঙে গড়ে তোলে যে তার কথা প্রায়ই উল্লেখ না করে পারা যায় না। আমাদের মনের পক্ষে এবং আমাদের উপরিতল-সঞ্চারী আত্মার পক্ষে এই সব জিনিসেরই নিজস্ব উপভোগ্যতা রয়েছে, আর এসব জিনিস উপভোগ করা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত এবং আমাদের ঊর্ধ্বায়নের পথে নিশ্চয়ই আমরা বলিষ্ঠতার সঙ্গে এবং জীবন্তভাবে এসব জিনিসই উপভোগ করে যাব ; কিন্তু শুধু তাদের নিয়েই যদি আমরা সন্তুষ্ট থেকে যাই তাহলে আমরা কাব্যলক্ষ্মীর উচ্চাসনের দিকে খুব বেশি আর উঠে যেতে পারব না।

এই ধরনের কাব্যের রচনাশৈলী সচরাচর তার বিষয়বস্তু অনুযায়ীই হয়ে থাকে। কারণ কবির দৃষ্টি এবং তাঁর বাক্যের মধ্যে একটা সমীকরণের প্রবণতা দেখা যায়, অবশ্য সেই সমীকরণ যে সর্বদা নির্ভুল এবং অপরিহার্য হবেই এমন কিছুতেই নয়। কাব্যে আমরা অনবরতই দেখি, প্রাণময় শৈলীর একটা নিজস্ব বলিষ্ঠতা আছে, আবেগময় শৈলীরও একটা নিজস্ব শক্তি আছে, তেমনি বুদ্ধিনিষ্ঠ শৈলীরও একটা নিজস্ব জোর আছে। তবে এসব শৈলীর নিজস্ব শক্তি থাকলেও এগুলিকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক কল্পনার ভাষা থেকে পৃথক করে দেখা একান্তই প্রয়োজন। কারণ চিন্তা ও আবেগের বলিষ্ঠ প্রকাশই ঊর্ধ্বতর বাক্-এর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক : বায়রনের সস্তা আবেগের শক্তি ফুটেছে একটি পংক্তিতে :

There's not a joy the world can
give like that it takes away.

—এ রকমের একটি পংক্তি বিশ্বব্যাপী বেদনাকে ব্যক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিংবা ব্রাউনিং-এর উচ্ছল শক্তি-সম্পন্ন ভঙ্গিতে বিশ্বের আনন্দকে ধ্বনিত করা যায় না :

God's in his heaven
All's right with the world,

কিংবা পোপের শাণিত এবং সর্বদা উদ্ধৃতিযোগ্য বুদ্ধি-নিষ্ঠতার মাধ্যমেও বিশ্বের আনন্দ এবং বেদনার মধ্যে একটা উভয়পদী সমতা আনা যায় না :

God sees with equal eyes as lord of all,
A hero perish or a sparrow fall.

—এ ভাষা চিন্তা ও আবেগের বাহক কাব্যিক ভাষা বা আধা-কাব্যিক ভাষা হতে পারে ; কিন্তু এ ভাষা সত্যকার কাব্যিক সূক্ষ্ম-দর্শনের প্রকাশোপযোগী ভাষা নয়। লক্ষ্য করুন, এই তিনটি ক্ষেত্রেই ভাষা এমন সব ভাবের ধার ঘেঁষে গেছে যে ভাবগুলি কোন মহাকবির ধ্যানদৃষ্টি থেকে উৎসারিত হয়ে যদি গভীরতর প্রকাশ লাভ করত তো কাব্যিক অভিব্যক্তির শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করতে পারত। বায়রনের পংক্তিটি বিশ্বব্যাপী বিষাদ ও বৈরাগ্যের আবেগানুভূতির আধ্যাত্মিক প্রকাশের ক্ষেত্রে সূচনা-বিন্দু মাত্র, গীতায় এই অনুভূতির প্রকাশ হল :

'অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্ ইমম্ প্রাপ্য
ভজস্ব মাম্।'*

বিষয়বস্তু যদি ছেড়েও দেন, তবু শুধু কাব্যশৈলী এবং ছন্দঃস্পন্দনের দিক থেকে এ দুইয়ের রীতির তুলনা করুন। তাহলেই দেখতে পাবেন মহৎ কাব্যের সঙ্গে লঘু কাব্যের পার্থক্য কোথায়। ব্রাউনিং-এর ভাষার জন্ম প্রাণোচ্ছল খোশ-মেজাজ থেকে, এ ভাষা আমাদের আন্তর সত্যের গভীরতর প্রস্রবণ-শীর্ষকে স্পর্শ করে না। বরং ঠিক উল্টো একটা মনোভাব থেকে হাসি পায় তার উচ্ছল আনন্দের

* তোমরা যারা এই নশ্বর অসুখী সংসারে জন্ম নিয়েছ, তারা আমাকে ভজনা কর।

'বাগ্‌বৈখরী' দেখে। তেমনি পোপের ভাষা 'গীতা'-র শিক্ষার সেই মহান্ সত্যটিকে—সেই দিব্য সমতার সত্যকে —তার কাব্যিক অক্ষমতার জন্যে একেবারে ভণ্ডামিতে পরিণত করেছে ; কারণ তিনি নিজে তো সেই সত্যকে দর্শন করেননি, সুতরাং আমাদেরও তিনি দর্শন করাতে পারেন না। সত্যের যেসব অর্থবহ চিত্ররূপ তিনি এঁকেছেন সেগুলি তাঁর নিজের অনুভূতির মতই শুধু বুদ্ধিগত এবং আলঙ্কারিক চিত্র, সেগুলি যথার্থ কাব্যিক চিত্রকল্প নয়।

কাব্যশৈলীর যে স্তরে আমাদের আরোহণ করতে হবে, এই শৈলী তার নীচেই পড়ে আছে। এর চেয়েও উর্ধ্বতর এক শৈলী আছে। তার ভাষা বুদ্ধি, প্রাণশক্তি বা আবেগ-শক্তির ভাষা মাত্র নয়, বরং তার বদলে বা তার অতিরিক্ত এ হল সত্যকার কল্পনার উপযোগী শৈলী। তাতে আছে কবির সূক্ষ্ম-দর্শনের মহৎ সৌন্দর্য, সে সৌন্দর্য বস্তুগত বা আত্মগত যে-কোন রকমই হতে পারে। সে সৌন্দর্য কখনো অল্প পরিমাণে থাকে, এবং প্রায়ই খুব বেশি পরিমাণে থাকতে পারে। কিংবা তাতে কখনো অল্প পরিমাণে, প্রায়ই খুব বেশি পরিমাণে থাকে আত্মার অপরিসীম শক্তি, সেইশক্তি কাব্যের শব্দ ও ছন্দের প্রবাহকে বহন করে নিয়ে যায়। তার তীব্রতায় তারতম্য নিশ্চয়ই আছে। লঘুতর তীব্রতার অনেক উদাহরণ পেতে পারি চসার থেকে—যখন তিনি পর্যবেক্ষণের দিকে মন না দিয়ে তাঁর কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেন। এমনকি স্পেন্সার যখন উচ্চগ্রামে সুর বাঁধেন তখনও এই লঘুতর তীব্রতারই দৃষ্টান্ত মেলে। অন্যদিকে, মহত্তর তীব্রতার একটা বিশেষ ধরনের যথেচ্ছ উদ্ধৃতি দিতে পারি মিল্টনের গোড়ার দিকের কবিতা থেকে ; আবার তারই অন্য এক ধরনের উদ্ধৃতি দিতে পারি সেইসব কবিদের থেকে যাঁরা কীট্‌স্ এবং শেলির মত লাভ করেছিলেন অকৃত্রিম আধ্যাত্মিক দিব্যদর্শন। বস্তুতঃ ইংরেজী কাব্যধারা সাধারণতঃ এই খাতেই প্রবাহিত। কিন্তু সাক্ষাৎদৃষ্ট, সত্য-প্রকাশক কাব্যবাণীর যে সমুচ্চতম তীব্রতা থেকে মন্ত্রের সূচনা হয়, ইংরাজী কাব্যধারাতেও সেই তীব্রতা নেই। সাক্ষাৎ-দৃষ্টির একটা বিশেষ শক্তি তাতে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তবু সেই গভীরতর দৃষ্টির উপরে পড়েছে আরো স্থূল কিছুর প্রলেপ। এবং কখনো মণ্ডন-সৌন্দর্যের জন্যে কাব্যিক প্রয়াস, কখনো-বা কবিমনের অন্য কোন সচেতন অভিপ্রায় অন্তরের আত্মার গভীরতর এষণাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে বাহ্য সৌন্দর্য দিয়ে,—চিত্রকল্পের সৌন্দর্য, চিন্তার সৌন্দর্য এবং আবেগের সৌন্দর্য দিয়ে। কোথায় সেই আত্মিক এষণাই আমাদের অধিকার করবে চিত্রকল্পের মাধ্যমে, তা নয়, সেই চিত্রকল্পের যবনিকা পেরিয়ে আমাদেরই চেয়ে থাকতে হয় তার সাক্ষাৎ পাবার আশায়! উর্ধ্বতর এক সম্ভোগ সেখানে রয়েছে,—তার প্রকৃতি যে আধ্যাত্মিক নয় তাও নয়,—কিন্তু তবু তা সেই বিন্দুতে পৌঁছায়নি যেখানে সম্ভোগ অবিমিশ্র আধ্যাত্মিক আনন্দে উত্তীর্ণ হয়ে যায় অথবা তাতেই বরং নিমগ্ন হয়ে থাকে। এই আধ্যাত্মিক আনন্দ হল সেই সৃষ্টিশীল কাব্যিক সাক্ষাৎ-দৃষ্টির উল্লাস।

এই তীব্রতার সাক্ষাৎ যেখানেই পাই সেখানে অন্য সব কিছুই রয়েছে, অথচ সবই সেই আধ্যাত্মিক সাক্ষাৎ-দর্শনের তরঙ্গ-ভঙ্গে বাহিত হয়ে চলেছে ; সেই অধ্যাত্ম-দর্শনের প্রেরণাদীপ্ত এবং অপরিহার্য বাণীমূর্তি লাভ করেছে। অন্য উপকরণগুলির মধ্যে সব কয়টি অথবা যে-কোন একটি সেখানে থাকতে পারে ; কিন্তু তাদের থাকতে হবে সেখানে অধস্তন হয়ে অথবা তাদের যথাসাধ্য রূপান্তরিত হতে হবে কাব্য-জ্যোতি এবং কাব্য-আনন্দ। এই তীব্রতা কোন একটি বিশেষ রচনাশৈলীরই যে আছে তা নয় ; কাব্যভাষা সম্বন্ধে কোন বিশেষ ধারণাগম্য সূত্রের উপরেও তা নির্ভর করে না। অলঙ্কৃত চিত্রসমৃদ্ধ রচনাশৈলীর সর্বোচ্চ বিকাশের মধ্যে তাকে পেতে পারি, যেমন কালিদাস বা শেক্সপীয়রে পেয়ে থাকি ; নিরলঙ্কার এবং ঋজু প্রকাশভঙ্গিতেও তাকে পেতে পারি, যেখানে ভাষার ব্যবহার হয় যেন অসীমের মধ্যে ঝাঁপ দেবার জন্যে একটা আশ্রয়স্থান হিসাবে ; আবার একে ভাষার সেই ঘনীভূত তীব্রতার মধ্যেও পেতে পারি যাতে বর্ণবিরল বা বর্ণাঢ্যরূপের যথেচ্ছ ব্যবহার রয়েছে অথচ যা প্রত্যেকটি শব্দকে যথাসম্ভব সর্বাধিক ছন্দঃ-স্পন্দন ও ভাবব্যঞ্জনায় পূর্ণ করে তোলে। কিন্তু এই তীব্রতা এসব কোন জিনিসের উপরেই নির্ভরশীল নয়। এটা কাব্যের কোন বাইরের ঢং নয়, এই তীব্রতা ও কাব্যশৈলী হল অভিন্নবস্তু, এ হল বাক্ স্বয়ং। কোন উপাদান তাকে সৃষ্টি করবে কি?—সে-ই বরং নিজের উপাদান সৃষ্টি করে চলে। তার বাইরের রূপ যা-ই হোক, সে-ই হল সর্বদা মন্ত্রের একমাত্র উপযোগী শৈলী। [ক্রমশ]

অনুবাদক—**রামেশ্বর শ'**

মা

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

কাছে থাকো, দূরে যাও
অবিরত সে তোমার পাশে
অমল হাতে হৃদয় ছুঁয়ে
দুঃখ-রাত ভরে কী আশ্বাসে।

কাতর বুকে চরণ বাজে
অন্ধকারে ধুলো-কাদার ঘরে
আকুল হলে তিনি কাঁদেন
দুঃখ ভোলান সে কোন্ মন্তরে।

তার অমলিন ভালবাসায়
যেন অযুত আনন্দ ফুল ফোটে
স্বপ্নপারের অমর্ত্ত-লোক
মাটির ঘরে মূর্ত হয়ে ওঠে।

তখন যেন জলে স্থলে
গোপন বুকের কাছে
চিরকালের সুরেশ্বরী
মা যেন এই হৃদয় ভরে আছে।

মায়ের পণ্ডিচেরী আগমন

অমলেশ ভট্টাচার্য

২৯শে মার্চ, ১৯১৪ সাল।

মা এসেছেন পণ্ডিচেরীতে।

বিকাল সাড়ে-তিনটার সময় মায়ের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ হল। তাঁকে দেখেই মা চিনতে পারলেন। এই তো তিনি। এতদিন স্বপ্নে জাগরণে ধ্যানে যাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর সাধনার যোগ। ধ্যানের মধ্যে যিনি তাঁকে সাধনায় সাহায্য করেছেন নির্দেশ দিয়েছেন। যাঁকে তিনি এতদিন চোখে দেখেননি, কিন্তু অন্তর দিয়ে চিনে এসেছেন, মনে মনে তাঁকেই ডেকেছেন "কৃষ্ণ" বলে। তিনিই যে আজ তাঁর সামনে বসে!

মা বুঝতে পারলেন, ভারতবর্ষই তাঁর সাধনার স্থান, আর শ্রীঅরবিন্দের সাধনাই তাঁর সাধনা। মা লিখেছেন, "The moment I saw Sri Aurobindo I recognised him as the being I used to call Krishna ·· this is enough to explain why I am fully convinced that my place and work are near him in India"। পরের দিন তাঁর ডাইরিতে লিখলেন, "শত শত জীব যদি গাঢ়তম অজ্ঞানের মধ্যে নিমজ্জিত রয়ে থাকে, কিছু এসে যায় না তাতে, কাল যাঁকে দেখেছি তিনি পৃথিবীতে আছেন। তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ যে একদিন আসবে যখন অন্ধকার আলোকে রূপান্তরিত হবে। তোমার রাজত্ব সত্য সত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে।"

এই বৎসরেই শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় মায়ের উদ্যোগে পণ্ডিচেরী থেকে প্রথম প্রকাশিত হল ইংরেজী 'আর্য' পত্রিকা ও তার ফরাসী সংস্করণ। প্রথম সংখ্যা বার হল শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন ১৫ই আগস্টে।

এদিকে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

কয়েক মাসের মধ্যেই পল রিশার ডাক পড়ল ফ্রান্সে, ফরাসী আইন অনুসারে দেশ আক্রান্ত হলে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ককে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়, এটা বাধ্যতামূলক। পল রিশাকে তাই চলে যেতে হল। যুদ্ধ শুরু হতেই ব্রিটিশ সরকার ফরাসী সরকারের উপর চাপ দিতে শুরু করল। কেননা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একজন ফরাসী মহিলার এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তারা ভয়ের চোখে দেখল। কারণ ব্রিটিশ সরকারের ধারণা শ্রীঅরবিন্দ সাধনা করার নাম করে ফরাসী এলাকায় থেকে তলে তলে ভারতবর্ষে বিপ্লব আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। ফরাসী সরকারের চাপের ফলে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত মাকেও পণ্ডিচেরী ছেড়ে ফ্রান্সে চলে যেতে হল।

শ্রীঅরবিন্দ পড়লেন একা। তবু 'আর্য' নিয়মিত প্রকাশ হয়ে চল। ১৯১৪ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়-সাত বৎসর ক্রমাগত অক্লান্তভাবে তিনি একাই লিখে চললেন 'আর্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে। গুনলে দাঁড়াবে প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা। শ্রীঅরবিন্দ 'আর্য' পত্রিকায় লিখতে লাগলেন তাঁর সাধনার কথা, মানব জাতির দিব্য ভবিষ্যৎ কি, কেমন করে তা সার্থক হয়ে উঠবে তার কথা, বিশ্বের সকল মানুষের ঐক্য ও সংহতির কথা, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি ও তার তাৎপর্যের কথা, বেদ উপনিষদ ও গীতার গূঢ় অর্থ ও ব্যাখ্যা—এসবই পরে একের পর এক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ; যার প্রত্যেকটি এক একখানি মহৎসৃষ্টি, পৃথিবী বিখ্যাত,সেগুলি হল, *The Life Divine*; *The Synthesis of Yoga*; *The Human Cycle*; *The*

Ideal of Human Unity; The Future Poetry; On the Veda; The Upanishads; Essays on the Gita ; The Foundation of Indian Culture।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিপুল সৃষ্টি পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিস্ময়। তাছাড়া প্রত্যেকটি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর গভীরতা, তার সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ দৃষ্টি পৃথিবীর সকল দেশের সকল মনীষী শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে তা স্বীকার করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক সাধনার বিপুলতার কথা যদি নাও ধরি, শুধু যদি তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির দিকেই তাকাই, তাহলেও কি তাঁকে আমরা একজন জগৎসম্পর্কহীন জীবনবিমুখ উদাসী যোগী বলতে পারি ?

এদিকে মা তখন ফ্রান্সে আছেন। ভারতে আসবার জন্য বারবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাকে সরকারী ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে না। তখন মা ফ্রান্স থেকে জাপানে গেলেন, যদি সেখান থেকে ভারতে আসার সুযোগ মেলে। বহু চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত মা ভারতে আসার অনুমতি পেলেন। এই সময়ে জাপানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মায়ের পরিচয় হয়। মায়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ মাকে অনুরোধ করলেন, ভারতে এসে তাঁর শান্তিনিকেতনের ভার গ্রহণ করতে।

মা বললেন, 'আমি ভারতে যাব। তবে আমার কাজ অন্যত্র।"

এরপরে ১৯২০ সালে ২৪শে এপ্রিল মা পণ্ডিচেরী ফিরে এলেন বরাবরের মত। শ্রীঅরবিন্দের কাজে ও তাঁর সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করলেন। তখন থেকে দুজনের সাধনার গতি চলল গভীরতর সিদ্ধির দিকে, ভগবৎ সত্যকে মানুষের চেতনায় নামিয়ে এনে তার রূপান্তরের দিকে। শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় পূর্ণতা মায়ের অপেক্ষা করে ছিল, তিনি নিজেই বলেছেন,…"the sadhana and the work were waiting for the Mother's coming"।

ক্রমেই তিনি গভীর থেকে গভীরতর ভাবে সাধনায় নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। তাই শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে ছয় বৎসর একাদিক্রমে চলার পর ১৯২১ সালে 'আর্য' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল।

এরপরে শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজিতে 'সাবিত্রী' নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেন। ইংরেজী অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা প্রায় ২৪ হাজার পংক্তির এক বিপুল মহাকাব্য। ইংরাজি ভাষায় রচিত যত মহাকাব্য আছে তার মধ্যে 'সাবিত্রী' হল দীর্ঘতম। আমেরিকার একজন সমালোচকের মতে, "ইংরেজী ভাষায় সম্ভবতঃ এটি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য"। যোগসাধনা ও সিদ্ধির উপলব্ধিতে লেখা অনুপম এই মহাকাব্যকে একমাত্র বেদ ও উপনিষদের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। 'সাবিত্রী' ছাড়াও শ্রীঅরবিন্দের বহু কবিতা ও নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এই সময়ে।

মায়ের পণ্ডিচেরী আসার আগে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কয়েকজন অনুগামী নিয়ে নিরিবিলিতে থাকতেন নিজের সাধনায়। মায়ের আগমনের পর থেকে এক এক করে ক্রমেই লোক আসতে লাগল জীবনের সব কিছু ছেড়ে এক উন্নততর জীবনের জন্য, তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনা অনুসরণ করবার জন্য। এমনি করে আস্তে আস্তে একদল সাধক জড় হয়ে গেল। ফলে তাদের তো সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মতভাবে থাকা খাওয়া কাজ কর্মের ব্যবস্থা করতে হবে। মা তাদের সেই ব্যবস্থার ভার নিলেন। এই হল শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম গড়ে ওঠার সূত্রপাত। ঠিক যে একটা আশ্রম গড়ে তুলতে হবে এই রকম কোন মন নিয়ে তাঁরা এটা করেননি। তাঁদের সাধনাকে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনমত আপনার থেকেই মায়ের পরিচালনায় আশ্রম দিন দিন বড় হয়ে উঠতে লাগল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ এখানে এসে জড় হল। তার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান কেউই বাদ নেই। তারা এই বর্তমান জীবনধারার পরিবর্তন চায়। মানুষের জীবনে সত্যিকার একটা উন্নত দিব্য চেতনা চায়। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে ও যোগসাধনার মধ্যে রয়েছে সেই পথের ইঙ্গিত। তাই পণ্ডিচেরী আশ্রম হয়ে উঠল এই রকম একটা জীবন গঠনের পরীক্ষা নিরীক্ষার গবেষণাগার।

আর শ্রীঅরবিন্দ ক্রমেই তাঁর সাধনার গভীরে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ অন্তরালে চলে যেতে লাগলেন। তারই একটা চূড়ান্ত অবস্থা এল ২৪শে নভেম্বর ১৯২৬। শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের মধ্যে অবতরণ ঘটল অধিমানস স্তরের দিব্য চেতনা। এরপর শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন। আর আশ্রম ও সাধকদের ভার দিলেন মায়ের উপরে। ঘোষণা করলেন, "মায়ের চেতনা আর আমার

চেতনা এক।...একই দিব্যচেতনার দুই রূপ।" "মায়ের দিকে যে ফিরেছে সেই আমার যোগসাধনা করে।" বলতে গেলে তখন থেকেই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম লোকসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত হল।

জীবন-স্বপ্ন

মা তাঁর সারা জীবন ভরে মানুষের জন্য এক স্বপ্ন দেখেছেন। আর সেই স্বপ্নকে জগতের উপর সত্য করে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

এই যে দুঃখের সংসার, যেখানে লাভ ক্ষতি টানাটানি, স্বার্থপরতা বিদ্বেষ হানাহানিতে মানুষ আর্তনাদ করছে, অথচ মানুষের অন্তর কিন্তু চাইছে শান্তি মিলন সামঞ্জস্য জীবনের সকল হীনতা কদর্যতার মধ্যেও মানুষ কিন্তু দেখে সৌন্দর্যের আনন্দের স্বপ্ন। মানুষের এই স্বপ্নই হল মায়ের স্বপ্ন।

ছোট্টবেলা থেকেই মা ভাবতেন পৃথিবীতে এমন একটা জায়গা থাকবে যেখানকার মানুষের অন্তরে থাকবে কেবল শুভেচ্ছা, ভালবাসা, সহানুভূতি। কেউ কারো উপর খবরদারি করবে না। কিংবা কেউ কারো তাঁবেদারিও করবে না। সবাই হবে স্বাধীন পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল। একমাত্র যা সত্য যা খাঁটি তাকেই তারা মেনে চলবে। কেউ নিজের সুখ নিজের ভোগ নিজের আরামের কথা চিন্তাও করবে না। তাদের সকল চেষ্টা সকল উদ্যম সকল জ্ঞান ও প্রতিভা দিয়ে চাইবে কেবল মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করতে, তাদের সকল অক্ষমতা অপূর্ণতাকে জয় করতে। সুন্দর ও স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবনের জন্য যার যেটুকু প্রয়োজন তা সবাই পাবে সমান ভাবে। তাদের সেই সমাজ শোষণ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর দাঁড়াবে না, তা দাঁড়াবে সমতা, সহমর্মীতা সমভ্রাতৃত্বের উপর। এই আদর্শ সামাজিক পরিবেশে অর্থ কখনই সর্বেসর্বা হবে না। মানুষকে দেখা হবে তার নিজের প্রতিভা যোগ্যতা ও অন্তরের মানমূল্য দিয়ে। আর্থিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে মানুষকে বিচার করা হবে না। কর্ম যেখানে জীবিকা অর্জনের জন্য নয়, কর্ম হবে নিজের অন্তরের আগ্রহকে, নিজের সামর্থ্য ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করার উপায়। কর্ম হবে দশের ও সমাজের সেবা। আর সমাজ নেবে কর্মীর কর্মব্যবস্থার ও পরিপোষণের ভার। বলা যেতে পারে এ এক আধ্যাত্মিক সমাজবাদ—Spiritual Socialism।

কিন্তু এমন একটা স্বপ্নকে সফল ও সার্থক করার জন্য হয়তো পৃথিবী এখনও তৈরী হয়ে ওঠেনি। কেননা এমন একটা উদার বিশ্বজনীন ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করার মত চেতনা মানুষের এখনও হয়নি। চেতনার দিক থেকে মানুষ এখনও রয়েছে পশুর স্তরের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও আগ্রাসী মনোভাবের মধ্যে। সেই চেতনাকে রূপান্তরিত করে ধরার শক্তি এখনও মানুষ পায়নি। সেই জন্য মা বলছেন, এটা এখনও স্বপ্ন।

কিন্তু মায়ের সেই স্বপ্নই আজ বাস্তবে সত্য হয়ে উঠতে চলেছে। যতটা সম্ভব সামার্থ্য নিয়ে স্বল্প পরিসরের মধ্যে সেই কাজই মা করতে চেষ্টা করেছেন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। যদিও তা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, তবুও সে কাজ এগিয়ে চলেছে, মা বলেছেন, "আশা করি জগতের সামনে আমরা এই ভাবে একদিন তুলে ধরতে পারব নূতন এক আধ্যাত্মিক সমাজ ও জীবনের বাস্তব ও কার্যকরী পন্থা।"

"ভগবানের কৃপার উপর ও ভগবানের শক্তির উপর অটল বিশ্বাস নিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব।

"এই উদ্দেশ্যে যারা জীবন উৎসর্গ করতে চায় তাদের জন্য দুয়ার উন্মুক্ত রয়েছে, এবং সর্বদাই তা থাকবে অবারিত।"

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

মায়ের এই স্বপ্নই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। তা হল পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।

কিন্তু কেমন সেই আশ্রম?

আশ্রম বলতেই আমাদের মনে ধারণা হয় তা বুঝি একদল সংসারত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীর নির্জন কোন মঠ বা আখড়া। যেখানে তারা কাজ কর্ম ছেড়ে কেবল গুহায় বসে চোখ বুঁজে জপতপ কৃচ্ছ্র সাধনা করে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতের যুগে আশ্রম বলতে কিন্তু তা বোঝাত না। আশ্রম হল গুরুগৃহ। সেখানে নারীপুরুষ সকল বয়সের সকলেই এসে মিলিত হয় শিক্ষালাভের জন্য। সবাই তারা গুরুর কাছে শিক্ষার্থী, শিষ্য। গুরু হলেন তাদের পিতৃতুল্য। তিনি সাধ্যমত তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় গড়ে তোলেন। শিক্ষা শেষ হলে তাদের নিজের নিজের

জীবন নির্বাচন করে নিতে দেন। তাই বৃহত্তর অর্থে আশ্রম হল এক গার্হস্থ্য পরিবার। যেখানে রয়েছে প্রত্যেকের জীবন ও কর্মের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ। এই হল ভারতের আশ্রমের আদর্শ। আর বিশেষ করে এই হল পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমেরও বিশেষত্ব।

এই আশ্রম কোন জনসংস্থা বা সমিতি নয়। কিংবা কোন রাজনৈতিক সংগঠন বা ধর্মসংস্থাও নয়। আর এর কোন বাঁধাধরা মতবাদ, নিয়ম নীতি, আচার অনুশাসনও নেই। যাদের অন্তরে ভগবানের ডাক এসেছে, যারা মনে-প্রাণে চায় একটা ঊর্ধ্বের জীবন, যাদেরকে মা গ্রহণ করেছেন তাদের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সকল দায়িত্ব মা-ই গ্রহণ করেন। তারা রয়েছে সরাসরি মায়েরই দায়িত্বে। তাদের প্রত্যেকের জন্য সম্ভবমত সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপনের ব্যবস্থা মা করে থাকেন। প্রত্যেকের স্বভাব ও প্রকৃতি অনুসারে জীবনকে নতুন করে ভাগবত আদর্শে গড়ে তুলবার জন্য মা তাদের পথ দেখান, সাহায্য করেন।

আশ্রমের এই আত্মগঠন ও আত্মশিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল চারটি,—শরীরের, প্রাণের, মনের এবং অন্তরাত্মার সমস্ত দিকের শিক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি। কেননা এই সবটা নিয়েই তো একটা মানুষের সামগ্রিক পূর্ণতা। আর এইভাবে গড়ে ওঠে যেসব পূর্ণাঙ্গ মানুষ তারাই হবে ভবিষ্যৎ দিব্য সমাজের এক একটি কেন্দ্র ও শক্তি।

এইভাবে অনেক লোকের একসাথে বসবাসের জন্য দরকার বিরাট এক কর্মব্যবস্থার। তাই গোটা আশ্রমই হল এক নীরব কর্মযজ্ঞ। মা বলেছেন, "কাজ করা হল শরীর দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা"। এখানে যাকে যে কাজটি দেওয়া হয়েছে সেটাকে সে নিয়েছে একটা নিঃস্বার্থ কর্মপালনের কর্মযোগের সুযোগ হিসাবে। আর সেই কাজকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করাই হল তার পূজা বা সাধনা। কে কত বড় কাজ করছে, বা কর্মীর দক্ষতা, যোগ্যতা বা কৃতিত্ব কতখানি তা দেখে কাজের বিচার হয় না। কি মনোভাব নিয়ে কাজটা করা হচ্ছে, সেটাই মা দেখেন। কথায় বলে, ভগবান কাজ দেখেন না, মন দেখেন।

কিন্তু যে দুর্বল যে রুগ্ন যে অসুস্থ তার দ্বারা কোন কাজই হয় না। সে সংসারের কাজই হোক, কি কোন আধ্যাত্মিক কাজই হোক। জীবনকে বলিষ্ঠভাবে গড়তে হলে চাই সুস্থ সবল সমর্থ দেহ। মা বলেন, শরীরই হল আমাদের সাধনার ভিত্তি। তাই আশ্রমে ছোট বড় সকলের জন্য রয়েছে শারীর শিক্ষার ও স্বাস্থ্যচর্চার ব্যবস্থা। পুঙ্খানুপুঙ্খ যত্ন ও অনুশীলনে আশ্রমের শরীর চর্চার মান এত উন্নত যে তাকে একমাত্র আন্তর্জাতিক সাফল্যের যেসব রেকর্ড তার সঙ্গেই তুলনা করা যায়।

তাছাড়া আশ্রমের যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাও সারা ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আজ স্বীকৃত। এখানকার শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে (Sri Aurobindo International Centre of Education) কিণ্ডার গার্টেন থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যন্ত কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানকার শিক্ষাদান, পঠন রীতি ও শিক্ষা অনুশীলনের পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব। মা ও শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শে তা রচিত। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। শিক্ষক কেবল বন্ধুর মত অনুগামীর মত নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে জীবন্ত প্রভাব দিয়ে শিক্ষার্থীকে কেবল সাহায্য করতে পারেন মাত্র। সেই হিসাবে আদর্শ শিক্ষক হলেন আদর্শ যোগী। তাই কেবল কতকগুলি বিষয়ের কিছু তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহ করলে বা সেগুলিকে কোনরকমে তোতাপাখির মত মুখস্থ করালেই শিক্ষা দেওয়া বা শিক্ষা পাওয়া হল না।

বিদ্যাকে জীবনের মধ্যে সার্থক করে ধরাই হল প্রকৃত শিক্ষা। আর আধ্যাত্মিক সাধনা বলতেও কি তাই বোঝায় না? ভগবত সাধনাকে যখন জীবনের সবদিকে সত্য করে সার্থক করে তুলতে চাই, তখন জীবনে আমরা যা কিছুই করি সবই হয়ে ওঠে তপস্যা। তাই এখানকার শিক্ষাকেন্দ্র আশ্রমেরই একটা সম্প্রসারণ বলা চলে। ফলে দেশের প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এর কোন তেমন মিল নেই। মা বলেছেন, বর্তমানে যেসব ব্যবস্থা চালু রয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হল ভবিষ্যৎ জগতের এক নতুন জীবন সৃষ্টি করা। আশ্রম যেন সেই ভবিষ্যৎ জীবনের একটা দোলনা। যেখানে অনাগত ভবিষ্যতের এক নূতন মানবচেতনা ধীরে ধীরে উন্মেষিত হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'লাইফ ডিভাইন'-এর মূল কথাটা এক জায়গায় বলেছিলেন, "ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে গড়ে তুলবার শ্রেষ্ঠ উপায় হল জগতের উপরে দিব্যজীবনের ও দিব্যচেতনাকে প্রকাশ করে ধরা।" শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম হল সেই জীবনপ্রকাশেরই কর্মক্ষেত্র।

সার কথা *

'দ্য লাইফ ডিভাইন' শ্রীঅরবিন্দের মূল বা আকর গ্রন্থ। অধিকাংশ ভক্ত এ-বইয়ের নামের সঙ্গে যতটা পরিচিত তার প্রতিপাদ বা বিষয়বস্তুর সঙ্গে ততটা হয়তো নন। দুঃখের সঙ্গে সেকথা স্বীকার করতে হয়। অনির্বাণকৃত আশ্চর্য অনুবাদ, 'দিব্য জীবন' আজও তার যোগ্য সমাদর থেকে বঞ্চিত। তাঁর 'দিব্য জীবন প্রসঙ্গ'-এর কথাই বা কজনে জানেন?

শ্রীঅরবিন্দের রচনা সম্পর্কে সাধারণ মনে একটি অসাধারণ ভীতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচনা আয়তনে বিশাল, গম্ভীর এবং বোধগম্য নয় এই হল যাকে বলে 'স্টক রেসপন্স'। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে ব্যাখ্যা বিস্তৃত হলেও তার স্বকীয় বীর্য বা মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি, কবিত্বের স্পর্শ তো সর্বত্র। অবশ্য তত্ত্ব-প্রধান বিষয়ের ব্যাখ্যায় চিন্তার প্রাধান্য বা মননশীলতা থাকবেই। চিন্তা না করে চিন্তামণিকে পাবার আশা দুরাশা। আমাদের আধ্যাত্মিক দৈন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে চিন্তার দৈন্য।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি প্রধান রচনার—যেমন 'দ্য হিউমন্ সাইকল্'; 'দ্য আইডিয়াল অফ হিউমন্ ইউনিটি'; 'দ্য সিন্থেসিস অফ যোগ'; 'দ্য ফাউণ্ডেশনস্ অফ ইণ্ডিয়ান কালচার' ও 'দ্য এসেজ অন দ্য গীতা'—যে কুশলী সারাৎসার করে দিয়েছেন তাতে সাধারণ পাঠক, ছাত্রসম্প্রদায় ও ভক্তমণ্ডলীর যথেষ্ট উপকার হয়েছে। এই সিরিজের শেষ বই 'দ্য লাইফ ডিভাইন' (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হল। অন্য দুই খণ্ড এই বছরেই বেরোবার কথা, প্রথমে ইংরেজী 'শৃণ্বন্তু' পত্রিকায়, পরে পুস্তকাকারে।

যারাই তাঁর মূল রচনার সঙ্গে পরিচিত তাদের জানা আছে যে শ্রীঅরবিন্দের যুক্তিতে কোন ফাঁক নেই। বিশ্ব প্রহেলিকাকে যিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করেছেন, যুগের দাবীতে উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যায় তাকেই আবার আধুনিক মনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

শিশিরকুমার মূলের ভাষা অক্ষুণ্ণ রেখে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য সযত্নে রক্ষা করেছেন। বিন্দুতে সিন্ধুকে ধরে দিয়েছেন। প্রদীপের আলোয় তাঁর সূর্যবন্দনা বহু কৃতজ্ঞ পাঠককে নবজীবনের বার্তা এনে দেবে সন্দেহ নেই। এই সারাংশ পড়তে পড়তেও অনেক সময় চিন্তা ও ভাষার ব্যাপ্তি ও সৌন্দর্যে চমকে যেতে হয়। মূলের স্বাদ হয়তো সব সময়ে মিলবে না, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য বুঝতে এ-বই সকলেরই কাজে লাগবে। স্কুলে, কলেজে, লাইব্রেরিতে, জিজ্ঞাসুর কাছে এর সমাদর হবার কথা।

---

* *The Life Divine*, Book I. Sri Aurobindo. Abridgement by Sisir Kumar Ghose. Sri Aurobindo Pathamandir. 1976.

—রচনাবলী—

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র বাংলা রচনা-সংগ্রহ একত্রে আটখণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, যোগ, ইত্যাদি জীবনের মর্মসত্যের বাস্তব বিশ্লেষণে এবং শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের জীবন-সাধনার গভীর ভাব-অবগাহনে তা সিদ্ধ-স্নাত।

সুদৃশ্য মনোটাইপে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ডবল-ডিমাই সাইজের পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার প্রতিটি বৃহৎ খণ্ড রেক্সিন ও বোর্ড বাঁধাই, মুদ্রণ ও গ্রন্থণ পারিপাট্যে সৌন্দর্যে চিত্তাকর্ষক।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। মূল্য—২৫·০০ দ্বিতীয় খণ্ড আগামী মাসে প্রকাশিত হবে

সম্পূর্ণ রচনাবলীর গ্রন্থসূচী

সাহিত্য ও শিল্পকলা

প্রথম খণ্ড : ১। সাহিত্যিকা, ২। রূপ ও রস, ৩। আধুনিকী, ৪। শিক্ষা ও দীক্ষা, ৫। রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় খণ্ড : ১। শিল্পকথা, ২। কবির্মনীষী-১ম, ৩। কবির্মনীষী-২য়, ৪। কবির্মনীষী-৩য়

তৃতীয় খণ্ড : ১। বাংলার প্রাণ, ২। মৃতের কথোপকথন, ৩। গানের গান, ৪। ফরাসী ষোড়শী, ৫। মারিয়ানা (ফরাসী নাটিকা), ৬। তিন্তাজিলের মৃত্যু (ফরাসী নাটিকা) ৭। অনুবাদমালা (কবিতা)

দেশ-সমাজ-রাজনীতি

চতুর্থ খণ্ড : ১। ভারত-রহস্য, ২। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান, ৩। স্বরাজের পথে, ৪। স্বরাজ-গঠনের ধারা, ৫। শ্রীঅরবিন্দ ও বর্তমান যুদ্ধ, ৬। কালের আহ্বান

পঞ্চম খণ্ড : ১। ভাবীসমাজ, ২। বোলশেভিকি, ৩। নীট্‌শের বাণী, ৪। নারীর কথা, ৫। স্মৃতির পাতা-১ম, ৬। স্মৃতির পাতা-২য়

ধর্ম-সাধনা—জ্ঞান-বিজ্ঞান

ষষ্ঠ খণ্ড : ১। ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা, ২। বেদমন্ত্র, ৩। উপনিষদ—কথা ও কাহিনী ৪। নব্যবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান

সপ্তম খণ্ড : ১। পূর্ণযোগ, ২। দেবজন্ম, ৩। সাধকের কথা, ৪। চেতনার অবতরণ, ৫। আলোর পথে-১ম, ৬। আলোর পথে-২য়, ৭। এ যুগের সাধনা, ৮। তিন কাহিনী, ৯। শতাব্দীর প্রণাম, ১০। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'

সম্প্রতি আবিষ্কৃত আদি কালের রচনা সম্ভার

অষ্টম খণ্ড : "আদি লেখা"

৬৩, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
৩৪-১৩৫১

শৃণ্বন্তু

শ্রীঅরবিন্দ ভবন
৮, শেক্সপীয়র সরণী
কলিকাতা-১৬

THE COLLECTED WORKS
OF
NOLINI KANTA GUPTA

Volume One
Volume Two
Volume Three
Volume Four
Volume Five

The collected works of SRI NOLINI KANTA GUPTA, shed a new light on the pressing problems of Man and his future. In the context of the present bewildering conditions of the world, they have a special relevance, and it is hoped that they will aid the modern man in his search of new hope for a new life of unity and harmony.

size : Double demy
pp : 406

Cloth Binding with attractive art-paper jacket.

Price Rs. 15·00 Each

Available at :

SRINVANTU
63, College Street
Calcutta-12
Ph : 34-1351

Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-12
Ph : 34-2376

Published by : Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry-2

Open yourself to the New Light that ha s dawned upon earth and a luminous path will spread in front of you.

—THE MOTHER



THE HOOGHLY MILLS CO., LTD.

MANUFACTURERS & EXPORTERS

10 CLIVE ROW,
CALCUTTA-1.

Telegraphic Address
"VICTO" Calcutta

Telephone No
22-5451 (2 Lines)
Codes : Acme & Bentley's
Second Phase

SRINVANTU PUBLICATIONS

সাবিত্রী—শ্রীঅরবিন্দ	...	৩·০০
মধুময়ী মা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২·০০
মধুময়ী মা (২য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২·৫০
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪·০০
কবির্মনীষী (৩য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪·৫০
Light of Lights—Nolini Kanta Gupta	..	4·00
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	..	১·৫০
শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' উপাখ্যান—শ্রীমণিবিষ্ণু চৌধুরী	...	৩·৫০
আলবার পদাবলী—শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	...	১০·০০
মায়ের অবতরণ কেন ?	...	০·৫০

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র বাংলা রচনাবলী প্রকাশের অপেক্ষায় (৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ)
তন্মধ্যে রচনাবলী : প্রথম খণ্ড : 'সাহিত্যিকা' প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য ২৫ টাকা

SRINVANTU

63, College Street,
Calcutta-12
Phone : 34-1351

Sri Aurobindo Bhavan
8, Shakespeare Sarani
Calcutta-16, Phone : 44-3057

॥ 'শৃঙ্খল'-র নিয়মাবলী ॥

বৈশাখ হতে 'শৃঙ্খল'-র বর্ষ আরম্ভ। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া চলে। বার্ষিক চাঁদা সডাক দশ টাকা, ষাণ্মাসিক পাঁচ টাকা, প্রতিসংখ্যা এক টাকা। ছয় মাসের কমে গ্রাহক তালিকাভুক্ত করা হয় না।

প্রতি বাংলা মাসের ৯।১০ তারিখে 'শৃঙ্খল' প্রকাশিত হয়, যথাসময়ে পত্রিকা না পেলে ১৫ দিনের মধ্যে জানালে ভাল হয়।

ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তন করতে হলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হলে 'শৃঙ্খল' অফিসে জানাবেন। চিঠিপত্রাদিতে যোগাযোগের সুবিধার জন্য গ্রাহকগণ যেন তাঁদের নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সর্বদা উল্লেখ করেন।

'শৃঙ্খল'-র চাঁদা মনিঅর্ডার যোগে অথবা পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টও গ্রহণ করা হয়। ভি. পি.-তে পত্রিকা পাঠান হয় না।

বাৎসরিক চাঁদা শেষ হয়ে গেলে তিন মাস অপেক্ষা করা হয় এবং কাগজ যথানিয়মিত পাঠান হয়ে থাকে এরই মধ্যে গ্রাহক যদি চাঁদা না পাঠান বা কোন কিছু জ্ঞাত না করান তাহলে পত্রিকা পাঠান সম্ভব নয়।

লেখকদের প্রতি আবেদন, তাঁরা যেন রচনার নকল রেখে পাঠান। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়।

কর্মাধ্যক্ষ : 'শৃঙ্খল'

The National Tape Loom Co

Manufacturers of SILK, COTTON & GLASS TAPES

7, LYONS RANGE

3rd Floor, Room No. 2

Calcutta-1

Phone : Office : 22-3718/5066

Love of God, charity towards men is the first step towards perfect wisdom.

—Sri Aurobindo

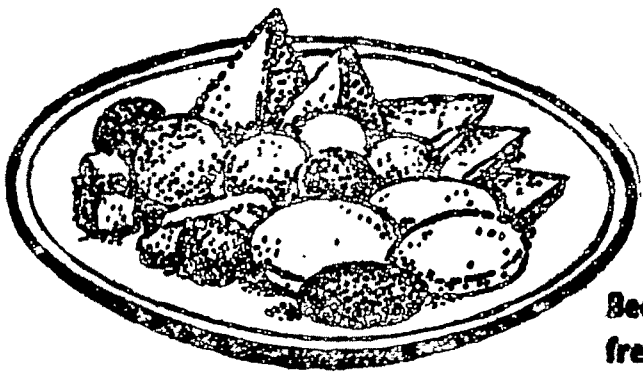


Cargo Surveyors
Analytical Chemists
Gram : JUTASPECTA
Telex : NOPROB CA 2414
Phone : 240046/47

ESKAPS (INDIA) PRIVATE LTD.
30, Chowringhee Road
Calcutta-700016

Telephone

VANASPATI COOKS A DELICIOUS MEAL— SO WHOLESOME TOO.



Because it's fresh and pure and enriched with Vitamin A and D

Always ask for Telephone Vanaspati. People love its taste. It's a delicious cooking medium. So good for curries, fried foods, western and oriental cooking. It's economical and so pure. Always fresh, it's enriched with Vitamin A and D for extra goodness. Remember to ask for :

Telephone

VANASPATI

cooking medium that's wholesome.



A produce of Swalka Vanaspati Products Ltd.



মাসিক সঞ্চয়ের সহজ পথ, গড়বে সুখের ভবিষ্যৎ

১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদী

ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট

★প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে, ২৫ বছর পরে পাবেন ১,৩৩,৮০০ টাকা

প্রতিমাসে সঞ্চয় তো করবেনই কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। ভেবে দেখুন কি ভাবে ও কতটা সঞ্চয় করলে আপনার ও আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটতে পারে আর আপনিও নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

॥ মাসিক সঞ্চয় ও আয়ের তালিকা ॥

মাসিক সঞ্চয়	১০ বছর পরে পাবেন	১৫ বছর পরে পাবেন	২০ বছর পরে পাবেন	২৫ বছর পরে পাবেন
১০৲	২০৬৬৲	৪১৮০৲	৭৬৬০৲	১৩,৩৮০৲
২০৲	৪১৩২৲	৮৩৬০৲	১৫,৩২০৲	২৬,৭৬০৲
৫০৲	১০,৩৩০৲	২০,৯০০৲	৩৮,৩০০৲	৬৬,৯০০৲
১০০৲	২০,৬৬০৲	৪১,৮০০৲	৭৬,৬০০৲	১,৩৩,৮০০৲

প্রতিমাসে যতটা সম্ভব সঞ্চয় করুন। এই প্রকল্পে আপনার সঞ্চয় থেকে আয় অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

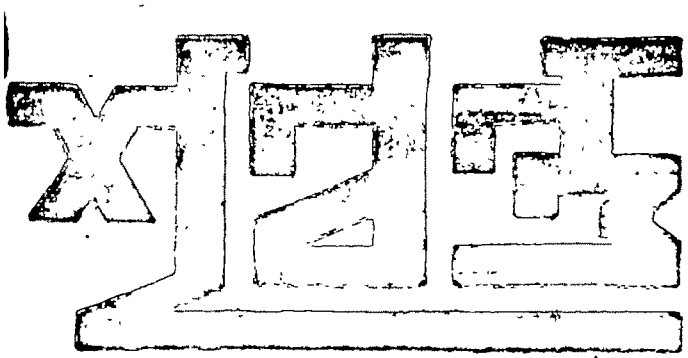
পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১ ✲ ফোন : ২৩-৯৭৮৪-৫-৬,
অথবা যে কোন শাখা অফিস

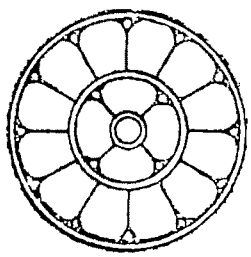
Progressive/UIB 12/75

প্রচ্ছদপট মুদ্রক ॥ কুইক প্রিণ্টিং সার্ভিস ॥ কলিকাতা ৯



অতীতে মানুষ যা করেছে চিরকাল তাই পুনরাবৃত্তি করে চলা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ হল অভিনব সিদ্ধি, অচিন্ত্যপূর্ব ঈপ্সিতা লাভ অর্জন করা।

—শ্রীঅরবিন্দ



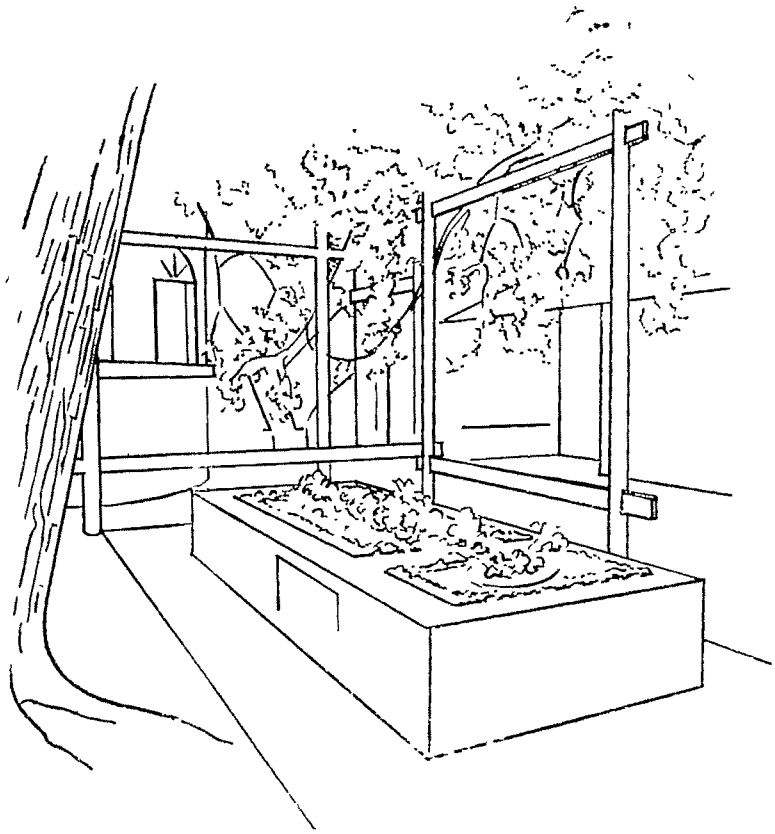
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা :

শ্রী নলিনী গুহ ৩৭

পঞ্চবিংশতি বর্ষ • সপ্তম সংখ্যা • কার্তিক ১৩৮৬

শ্বস্তি

পঞ্চবিংশতি বর্ষ : সপ্তম সংখ্যা
কার্ত্তিক : ১৩৮৩



সম্পাদক : অমলেশ ভট্টাচার্য
প্রকাশক ও মুদ্রক : সাম্যকান্তি মৈত্র
সম্পাদকীয় কার্যালয় : শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮ শেক্সপীয়ার সরণী, কলিকাতা-৭১
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে
মুদ্রিত এবং 'শ্বস্তি' কার্যালয়, ৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত
ফোন : ৩৪-১৩৫১

সূচী—

শ্রীঅরবিন্দ
সাবিত্রী ২৩৮
আদর্শ মানব ঐক্য ২৫০

শ্রীমা
মায়ের ঘরোয়া কথা ২৪৫
যোগ জীবন ২৪৭

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
আত্ম-সমর্পণ ২৩৫

চম্পকলাল
অপরূপ এক স্বপ্ন ২৫২

শ্রীদিলীপ কুমার রায়
নিয়ন্তা (কবিতা) ৫৫

বিহারীলাল
কোজাগরী (কবিতা) ২৫৬

গৌরী ধর্মপাল
বেদের কবিতা ২৫৭

ইন্দুলেখা
নিখিলকে স্মরণ করে (কবিতা) ২৬১
...
নিখিলদার দিনলিপি থেকে
কয়েক পৃষ্ঠা ২৬২
...
অমলেশ ভট্টাচার্য
নিখিলদা (সম্পাদকীয়) ২৬৬

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক সডাক : দশ টাকা

কার্ত্তিক ১৩৮৩ পঞ্চবিংশতি বর্ষ সপ্তম সংখ্যা

আত্ম-সমর্পণ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

['বিজলী', ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩২৯ সাল]

আজকালকার গণতন্ত্র বা ডেমোক্রাসীর যুগে এই কথাটাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে যে প্রত্যেক মানুষ ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ স্বাধীন স্বতন্ত্র, অর্থাৎ তাহার থাকিবে নিজের মতে নিজের পথে যথেচ্ছ চলিবার ফিরিবার পূর্ণ অধিকার, মুক্ত অবকাশ। "সর্বং পরবশং দুঃখং, সর্বমাত্মবশং সুখং" এই আমাদের আজকালকার জীবন সাধনার মূলমন্ত্র। মানুষের সার্থকতা নিজের নিজের আত্ম-প্রতিষ্ঠায়, আত্ম-প্রকাশে। শিক্ষা ও দীক্ষা এই আত্ম-কর্তৃত্বকেই ফুটাইয়া তুলিবে, সমাজের গড়ন এমনভাবে দিতে হইবে যেন মানুষ এই আত্ম-কর্তৃত্বের পথই খোলা পায়। বাহিরের, পরের দেওয়া বাঁধন—সে বাঁধন যতই সৎ উদ্দেশ্যমূলক হউক না কেন, মানুষ পরিণামে তাহাতে খাটো হইয়াই পড়িবে। তাই এমন কোথাও কোথাও শুনিতে পাই যে কোন বিশেষ মানুষের কথা ছার, ভগবানের বিরুদ্ধেও মানুষকে দাঁড়াইতে হইবে নিজের নিজত্ব লইয়া, ভক্ত তাঁবেদার হইয়া চলা মানুষের পক্ষে কোনক্রমে মঙ্গলকর নয়। সর্বদা সর্বত্র এই আত্মবশ হইয়া চলার দরুন যদি ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতে হয় তাহাও ভাল, কিন্তু পরবশ হইয়া সমৃদ্ধিলাভ "শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ"—To reign is worth ambition though in hell।

নিজত্বের এই যে সাধনতত্ত্ব, ইহার মধ্যে একটা খুব বড় সত্য আছে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে সত্যটি এখানে ঢাকা পড়িয়াছে তাহা হইতেছে এই যে স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রকৃতভাবে হইতে হইলে আগে জানা দরকার, প্রকৃত "স্ব" কি, আত্ম-কর্তৃত্ব পাইতে হইলে আগে পাওয়া দরকার আত্মাকে। নিজের নিজত্ব খুব ভাল কথা, কিন্তু সে "নিজ" জিনিসটা কি? পশু "নিজ" অর্থ বুঝে শরীর এবং এই শরীরের দাবি দাওয়া মিটাইয়াই সে পায় তাহার নিজের চরম চরিতার্থতা। পশু-প্রকৃতির মানুষ যে, তাহারও নিজত্ববোধ এই শরীরের মধ্যেই আবদ্ধ। মানুষ শিশু অবস্থায় এবং ক্রমবিকাশের

আদিমযুগে এই পশুর একান্ত দেহধর্ম উদ্‌যাপন করিয়াই নিজের পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। তখনকার পুরুষার্থ শরীরকে বাঁচিয়ে বর্তিয়ে রাখা। মানুষের এই স্তরের ধর্মকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি"। তারপরে যখন তাহার চেতনা একটু প্রসারিত হয়, তখন সে শরীরকে ছাড়াইয়া যায়—শরীরের উপরে আছে যে প্রাণের স্তর, তাহাকেই "নিজে" বলিয়া আঁকড়িয়া ধরে। তখন ফুটিয়া উঠে তাহার রাক্ষস-প্রকৃতি। এই প্রাণের তোড়ে পড়িয়া তাহার শত বুভুক্ষা জাগিয়া উঠে—সে চায় বিরাট বিপুল ভোগ বৈচিত্র্য। নূতন নূতন তৃষ্ণা তাহার মধ্যে নিত্য দেখা দিতে থাকে, সে তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য নূতন নূতন উপকরণ সম্ভার নিত্য সৃষ্টি করিতে থাকে। তারপরে মানুষ আরও একটু উপরে যখন উঠিয়া যায়, তাহার চেতনা পায় আর এক ধারা, যখন প্রাণ হইতে মনের পর্দায় সে উঠিয়া দাঁড়ায়। এই মনকেই তখন যে নিজ-জ্ঞানে উপাসনা করে, এই মনই হয় তখন তাহার আত্মা। মনের ধর্ম পাইয়া মানুষ হয় অসুর। মনের মধ্যে আসিয়া মানুষ হয় সজ্ঞান, নিজত্ব সম্বন্ধে সচেতন। প্রাণের দেহের স্তরে মানুষ চলে প্রকৃতির সাথে গা ভাসান দিয়া, প্রকৃতির যন্ত্র হইয়া তখন প্রাণকে ও দেহকে আত্মা বলিয়া সে বোধ করে মাত্র, একটা ভাব, তাহাতে জ্ঞান নাই। কিন্তু মনের আলোতে আসিয়া আত্মকর্তৃত্ব তাহার সজাগ হইয়া উঠে—তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কারের শক্তি দিয়াই সে প্রকৃতিকে, সমস্ত বস্তুকে নিজের বশীভূত করিতে চায়। তাহার মর্ম অর্থাৎ যতটুকু জ্ঞানের আলো সে পাইয়াছে তাহা নিযুক্ত করে এই অহমিকার সাধনে, পরিস্ফুরণে। আমি যে একটা কিছু, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাকে সকলের—প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, নিজের একটা বিশেষ কোট আঁকিয়া লইতে হয়। অধিকার, দাবী তখনকার যুগের হয় যুদ্ধ-মন্ত্র। মানুষ তখন ধর্ম অধর্ম, কল্যাণ অকল্যাণ, স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য বিচার করে না—সে চায় কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠা, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" বলিয়া সে বাস্তবিকই নিধনকে বরিয়া লইতে দৃক্‌পাত করে না।

জগতে আজও পাশব ও রাক্ষস-ধর্মের জের যে অনেকখানি চলিয়াছে, তাহার পরিচয় আমাদের চোখের সম্মুখে যথেষ্টই মিলে। তবুও ইহাদের বিরুদ্ধেও যে একটা আন্দোলনের স্রোত চলিয়াছে তাহাও স্পষ্টই দেখি। কিন্তু যে বাণী এখনও অরণ্যে রোদন মাত্র, তাহা হইতেছে ঐ আসুরী ভাবকেও অতিক্রম করিয়া চলিবার আহ্বান। কারণ, দেখিতে পাই, মানুষের মধ্যে যাঁহারা সর্বোচ্চ স্তরে, চিন্তা-জগতে যাঁহারা নূতনের আলো লইয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও অনেকস্থলে আসুরী ভাবকেই প্রচ্ছন্নভাবে প্রচার করিতেছেন। স্বাতন্ত্র্য, স্বধর্ম, স্বাধীনতার নামে তাঁহারা যে "স্ব"-কে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন, তাহা হইতেছে অসুরের স্ব—মনের স্তরে যে আত্মা প্রকট অর্থাৎ বিদ্রোহী বিজিগীষু অহমিকা।

মানুষের আসল নিজত্ব দেহেও নয়, প্রাণেও নয়, মনেও নয়—সে নিজত্ব আরও উপরে। সে তুরীয় নিজত্বে নিজত্ব বোধহয় তত বড় কথা নয়, সেখানকার ধর্ম বোধহয় আত্ম-কর্তৃত্ব ততখানি নয়, যতখানি হইতেছে একটা বৃহৎ সমগ্রত্ব, একটা অকুণ্ঠ আত্ম-সমর্পণ, একটা পরিপূর্ণ প্রণতি (বৈদিক "নমঃ")। অসুর ভাবের উপরে দেব-ভাব। এই দেব-ভাবে অসুরের সে তীব্র সঙ্কীর্ণতা, সে বিরোধের আনন্দ-নেশা, জোর করিয়া শক্তি ফলানোর উৎকট চেষ্টা নাই—তাই দেব-ভাবের মানুষকে আমরা শক্তিহীন ক্লীব বলিয়া অনেক সময় সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। কিন্তু দেব-ভাবের বিশেষত্বই এই যে এখানে স্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্ব ওপরের একটা নিবিড় মিলনের মধ্যে মনের দ্বৈত এখানে ঘুচিয়া গিয়াছে, তাই এখানকার শক্তিতে আছে একটা উদার প্রশান্ত প্রসন্ন অথচ অমোঘ সামর্থ্য। মনের অল্পতা ভূমার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, অহমিকা আপনার মাথা নুয়াইয়া দিয়াছে একটা বৃহত্তর শক্তির কাছে। ক্ষুদ্রের ব্যষ্টির যে প্রকৃত নিজত্ব, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, তাহা ক্ষুদ্র যতক্ষণ ক্ষুদ্রের মধ্যে, ব্যষ্টি যতক্ষণ ব্যষ্টির মধ্যে আবদ্ধ ততক্ষণ ফুটিয়া উঠিতে পারে না। আপনাকে হারাইয়া তবে আপনার প্রকৃত "স্ব"-কে স্বধর্মকে লাভ করা যায়—He that findeth his life shall lose it and he that loseth his life for my sake shall find it।

এইভাবে যে প্রকৃত স্বধর্ম পাইয়াছে তাহার স্বধর্মে কখন নিধন নাই, স্বধর্মে তাহার পূর্ণতা সার্থকতাই নিয়ত ফুটিয়া উঠিবে—অসুরেরই স্বধর্মে নিধন সম্ভব, দেবতার নহে। দেবতা স্বরাট্ বটে, কিন্তু সে স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত একটা পরম

সেবক-ভাবের উপরে। দেবতা-স্বরাট্, সেই জন্যই তিনি সেবক হইতেও কুণ্ঠিত নহেন, অসুর স্বরাট্ নহে বলিয়াই জোর করিয়া স্বারাজ্য ফলাইতে চায়।

আর আমরা কর্মী, আজ আমরা জ্ঞানী হইতে চাহিতেছি, কিন্তু কর্মের উৎস আমাদের দেহের ও প্রাণের "স্ব" ও জ্ঞানের উৎস আমাদের মনের "স্ব"-এর মধ্যে নিহিত, তাই আমাদের জ্ঞান কর্ম সঙ্কীর্ণ নিষ্ফলই হইয়া চলিয়াছে। কর্ম ও জ্ঞানকে একটা নূতন স্তরে উঠাইয়া, একটা দিব্য সত্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার রহস্য আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। গীতার "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" কথাটিই আমরা একান্ত করিয়া ধরিয়াছি, কিন্তু ভগবানের যে সর্বগুহ্যতমং পরমং বচঃ, সেই —সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—সেই অনন্যা পরাভক্তি, যাহা জ্ঞানকে কর্মকে সত্যসন্ধ ও শ্রেয়োমুখী করিয় রূপান্তরিত করিয়া লয়, যাহা অহঙ্কারের সঙ্গে একটা শাশ্বতং অব্যয়ং পদে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার প্রসাদ যতদিন না পাইতেছি ততদিন আমরা আমাদের যথার্থ স্বাতন্ত্র্য পাইব না, ততদিন আমাদের সকল চেষ্টা সকল সাধনা বিফল।

ভগবানকে বুঝতে হলে নিজস্ব রুচি রাখা চলবে না।

—শ্রীমা

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

২য় পর্ব—বিশ্ব পর্যটক

ষষ্ঠ সর্গ—বৃহত্তর প্রাণময় লোক এবং তাদের দেবতাবৃন্দ

(৭)

এখানেই হল ছেদ, এখানেই থেমে যায় অথবা ডুবে যায় জীবনীশক্তি ;
এই ত্রুটি দুর্বল করে দেয় যাদুকরের কলাকৌশল :
এই অভাবে আর সব কিছু দেখায় যেন ক্ষীণাঙ্গ রিক্তদেহ।
একটা অর্ধদৃষ্টি এঁকে দেয় তার কর্মাবলীর দিকবলয়ঃ
গভীরে তার স্মৃতি রয় কি ব্রতের জন্য এসেছে সে,
কিন্তু মন গিয়েছে ভুলে অথবা হৃদয় চলে প্রমাদের বশে :
প্রকৃতির অন্তহীন রেখাবলীর মাঝে ভগবান হয়েছে বিলুপ্ত।
জ্ঞানের মধ্যে সর্বজ্ঞতা ধরে দিতে,
কর্মের মধ্যে সর্বশক্তিমত্তা তুলে ধরতে,
আর আপন স্রষ্টাকে সৃষ্টি করতে এখানে, ছিল তার হৃদয়ের দম্ভ,
সমগ্র সৃষ্টিকে পূর্ণ করে দিতে পূর্ণ ভগবানকে দিয়ে।
শ্রম তার দূর-দূরান্তরের অনির্দেশ্যকে দেবে রূপান্তর
একটা পূর্ণ সিদ্ধিময় পরম-আবির্ভাবের মধ্যে,
অনির্বচনীয়কে ধরে দেবে বাক্যের মধ্যে,
এখানে নিয়ে আসবে পরাৎপর শক্তির পূর্ণ মহিমা,
স্থিরতাকে দুলিয়ে দেবে সৃষ্টির ছন্দিত তালে,
প্রশান্তির আকাশকে উদ্বাহে বেঁধে দেবে মহানন্দ-সাগরের সঙ্গে।
বহ্নি এক শাশ্বতকে ডেকে আনবে মহাকালের মধ্যে,
দেহের আনন্দকে সমান জীবন্ত করবে অন্তরাত্মার আনন্দের মত,
এই জীবনীশক্তি পৃথিবীকে তুলে ধরবে স্বর্গের সঙ্গী করে,
তার প্রয়াস জীবনধারাকে পরম পুরুষের সঙ্গে একই করে ধরবে,
ঊর্ধ্বের আনন্ত্যকে মিলিয়ে ধরবে নিম্নের অতলের সঙ্গে।

তার লোকাতীত সত্যের কর্মতৎপরতা
নীরবতাকে দেববৃন্দের কলকণ্ঠে পূর্ণ করেছে,
কিন্তু এই যে উচ্চ আরাব তার মধ্যে অদ্বৈত কণ্ঠটি হারিয়ে গিয়েছে।
তবে পূর্ণা প্রকৃতির দৃষ্টি তার কর্মাবলীর ওপারে চলে যায়।
ঊর্ধ্বে সে দেখে স্বর্গে দেবতাদের জীবন,
দেখে সে বানর হতে উঠে আসে অর্ধদেবতা—
এই তার সাধ্যের সীমা আমাদের মর্ত্য উপাদান নিয়ে।
এখানে তার চূড়ান্ত সীমানা হল অর্ধদেবতা, অর্ধপশু :
এই বৃহত্তর জীবন পৃথিবীর এবং আকাশের মাঝখানে দোদুল্যমান।
মর্মস্পর্শী এক দ্বৈধভাব তার স্বপ্নে খেলে যায় :
তার অবগুণ্ঠিত কর্মবল অজ্ঞানের জগৎকে নিয়ে চলেছে
এক আনন্দের অন্বেষণে যাকে আপন দৃঢ় মুষ্টির অধিকার হতে রেখেছে সুদূরে :
তার আলিঙ্গনে আবদ্ধ সে-আনন্দ আপন উৎসে ফিরে যেতে পারে না।
বিপুল তার শক্তি, অন্তহীন তার কর্মের বিশাল প্রবেগ,
কর্মের নিগূঢ় অর্থ পথভ্রষ্ট হয়েছে, লুপ্ত হয়েছে।
যদিও তার গুপ্ত বক্ষতলে সে বহন করে
যা কিছু জাত পৃথিবীতে তাদের বিধিবিধান তাদের যাত্রাকক্ষ
তবুও জ্ঞান তার আংশিক মনে হয়, তার উদ্দেশ্য ক্ষুদ্রকায় ;
ব্যাকুল ক্ষেত্রের উপর দিয়ে চলে যায় তার ঐশ্বর্যমণ্ডিত নিমেষের শ্রেণী।
গুরুভার এক নিশ্চেতনা চিন্তাবৃত্তিকে দেয় না উড়ে চলতে ডানা মেলে,
তার শক্তিমত্তা পোশাক-পরিচ্ছদের সম্ভারে সত্তাকে দাবিয়ে রেখেছে,
তার কর্মবেগ বন্দী করে রাখে তার অমর দৃষ্টিকে।
শক্তিময়ীর সকল প্রভুত্ব একটা সীমানার বোধে অভিভূত,
সেখানে নাই কোন নিঃসন্দেহ তৃপ্তি বা শান্তি :
তার কর্মে রয়েছে সৌন্দর্য রয়েছে গভীরতা,
অভাব সেখানে সেই জ্ঞানের অন্তরাত্মার মুক্তি এনে দেয় যে।
মুখমণ্ডলে এখন তার দেখা দিয়েছে প্রাচীন বিলীয়মান মাধুর্য শুধু,
চিন্ময়ের পক্ষে তার ক্ষিপ্র বিচিত্র বিদ্যা হারিয়েছে তার জীবন্ত স্বাদ ;
তার বিপুল অন্তরাত্মা আকাঙ্ক্ষা করে এখন প্রাণময়ী শক্তির আনন্দ অপেক্ষা
গভীরতর আনন্দ।
প্রাণময়ীর জটিল পাকচক্র হতে পুরুষবর চায় পরিত্রাণ
কিন্তু হস্তিদণ্ডের হোক বা মহিষশৃঙ্গের হোক কোন দুয়ারই
দেখে না, এমনকি অধ্যাত্মদৃষ্টির পিছনের দুয়ারটিও নয়।

সেই স্বপ্নসম আকাশ থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ নাই।
আমাদের সত্তা চিরকাল ধরে চলে যাবে মহাকালের ভিতর দিয়ে ;
মৃত্যুও সহায় নয়, লয় পেয়ে যাব বৃথা এ-আশা ;
গুপ্ত এষণা এক বাধ্য করে আমাদের নিরন্তর চলতে।
আমাদের জীবনের বিরাম শুধু সেই অনন্তের মধ্যে ;
শেষ হয় না কখনও তার, শেষ হল পরম জীবন।
মৃত্যু হল পথের একটা সুড়ঙ্গ, লক্ষ্য নয় আমাদের পথ যাত্রার ঃ
একটা প্রাচীন গভীর প্রবেগ শ্রম করে চলেছে ঃ
আমাদের অন্তরাত্মাকে টেনে নেওয়া হয়েছে একটা প্রচ্ছন্ন রজ্জুতে বেঁধে,
আমাদের চালিয়ে নেওয়া হয়েছে জন্ম হতে জন্মান্তরে, লোক হতে লোকান্তরে,
আমাদের কর্মাবলী চলে যায় শরীর পতনের পরেও
সেই পুরাতন নিরন্তর পরিক্রমায়, বিরতি নেই কোথাও তার।
নীরব শিখর কোথাও নাই যেখানে মহাকাল বিরাম গ্রহণ করে।
এ হল একটা যাদুময় প্রবাহ চলেছে যা, পৌঁছে না কোন সাগরে।
যতদূরে যায় পুরুষবর, যেদিকেই চলে সে
কর্মের চক্র সমানে ধায় তার সঙ্গে, তার সঙ্গে, তাকে ছেড়ে এগিয়ে যায় ;
সর্বদাই রয়ে যায় আরও কিছু করণীয় কর্ম তার।
কর্মের দামামা, অনুসরণের চিৎকার
ক্রমেই বেড়ে চলেছে সেই অশান্ত জগতে ;
উদ্ভ্রান্ত আরাব এক পূর্ণ করে ধরেছে মহাকালের হৃদয়।
সবই হল কলাকৌশল আর নিরন্তর চাঞ্চল্য।
শতাধিক উপায় নিরর্থক চেষ্টা করা হয়েছে বেঁচে থাকবার জন্য ঃ
একই জিনিস ধারণ করেছে সহস্ররূপ
চেষ্টা করেছে তার সুদীর্ঘ একই টানা সুর থেকে মুক্তির জন্য,
নূতন জিনিস তৈরী করেছে, অবিলম্বে তা হয়ে পড়েছে পুরাতনের মত।
বিচিত্র শোভা এক দৃষ্টিকে লুব্ধ করেছে,
নূতন মূল্য পুরাতন আখ্যানকে মার্জিত করে ধরেছে
মনকে প্রতারণা করেছে পরিবর্তনের ধারণা দিয়ে।
ভিন্ন আলেখ্য এক তবে একই পুরাতন বস্তু
দেখা দিল বিশ্বের অস্ফুট দিকপটে।
শুধু অন্যতর একটি জটিল আবাসগৃহ
জীবেদের জন্য তাদের কর্ম নিয়ে ঘটনাচক্র নিয়ে,
নগর এক—বদ্ধ জীবেরা চলাফেরা করে নিরন্তর,

সৃষ্টির বিপণি এক—সৃষ্টিকর্ত্রী তার পণ্যরাজি ধরে দেখায়
শ্রমরত মনের হৃদয়ের কাছে।
পরিক্রমা শেষ হল এক যেখান থেকে আরম্ভ করেছিল—
তাকেই বলা হয় চিরন্তন অগ্রগতি,
সিদ্ধির অজ্ঞাত পথে ক্রমোন্নতি।
শেষ পরিকল্পনা সর্বদা নিয়ে চলে পরবর্তী পরিকল্পনায় এক।
প্রতি নূতন আরম্ভ মনে হয় এই সর্বশেষ,
অপৌরুষেয় বাণী, শাস্ত্রের চূড়ান্ত চূড়া,
ঘোষণা করে সর্বকালের সর্বদুঃখের নিরসন
অথবা চিন্তাকে নিয়ে যায় ডানা মেলে তার চরম তুঙ্গস্থানে
ঘোষণা করে উচ্চকণ্ঠে পরম আবিষ্কার যেন ;
প্রতিটি সংক্ষিপ্ত ভাবনা, ভঙ্গুর গঠন এক,
প্রচার করে তার রাজত্বের অমরত্ব,
তার দাবি—তারই হল জিনিসের সর্বাঙ্গসুন্দর রূপায়ণ,
সত্যের চূড়ান্ত সূত্র, কালের হিরণ্ময় পরিণাম।
ফলতঃ কিন্তু অন্তহীন মূল্যের কিছুই লব্ধ হয়নি :
একটা জগৎ নূতন করা হয়েছে বারবার, সম্পূর্ণ কখনও নয়,
পুঞ্জীভূত করেছে অর্ধপ্রয়াস ব্যর্থপ্রয়াসের উপর,
খণ্ডকে দেখেছে শাশ্বতের পূর্ণতা রূপে।
কৃতকর্মের সমষ্টি এই যে লক্ষ্যহারা ঊর্ধ্বগতি
এখানে জীবনসত্তা মনে হয় যেন একটা ব্যর্থ অনিবার্য ঘটনা,
চিরন্তন দ্বৈতের নিরন্তর মল্লযুদ্ধ
বৈপরীত্যের সুদৃঢ় ঘন আলিঙ্গনে,
নাটিকা এক নাই পরিণাম তার, নাই ভাববৈশিষ্ট্য,
বুভুক্ষু পথচারী জীব সব গন্তব্যহীন,
অথবা, যেন শূন্য ঘনকৃষ্ণ আকাশপটের উপর লিখিত,
নাম সব জীবাত্মাদের উক্ত পুনঃপুনঃ নিরর্থক,
আশা এক বিফল হয়েছে, আলো এক কখনও জ্বলেনি,
অসম্পূর্ণ এক শক্তির কর্মধারা
বাঁধা কর্মজালে তার অস্ফুট অনন্তে প্রসারে।
শেষ নাই কোথাও, এখনও দেখা যায় না কোন :
পরাজিত নিরন্তর, জীবনকে তবু চলতে হবে কষ্টশ্রম করে ;
দেখে সে বিজয়মুকুট এক কিন্তু তার মুষ্টির বাহিরে ;

দৃষ্টি তার আবদ্ধ এই অবনত অবস্থার ওপারে।
এখনও স্পন্দিত তার বক্ষতলে আমাদেরও বক্ষতলে
একদিন যে মহিমা ছিল প্রকট কিন্তু অদৃশ্য এখন
অথবা সেখানে আমাদের কাছে আসে আহ্বান এক অপূর্ণ কোন পারান্তর হতে
সেই মহত্ত্বের এই স্খলিতগতি বিশ্ব এখনও পৌঁছে নাই যেখানে।
আমাদের মর্ত্য ইন্দ্রিয়ের পিছনে স্মৃতির মধ্যে
একটা স্বপ্ন রয়ে যায়, নিরন্তর বৃহত্তর সুখীতর আকাশ বাতাস
বয়ে চলে প্রেমে পুলকে আপ্লুত মুক্ত সব হৃদয়ের চারিদিকে,
বিস্মৃত আমাদের কাছে, লুপ্ত কালধারায় অমর তবু।
আনন্দের প্রেতছায়া প্রাণময়ীর ভূতাবিষ্ট গভীরে অনুসরণ করে গিয়ে ;
স্মৃতিমাঝে জাগে এখনও তবু তার সেই সুদূরের
হিরণ্ময় স্বস্তির আর সুখকর বাসনার রাজ্য,
সেই সৌন্দর্য আর সামর্থ্য আর তৃপ্তি ছিল যা তার আপনার
তার প্রোজ্জ্বল স্বর্গের মধুরিমায়,
তার মৃত্যুঞ্জয়ী উল্লাসের সাম্রাজ্যে
যার একদিকে ভগবানের নৈঃশব্দ্য আর একদিকে অচল অতল।
এই জ্ঞান আমরা ধরে রেখেছি আমাদের নিভৃত অংশে ;
সচকিত আমরা এক অস্ফুট রহস্যের আহ্বানে,
আমাদের সাক্ষাতে আসে গভীর অদৃশ্য সদ্বস্তু এক
বহুগুণে সত্যতর যা বর্তমান জগতের মুখমণ্ডলে প্রকটিত সত্যের চেয়ে :
আমাদের সবলে চালিয়ে নিয়েছে আমাদের বিস্মৃত আত্মসত্তা এক,
সেই চিন্ময়সত্তা আমাদের প্রচালিত করে আমাদের যা হতে হবে একদিন।
আমরা হারিয়েছি যেন আমাদের অন্তরাত্মার রাজ্য,
আমরা পিছনে চেয়ে দেখি আমাদের জন্মের এক সৌভাগ্যযোগ
এখানকার বর্তমানের এই অপূর্ণ জীবটিকে নয়,
আমাদের আশা—এজগতে অথবা দিব্যতর লোকে এক
ফিরে আমরা অর্জন করব ভগবানের নিশ্চিত আশ্রয়ে রক্ষিত
সেই যা মনের বিস্মৃতির ফলে আমরা হারিয়েছি,
আমাদের সত্তার স্বাভাবিক সুখস্বস্তি,
আমাদের হৃদয়ের পুলক যাকে বিদায় দিয়ে আমরা বরণ করেছি শোক,
দেহের হর্ষ যার পরিবর্তে অর্জন করেছি কেবল বেদনা,
আর সেই পরমানন্দ যার জন্য আমাদের মর্ত্যপ্রকৃতি এখনও আকুল
যেমন আকুল তুচ্ছ পতঙ্গ দীপ্ত জ্যোতির জন্য।

আমাদের জীবন পথযাত্রা এক চির-অলব্ধ বিজয়ের দিকে।
এই যে জীব-তরঙ্গ আনন্দের জন্য উদ্‌গ্রীব,
এই যে অতৃপ্ত সামর্থ্যরাজির উৎকণ্ঠ চাঞ্চল্য,
আর এই যে সুদূরপ্রয়াসী উন্মুখী আশারাজির দীর্ঘ শ্রেণী—
এরা তাদের প্রণতিভরা নেত্র তুলে ধরেছে সুনীল শূন্যের দিকে যার নাম স্বর্গ,
তাকিয়ে রয়েছে সেই হিরণ্ময় করকমলের জন্য যা কখনও প্রসারিত হল না,
সেই আগমনী যার অপেক্ষায় রয়েছে সকল সৃষ্টি,
শাশ্বতের সেই সৌম্য মুখমণ্ডল
একদিন যা দেখা দেবে মহাকালের কোন পথে।
তবুও আমরা বলে উঠি, বিশ্বাসকে পুনঃপুনঃ সমিদ্ধ করে,
"আহা, একদিন নিশ্চয় সে আসবে আমাদের কণ্ঠ শুনে,
একদিন সে আমাদের জীবন গড়বে নূতন করে,
একদিন সে উচ্চারণ করবে শান্তির যাদুময় মন্ত্র,
পূর্ণতায় গড়ে তুলবে বিশ্বের বাহ্য ব্যবস্থা।
একদিন সে অবতরণ করবে জীবনের মধ্যে পৃথিবীর উপরে,
ছেড়ে আসবে সনাতন দুয়ারের গোপন রহস্য,
এই জগতের মধ্যে, যে আকুল কণ্ঠে চায় তার সাহায্য,
নিয়ে আসবে চেতনার মুক্তিদাতা সত্যকে,
অন্তরাত্মার দীক্ষাদাতা আনন্দকে,
আর প্রেমের প্রসারিত-বাহু সেই সাম্যর্থকে।
একদিন সে অনাবৃত করবে তার সৌন্দর্যের উপর এই ভীতিকর অবগুণ্ঠন,
রভস ছড়িয়ে দেবে পৃথিবীর স্পন্দিত বক্ষের উপর,
মুক্ত করে ধরবে তার আলোর আনন্দের গুপ্তদেহ।"
কিন্তু এখন আমরা কষ্টশ্রম করি একটা অজ্ঞাতলক্ষ্যে পৌঁছিতে :
শেষ নাই অন্বেষণের আর জন্মের,
শেষ নাই মৃত্যুর আর প্রত্যাবর্তনের ;
যে-জীবন সিদ্ধি লাভ করেছে সে চায় বৃহত্তর সিদ্ধি,
মৃত্যুবশ ব্যর্থ যে জীবন তাকে আবার বেঁচে উঠতে হবে ;
যে অবধি আপনাকে সে না লাভ করে সে অবধি তার বিরতি নাই।
সে সবই করতে হবে জীবন মৃত্যুর সৃষ্টি যার জন্য।
কিন্তু কে বলবে এর পরেই রয়েছে বিশ্রান্তি ?
অথবা বিশ্রাম এবং কর্ম একই বস্তু
ভগবানের পরম আনন্দময় বক্ষের গভীর অতলে।

সেই সমুচ্চ স্তরে যেখানে অজ্ঞান আর নাই
সেখানে প্রতিটি গতিধারা হল শান্তির পুলকের তরঙ্গ,
বিরাম হল ভগবানের নিশ্চল সৃষ্টিশক্তি,
কর্ম হল অনন্তের একটি বুদ্বুদ
আর জন্ম হল শাশ্বতের অঙ্গভঙ্গি।
রূপান্তরের সূর্যের উদয় এখনও হতে পাবে,
রাত্রি খুলে ধরতে পারে তার নিভৃত অলৌকিক আলোক ;
এই যে আত্মবিলয় আত্মপীড়নের দ্বন্দ্ব
পরিবর্তিত হতে পারে একটা স্বয়ংপ্রভ রহস্যে,
এই যে বিশৃঙ্খল অর্থশূন্যতা, পরিণত হতে পারে রভসের অলৌকিক সৃষ্টিরূপে।
তখন ভগবান গোচর হতে পারে এখানেই, এখানেই, এখানে রূপধারণ করতে পারে ;
ব্যক্ত হতে পারে অধ্যাত্মের আপন স্বরূপ ;
প্রাণশক্তি তখন উন্মুক্ত করবে তার সত্যকার অমর মুখমণ্ডল।
তবে এখন তার নিয়তি হল অন্তহীন কষ্টশ্রম :
ঘটনাচক্রের পুনরাবর্তনের ধারায়
জীবন, মৃত্যু দেখায় যেন স্পন্দিত বিন্দুমালা ;
সেই সনাতন জিজ্ঞাসা-চিহ্ন প্রত্যেক সমাপ্ত পৃষ্ঠার অঙ্কে অঙ্কিত,
তার প্রচেষ্টার ইতিহাসের প্রত্যেকটি গ্রন্থেব শেষে।
একটা খঞ্জ ইতি যুগ-যুগান্তর পার হয়ে এখনও চলেছে তার যাত্রাপথে,
সঙ্গে রয়েছে তার এক চিরন্তন নেতি।
সবই মনে হয় ব্যর্থ কিন্তু শেষ নেই লীলার।
নিস্পৃহ ঘুরে চলেছে বিশ্বচক্রটি আবর্তে আবর্তে,
জীবনে খোলা পথ নাই কোথাও, মৃত্যু নিয়ে আসে না মুক্তি।
আপনার মধ্যে আপনি বন্দী জীব বেঁচে রয়,
ধরে রাখে তার ব্যর্থ অমরত্ব ;
বিলুপ্তি তাকে দেওয়া হয়নি, একমাত্র মুক্তির উপায় যা।
দেবতাদের ভ্রান্তি এক সৃষ্টি করেছে জগৎ।
অথবা উদাসীন শাশ্বত চেয়ে রয় মহাকালস্রোতের দিকে।

[ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত]

অনুবাদ : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

মায়ের ঘরোয়া কথা

সোমবার, ৭.১২.৫৩

কথা উঠল, স্কুলের নতুন বছরের শ্রেণী বিভাগের সমস্যা নিয়ে।

পবিত্র বলল, আশ্রমের গেটের ঠিক উল্টো দিকে, "পুরানো বেকারী"র ঘরগুলিকে ভেঙে গড়ে কিছু বদলে, যে নতুন তৈরী ঘরকটি হয়েছে, সেগুলি কারা অধিকার করবে?

মা বললেন, ওগুলি দাও শিশু বিভাগের জন্যে। আবার সমস্যা। কে বা কারা অধিকার করবে? জয়ন্তী ভাই, প্রাণ ভাই, শ্রীমতী "নভী" ও শ্রীমতী "পভিতা"। এই চারজন candidates. শিক্ষক।

মা বললেন, জয়ন্তী ভাইয়ের চাই বাগানের পাশে ক্লাশ। নইলে শিশুদের শিক্ষার অসুবিধা হবে। তাই ওদের তিনজনের ক্লাশ ওখানে হোক।

* * *

একজন মাকে জিজ্ঞাসা করল, অ্যাটর্নির কাছ থেকে তার প্রাপ্য ১৪০০ টাকা আসার কথা ছিল মায়ের কাছে, সেটা এসেছে কিনা। মা বললেন, একটি পয়সাও আসেনি। সে তখন মাকে দেড়-বছর আগের লেখা উক্ত অ্যাটর্নির চিঠি দেখাল। তাতে প্রতিশ্রুতি রয়েছে ছ-মাসের মধ্যেই টাকাটি পাওয়া যাবে এবং সোজা মায়ের নামে পাঠাবে। এখন উক্ত অ্যাটর্নির এক বন্ধু আশ্রমে কদিন আছেন, শীঘ্রই ফিরবেন। মা যদি অনুমোদন করেন, সেই ভদ্রলোকটিকে খোঁজ নিয়ে জানাতে অনুরোধ করা যেতে পারে।

মা বললেন, অবশ্যই তা পার। তবে তোমার উক্ত অ্যাটর্নিটি বড় সুবিধার লোক নয়। অর্থের প্রতি তার বেজায় লোভ। তাই ছ-মাসের প্রতিশ্রুতি যখন দেড়-বছরেও পূর্ণ হল না, এবং আমাকেই সে টাকা পাঠাবে লিখেছিল, তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পার…। (অনেক কাল পরের খবর। লোকটি মাকে টাকা পাঠায়নি, এবং মৃত্যুর সময় সে অনেক কষ্ট পেয়েছিল)।

* * *

খানিকবাদে মা এলেন পবিত্রর ঘরে। বসলেন তাঁর চেয়ারটিতে। একজন তাঁর পা রাখবার ছোট পাদানিটি ঠিক করে সরিয়ে দিতে গেল। মা বললেন, কাজ নেই, ঠিক আছে।…একটি নতুন Recording machine এসেছে; এতদিন পুরনো Wire-recorder ব্যবহার করা হচ্ছিল। এই নতুন Tape-recorder-টি দেখবার জন্যে মাকে ডাকা হয়েছে। বিশ্বনাথের দিকে (এঞ্জিনীয়ার, এই সব ব্যাপারের) চেয়ে মা বললেন:

"You do not seem to be very satisfied! The machine is not as good as you expected?"

সে বলল, হ্যাঁ মা, ঠিক তাই। তেমন ভাল আওয়াজ আসছে না। তারপর machine-টি চালিয়ে মাকে শোনানো হল।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের পুরনো Wire-recorder-এর চেয়ে ভাল নয় কি? এর আয়তনটিও পুরনোটির চেয়ে বেশ ছোট মনে হচ্ছে। বুধবারের ক্লাশে এটি ব্যবহার করে দেখতে পার।

সবাই উৎসুক ছিল. মা কিছু বলবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তা রেকর্ড করে তাঁকে শোনানো হবে, কিন্তু সবাইকে হতাশ করে মা বললেন, না, আমি কিছু বলব না।

* * *

মঙ্গলবার, ৮.১২.৫৩

মা ব্যালকনিতে এলেন প্রায় ১০-৪৫ মিনিটে নিচে নামার দিন।

মা বললেন, ক্রমশঃ এত দেরী হয়ে যাচ্ছে! সত্যিই এ বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ৯ তারিখের পর থেকে তোমাদের স্কুলের নতুন বছর। নিয়ম করে দাও। কেউ যেন আমার জন্য অপেক্ষা না করে। সবাই সোজা স্কুলে চলে যাবে। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে, দেরী করা বা কামাই করা চলবে না আর। জিজ্ঞাসা করলেন আবার, কখন থেকে স্কুলের এবং Higher Course-এর ক্লাশ আরম্ভ হয়?

পবিত্র বলল, সাধারণতঃ আটটা থেকে, আর যে যে দিন week days-এ তুমি নিচে নামো, অর্থাৎ মঙ্গল আর শুক্রবার, আরম্ভ হয় সাতটা-পঁয়তাল্লিশে।

মা বললেন, ওসব করার দরকার নেই। ওতে আর কি এমন সময় বাঁচে? আর আমি তো চাইছি না যে স্কুলের কাজ আটকে রাখা হোক। আমি যখন নামব, তখন স্কুলে খবর দেওয়া হবে, এবং শিক্ষকদের মতে যদি সম্ভব হয় তো ছেলেরা আসবে, কিন্তু যদি সম্ভব না হয়, যদি কাজের ক্ষতি হয়, তাহলে আসবে না…

রোজ সকালে সিঁড়িতে এত লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে যে, আমি কিছুতেই যথাসময়ে সব কাজে সময় দিতে পারি না। আমি যদি একা থাকি, তাহলে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে প্রত্যেকটি কাজ আমার হয়ে চলে, বরং দু-চার মিনিট এগিয়েই থাকি। কিন্তু এত বেশী দর্শকদের ভিড় লেগে থাকার দরুন আমার দেরী, মিনিট ধরে হচ্ছে না, ঘণ্টা ধরে হয়ে চলেছে। এটা সত্যিই যেন যা-খুশি-তাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। C'est fantastique! মা বললেন, আজও আমি আধঘণ্টা আগে সকালে উঠেছি। কিন্তু এত লোকের দরুন দেরী ঠিক আমার হবেই দিনের বেলায়। আমি যত পরেই শুতে যাই না কেন, ঘুমবার আগে, ঠিক যে সময়ে উঠব বলে শুই, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সেই সময়েই উঠি। এ একেবারে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে বহুকাল ধরে। তাই আমার নিজের দিক থেকে দেরী হবার কোনই কারণ নেই।

* * *

বুধবার, ৯.১২.৫৩

আজ ৯ই ডিসেম্বর। ঠিক তিন বছর আগে এই দিনে, শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য দেহটিকে সমাধিস্থ করা হয়। এই বিশেষ দিনের স্মৃতিকে জীবন্ত রাখবার জন্যে ব্যালকনির পরে আজও আধঘণ্টা ধ্যান হল, নিচের উঠনে। মা বসলেন, ঠিক সিঁড়ির নিচে, আর সমাধিকে ঘিরে আশে পাশে Play-ground Groups এবং আর সকলে বসল (অর্থাৎ Groups not in uniform)।

ব্যালকনির আগে, মা আমাদের প্রণাম গ্রহণ করলেন। পবিত্র মাকে দেখাল একটি বিজ্ঞপ্তি: Higher Course-এর পঠন-পাঠনের বিষয়। যারা ছাত্র নয়, শ্রোতা মাত্র, বয়সে বড়র দল, তাদের ঠিক ছাত্রদের মতন দেখা হবে না। শিক্ষকদেরও এই কথা মনে রেখে চলতে হবে। যাতে বড়দের দরুন ছোটরা কোন রকমে অবহেলিত না হয়। বিজ্ঞপ্তিটি ইংরেজীতে পবিত্রর রচনা।

সে নিজেই প্রস্তাব করল মায়ের কাছে, এটি নলিনীকে দেখাবে? কারণ ইংরেজীর ভুল নিশ্চয়ই কিছু আছে।

মা হেসে তার প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন, "ভুল নয়, তবে খুব পরিষ্কার হয়নি, clumsy হয়ে গেছে।"

* * *

শুক্রবার, ১১.১২.৫৩

মাকে একজন শিক্ষক বলল, স্কুল তো খুলেছে, নতুন ক্লাশও শুরু হয়েছে। কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় ও অনিচ্ছা জমে রয়েছে।

মা শুনে কৌতুক করে বললেন, ভয়? কিসের ভয়?

সে বলল, ফরাসীতে পড়াতে হবে, বিজ্ঞানের বইটি, চমৎকার বই, কিন্তু ওরা বুঝবে না। তাই উৎসাহ কমে যাচ্ছে।

মা কথাটি উল্টে তার ঘাড়ে চাপিয়ে বললেন, ওঃ, ওরা যা বলবে ফরাসীতে তা তুমি বুঝতে পারবে না। তাই ভয়…? (সবাই কৌতুকটি উপভোগ করে হাসতে লাগল। সেও হেসে তার বক্তব্যটি পরিষ্কার করে বলল।) তখন মা জিজ্ঞাসা করলেন, কতজন ছাত্র? কতজন বুঝতে পারে?

সে বলল, আঠারো জন ছাত্র। অর্ধেকই বুঝতে পারে না। তাই ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দীতে বুঝিয়ে দিতে হয়।

মা তাতে আপত্তির কোন ভঙ্গি দেখালেন না।

* * *

শনিবার, ১২.১১.৫৩

ভীতু শিক্ষকটি মাকে বলল, সত্যিই ভয় কেটে গেছে, তোমারই করুণায়। ছাত্রগুলিও ভাল এবং শিখতে উৎসাহী। মা যেন আশ্বস্ত হলেন। তারিফ করলেন।

[জনৈক সাধকের ডাইরি থেকে]

যোগ-জীবন

প্রশ্নোত্তরে শ্রীমা

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫১

শ্রীমা পড়ছেন ১৯২৯ সালের 'কনভারশেসন্স-'এর প্রথমটি :

যোগে তুমি কি চাও? শক্তি? শান্তি ও নীরবতায় পৌঁছাতে চাও? চাও কি মানুষের সেবার জন্য? এ উদ্দেশ্যগুলির কোনটাই বলে না যে তুমি পথের জন্য উপযুক্ত।

শ্রীমা বললেন :

আসল গোলমালটি হল তোমরা কথার সাহায্যে চিন্তা কর, কিন্তু সেসব কথাগুলি যে অন্তঃসারশূন্য, বেশীরভাগ সময়ই সেগুলি যে শুধু কথাই—তোমরা বল ভগবানের কথা, বিরাটের কথা, যোগের কথা, কত কথা বল, কিন্তু সব কথাগুলি তোমাদের মাথায় কিছু কি মূর্ত করে তোলে? একটি চিন্তা, কোন সংবেদন, একটি স্বচ্ছ ধারণা, একটি অভিজ্ঞতা? অথবা সেগুলি শুধু কথাই?

বলা হয় "যোগ হল জীবনের পরম লক্ষ্য," কিন্তু এই লক্ষ্য থেকে তুমি কি চাও? কেউ কেউ বলবে এ হল নিজেকে জানা, এ হল নিজস্ব ও ব্যক্তিগত দিক। কথাটাকে যদি আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে এর মানে হবে নিজের সত্তার সত্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া; কেন তোমার জন্ম? কি তোমার করণীয়? আরও যদি খানিকটা এগিয়ে যাও, তাহলে তুমি সচেতন হবে অন্য মানুষের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি সে সম্বন্ধে, আরও অল্প একটু এগুলেই তুমি হয়তো জানতে চাইবে এই জগতে মানব জাতির ভূমিকা কি, উদ্দেশ্য কি? তাছাড়া, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ পৃথিবীর অবস্থা কি, এ জগৎ কি, এর লক্ষ্য কি, ভূমিকা কি? এই ভাবে তুমি এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাবে এবং শেষে সমস্যাটি সমগ্রভাবে দেখতে পাবে। কথার পরের অভিজ্ঞতাটিকে তোমায় দেখতে হবে। এখানে আমরা বলি "যোগ" অন্যখানে কোন একজন হয়তো অন্য-ভাবে বলবে; কেউ হয়তো বলবে, "আমি আমার কারণ খুঁজছি" বা আরো কিছু। যাদের টান ধর্মের দিকে তারা বলবে, "আমি ভগবানের উপস্থিতি পেতে চাই"। অনেক ভাবে এই একই তথ্য বলা যায়, কিন্তু তথ্যটিই হল আসল; এটি তোমায় অনুভব করতে হবে মাথায়, হৃদয়ে, সর্বত্র। এটি মূর্ত করে তুলতে হবে, প্রাণবন্ত করতে হবে, নইলে চলতে পারবে না। তোমায় কথার বাইরে আসতে হবে, কাজে নামতে হবে—যেতে হবে অভিজ্ঞতায়, ঢুকতে হবে জীবনের মধ্যে।

একটি শিশুর দিকে ফিরলেন শ্রীমা—

তুমি কি যোগ করতে চাও?

হ্যাঁ মা।

কেন তুমি যোগ করতে চাও?

ভগবানের উপস্থিতি বুঝতে চাই?

আর তুমি?

ভগবানকে পাবার জন্য, এবং সেইজন্য নিজেকে সম্পূর্ণ করতে হবে।

আর তুমি, যোগে তোমায় কি আকর্ষণ করে?

আমি যে নিজেকে জানতে পারি!

আর তুমি?

আন্তর সত্যের আলোয় কাজ করার জন্য।

আর তুমি, তুমি কি যোগ কর?

কখনো-সখনো।

তুমি সত্যবাদী, কিন্তু কখনো কখনো কেন?

আর একটি শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীমা—

যোগ কি এ সম্বন্ধে তুমি কি কিছু জান?

আমার মনে হয় এটি একটি পথ, যে পথ দিয়ে...

পথের শেষে কি আছে বল তো?

ভগবানের অবিচল উপস্থিতি।

আর একটি শিশুর দিকে ফিরলেন শ্রীমা, বললেন,

যোগে কি তোমায় সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে?

আমি জানি না যোগ কি। তোমার উপর একাগ্র হওয়াই কি?

এটি একটি ভাল প্রতীক।

যাই হোক, তবু ভাল কেউ বলনি যে যোগ চাও শক্তি পাবার জন্য। এমন অনেক দেশ আছে, আছে মানুষ যারা অস্পষ্টভাবে জানে যোগ বলে কিছু আছে, আর তারা আরম্ভ করে এই ধারণা নিয়ে যে তারা অন্যদের থেকে উন্নত হবে, অন্যদের থেকে বেশী শক্তি হবে তাদের যার ফলে অন্যদের দাবিয়ে রাখতে পারবে—এই হল সব থেকে নিকৃষ্ট কারণ, চরম স্বার্থপরতা যা আনে চরম ক্ষতিকর ফলাফল। অন্যরা যারা বেশী উদ্বেগময়, অশান্তিপূর্ণ যাদের জীবন, যাদের আছে হয়রানি, দুঃখ, অনেক দুশ্চিন্তা, তারা বলে, "আমি এমন কিছু খুঁজে পাব, যা আমায় দেবে শান্তি স্থৈর্য, আর পাব সামান্য বিশ্রাম"। অমনি তারা যোগের পথে ছোটে, ভাবে সুখী হবে, সন্তুষ্ট হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্পূর্ণভাবে তা ঠিক নয়। তুমি যখন এই সব কারণের জন্য যোগ আরম্ভ কর, পথে অনেক বড বাধার সম্মুখীন হতে বাধ্য। এছাড়া মানুষের চোখের সামনে আর একটি নৈতিক উৎকর্ষ আছে: "লোকহিতৈষণা", "মানবজাতির প্রতি ভালবাসা", তাই কতলোক বলে, "মানুষের সেবায় লাগব বলে যোগ করব, দুঃখীকে করব সুখী, পৃথিবীটিকে এমনভাবে গুছিয়ে তুলব যাতে সকলের জন্য সুখময় হয়"।

আমি বলি এই তো যথেষ্ট নয়—এ যে খারাপ তা আমি বলছি না, যদিও আমি এক বৃদ্ধ নেপথ্যতত্ত্ববিদকে রসিকতা করে বলতে শুনেছি: "পৃথিবীতে দুর্দশা থাকবে না এমন সময় সহজে আসবে না কারণ অনেক বেশী সংখ্যক লোক আছে যারা দুর্দশায় সুখে থাকে।"

যদিও এটা রসিকতা করেই বলা তবু একেবারে মিথ্যা নয়। যদি সান্ত্বনা দেবার মত কোন যন্ত্রণাই না থাকল তাহলে যে লোকহিতৈষীদের থাকারই কোন কারণ থাকবে না—সে যে নিজেকে নিয়ে বড় খুশি, তার কত বড় ধারণা যে সে স্বার্থপর নয়। আমি এমন লোক জানতাম যারা পৃথিবীতে দুঃখ যন্ত্রনা না থাকলে বড়ই অসুখী হ'ত। আর যন্ত্রণার উপসম যদি করতে না হয়, তাহলে তাদের করার আর কি থাকল, কি কাজ তাদের রইল, কোথায় থাকবে তাদের মহিমা? কেমন করে তারা লোকেদের দেখাবে, "আমরা স্বার্থপর নই!" আর কেমন করে বলবে যে তারা কত উদার কত দয়ালু?

শ্রীমা আবার পড়তে শুরু করলেন,

"তুমি কি যোগ চাও ভগবানের জন্য? ··তাই যদি হয় তাহলেই বলা যেতে পারে যে তুমি পথের জন্য তৈরী। এটাই প্রথম প্রয়োজন—ভগবানের জন্য আস্পৃহা।"

আস্পৃহার প্রথম গতি হল: তোমার মধ্যে একটি অস্পষ্ট সংবেদন উঠবে যে এই জগতের পিছনে এমন কিছু আছে যা জানার প্রয়োজন (তা তুমি এখনো জান না): ঐ একটি মাত্র জিনিস যার জন্য বাঁচার মূল্য আছে, যা তোমাকে সত্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারে; এমন কিছু যার উপর এই জগৎ সংসার ভর করে আছে কিন্তু যা জগতের উপর নির্ভর করে নেই, যা এখনো তোমার উপলব্ধির নাগাল এড়িয়ে চলছে অথচ তুমি বুঝছ সব কিছুর পিছনে রয়েছে সেটিই।···আমি বলছি সংখ্যাধিক অংশের কথা, অনেক বেশী লোকে এই সংবেদনের ছোঁয়া পায়, কিন্তু, এই হল আস্পৃহার আরম্ভ - তাকে জানা, নিরন্তর অসাধুতার মধ্যে বাস না করা যেখানে সব কিছু বিকৃত আর কৃত্রিম, এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যার জন্য বাঁচার মূল্য আছে; সে হবে কিছুটা মনোরম।

শ্রীমা আবার পডলেন:

"এরপর যা তোমায় করতে হবে তা হল, এই আস্পৃহাটিকে লালন করা, তাকে সদা-তৎপর, জাগ্রত আর জীবন্ত রাখার জন্য···"

শুধু কখনো-সখনো এ কথা না বলে, "ও হ্যাঁ। আমি ভগবানকে খোঁজার কথা ভাবছি," আর ঠিক যখন অপ্রিয় কিছু ঘটে, যখন তুমি তিতিবিরক্ত, কারণ তখন তুমি ক্লান্ত—সত্যি এমন ভুরি ভুরি তুচ্ছ কারণ থাকে—যখন তোমার

মনে পড়ে যোগ বলে কিছু আছে, ভগবান বলে কিছু একটা আছে, যাঁকে জানা দরকার কারণ তিনিই জীবনের বৈচিত্র্য-হীনতা দূর করতে পারেন। শ্রীমা আবার পড়ছেন:

"...আর তার জন্য যা দরকার তা হল একাগ্রতা ভগবানের উপর একাগ্রতা, তাঁর ইচ্ছা ও লক্ষ্যের কাছে পূর্ণ ও চরম উৎসর্গের জন্য।"

এই হল দ্বিতীয় ধাপ। তার মানে তুমি ভগবানকে চাইতে শুরু করছ আর সেই চাওয়াতেই বাঁচবে বলে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জেন যে এ জিনিস এত দুর্মূল্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে তোমার সমস্ত জীবনও তা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। তাহলে, প্রথম গতি হল নিজেকে দেওয়া; নিজেকে বল: "আমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য আমি আর নিজের হয়ে থাকতে চাই না, আমি সেই পরমাশ্চর্য ভগবানের হয়ে যেতে চাই, যাকে আমি খুঁজে বার করব, যাঁকে জানব, যাঁর মধ্যে বাঁচব আর তাঁর জন্যই আমার আস্পৃহা।"

আবার পড়ছেন শ্রীমা: "হৃদয়ে একাগ্র হও। তার ভিতরে প্রবেশ কর; যাও অন্তরে, গভীরে, দূরে, যত দূরে যেতে পার তুমি। জড়ো কর তোমার চেতনার সব তন্তুগুলি যেগুলি বাইরে ছড়িয়ে আছে, পাকিয়ে ধর, তারপর ঝাঁপ দাও ডুব দাও তোমার অন্তর সত্তার নীরবতায়। আমি অবশ্য যে হৃদয়ের কথা বলছি তা দেহের অঙ্গ হৃৎপিণ্ড নয়, তা হল মনস্তাত্ত্বিক, সত্তার চৈত্যপুরুষের কেন্দ্র।

শ্রীমা এবার গেলেন 'কনভারশেসন্স'-এর দ্বিতীয় প্রশ্নে:

"যোগের জন্য তৈরী হতে হলে কি করা উচিত?"

যখন একজন এই প্রশ্নটি করেছিল, শ্রীমা বললেন, আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম, সর্বপ্রথম সচেতন হও। সে সচেতন হবার চেষ্টা করল। তারপর কয়েক মাস বাদে ফিরে এসে আমায় বলেল: "কি যে উপহার আমায় তুমি দিয়েছ! আগে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশায় মনে হ'ত তারা সবাই ভাল। আমার প্রতি তাদের মনোভাব ছিল মধুর, আমার সঙ্গে তারা সুন্দর ব্যবহার করত, আর এখন, সচেতন হবার পর থেকে, আমি এখন যত রাজ্যের জিনিস দেখি নিজের মধ্যে সেগুলি তেমন শোভন নয়, আর সেই সঙ্গে অন্যদের মধ্যেও যা দেখি তা একেবারেই সুন্দর নয়।" আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম: খুবই সম্ভব! যদি ঝঞ্ঝাট পোয়াতে না চাও তাহলে তোমার অজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে না আসাই ঠিক।

প্রথম সিঁড়ি হল তাহলে খুঁজে বার করা যে একজন সত্য দেখতে এবং জানতে চায়, না, সে সুখে স্বচ্ছন্দে নিজের অজ্ঞানতায় থেকে যেতে চায়?*

অনুবাদ: **অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়**

* *Questions & Answers—1950-51*-এর পৃ, ৫৮-৬০

আদর্শ মানব ঐক্য

শ্রীঅরবিন্দ

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ (১)

যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজন

সামরিক প্রয়োজন, নেশনগুলির মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের হাতে—যথা বিশ্বরাষ্ট্র অথবা বিশ্বসমবায় কিংবা বিশ্বশান্তি সংস্থা—সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তুলে নিয়ে যুদ্ধ নিবারণ করবার আবশ্যকতা এইসব পরিণামে মানবজাতিকে প্রত্যক্ষভাবে কোন্ এক ধরনের আন্তর্জাতিক ঐক্যস্থাপনের দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু এদের পিছনে রয়েছে আর একটি প্রয়োজন, আধুনিক মনের উপর যার ক্রিয়া প্রবল, সেটি হল শিল্প ও বাণিজ্য অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভর হতে সঞ্জাত। বাণিজ্যতন্ত্র আধুনিক সামাজিক ব্যবস্থার একটি নূতন অঙ্গ; প্রায় বলা যায় এটি আধুনিক সমাজের সর্বাঙ্গ। সু-সংগঠিত গোষ্ঠী জীবনে তার অর্থনৈতিক অংশটি সর্বদাই প্রধান—এমনকি মূল অংশ বিশেষ। কিন্তু পূর্বে এটি ছিল অবশ্য সর্বদাই, শুধু আদি প্রয়োজন, মানুষের চিন্তা-ভাবনা তা অধিকার করে রাখত না, সমাজ জীবনের সমগ্র সুরই এতে বাঁধা থাকত না, শীর্ষস্থান পেত না—স্পষ্টই স্বীকার করা হ'ত যে সে রয়েছে সমাজ ব্যবস্থার মূল শিকড় হিসাবে। প্রাচীন মানুষ গোষ্ঠী হিসাবে প্রধানতঃ ছিল একটা রাজনৈতিক সত্তা—আরিস্টটলের অর্থ অনুসারে—যে মুহূর্ত থেকে সে ত্যাগ করেছে তার আদি সাধনা ধর্মকে, ধর্ম সাধনার সঙ্গে সে যোগ করেছে—যেখানেই সে লাভ করেছে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, চিন্তার সাধনা, শিল্পের সাধনা এবং সংস্কৃতির সাধনা। সমাজের আর্থিক প্রেরণা সব পরিপূর্ণ হ'ত একটা যান্ত্রিক প্রয়োজনের মত, প্রাণ স্তরের একটা প্রবল বাসনার বশে যতখানি ততখানি মনের চিন্তার চালনায় নয়। অধিকন্তু এক বাহ্যিক দিক দিয়ে ছাড়া সমাজকে একটি অর্থনৈতিক আধাররূপে পর্যালোচনা করা হ'ত না। অর্থনীতিক মানুষকে সম্মানের চোখে দেখা হলেও সমাজে তার আসন অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে ছিল; সে ছিল শুধু তৃতীয় বর্ণ বা শ্রেণী—বৈশ্য; নেতৃত্ব ছিল বুদ্ধিনীতিক ও রাজনীতিক শ্রেণীদের হাতে—ব্রাহ্মণ, বুদ্ধিজীবী, বিদ্বান, দার্শনিক, পুরোহিত; তারপর ক্ষত্রিয় শাসক এবং যোদ্ধা। তাদের চিন্তা ও কর্মধারাই সমাজের জীবনছন্দ নির্ধারণ করত, নিয়ন্ত্রণ করত, তার সচেতন গতি ও ক্রিয়াকে, তার সকল প্রেরণাকে প্রবলভাবে রঞ্জিত করত।

বাণিজ্যগত স্বার্থ অবশ্য রাষ্ট্র সকলের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের সঙ্গে আর যুদ্ধ এবং শান্তির প্রেরণার সঙ্গে জড়িত ছিল। তবে তাও এসে যেত বন্ধুত্বের বা শত্রুতার ক্ষেত্রে কেবল গৌণ বা পরোক্ষ প্ররোচক হিসাবে; শান্তি, মিতালি বা সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ এবং সজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত কারণ সকলের মধ্যে সচরাচর পরিগণিত হয় না। রাজনীতিক চেতনা, রাজনীতিক লক্ষ্যই ছিল সর্বপ্রধান; ধন-সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি মুখ্যতঃ বিবেচনা করা হ'ত একটা উপায় হিসাবে যাতে রাজনীতিক ক্ষমতা আর মহত্ত্ব আর ঐশ্বর্য রাষ্ট্রের স্বাধিকারের মধ্যে সংগৃহীত হয়, সে জিনিস স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না, বা সর্বপ্রথম বিবেচ্যও ছিল না।

এখন সব কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক সামাজিক পরিণতির বৈশিষ্ট্য হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ধর্মসংস্থা (church), সামরিক আভিজাত্য আর শিক্ষা ও সংস্কৃতির আভিজাত্যের

অবনতি এবং ব্যবসায়ী শিল্পগোষ্ঠী বৈশ্য ও শূদ্র, ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতালাভ ও প্রাধান্য। সকলে মিলে এরা গ্রাস করেছে অথবা দূর করে দিয়েছে বিপক্ষদের। এরা এমন সব কিছু নিরঙ্কুশভাবে অধিগত করবার অভিপ্রায়ে ভ্রাতৃবধে লিপ্ত যাতে সমাজ-চেতনার অধোমুখী গতিটি সম্পূর্ণ হয়—উদ্দেশ্য যাতে শ্রমিকের পূর্ণ জয় হয় আর তাকে শীর্ষ-স্থান এবং সর্বোত্তম মর্যাদা দিয়ে সকল সামাজিক আদর্শের পুনর্গঠন হয়; এই সংজ্ঞাটির মূল্য দিয়েই আর সকলের মূল্য নির্ণীত হবে; ভবিতব্যের মনে হয় এই যেন সুস্পষ্ট বিধিলিপি। বর্তমানে অবশ্য বৈশ্যদেরই প্রাধান্য চলেছে এবং জগৎকে তারা যেভাবে চিহ্নিত করেছে তা হল ব্যবসা-তন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক মানুষের প্রাধান্য, ব্যবসাগত মূল্যের অথবা যে মূল্য নির্ভর করে উপযোগিতা, স্থূল কার্যকারিতা এবং উৎপাদন যোগ্যতার উপর মানবজীবনে সকল জিনিসের সম্বন্ধে এই তত্ত্ব বিশ্বব্যাপক করে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে জ্ঞানান্বেষণ, চিন্তাবৃত্তি, বিজ্ঞান, কলাকাব্য এবং ধর্ম সব কিছুর ক্ষেত্রে জীবনে অর্থনৈতিক বিবেচনাই আর সকলকে স্থানচ্যুত করেছে।[১]

জীবনধারা, তার শিক্ষার এবং তার যা কিছু উৎপাদন ক্ষমতা সম্বন্ধে যে আধুনিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তাতে তাদের মূল্য হল প্রধানতঃ অলঙ্কার হিসাবে; তারা ব্যয়-সাধ্য এবং লোভনীয় বিলাস-সামগ্রী কিন্তু অপরিহার্য প্রয়োজনের নয়। এই মতে ধর্ম হল মানুষীমনের উপসৃষ্টি, তার প্রয়োজন একান্ত সীমাবদ্ধ, অবশ্য যদি তা সত্যসত্যই কেবল অপচয় বা প্রতিবন্ধক স্বরূপ না হয়। শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করা হয় বটে তবে তার উদ্দেশ্য ও গঠন যতখানি বৈজ্ঞানিক, বাস্তবধর্মী ও অর্থনৈতিক ততখানি সাংস্কৃতিক নয়; তার মুখ্য হল মানুষকে ব্যষ্টি হিসাবে কর্মকুশলী করে তোলা যাতে সে অর্থনীতিক সংগঠনের মধ্যে নিজস্ব স্থান গ্রহণ করতে পারে। বিজ্ঞানকে অবশ্য খুবই উচ্চস্থান দেওয়া হয় তবে তা প্রকৃতির গুপ্ত-রহস্য সব ব্যক্ত করে জ্ঞানের ক্রম-বৃদ্ধি সাধনের জন্য নয়; পরন্তু তাকে যন্ত্রপাতি নির্মাণের এবং সমাজের আর্থিক সম্পদ ও সংগঠন সামর্থ্য বৃদ্ধি করবার কাজে লাগান হয়। সমাজের চিন্তাশক্তি, প্রায় তার আত্মিক শক্তি যদি এখনও আত্মার মত একটা অশরীরী অনুৎপাদক বস্তু কিছু থাকে তা ধর্মে নয়, সাহিত্যে নয়, যদিও প্রথমটি কোনরকমে একটা ক্ষীণ জীবনধারা টেনে নিয়ে চলেছে আর শেষেরটি প্রচুর ও বিপুল উৎপাদনশীল তবে তা দৈনিক সংবাদপত্রে—প্রধানতঃ ব্যবসায়ীদের যন্ত্র হিসাবে; এবং তাও নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনীতিক ও ব্যবসায়িক অনুপ্রেরণায় তবে তা সাহিত্য হিসাবে সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ বাহনের মত নয়। রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত ক্রমেই অধিক মাত্রায় একটা যন্ত্র হয়ে উঠেছে শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা একটা সমাজ গড়ে তোলবার জন্য—দ্বিধাভিন্ন সেই শাসনব্যবস্থা একদিকে তার কাজ মধ্যবিত্ত ধনিক গোষ্ঠীর সেবা আর একদিকে তার কাজ হল যে অর্থনৈতিক সমাজবাদের প্রবাহ চলে আসছে নিজের অজ্ঞাতসারেই তার বাহক হয়ে পড়া। স্বাধীন চিন্তা ও সংস্কৃতি বাণিজ্যবাদের এই ক্রমবর্ধমান বিপুল কলেবরের উপরস্থ ভাসমান বস্তু মাত্র—তাকে প্রভাবান্বিত ও পরিমার্জিত করে ধরতে চায় কিন্তু নিজেরাই প্রভাবান্বিত, রঞ্জিত ও অবদমিত হয় মানবজীবনের মোহসর্বস্ব অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা। [ক্রমশ]

১। লক্ষ্য করা যায় যে ব্যবসা-বাণিজ্যবাদের প্রাধান্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধর্ম হয়ে উঠেছিল, এখন তা অধিগত হয়েছে এবং বৃহত্তর পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে নূতন সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীদের মধ্যে, শ্রমিক শ্রেণীর উপর যদিও তা প্রতিষ্ঠিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনীতির উপর নয়। সেই সঙ্গে চেষ্টা হয়েছে লভ্যাংশের নূতন ধরনের বণ্টন ব্যবস্থা অথবা বা হল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রের অধিকারে সব কিছু সংগ্রহ করে ধরা।

অপরূপ এক স্বপ্ন

[২. ৯. ৭৬ তারিখে চম্পকলাল যে স্বপ্ন দেখেছিলেন]

চম্পকলাল

লিখে প্রকাশ করা বড় কঠিন কিন্তু তবুও আমি তা চেষ্টা করব—কেননা ব্যাপারটি খুবই চিত্তাকর্ষক…

চারটি ছোট ছোট আশ্রম-শিশু এল আমার কাছে—তারা জানাল, "আমরা একটা কিছু করতে চলেছি—কিন্তু আমরা নিজেরাই জানি না কি আমরা করতে যাচ্ছি। আমরা আর কাউকে এসবের কিছুই জানাইনি। আমরা এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। আমরা আর কাউকে চাই না। তাহলে তারা সব নষ্ট করে দেবে।"

আমি তাদের লিখে জানালাম, "আমি কথা বলি না।"

তাদের মধ্যে একটি ছেলে আমার খুব কাছে এসে জানাল, "আমরা জানি তুমি কথা বল না। তুমি কেবল চল আমাদের সঙ্গে। আমরা চাই তুমি আমাদের সঙ্গে যাও।"

আমি লিখলাম, "আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতে খুব পছন্দ করি।"

তখন সব ছেলেই জানাল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা জানি, তুমি কথা বল না। সেই জন্যেই তো আমরা এসেছি তোমাকে নিতে।"

আমি লিখলাম, "কিন্তু কোথায় তোমরা আমাকে নিয়ে যাবে?"

হাসতে হাসতে ছেলেরা জানাল, "তা তো আমরাও জানি না।" সব ছেলেই হাসছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট শিশুটি আমার খুব কাছে এসে আমার দিকে চেয়ে এক প্রাণ-খোলা হাসি হাসল। তাকে দেখেই আমি বুঝতে পারলাম সবেমাত্র সে হাঁটতে শিখেছে। সে আমার হাত-খানি আঁকড়ে ধরে আর একটি হাতে ইসারায় জানাল আমাকে উপরদিকে উঠে আসতে এবং ইঙ্গিতেই বোঝাল তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে। দেখলাম ছেলেটির মুখের হাবভাব চলাফেরা এত সুন্দর যে বলা যায় না! আমরা কেউ-ই একটা কথাও বলিনি। কেবল আকারে ইঙ্গিতে সমস্ত কিছু প্রকাশ পেয়েছে। সেই ছোট্ট শিশুটি এমনভাবে চলেছে যেন সে পথ চেনে—কোথায় গিয়ে পৌঁছতে হবে তা তার বেশ জানা। আমি আপন মনেই আশ্চর্য হয়ে উঠছিলাম—"এটা কি?" ছেলেরা বলে ওঠে, "আমরা তা জানি না।" আমি ভাবলাম, "এটা কি করে সম্ভব?" তারপর আমি ওদের সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললাম। আমরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম যেখান থেকে দেখা যায় কেবল বিপুল বিশাল উদার উন্মুক্ত আকাশের শূন্যতা…সেখানকার সমতল আর আকাশ কি অপূর্ব সুন্দর! জ্যোতির্ময় গোলাপী রং…সেই স্থানের মধ্যবর্তী এক জায়গায় আমাদের জন্যে আরও অনেক ছেলেমেয়ে প্রতীক্ষা করছে দেখতে পেলাম। সংখ্যায় তারা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হতে পারে। যখন আমরা পৌঁছলাম—সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাকে ওদের মধ্যে পেয়ে কি যে খুশি হল।

ওরা আমার চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল, এক বিচিত্র ভঙ্গিমা আর হাসি দিয়ে ওরা আমায় স্বাগত জানাল। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই কি ধীর স্থির প্রশান্ত। যে ছোট্ট শিশুটি হাত ধরে এখানে আনল সেই আমাকে আরও দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমার হাতখানি ধরল। সে হাঁটছে তো হাঁটছে। ক্রমে আর একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। আমার দৃষ্টিগোচর হল সর্বত্রই যেন রয়েছে এক নতুন উদার উন্মুক্ত স্থান। সেখানে দেখতে পেলাম এক প্রকাণ্ড বকুলফুলের গাছ ("Patience") বিরাট

এলাকা জুড়ে রয়েছে। গাছটি যেন অশ্বত্থ গাছের মতই বিশাল। এমনকি মনে হল তার চেয়েও বড় আর দেখতে তার চেয়েও অপরূপ। গাছের কয়েকটি ডালপালা নানা দিক থেকে ঝুঁকে পড়ে মাটিকে স্পর্শ করছে। গাছটি আলোকে আলোকময়। গোলাপের ("Surrender") মত বড় বড় গাছটির সোনালি ফুলগুলি। প্রতিটি ফুল যেন সূর্যের মত ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে। আমরা সকলে মিলে যে জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিলাম সেখানটি অপূর্ব সুন্দর। গোলাপী রঙে ভরা। স্থানটির চারপাশে এবং ঊর্ধ্বে ছিল নীল রঙের উজ্জ্বল আলো। সেখান থেকে দেখলাম দূরে—চারপাশ ঘিরে এবং ঊর্ধ্বে অবিরাম সোনালি আলো চমকাচ্ছে। আমি সেই গাছটির সামনে দাঁড়িয়ে এই নতুন জগৎটির প্রশংসা করছিলাম। ঠিক সেই সময় দেখলাম আমার সামনেই রয়েছেন মা এবং শ্রীঅরবিন্দ। কিন্তু কি ভাবে তাঁরা বসে আছেন আর তাঁদের চরণ কোথায় স্থাপন করেছেন তা মোটেই জানতে পারলাম না। আমি কেবল দেখলাম তাঁদের সোনালি জ্যোতির্ময় মূর্তি আর চারপাশ ঘিরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাঁদেরই সোনার আলো। তাঁদের আমি কেমন দেখলাম সে সম্বন্ধে সব কথা লিখে ঠিক মত প্রকাশ করা বড় কঠিন। আমার দৃষ্টির সমতলেই তাঁরা ছিলেন বিরাজমান। আমি তাঁদের দিকে তাকালাম —তাঁরা হাসছিলেন। কি শান্ত শান্তিময় পরিবেশ, আনন্দে পরিপূর্ণ, এ যে মানুষের কল্পনাতীত।

আমি দু'বাহু প্রসারিত করে মা ও শ্রীঅরবিন্দের সামনে দাঁড়ালাম। দু'হাতই আমার খালি। তারপর দেখলাম আমার হাতের উপর রয়েছে একটা বড় রকমের ডিস্। ডিসটির ওপর রয়েছে একটি ঢাকনা। সেটি খুবই অন্ধকারময় কর্দমাক্ত আর কালো রঙের দেখতে। আমি ডিসের ওপর থেকে সেই কালো ঢাকনাটি সরিয়ে ফেলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু তা পারলাম না। তখন তাঁদের দিকে ফিরে তাকালাম। মা ও শ্রীঅরবিন্দ দুজনাই আমার দিকে চেয়ে করুণা-ভরা সুন্দর হাসি হাসছেন। সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম আমি তাঁদের কত-না অন্তরঙ্গ···এরপর আর একবার চেষ্টা করলাম ঢাকনাটি সরিয়ে ফেলতে। যেমনি সেটি সরিয়ে ফেলার জন্য স্পর্শ করেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে তা মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল আর দেখতে পেলাম না। এরপর আমি দেখলাম সেই একই জায়গায় রয়েছে একটি হল্‌দে ঢাকনা। আমি সরাবার চেষ্টা করতেই সেটিও একই ভাবে মিলিয়ে গেল। আগেরবার যা যা ঘটেছিল এবারও ঠিক তাই ঘটল। এ রংটিও আবার মিলিয়ে গেল। যেমন কালো থেকে ঢাকনাটি হলদে হয়েছিল—ঠিক তেমনিভাবেই তা আবার ক্রমান্বয়ে হয়ে গেল গোলাপী, নীল, সাদা, রূপালি—পরিশেষে সোনালি···প্রত্যেকবারই ঢাকনাটিকে সরাতে আমাকে একই রকম চেষ্টা করতে হচ্ছিল। যেমনি আমি সোনালি ঢাকনাটি স্পর্শ করেছি অমনি তা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে আমি বিস্ময়ে দেখলাম ডিসের মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণ বিকশিত জ্যোতির্ময় সোনালি পদ্মফুল। সেই পদ্মফুলটি আমি হাতে করে গ্রহণ করলাম। যেমন ফুলটিকে নিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেলাম যে সেই পূর্বেকার কালো কর্দম-মলিন ঢাকনাটি আবার ডিসের ওপর রয়েছে। পিছন পানে না তাকিয়ে আমার পিছনে যে ছিল তাকে সেটি অর্পণ করে দিলাম। তারপর আমি তাকালাম মা ও শ্রীঅরবিন্দের পানে। তাঁরা হাসছেন। তাঁদের কাছ থেকে কি একটা জিনিস যেন আমারই মধ্যে এসে প্রবেশ করল আর আমি কেবলই উপরের দিকে উঠে যেতে লাগলাম—ক্রমাগত ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে···তারপর হঠাৎ থেমে গেলাম আর উপরে উঠতে পারছিলাম না। কেবল চোখে পড়ল এক ফিঁকে নীলাভ আলো···যেন আমি তারই উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি। কি যে সান্ত্বনাময় আরামদায়ক সে অবস্থা। আমি দেখলাম আমার দেহের সর্বকেন্দ্রে কি যেন একটা গতিবিধি চলেছে। আমি তাঁদের কাছে বর্ণনা করলাম। আমার মধ্যে, আমার চারপাশে রয়েছে শান্তি, উল্লাস আর আনন্দ···

কিছুক্ষণ পর আমার পাশে খুব হাসিখুশি ছোট্ট একটি ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম—ওর হাতে রয়েছে এক আলোকে উদ্ভাসিত সোনালি পদ্ম। ছেলেটি তার সুখকর অভিজ্ঞতার সমস্ত মুহূর্তগুলিকে বর্ণনা করে চলেছে। আমি যা স্বতস্ফূর্তভাবে করেছিলাম সেও তাই অবিকল করছে। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তার সঙ্গে নীচেতে ছিলাম তখন যা যা ঘটেছে তা কি সে দেখেছিল। আমি যা করেছি তা সে জানে কিনা। সে বলল যে যখন ও আমার পিছনে ছিল তখন কি ঘটেছে তা জানে না। এটা স্থির নিশ্চয় যে

সে তখন ঘুমিয়ে পড়েনি। সে বলল, "কেবল যখনই তুমি ডিসটি আমার হাতে দিয়ে দিতে চাইলে—তখনই আমার হাতখানি তোমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলাম।" সব ব্যাপারটি ঘটেছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সত্যিই, কি বিস্ময়কর ব্যাপার! আমি যা যা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম—ছেলেটিও হুবহু একই রকম বর্ণনা দিল।

একের পর এক সকল ছেলেই এল। ওরা সকলেই মহাখুশি! কেউ তাদের অভিজ্ঞতার কথা আমাকে জানাচ্ছে। কেউ কেউ-বা তাদের বন্ধুদের বলছে। তবে সকলেরই একইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

যে ছোট্ট শিশুটি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এল—সে একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অন্যসব ছেলেরা নাচছে আর হাতে পূর্ণ প্রস্ফুটিত আলোক উদ্ভাসিত সোনালি পদ্মফুল নিয়ে কি অপূর্ব ভঙ্গিমায় লাফাচ্ছে। হঠাৎ যে ছেলেটি এতক্ষণ পর্যন্ত মুখে একটিও কথা বলেনি সেও উচ্চৈস্বরে বলতে লাগল, "চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ, উপরের দিকে চেয়ে দেখ…"এই কথাকটি বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখমণ্ডল ফুলেরই মত বিকশিত হয়ে উঠল। আমরা সকলেই তখন চোখ মেলে দেখলাম—আমাদের সকলেরই বহু উর্ধ্বে মা এবং শ্রীঅরবিন্দ অধিষ্ঠিত রয়েছেন। সোনালি আলোর বন্যায় চতুর্দিক প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। সেই আলো আমাদের দিকে নেমে এসে আমাদেরও ঘিরে ফেলল…আমাদের উর্ধ্বে; আমাদের চারপাশে রয়েছে কেবল সোনালি আলো। আমি তখন ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন আমাদের কি করা কর্তব্য?" সব ছেলেই সমস্বরে তার জবাবে জানাল, "চিরকালের জন্যে এখানে থেকে যাওয়াই কি অপূর্ব নয়?"

এরপর কি ঘটল জানি না। আমি চোখ মেলে তাকালাম।

আমার এই স্বপ্নটি এত সত্য, এমন জীবন্ত আমার কাছে—এখনও যেন আমি স্বপ্ন দেখছি…এখনও আমি রয়েছি এই জগতেই!

অনুবাদ : **কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়**

নিয়ন্তা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কেন করি প্রার্থনা নাথ, জানি যখন অন্তরে—আমার
স্বভাব অভাব রুচি—সবই তুমি জানো, থাকো আমায় ঘিরে
তোমার ভালোবাসার আলোয় ? না চাইতেও দাওনি কি অপার
আনন্দ বল বাঁশির সুরে ? পাইনি কি ঠাঁই তোমার চরণতীরে ?

সব জেনেও কেন তবু বলি—আমি দুর্বল মলিন ?
ত্রাণ করেছ কতবারই, তবু কেন ভাসি চোখের জলে
তুফানেও ধ্রুবতারা জ্বালো যখন দিনের পরে দিন ?
সংশয় কি তার সাজে যে তোমার ডাকেই অচিন পথে চলে ?

এ-বিশ্বে শোক তাপ দৈন্যের নেই সীমা—এ-দুঃখ কেন মনে
জাগিয়ে রাখি যখন জানি—প্রেমের ঠাকুর তুমি বিশ্বপতি ?
কোন্ বেদনার ঘূর্ণী থেকে কোথায় নিয়ে তোলো আর্ত জনে
কেউ জানে না যখন, কেন বিচার ছেড়ে করি না প্রণতি ?

প্রেম বিনা কি বুদ্ধি পারে জানতে—কোথায় শুরু কোথায় শেষ ?
"কালো ব্যথার পরেই তোমার ঝরবে আলো"—গাওয়াও হৃদয়েশ।

কোজাগরী

বিহারীলাল

ঝরিতেছে কোজাগরী পূর্ণিমার রজতের ধারা
আমি ভাসি বিশ্বময়ী-জননীর সৌন্দর্য সাগরে,
সর্বব্যাপী প্রেম তার এ নিখিল রাখিয়াছে ধরে
তাহারি মায়ার স্পর্শে চরাচর নিত্য আত্মহারা।

স্থাবর জঙ্গম জাগে, জাগে আজি সর্বজলস্থল
জোৎস্না-নিঝরে জাগে আকাশের শুভ্র-সুধাকর,
আমার অন্তরে জাগে আনন্দের সঙ্গীত লহর
অসীমের জাগরণে জাগে প্রাণ নিস্তব্ধ বিহ্বল।

মহালক্ষ্মী, তব বিশ্ব সঙ্গতির বীণার-ঝঙ্কারে
হিয়া মোর ডুবে যায় কালাতীত আস্তত্বের মাঝে
চক্ষে মোর পরতম সত্য-সূর্য—কী সুন্দর সাজে!
তোমার রহস্যলোক নেমে আসে মর্তের দুয়ারে।

মহাজাগরণ হতে লভিয়াছে জন্ম কোজাগরী
জাগিছে নিশীথ চাঁদ সুন্দরের অনুধ্যান করি।

বেদের কবিতা

গৌরী ধর্মপাল

[শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বারবার শুনতে পাই বেদের প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনি, না, ধ্বনি ?

ধ্বনিই বলব। কেননা, যদিও এরাঁ দুজনেই খুব ভাল করে বেদ পড়েছেন, তবু এঁরা তো বেদ পড়ে বৈদিক ঋষি হননি। বেদ এঁদের মধ্যে আপনিই জেগে উঠেছে। এই জন্যেই বেদকে বলা হয় নিত্য সনাতন এবং স্বয়ম্ভূ। অর্থাৎ যে-কোন কালে যে-কোন স্থানে উপযুক্ত পাত্র পেলে বেদ আপনিই তার মধ্যে জেগে ওঠে। পাঞ্জাবের স্বামী রামতীর্থও তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের শেষদিকে বলেছিলেন, বেদের অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি। দুঃখের বিষয় তাঁর উপলব্ধি তিনি লিখে যেতে পারেননি। লিখলে, সেটিও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'যজ্ঞকথা', শ্রীঅরবিন্দের *The Secret of the Veda* এবং শ্রীমৎ অনির্বাণের 'বেদ-মীমাংসা'-র মত একটি অমূল্য গ্রন্থ হ'ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে বেদ কি করে আপনি জেগেছিল, এবং তারপরে নতুন করে বেদ পড়ে তিনি বেদের হারানো অর্থ কেমন করে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন, সে কাহিনী তিনি নিজমুখেই বলেছেন তাঁর *The Secret of the Veda* বা 'বেদরহস্য' গ্রন্থে। তাঁর তন্ন তন্ন বেদ-চর্চার প্রমাণ যেমন আছে এই বইটিতে এবং বিভিন্ন উপনিষদের অনুবাদ ও আলোচনায়, তেমনি আছে তাঁর 'দিব্যজীবন' গ্রন্থেরও পাতায় পাতায়। এই মহাগ্রন্থের একটি বাদে আর প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তিনি শিরোধার্য করেছেন বেদমন্ত্র-- ঋগ্বেদের প্রায় ৭০/৭৫টি, অথর্ব ও যজুর্বেদ থেকে ৫/৬টি ও বিভিন্ন উপনিষদ্ থেকে প্রায় ১২০টি।

অর্থাৎ তিনি নিজেই তাঁর দর্শনের সঙ্গে বৈদিক দর্শনের মিলের সূত্রগুলি ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, ঠিক যেমন আমাদের প্রাচীন দর্শনকারেরা তাঁদের গ্রন্থের মধ্যে বেদমন্ত্র উল্লেখ বা উদ্ধৃত করে তাঁদের উপলব্ধি, দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করতেন।

বেদ একটি বিশাল সাহিত্য। একটি অপূর্ব বিশ্বাত্ম-যোগসাধনার সাধককবিদের—কয়েক শতাব্দী শুধু নয়, কয়েক সহস্রাব্দীব্যাপী সাধনা ও সিদ্ধির ফসল। সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষদ—বৈদিক সাহিত্যের এই চারটি পর্ব। তার মধ্যে যেটি সংহিতা অংশ—যাকে আমরা সাধারণভাবে ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ ও অথর্ববেদ বলে থাকি—সেইটিই বেশি প্রাচীন। তার মধ্যেও আবার ঋগ্বেদ হল প্রাচীনতম, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন "lyrical epic of the soul in its immortal ascension" অর্থাৎ মানবাত্মার অমৃতে উত্তরণের মহাগীতিকাব্য। ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রূপক, কবিকর্ম, ঋষি, দেবতা ইত্যাদি যে কোন দিক ধরেই এই মহাগীতিকাব্য ঋগ্বেদের অফুরন্ত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এই নিবন্ধে যে দিকটি ধরে আলোচনা করা হচ্ছে, তা হল বেদের অপৌরুষেয়-বাদ। কেননা এরই সাহায্যে বেদের মূলভাবটি, বৈদিক সাধনার মূল সুরটি, বেদের ঋষিকবিদের প্রাণের কথাটি বুঝতে পারা সহজ হবে।]

(এক)

বেদ অপৌরুষেয়, পুরুষের অর্থাৎ মানুষের লেখা নয়। ঋষিরা বেদের দ্রষ্টামাত্র, স্রষ্টা নন। কথাটা অনেকদিন ধরে আমাদের দেশে চলে আসছে। আমাদের দর্শনে কথাটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এখন কথাটা একটু অন্য দিক দিয়ে ভেবে দেখা যাক।

ঋষিকবির মনীষাদীপ্ত হৃদয় বেদের জন্মভূমি। তার প্রথম পরিচয়, সে হল ছন্দঃ, কাব্য। পূর্ণদৃষ্টির পূর্ণজীবনের সর্বচ্ছন্দা কাব্য।

তার দ্বিতীয় পরিচয়, সে হল শাস্ত্র। ঋষিকবির উদার অনিবার্য প্রজ্ঞাদৃষ্টির সামনে যে সত্য ফুটে উঠেছিল, তা এত গভীর ব্যাপক বিশাল পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং অন্তরতম যে মানুষ তাকে শাস্ত্রের মর্যাদা না দিয়ে পারেনি।

তাই বেদ একাধারে প্রভু সুহৃদ্ এবং কান্তা। সে সত্য এবং সেই সঙ্গে সুন্দরও। যদিও তার এই কান্তা-রূপ সুন্দর-রূপ তার শান্তা-রূপের আড়ালে অনেকাংশে ঢাকা পড়ে গেছে। অথচ এই রূপটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে বেদের অপৌরুষেয়তার রহস্য।

যেহেতু বেদ শাস্ত্র, তথা আমাদের সমস্ত আস্তিকদর্শন-গুলির আকর এবং প্রমাণ, সেহেতু তার পৌরুষেয়ত্ব অপৌরুষেয়ত্ব নিয়ে দর্শনকারেরা স্বভাবতঃই প্রশ্ন তুলেছেন। কেননা শাস্ত্রকে,প্রমাণকে হতে হবে সমস্ত রকমের ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য, একেবারে ষোল-আনা খাঁটি। মানুষের রচনায় কোথায় সে সম্ভাবনা? তাই মীমাংসক বললেন, বেদ নিত্য, তাকে কেউ রচনা করেনি। পাতঞ্জল নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক বললেন, বেদ পুরুষের রচিত বটে, কিন্তু সে পুরুষ মানুষ নয়, স্বয়ং ঈশ্বর। নাস্তিক দার্শনিকেরা এসব কথা হেসে উড়িয়ে দিলেও এদেশের প্রাচীনপন্থী বেদাধ্যায়ীরা বেদের অপৌরুষেয়ত্বেই দৃঢ় বিশ্বাসী।

কিন্তু অপৌরুষেয় বলতে ঠিক কি বোঝায়?

ভগবান বেদপুরুষ বা ব্রহ্মা বা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বেদ উচ্চারণ করে চলেছেন আর ঋষিরা নীরব দর্শক হয়ে তা দর্শন করে যাচ্ছেন, শ্রদ্ধাজড়েরা এটা অনায়াসে মেনে নিলেও যুক্তিবাদী মন এ ধরনের অপৌরুষেয়ত্বে কোনদিনই বিশ্বাস করেনি, আজও করবে না। স্বয়ং বেদের ঋষিদের সাক্ষ্যই এর বিরুদ্ধে যায়।

তা-ই যদি হবে, তাহলে বেদের অন্তর্নিহিত ঐক্যসত্ত্বেও ঋষি অনুসারে তার ভাব-ভাষা ভঙ্গির এত বৈচিত্র্য কোথা থেকে এল? দীর্ঘতমা ঔচথ্য কথা কইছেন মরমিয়া ঠারে, মেধাতিথি কাণ্বের মধ্যে রয়েছে সুরেলা স্বচ্ছতা, বিশ্বামিত্রের বাণী ওজোদীপ্ত বেগবান্, বসিষ্ঠের মধ্যে দেখছি শান্ত স্নিগ্ধ সুষমা[১]। পুনরাবৃত্তি দিয়ে বাণীকে জোরালো করা ঋষি পরুচ্ছেপ দৈবোদাসির শৈলী[২], অতিচ্ছন্দের ব্যবহারও তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য। দেবতার প্রতি ঋষির একান্ত ব্যক্তিগত ভাব-ভালবাসার প্রকাশ ঋগ্বেদের বহু সূক্তে। যেমন ৭/৮৬, ৮৮-তে বসিষ্ঠের আর্তি বিশেষ করে বরুণের জন্যে, ১০/৯১-তে ঋষি অরুণ প্রিয়া জায়ার মতই উতলা প্রিয়তম অগ্নির জন্যে, ১০/১২০-তে ইন্দ্রের সঙ্গে একদেহ হবার গৌরবে গরীয়ান্ ঋষি বৃহদ্দিব অথর্বা।

ঋগ্বেদের বহু জায়গায় রয়েছে কবির ভণিতা, যেখানে পাই তাঁর অথবা তাঁর কুলের মন্ত্রকর্তৃত্বের সংশয়াতীত শিল-মোহর।

গায়ত্রীমন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র সগৌরবে ঘোষণা করেছেন—

বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্ (৩।৫৩।১২), বিশ্বামিত্রের এই বাণী রক্ষা করছে ভারতজনকে অর্থাৎ ভরতকুলকে।

সবাইকার থেকে উজ্জ্বল করে, বিশিষ্ট করে, আপন পুত্রদের রচিত স্তোমের গৌরব গাইছেন ঋষি বসিষ্ঠ—

সূর্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতির্ এষাং সমুদ্রস্যেব মহিমা গভীরঃ।
বাতস্যেব প্রজবো নান্যেন স্তোমো বসিষ্ঠা অনেতবে বঃ
(৭।৩৩।৮)

সূর্যের মত এদের জ্যোতি, বাড়ছে তো বাড়ছেই,
সমুদ্রের মত গভীর মহিমা, বায়ুর মত বেগ,
বসিষ্ঠের পুত্রেরা,
কার সাধ্য তোমাদের গানের অনুকরণ করে?

কাঠকে কেটে-কুটে চেঁচে-ছুলে কুঁদে শিল্পবস্তু তৈরী করে তক্ষা। এই প্রক্রিয়াটির নাম তক্ষণ। বেদে বহু জায়গায় মন্ত্ররচনা প্রসঙ্গে পাই এই তক্ষ্ ধাতুর ব্যবহার। অর্থাৎ ঋষিকবি যেন কাটাকুটি গ্রহণবর্জন করতে করতে গড়ে তুলছেন একটি নিটোল মন্ত্র বা সূক্ত বা স্তোম। এই ধাতুটির মধ্যে ঋষির শিল্পীসত্তার সক্রিয় সতেজ অক্লান্ত অনিমেষ উপস্থিতি টের পাই।

এবা তে গৃত্সমদাঃ শূর মন্ম···তক্ষুঃ (২।১৯।৮)
এমনি করেই গৃত্সমদেরা, ওগো শূর (ইন্দ্র), তোমার উদ্দেশে তক্ষণ করেছে মন্ত্র।

অগ্নয়ে ব্রহ্ম ঋভবস্ ততক্ষুঃ (১০।৮০।৭)
অগ্নির উদ্দেশে ঋভুরা তক্ষণ করেছেন বাণী।

১ *On The Veda—P.62.*

২ নিরুক্ত ১০/৪২

সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্যম্ অতক্ষদ্ ব্রহ্ম···নোধাঃ
সনাতন তুমি, তোমার জন্যে ১।৬২।১৩
নূতন মন্ত্রবাণী, হে ইন্দ্র
তক্ষণ করে নোধা গৌতম।
ইমং সু-অস্মৈ হৃদ আ সুতষ্টং মন্ত্রং বোচেম কুবিদ্ অস্য বেদত্ (২।৩৫।২)

হৃদয় থেকে সুন্দর করে তক্ষণ করা এই মন্ত্র আমি উচ্চারণ করব এই দেবতার উদ্দেশে, ইনি সে-মন্ত্রকে নিশ্চয় জানবেন।

ঋষির নিঃসংশয় মন্ত্রকর্তৃত্বের প্রমাণ মেলে জন্ ধাতুর ব্যবহারেও—

আ ত্বায়ম্ অর্ক উতয়ে ববর্ততি যং গোতমা অজীজনত্ (৮।৮৮।৪)

আমাদের রক্ষা করতে তোমাকে এদিকে ফেরাক এই গান, যাকে জন্ম দিয়েছে গোতমেরা।

বংশানুক্রমিকভাবে মন্ত্রস্বত্ব কিভাবে সংক্রামিত এবং রক্ষিত হচ্ছে, তারও পরিচয় পাচ্ছি বামদেবের একটি মন্ত্রে, যেখানে তিনি বলছেন, যে বাক্ দিয়ে আমি বলবানকে ধ্বংস করি, তা আমি পেয়েছি আমার পিতা গোতমের কাছ থেকে। হে অগ্নি, আমাদের এই বচনকে তুমি জানো—

মহো রুজামি বন্ধুতা বচোভিস্
তন্ মা পিতুর্ গোতমাদ্ অন্বিয়ায়।
ত্বং নো অস্য বচসশ্ চিকিদ্ধি
হোতর্ যবিষ্ঠ সুক্রতো দমূনাঃ (৪।৪।১১)

মহাকবি অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি নিজের সূক্তগুলিকে বারবার মান-পুত্র কবি অগস্ত্যের রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন—

অবোচাম নিবচনানি অস্মিন্ মানস্য সূনুঃ সহসানে অগ্নৌ
মানের পুত্র আমি (১।১৮৯।৮)
বিশ্ববিজয়ী অগ্নিকে শোনালাম এ গোপন বাণী।
যুবাং চিদ্ হি স্ম-অশ্বিনৌ-অনু দ্যূন্ বিরুদ্রস্য প্রস্রবণস্য সাতৌ।
অগস্ত্যো নরাং নৃষু প্রশস্তঃ কারাধুনীব চিতয়ত্ সহস্রৈঃ ১।১৮০।৮
রুদ্রনিনাদে ঝরঝর ঝরে বিপুল প্রস্রবণ—
তাকে জিনে নিতে, ওগো অশ্বীরা, অনুদিন অনুক্ষণ
জাগিয়ে তুলতে তোমাদের ডাক দিয়েছে শঙ্খস্বনে
লোকবিশ্রুত এই অগস্ত্য শত সহস্র গানে।

এই প্রস্রবণ হল বিশ্বকাব্যের অফুরন্ত নির্ঝর, যাকে ঋষি বিশ্বামিত্র বলেছেন 'অক্ষীয়মাণম্ উত্সং শতধারম্···' শতধার অফুরান ফোয়ারা—যেখানে পৌঁছলে সর্বদৃক্ সর্বজ্ঞ সর্বভূ হওয়া যায়। সেই নিত্যসুরের ধারায় পৌঁছন যায় সুরেরই পথ দিয়ে, যার বৈদিক নাম হল 'গাতু' গানের পথ (√গম্ ও √গৈ এর আশ্লিষ্ট রূপ)। তাই ঋষি অগস্ত্য দিনের পর দিন অজস্র গান গেয়ে চলেছেন, ঘুমন্ত দেবতার কানের কাছে ঘুম-ভাঙানি গান, বোধন-সঙ্গীত। বলছেন, জাগো হে অশ্বিদ্বয়, জাগো হে সত্যের যুগলমূর্তি, ছোটাও তোমাদের সৃষ্টিমাতাল পাগলা ঘোড়া পক্ষীরাজ, নিয়ে চল আমাকে সেই দেখা-না-দেখায় মেশা অনাদ্যন্ত জলপ্রপাতের একান্ত নির্জন ধুধু সৈকতে। আমি তাকে চোখ ভরে দেখব, কান ভরে শুনব। আমি ডুবতে চাই, মরতে চাই, বাঁচতে চাই তার আলো-ঝিকমিক কালো জলে।

বেদকে মানুষেরই রচনা বলে স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করছেন আর একজন মহাকবি—মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ। তিনি বলছেন—

কা তে অস্তি-অরংকৃতিঃ সূক্তৈঃ কদা নূনং তে মঘবন্ দাশেম।
বিশ্বা মতীর্ আ ততনে ত্বায়া—অধা মে-ইন্দ্র শৃণবো হবেমা
উতো ঘা তে পুরুষ্যা ইদ আসন্ যেষাং পূর্বেষাম্ অশৃণোর্ ঋষীণাম্।
অধাহং ত্বা মঘবন্—জোহবীমি ত্বং ন ইন্দ্রাসি প্রমতিঃ পিতেব (৭।২৯।৩,৪)

সূক্তে তোমার কী বা হবে প্রসাধন ?
সত্যিই দিতে পারব তোমায় কবে বল মঘবন্।
তোমাকেই চেয়ে মন্ত্রে মন্ত্রে বিস্তার করি তান,
শোনো হে ইন্দ্র, শোনো শোনো শোনো আমার এ আহ্বান।
যেসব পূর্ব ঋষিকবিদের আহ্বান শুনেছিলে
মানুষই তো তারা ছিল গো সকলে, ছিল মানুষেরই ছেলে।
তাই বারে বারে ডাকছি তোমাকে, শোনো শোনো মঘবন্,
ইন্দ্র, তুমি যে আমাদের পিতা, বন্ধু, আপনজন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বেদবাণী যে-অর্থেই অপৌরুষেয় হোক না কেন, পুরুষের ব্যক্তিগত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ তার

সর্বাঙ্গে মাখানো। এবং এ পৌরুষ যে দেবতা বেশ পছন্দ করেন, শুধু তাই নয়, এই পৌরুষই যে দেবতার জনক পালক পোষক বর্ধক, তার প্রমাণও বেদময় ছড়ানো। ঋষি বসিষ্ঠ বলছেন, অকবি মানুষের মধ্যে নিহিত রয়েছেন এই অমৃত কবি অগ্নি। মানুষ ধরেছে এঁকে। ইনিও ধরা দিয়েছেন, মেনে নিয়েছেন এই 'পৌরুষেয়ী গৃভ্,' মানুষের এই ধরা (৭।৪।৩,৪)। যে-অগ্নি থেকে আসছে মানুষের কাব্য, মানুষের মনীষা (৪।১১।৩), তিনিই আবার মানুষের 'সহসঃ সূনুঃ', 'উর্জো নপাত্', অর্থাৎ বীর্যসম্ভব পুত্র। যে ইন্দ্র কবিদের সেরা কবি (৬।১৮।১৪), তিনি বেড়ে উঠছেন মানুষেরই গানে—পুরোন, নতুন, এবং এ-দুয়ের মাঝামাঝি সেই সব গান (৩।৩২।১৩)। যে-সবিতা আমাদের ধীকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দেন (৩।৬২।১০,) সেই কবির কবিকে ঠেলে তুলছে মানুষই (৫।৪২।৩)। যে সোম ঋষিকৃত্ (৯।৯৬।১৮), দুলিয়ে দেন ঋষির হৃদয়ে বাক্‌সমুদ্রকে (৯।৩৫।২), মানুষেরই নিয়ন্ত্রণে যজ্ঞভূমিতে তাঁর জন্ম (৯।১০৯।৮) এবং বৃদ্ধি (৯।৪।৯)।

ঋষির মন্ত্রকর্তৃত্ব স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিয়েছেন ব্রাহ্মণও। তাণ্ড্যব্রাহ্মণ বলছেন, শিশু আঙ্গিরস ছিলেন মন্ত্রকৃত্ দেব মধ্যে মন্ত্রকৃত্, তিনি পিতৃগণকে আহ্বান করেছিলেন 'পুত্রক' অর্থাৎ 'খোকা' বলে! তাঁরা দেবতাদের জিগ্যেস করলে, দেবতারা বললেন, যে মন্ত্রকৃত্ সে-ই তো পিতা।

পূর্বোক্ত ধরনের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাসী নন বেদাঙ্গ-কাররাও। যাস্ক বলছেন, 'এই রকম নানা ধরনের অভিপ্রায় অনুসারে ঋষিদের মন্ত্রদর্শন হয়।' দর্শন একটা অলৌকিক ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু অভিপ্রায় তো মানুষেরই। তাহলে মন্ত্রদর্শনের ব্যাপারে ঋষির ভূমিকা শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শকের নয়। তাঁর আরো স্পষ্ট উক্তি হল, 'যে-কামনা নিয়ে যে-দেবতাতে অর্থপতিত্ব ইচ্ছা করে ঋষি স্তুতিপ্রযোগ করেন, সেই মন্ত্র সেই দেবতার হয়।' (নিরুক্ত ৭।১)এই মন্তব্যটিতে মন্ত্রের রচনাস্বত্ব যাস্ক পুরোপুরি ঋষিকেই দিচ্ছেন, অথচ তিনি একথাও ভোলেননি যে যিনি দর্শন করেন তিনিই ঋষি, স্বয়ম্ভু বেদ তপস্যাবত ঋষিদের কাছে 'অর্ষণ' করেছিলেন অর্থাৎ এসেছিলেন বলেই তাঁরা ঋষি, (নি. ২।১১) এবং ঋষিরা ধর্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন (নি. ১।২০)। অর্থাৎ এখানেও সেই বিরোধাভাস। অর্থাৎ বেদের সৃষ্টি পৌরুষে-অপৌরুষে মানুষে-দেবতায় মেশামেশি একটা যুগ্মব্যাপার! Joint authorship!

পানিনি তাঁর সূত্রে 'মন্ত্রকার' পদটিকে স্বীকার করে মন্ত্রের পৌরুষেয়তা নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছেন (অষ্টাধ্যায়ী ৩।২।২৩)। এবং তাঁর এ স্বীকৃতি বেদের ঋষিদের দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত।

অনুক্রমণিকাকারও ঋষির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'যাঁর বাক্য, তিনিই ঋষি। সেই ঋষি অথবা ঋষি-বাক্যের দ্বারা যিনি উক্ত হন, তিনিই দেবতা। এই বাক্য যেখান থেকেই আসুক না কেন, তা যে একান্তভাবে ঋষিরই বাক্য, এ বিষয়ে তাঁর তিলমাত্র সন্দেহ নেই। লক্ষণ দেওয়ার সময় তিনি আগে ঋষিকে,পরে দেবতাকে এনেছেন, এ-ও লক্ষ্য করার বিষয়।

যাজ্ঞিকরা যখন উহ করেন, অর্থাৎ যজ্ঞের প্রয়োজনে মন্ত্রের বচনে-লিঙ্গে বিভক্তিতে নানারকম অদলবদল করেন, তখন তাঁদেরও গলা কাঁপে না, অর্থাৎ তাঁরাও মেনে নিচ্ছেন যে একটু আধটু পৌরুষেয় আঁচড়ে মন্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

তাহলে 'বেদ অপৌরুষেয়'—একথার অর্থ কি?

[ক্রমশ]

৩ দ্র. বেদমীমাংসা পৃ ৪০/টী ৬, মন্ত্রকৃত্, ব্রহ্মকার ইত্যাদি বলে ঋষির উল্লেখ করছেন নিজেদের।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

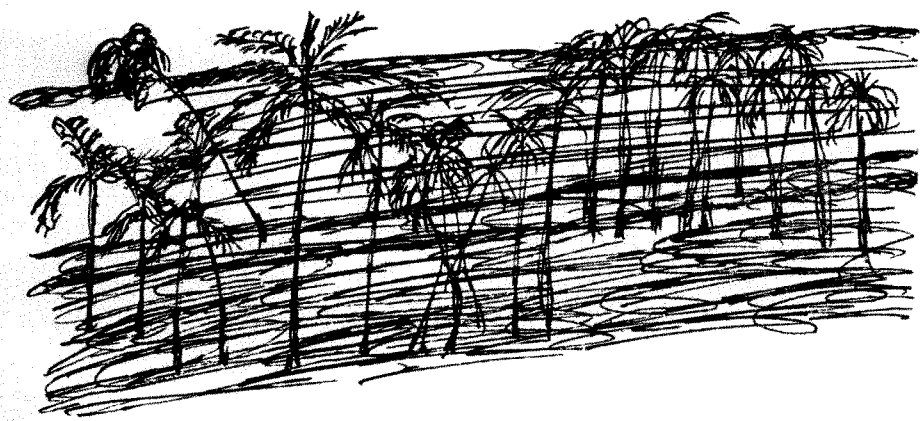


নিখিলকান্ত গুপ্ত











স্কেচ : নিখিলকান্ত গুপ্ত

নিখিলকে স্মরণ করে

দোষগুণ কার নাই মাটির মানুষে
তবু তারি মাঝে কত আলোক ঝলসে।
ধীর শান্ত মানুষটি সবাকার প্রিয়
কোনদিন কাউকে সে করেনি তো হেয়,
নিঃসঙ্গ জীবন তার রুদ্ধ বেদনার
একাকী বহিয়া গেছে না করি প্রচার।
মা তারে নিলেন তুলে আপনার কোলে
সুখে থাক মাথা রাখি সেই পদতলে।

১৩-৭-৭৬ —ইন্দুলেখা

ছিন্নপত্র ঃ নির্জন মর্মর

নিখিলদার দিনলিপি থেকে কয়েক পৃষ্ঠা

২৩.৮.১৯৫৯

১৯৩০ সালের প্রথম দিকটা হবে।

কলকাতায় আছি। জীবনের দিনগুলি তখন অনেকটা কাটছে এই ভাবে—

লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিয়েছি বছর দুই আগে। চাকুরী করব না—কি করব তারও কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য নেই। নিলফামারীতে কিছুদিন স্কুলে শিক্ষকতা করলুম—কিন্তু টিকলো না। তারপর বেকারী জীবনের উপলক্ষ্য টাউনক্লাব, থিয়েটার, পাবলিক লাইব্রেরী, ইত্যাদি নিয়ে মাতামাতি দলাদলি ঠিক আর ভাল লাগল না। ঘরে বসে যে একটু আধটু পড়াশুনা করতুম তাতেও মন বসল না—বেকারী জীবনে কিসেই-বা মন বসবে? তাই তেমনি লক্ষ্যহারা উদ্দেশ্যহীন কলকাতায় চলে এসেছিলুম এই ভাব নিয়ে যে কিছু একটা করা যাবেই,কিন্তু দেখলুম কঠিন জীবনরঙ্গভূমি।

কার্ত্তিকবাবুর সঙ্গে ঘোরাফেরা করি এখানে ওখানে—দরকার হলে গণেশের সাহায্য নিই। তাদের ধরে একটা মেস্ ঠিক করে নিলুম (বোধহয় ৬৯, আমহার্স্ট স্ট্রীট)—একেবারে হতাশ হবার আগে টাইপ রাইটিং ও সর্টহ্যাণ্ড ক্লাশে ভর্ত্তি হলুম। মনে মনে খুশি হলুম ভবিষ্যতের আশায়। এরমধ্যে রংপুরের সুরেশ রায়ের সঙ্গে দেখা করলুম—তিনি তখন একটা বড় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বড় ম্যানেজার। চাকরী করব না মনে মনে ঠিক করছি তবু একটা দরখাস্ত দিয়ে এলুম তিনি বলাতে। দরখাস্ত দিলেই যে চাকুরী নিতে হবে তার হেতু কি? কিন্তু সেখানে তাঁর পারিষদ-বর্গের (প্রায়ই অবাঙালী) কাছ থেকে এমন কতকগুলো কথা শুনতে হল যে মনটা খিঁচিয়ে গেল। কথাগুলি যে সোজাসুজি আমাকে বলা তা নয়—কিন্তু আমাকে উপলক্ষ্য করে। সুরেশ রায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলুম তিনি যেন খুব অপ্রস্তুত হয়েছেন। আমিও অস্বস্তি বোধ করলুম। সেখান থেকে চলে এলুম। আর যাইনি। আর আমার দরখাস্তেরও খোঁজ করিনি।

শ্রদ্ধেয় বারীন ঘোষ—বোমার যুগের—তখন কলকাতায়। তাঁর সঙ্গেও দেখা করলুম। দেখা ও আলাপ হয়ে আনন্দ হল। প্রকৃত স্নেহশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষের কাছে এসেছি বোধ করলুম। তিনি বললেন, "দেখি, কি করতে পারি তোমার জন্য।" শেষ পর্যন্ত তিনি কিছু সুবিধা করতে পারেননি কিন্তু তাঁর স্নেহপূর্ণ ব্যবহার মনে আছে। তিনি আমার জন্য কিছু করতে পারেননি—সেসব সামান্য, তুচ্ছ—তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম, কাছে টেনে নিয়ে আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন, এইটুকুই যথেষ্ট।···

এর পরেই বুঝি ডাক বিভাগের এই চাকুরীর সন্ধান পেলুম—নিলফামারী থেকে চিঠি এল। দাদা সন্ধান দিয়েছেন পণ্ডিচেরী থেকে। শ্রীযুক্ত রজনী পালিত দাদার পরিচিত—শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য—তখন রংপুর পোস্টাল ডিভিশনের সুপারিনটেনডেণ্ট। বগুড়ায় হেডকোয়ার্টার্স, সেখানেই থাকেন। কিন্তু আমি মন দিলুম না। ঘুরে ঘুরে যা পেলুম তাতে আর উৎসাহ লাগল না বারীনদাকে বললুম, তিনি বললেন, "মন্দ কি, নাও না? দুটো একটা ধাপ এগিয়ে Boss হয়ে বসতে পারলে, ব্যস্, তারপরে আর চিন্তা নেই।"

আমি শুধু হাসলুম।

আজ বহু দিন পরে, চাকরীর শেষ প্রান্তে এসে সেই সব

চিন্তা করে নিজের হাসিটুকুই কেবল মনে পড়ছে। এমন সত্য হয়ে ফুটে উঠবে কে জানত? কি রকম আমি Boss হয়েছি আর অজানা নেই—আমারও না, আর কারোও না।

*　　*　　*

১.১.১৯৭১

নূতন বৎসরে লাইনে দাঁড়াইয়া শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের Reception Room-এর দোতলায় উঠিয়া Calendar গ্রহণ করিলাম। দুপুরে মায়ের Music – নববৎসরে মায়ের বাণী—

1971

Blessed are those who take a leap towards the Future.

—The Mother

*　　*　　*

২.১.৭১

সকলেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করে চলেছে কোন এক উদ্দীপনায়, তাঁরা বলেন কর্মের উদ্দীপনায়, আদর্শের প্রেরণায়। এক পরমা শক্তি—এঁরা একে বলেন মাতৃশক্তি—সেই জীবন্ত মূর্তি বক্ষের উপর থেকে তাঁদের চালিত করছে, রক্ষা করছে, ভবিষ্যতের রূপ এঁকে দিচ্ছে। এঁদের কোন হতাশা ছিল না, তাঁদের নিজেদের কোন দুর্ভাবনা ছিল না।

আমার সে উদ্দীপনা নেই, কর্মের প্রতি আকর্ষণ নেই, আমারই দিনগুলি কাটে তাই বিনা উদ্যমে। অহেতুক ছোটাছুটি করছে কেন লোকগুলি? আমিই শুধু প্রশ্ন করি। আমার জীবনে কি অদৃশ্য মাতৃশক্তি কাজ করছে না? করছে বৈকি। তাই তো আমারও হতাশা বলে কিছু নেই। তোমাদের যদি আদর্শ থেকে থাকে আমারও তা আছে। তাই তোমাদের আনন্দের চেয়ে আমারও আনন্দের কমতি নেই।

*　　*　　*

৭.১.১৯৭১

অদ্য আমার জন্মদিন।

৬৮ বৎসরে পদার্পণ করিলাম। মাকে প্রণাম করা হইল না। দাদাকে প্রণাম করিয়া শুধু মায়ের দেওয়া কার্ড গ্রহণ করিলাম। তাঁর জন্য দাদার হাতে ফুল দিলাম।

সেই উপলক্ষে বৌদির ওখানে দুপুরে আহার করিলাম।

অমলেশ একখানা কার্ড পাঠাইয়াছে। অনিল মুখার্জীর বাড়ীতে এই উৎসবের নিমন্ত্রণ আগেই হইয়াছে—৬.১.৭১ তারিখে।

*　　*　　*

১৩.১.৭১

আজ দাদার জন্মদিন।

তিনি ৮৩ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। তাঁহাকে প্রত্যুষে প্রণাম করিলাম। বিকালে তাঁর French ক্লাশের ছাত্রদের সঙ্গে যোগদান করিয়া আশীর্বাদ স্বরূপ মিষ্টি ও তাঁর বই *Yoga of Sri Aurobindo*, Part XI গ্রহণ করিলাম। সবাই মিলিয়া Photo তোলা হইল। তাঁর জন্মদিনে মায়ের বাণী এই রূপ :—

Bonne Fête à Nolini—

avec ma tendresse pour une vie de collaboration et mes bénédictions pour la continuation prolongée de cette heureuse collaboration dans la paix et l'amour.

—La Mère

With my affection for a life of collaboration and my blessings for a long continuation of this happy collaboration in peace and love.

—The Mother

শুভ জন্মদিনে নলিনীকে আমার প্রীতিস্নেহ, সহযোগপূর্ণ জীবনের জন্য আমার আশীর্বাদ—এই সুন্দর সহযোগ চলে যেন দীর্ঘকাল শান্তি আর ভালবাসার ভিতর দিয়ে।

—শ্রীমা

*　　*　　*

৬.৪.৭১

প্রকাশের বেদনা কাউকে থামতে দেবে না। সৃষ্টির আনন্দও সেই কথা বলে। তাই তো প্রকাশিত এই জগৎ—তাই তো সৃষ্টির সমারোহ জগৎময়। যে স্তব্ধতা তোমার হৃদয়ে তারই লীলা ঐখানে—

এসো, এসো আজ সব স্তব্ধতা সরিয়ে আপন হৃদয়কে উন্মুক্ত কর। চিন্ময়ী চেতনাকে উপলব্ধি কর। তিনি কতরূপে

বিরাজমান তোমার ভিতরে, বাইরে, কতরূপে প্রকাশ—জীবন্ত প্রাণরূপে তাঁর আত্মজ্যোতি।

* * *

১১.৫.৭১.

সমুদ্রে সূর্য উঠছে কত ঘন মেঘের আস্তরণ ভেদ করে। কঠিন এবং দুরন্ত দুর্ধর্ষ সে বাধা—কিন্তু জয়ী সে হবেই। সূর্যকে ডুবিয়ে রাখে এমন সাধ্য কার? নিজের অন্তরেব ভাবনাব বস্তুকে ধরা যায় আবার যায়ও না। নিজের থেকে রয়েছে সেখানে যে আলো, যে রূপ, তাদের ধরতে চেষ্টা কর - একদিন তাকে পাবেই।

নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওবে মন, হবেই হবে।

কিন্তু সে বিশ্বাসী কর্মপরায়ণ প্রাণ কোথায়? ঘুমের চোখে, কি দেখাব? সব তো ঝাপসা হয়ে উঠেছে। আরও তা ঝাপসা হয়ে যাবে তোমার ঐ নিরন্তব ভাবনাবিহীনতার চাপে। অতন্দ্র প্রহরী হবে তুমি। তোমার হৃদয়ের দ্বারে জাগবে তুমি। ঘুমাবে না, নুয়ে পডবে না নিদ্রার চাপে। সে তো আসবেই তাব আপন স্থান অধিকারের আশায়। এমনি আমরা দৃঢ় হতে পারি না। একাগ্রতা তীব্র হতে পারে না, তাই লক্ষ্য ভেদ হয় না। হাতের নিশানা ফস্‌কে যায় অল্পেব জন্য। মুক্তি এসে আনন্দকে জীবনদান না করে তাকে দূরে পাঠায়নি।

* * *

৬.৭.৭১

নূতন মানুষ দাস হবে না। সে হবে প্রভু। প্রথমে নিজের, তারপরে জগতেব। মানুষকে আমরা যেভাবে দেখি তাতে সে দাস ছাডা কিছু নয়। তার নিজস্ব কোন ভাষা নেই, তার পছন্দের কোন মূল্য নেই। নির্ধারক যিনি—তার ভিতরের ঈশ্বর—তিনি ঘুমে আচ্ছন্ন। সে ক্রীড়নক প্রকৃতির—পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্রীড়নক। সেই জন্যই বিজ্ঞান হয়েছে তার 'ধর্মশাস্ত্র'—প্রকৃতির খেয়ালগুলির শিক্ষাই সে আমাদের প্রদান করে। তারই রীতিনীতিকে পূজা কবতে বলে। যে দাস সবচেয়ে ধূর্ত সেই হয় মানুষের মাতব্বর।

কিন্তু নূতন মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করবে তার অন্তরে তাই দিযে সে তার জগৎ তৈরী করবে। এক প্রচ্ছন্ন সমন্বয় ও ঐক্যকে ভিত্তি করে সে স্বরাট্ হয়ে উঠবে। তার প্রতিটি প্রকাশভঙ্গি, স্বচ্ছন্দ রাজোচিত ব্যবহারে, তার চলন এবং আচরণ দেখে আমরা নূতন মানুষকে চিনতে পারব।...

যে শক্তি সে প্রয়োগ করবে তা হল দিব্যশক্তি। জয়লাভ তার অহংসম্ভূত হবে না। অহং বাইরের বস্তুকে আশ্রয় করে। কিন্তু সে হবে উচ্চতর ব্যক্তিপুরুষ থেকে। সে আবার বিশ্বাত্মার সঙ্গে একীভূত যেমন তেমনি অন্যান্য ব্যষ্টি আত্মার সঙ্গেও।...সেই শক্তি হল শান্ত স্বচ্ছন্দ এবং আত্ম-নির্ভর। দিব্যশক্তি জোর করে না, শুধুই পূর্ণ করে তোলে। জগতের শক্তিগুলি তার বিরুদ্ধে কাজ করবে না, তবে যন্ত্র হবে। নূতন জ্ঞান হবে বিশাল, গভীর ও সৃজনশীল—তার মূল ভিত্তি হবে বাস্তবিকতায়, কারো ছায়া সে হবে না। প্রতিটি অভিজ্ঞতা প্রতিটি বাক্যের ভিতর দিয়ে জ্বল্‌জ্বল্ করবে, বেদের কথায়—আমাদের বাক্যে,মনে এবং শ্রুতিতে বাস কববে। আপন আলোকে আলোকিত যে জ্ঞান, মন ও বুদ্ধি হবে তার জলন্ত অববাহিকা। এখন যে হৃদয় আসক্তি ও অহং-এর ক্ষেত্র সে ঐ হট্টগোল ও তামস মুক্ত হবে। নির্মল আকাশ তার বিশুদ্ধ উষ্ণতা, বিমল দীপ্তি বিকিরণ করবে। গ্রন্থি ছেদন হযে যাবে -ভিত্তিতে হৃদয়-গ্রন্থি—আর এক সাগবের অনন্ত ও ভীমা জলস্রোতরাজি প্রবাহিত হবে তার ভিতর দিয়ে। যারা আমাদের নিকট-তম কেবল তাদেরই আমরা ভালবাসি না, আমরা ভালবাসি ভগবানের সন্তানদের, শুধু একজন নয়, সকলকে। নশ্বর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষুধা দিয়ে আমরা ভালবাসব না, কিন্তু অপার ও প্রগাঢ় এক ভাগবত আনন্দ, যা ভগবান ও আমাব মিলনে উল্লসিত হযে ওঠে, তাই দিযে ভালবাসব।

নতুন সমাজের ভিত্তিমূলে থাকবে না প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মানবজাতির সমবেত আত্মার ইন্দ্রিয়ানুগ প্রকাশ সেখানে হবে। তারা পরস্পর প্রত্যেকে এক সঙ্গে কাজ করবে—প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভিতব দিয়ে ব্যক্তিগত আত্মার উৎকর্ষ লাভ করবে, প্রত্যেকেব ভিতরে যে দেবত্ব তাকেই ফুটিয়ে তুলবে। মনে করা যেতে পারে যে এটি হবে ভগবৎশক্তি-সম্পন্ন—প্রত্যেকেই যেখানে শ্রেষ্ঠ, কারণ প্রত্যেকেই অখিল এবং অখিলই প্রত্যেকের ভিতরে একই সঙ্গে।

নূতন মানবজাতির এমন গড়ন হবে দেবত্বে আমরা যা আরোপ করি। দেবতা ও মানুষের যে সংযোগ সূত্রটি

আমরা হারিয়ে ফেলেছি নূতন মানব তাকে ফিরিয়ে আনবে। ভাগবৎ শরীরধারী এক জাতি হয়ে উঠবে সে।

যে প্রশ্ন আজ আমাদের সম্মুখে—নূতন মানব অতি-মানব জাতি আসবে কিনা, অথবা যদি আসে তবে কখন, তা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা সেই ভবিষ্যত রূপান্তরের আধার হতে যন্ত্র হতে প্রস্তুত কিনা।

১৩. ৩. ৭২

জীবনের বাঁচবার পালা-শেষের গান কি শুনলাম সেই গভীর রাত্রের স্বপ্নে শোনা গানের সুরে? মাঝে মাঝে এমনি আসে কে? শুনিয়ে যায় আমার কানে, অবশ হয়ে যায় দেহ, স্তব্ধ হৃদয়ের ওঠা-নামা সেই মুহূর্তে—ক্ষণিকের তরে হলেও সমুদ্রের কোন অতলে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে—

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মরণের পথে টান দিয়েছেন যিনি, বাঁচবার পথ দেখাতে কেন এত কৃপণতা তাঁর? সন্ধান যতই কর, নয়নরঞ্জন, আত্মবিমোহন দেবযান দূরেই থাকে, কিংবা ঘুরে চলে যায় বিদ্যুৎগতি যেন ঝল্‌সে দিয়ে। চক্ষু স্থির হল এক জায়গায়। চলবে না আমার যাওয়া সেখানে।

ঘন নীলে লেপে দেওয়া আকাশ। তোমার দিকে তাকিয়ে আঁখি ফিরানো গেল না। মনও উধাও হয়ে ছুটল পাখির মত পাখা মেলে। আদি অন্তহীন ঐ যাওয়া আবেগের কোন স্রোতে দেখা দিল, চেতন অবচেতন চলল এক সাথে, জড়ও বুঝি তার সাথে মিশল গিয়ে ঐ টানে। কিন্তু আকাশ তো স্থির, গতিহীন—প্রাণের সাড়া নেই. তরঙ্গহীন, তবুও দুর্বার তার আকর্ষণ। আঁখির তারকা কার স্পর্শ পেয়ে মনকেও নিয়ে চলল ঐ সুদূর হতে সুদূরে।

হারিয়ে গেলাম নীল আকাশের মায়ায়…

নিখিলদা

(সম্পাদকীয়)

অমলেশ ভট্টাচার্য

সংসারে এমন ব্যক্তি থাকেন, সংখ্যায় তাঁরা বেশি না হলেও, তাঁরা উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের মত। আমাদের সাধারণ জীবন থেকে অনেক দূরে এবং অনেক উঁচুতে। তাঁদের নিয়ে গ্রন্থ রচনা হয়, কথা শুনবার জন্য সভা-সমিতি হয়। কিন্তু আমরা তাঁদের নাগাল পাই না। কখনও নিজেদের পাশে পাই না। হাত ধরে পথ চলতে পারি না। কেবল দূর থেকে প্রণাম করি।

কিন্তু আবার এমন কিছু সহজ সুন্দর মানুষও আছেন, সংখ্যায় তাঁরাও বেশি নন,কিন্তু তাঁরা আমাদের খুব কাছের, খুব আপন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত। তাঁরা পাশে এসে বসেন। আমাদেরই মত জীবনে দুঃখ পান, কিন্তু কখনও কাওকে দুঃখ দেন না। কষ্টের দিনে কাছে গেলে প্রতিকার না পেলেও, সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আনন্দের মুহূর্তে এক সঙ্গে আনন্দ করা যায়। নিতান্ত হতাশা ও আশাভঙ্গের মধ্যে তাঁদের কাছে গিয়ে উৎসাহ পাওয়া যায়। নতুন করে বুক বেঁধে ভরসা করবার সাহস পাওয়া যায়। এই কাদামাটির সংসারে মাটির মানুষ এঁরা। এঁদের জীবন নিয়ে তাই কোন গ্রন্থ রচিত হবে না। প্রশস্তি জানিয়ে কোন সভা-সমিতি হবে না। কেননা সকল প্রশংসা প্রশস্তি থেকে চিরদিন এঁরা দূরে দূরে থাকেন। কথা দিয়ে ধরতে গেলে সব কথার বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। আবার কোন ঘটনা দিয়েও বিশিষ্ট করে পরিচয় পাওয়া যায় না। কি জানি কখন কেমন করে যেন তাঁরা সকল ঘটনার কোলাহল থেকে সরে অন্তরালে গিয়ে দাঁড়ান। উৎসবের দিনে এঁদের আমরা ভুলে যাই। কিন্তু যখন আমরা একা। পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। তখন হঠাৎ দেখি তাঁরাই আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। নিজেরা নিঃসঙ্গ বলেই বোধহয় এমন করে সকলের সঙ্গী হতে পারেন।

বয়সে পিতৃতুল্য হলেও নিখিলদা ছিলেন আমাদের এমনি একজন সঙ্গী। ,সখার মত বন্ধুর মত তাঁকে আমাদের কাছে পেয়েছিলাম। দুঃখে কষ্টে আপদে বিপদে প্রাণ খুলে সব কথা বলে হাল্‌কা হওয়ার মত আর কেউ তো ছিল না আমাদের কাছে। অথচ একবারও খোঁজ নিইনি, তাঁর কি কষ্ট? তাঁর কি অসুবিধা? সদা সন্তুষ্ট হাসি নিয়ে নিজের সকল বেদনাকে আড়াল করে রাখার মত আশ্চর্য আভিজাত্য ছিল তাঁর। কিছু বোঝবার উপায় ছিল না। অথচ জীবনে তাঁর মত দুঃখ কজন পেয়েছে?

কিন্তু সকল দুঃখকে তিনি এক গভীর বৈরাগ্যের মধ্যে পুণ্যস্নান করিয়ে এক শান্ত আনন্দে রূপান্তরিত করে তুলেছিলেন। ভাগ্য তাঁকে বারবার আঘাত করেছে, মানুষ তাঁকে পদেপদে অবহেলা করেছে, কিন্তু তিনি কখনও তার প্রত্যাঘাত করেননি। অভিযোগ করেননি। এমনকি অভিমানও নয়। তাঁর সদাসন্তুষ্ট নির্মল হাসি একদিনও ম্লান হতে দেখিনি। আমরা তাঁকে হেসে বলতাম, ছদ্মবেশী যোগী। তিনি তখন শিশুর মত প্রতিবাদ করতেন। আমরা মনে মনে বুঝতাম, তাঁর সেই সরল সহজ প্রতিবাদই আমাদের কথাকে প্রমাণ করছে। সর্বদা শঙ্কিত হয়ে থাকতেন, কুণ্ঠিত হয়ে পড়তেন অগ্রজের পরিচয়ে তাঁর নাম কখনও এসে পড়লে।

তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল জুড়ে মা শ্রীঅরবিন্দের প্রতি যে গভীর ভালবাসা, সেই ভাবের অনুভবের কেন্দ্র থেকে হয়তো তিনি জীবনকে দেখেছিলেন। তাই জীবনের দুঃখ বেদনাকে

নিতান্ত স্থূল ঘটনাপুঞ্জ বা বস্তুপুঞ্জ বলে ভাবেননি। দেখেছেন আগাগোড়া এক পরিপূর্ণ অনুভূতি নিয়ে। সেই অন্তরের ভাবময়তা নিয়েই জগতের সবকিছু দেখেছেন এবং ভালবেসেছেন। নিতান্ত তুচ্ছ যা, ক্লেশকর যা, যার দিকে আমরা কখনও ফিরেও তাকাই না, সেসবও তাঁর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে, মন ভুলিয়েছে। আর সেই কারণেই, আন্তরিক নয় জেনেও, সাংসারিক জীবনের ক্ষণিক প্রীতি ও আত্মীয়তাকে পর্যন্ত অবহেলা করতে পারেননি।

তাঁর তীব্র সংবেদনশীল কবি-মনের মধ্যে সংসারের সকল দুঃখ বেদনার দোলা এসে লাগত এবং সেসব এক অন্তরঙ্গ সহানুভূতির স্পন্দন নিয়ে আবার ছড়িয়ে পড়ত, অথচ নিজে থাকতেন নিস্তরঙ্গ। আমাদের মধ্যে থেকেও তিনি তাই অন্তরে অন্তরে ছিলেন মায়েরই কাছে। এবং গত ১৩. ৭. ৭৬ তারিখে আমাদের কাছ থেকে তাঁর কায়াটিকেও সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ মায়ের কাছেই চলে গেলেন।

এমন মানুষের কোন কথা দিয়ে কিছু পরিচয় দেওয়া যায় না। কেবল ভালবাসা দিয়ে জানা যায়। কিন্তু আমরা তাঁকে কতটুকু ভালবেসেছিলাম? সেই উপেক্ষিত মানুষটির যে উপলব্ধি, যা আমরা কোনদিন জানতেও চেষ্টা করিনি, সেইখানেই আমাদের প্রীতি আমাদের ভালবাসা। তা আমাদের অদেয় থেকে গেল। তাঁকে আমরা বঞ্চিত করে নিজেরাই বঞ্চিত হয়ে রইলাম।

—রচনাবলী—

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র বাংলা রচনা-সংগ্রহ একত্রে আটখণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, যোগ, ইত্যাদি জীবনের মর্মসত্যের বাস্তব বিশ্লেষণে এবং শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের জীবন-সাধনার গভীর ভাব-অবগাহনে তা সিদ্ধ-স্নাত।

সুদৃশ্য মনোটাইপে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ডবল-ডিমাই সাইজের পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার প্রতিটি বৃহৎ খণ্ড রেক্সিন ও বোর্ড বাঁধাই, মুদ্রণ ও গ্রন্থণ পারিপাট্যে সৌন্দর্যে চিত্তাকর্ষক।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত * মূল্য—২৫·০০ ✆ **দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত * মূল্য—২৫.০০**

সম্পূর্ণ রচনাবলীর গ্রন্থসূচী

সাহিত্য ও শিল্পকলা

প্রথম খণ্ড : ১। সাহিত্যিকা, ২। রূপ ও রস, ৩। আধুনিকী, ৪। শিক্ষা ও দীক্ষা, ৫। রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় খণ্ড : ১। শিল্পকথা, ২। কবির্মনীষী-১ম, ৩। কবির্মনীষী-২য়, ৪। কবির্মনীষী-৩য়

তৃতীয় খণ্ড : ১। বাংলার প্রাণ, ২। মৃতের কথোপকথন, ৩। গানের গান, ৪। ফরাসী যোড়শী, ৫। মারিয়ানা (ফরাসী নাটিকা), ৬। তিন্তাজিলের মৃত্যু (ফরাসী নাটিকা) ৭। অনুবাদমালা (কবিতা)

দেশ-সমাজ-রাজনীতি

চতুর্থ খণ্ড : ১। ভারত-রহস্য, ২। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান, ৩। স্বরাজের পথে, ৪। স্বরাজ-গঠনের ধারা, ৫। শ্রীঅরবিন্দ ও বর্তমান যুদ্ধ, ৬। কালের আহ্বান

পঞ্চম খণ্ড : ১। ভাবীসমাজ, ২। বোলশেভিকি, ৩। নীট্‌শের বাণী, ৪। নারীর কথা, ৫। স্মৃতির পাতা-১ম, ৬। স্মৃতির পাতা-২য়

ধর্ম-সাধনা—জ্ঞান-বিজ্ঞান

ষষ্ঠ খণ্ড : ১। ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা, ২। বেদমন্ত্র, ৩। উপনিষদ—কথা ও কাহিনী ৪। নব্যবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান

সপ্তম খণ্ড : ১। পূর্ণযোগ, ২। দেবজন্ম, ৩। সাধকের কথা, ৪। চেতনার অবতরণ, ৫। আলোর পথে-১ম, ৬। আলোর পথে-২য়, ৭। এ যুগের সাধনা, ৮। তিন কাহিনী, ৯। শতাব্দীর প্রণাম, ১০। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'

সম্প্রতি আবিষ্কৃত আদি কালের রচনা সম্ভার

অষ্টম খণ্ড : "আদি লেখা"

৬৩, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩
৩৪-১৩৫১

শ্রীগুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দ ভবন
৮, শেক্সপীয়র সরণী
কলিকাতা-৭১

India has become the symbol representing all the difficulties of modern humanity.

India will become the land of the world's resurrection—the resurrection of a higher and truer life. —The Mother



The Hooghly Mills Co. Ltd.

MANUFACTURERS & EXPORTERS

10 Clive Row

Calcutta-1

Telegraphic Address
"VICTO" Calcutta

Telephone No
22-5451 (2 Lines)
Codes : Acme & Bentley's
Second Phrase

The National Tape Loom Co.

Manufacturers of SILK, COTTON & GLASS TAPES

7, LYONS RANGE

3rd Floor, Room No. 2

Calcutta-1

Phone : Office : 22-3718/5066

The Lord is with those who love the Truth and His power helps them to conquer. —**The Mother**

★

Cargo Surveyors
Analytical Chemists
Gram : JUTASPECTA
Telex : NOPROB CA 2414
Phone : 240046/47

ESKAPS (INDIA) PRIVATE LTD.
30, Chowringhee Road
Calcutta-700016

THE COLLECTED WORKS
OF
NOLINI KANTA GUPTA

Volume One
Volume Two
Volume Three
Volume Four
Volume Five

VOLUME SIX IS IN PRESS

The collected works of SRI NOLINI KANTA GUPTA, shed a new light on the pressing problems of Man and his future. In the context of the present bewildering conditions of the world, they have a special relevance, and it is hoped that they will aid the modern man in his search of new hope for a new life of unity and harmony.

size : Double demy
pp : 406

Cloth Binding with attractive art-paper jacket.

Price Rs. 15·00 Each

Available at :

SRINVANTU
63, College Street
Calcutta-700073
Ph : 34-1351

Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700012
Ph : 34-2376

Published by : Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry-2

ডব্লিউ-বি-আই-ডি-সি কি আপনার তালিকায় আছে ?

মঞ্জুরীকৃত মোট অর্থ ৩০ কোটিরও বেশী। গত বছরে মোট প্রদত্ত অর্থ ২·৪৭ কোটি টাকা। (তার আগের বছরের ৪৬ লক্ষ তুলনীয়) সাহায্যপ্রাপ্ত মোট শিল্পের সংখ্যা—৯৭। এদের মধ্যে ২৫টির উৎপাদন ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে।

কাদের সাহায্য করা হচ্ছে ? মাঝারী বা বড় বেসরকারী শিল্প যাদের শিল্প সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বাবদ স্থায়ী বিনিয়োগ ১০ লক্ষ টাকার বেশী।

কি জন্য ? বর্তমান শিল্পের যথেষ্ট সম্প্রসারণ (স্থায়ী সম্পদের ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি), বিকীর্ণকরণ বা পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্প স্থাপন।

কেমন করে ? পরিকল্পনা রূপায়নে কার্যকারিতা সম্বন্ধে গবেষণা, শেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ, বিক্রয়কর ফেরৎ, বৈদ্যুতিকশক্তি বাবদ ব্যয়ের আংশিক পরিপূরণ, অকট্রয় করের পরিপূরণ এবং অনুন্নত এলাকায় শিল্পস্থাপনে বিশেষ সাহায্যদান।

ডব্লিউ-বি-আই-ডি-সির সঙ্গতি কতখানি ? শেয়ার মূলধন ৩·৪৩ কোটি টাকা এবং বণ্ড বিক্রয়লব্ধ আয় ৮·৮ কোটি টাকা। শিল্পকে উৎসাহমূলক সাহায্যদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য সরকার দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া শিল্পোদ্যোগীদের শিল্প পরিকল্পনায় এবং শিল্পোন্নয়নে যথাযথ পরামর্শ দেবার জন্য আছেন প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ কর্মীবৃন্দ।

আর কিছু প্রশ্ন আছে ? জনসংযোগ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করুন।

WBIDC

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ডেভালেপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ
২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন : ২২-২৪৪৮, ২৩-১৬১৫, ২৩-১৬২৮

প্রকাশিত হয়েছে

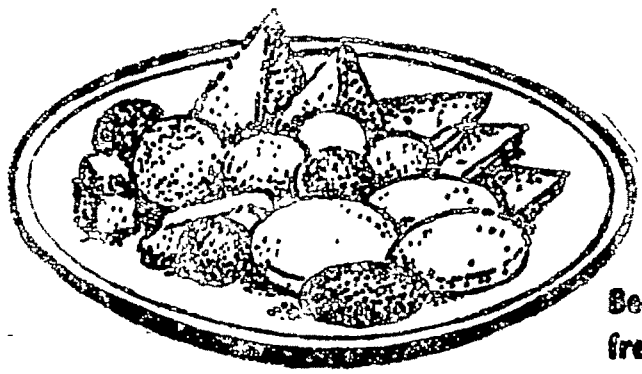
রচনাবলী
শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড : শিল্পকথা

* আগামী কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে—মধুময়ী মা (৩য় খণ্ড) *

Telephone

VANASPATI COOKS A DELICIOUS MEAL— SO WHOLESOME TOO.



Because it's fresh and pure and enriched with Vitamin A and D

Always ask for Telephone Vanaspati. People love its taste. It's a delicious cooking medium. So good for curries, fried foods, western and oriental cooking. It's economical and so pure. Always fresh. It's enriched with Vitamin A and D for extra goodness. Remember to ask for :

Telephone

VANASPATI



cooking medium that's wholesome.

A product of Swastik Vanaspati Products Ltd.

SRINVANTU PUBLICATIONS

সাবিত্রী—শ্রীঅরবিন্দ	...	৩'০০
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪'০০
মধুময়ী মা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২'০০
মধুময়ী মা (২য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২'৫০
কবির্মনীষী (৩য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪'৫০
Light of Lights—Nolini Kanta Gupta	..	8'00
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	..	১'৫০
শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' উপাখ্যান—শ্রীমপিবিষ্ণু চৌধুরী	...	৩'৫০
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র রচনাবলী (৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ)	...	**যন্ত্রস্থ**
রচনাবলী : প্রথম খণ্ড : সাহিত্যিকা	...	২৫'০০
রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড : শিল্পকথা	...	২৫'০০
আলবার পদাবলী—শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	...	১০'০০
মায়ের অবতরণ কেন ?	...	'৫০

॥ 'শৃণ্বন্তু'-র নিয়মাবলী ॥

বৈশাখ হতে 'শৃণ্বন্তু'-র বর্ষ আরম্ভ। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া চলে। বার্ষিক চাঁদা সডাক দশ টাকা, ষাণ্মাসিক পাঁচ টাকা, প্রতিসংখ্যা এক টাকা। ছয় মাসের কমে গ্রাহক তালিকাভুক্ত করা হয় না।

প্রতি বাংলা মাসের ৯।১০ তারিখে 'শৃণ্বন্তু' প্রকাশিত হয়, যথাসময়ে পত্রিকা না পেলে ১৫ দিনের মধ্যে জানালে ভাল হয়।

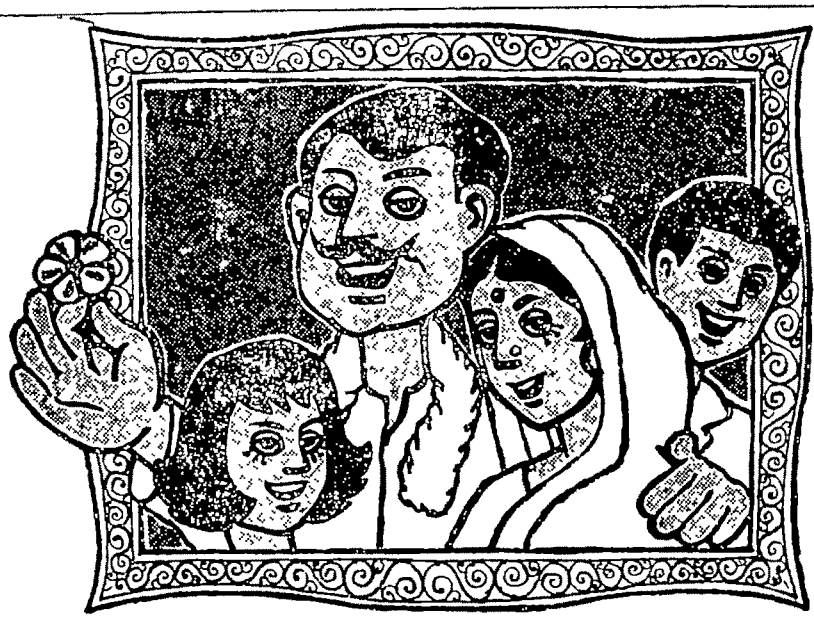
ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তন করতে হলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হলে 'শৃণ্বন্তু' অফিসে জানাবেন। চিঠিপত্রাদিতে যোগাযোগের সুবিধার জন্য গ্রাহকগণ যেন তাঁদের নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সর্বদা উল্লেখ করেন।

'শৃণ্বন্তু'-র চাঁদা মনিঅর্ডার যোগে অথবা পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টও গ্রহণ করা হয়। ভি. পি.-তে পত্রিকা পাঠান হয় না।

বাৎসরিক চাঁদা শেষ হয়ে গেলে তিন মাস অপেক্ষা করা হয় এবং কাগজ যথানিয়মিত পাঠান হয়ে থাকে এরই মধ্যে গ্রাহক যদি চাঁদা না পাঠান বা কোন কিছু জ্ঞাত না করান তাহলে পত্রিকা পাঠান সম্ভব নয়।

লেখকদের প্রতি আবেদন, তাঁরা যেন রচনার নকল রেখে পাঠান। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়।

কর্মাধ্যক্ষ : 'শৃণ্বন্তু'



মাসিক সঞ্চয়ের সহজ পথ, গড়বে সুখের ভবিষ্যৎ

১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদী

ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট

29 NOV 19

*প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে, ২৫ বছর পরে পাবেন ১,৩৩,৮০০ টাকা

প্রতিমাসে সঞ্চয় তো করবেনই কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। ভেবে দেখুন কি ভাবে ও কতটা সঞ্চয় করলে আপনার ও আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটতে পারে আর আপনিও নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

॥ মাসিক সঞ্চয় ও আয়ের তালিকা ॥

মাসিক সঞ্চয়	১০ বছর পরে পাবেন	১৫ বছর পরে পাবেন	২০ বছর পরে পাবেন	২৫ বছর পরে পাবেন
১০৲	২০৬৬৲	৪১৮০৲	৭৬৬০৲	১৩,৩৮০৲
২০৲	৪১৩২৲	৮৩৬০৲	১৫,৩২০৲	২৬,৭৬০৲
৫০৲	১০,৩৩০৲	২০,৯০০৲	৩৮,৩০০৲	৬৬,৯০০৲
১০০৲	২০,৬৬০৲	৪১,৮০০৲	৭৬,৬০০৲	১,৩৩,৮০০৲

প্রতিমাসে যতটা সম্ভব সঞ্চয় করুন। এই প্রকল্পে আপনার সঞ্চয় থেকে আয় অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১ ✲ ফোন : ২৩-৯৭৮৪-৫-৬,
অথবা যে কোন শাখা অফিস

Progressive/UIB 12/75

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ ॥ কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস ॥ কলিকাতা ৯

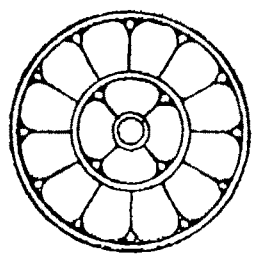
শ্রীঅরবিন্দ

অতীতে মানুষ যা করেছে চিরকাল তারই পুনরাবৃত্তি করে চলা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ হল অভিনব সিদ্ধি, অচিন্ত্যপূর্ব ঈপ্সিতা সব অর্জন করা।

—শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীনলিনীকান্তের

অষ্টাশীতি জন্মজয়ন্তী সংখ্যা



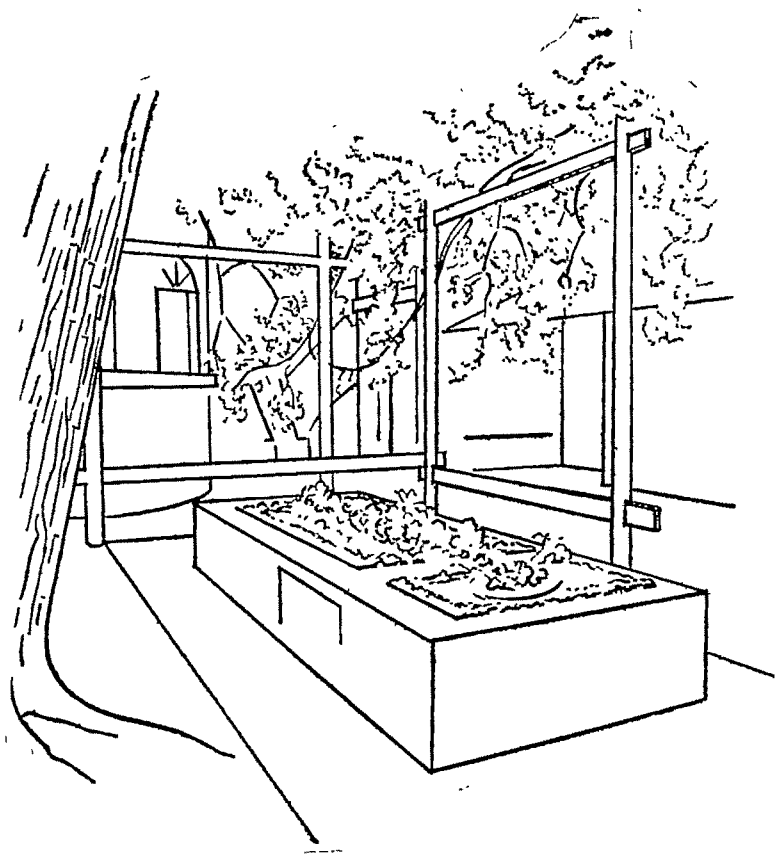
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা :

শ্রী নলিনী কান্ত গুপ্ত

পঞ্চবিংশতি বর্ষ • নবম সংখ্যা • পৌষ ১৩৮৩

শ্বস্তি

পঞ্চবিংশতি বর্ষ : নবম সংখ্যা
পৌষ : ১৩৮৩



শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের
অষ্টাশীতি জন্মজয়ন্তী সংখ্যা

সূচী—

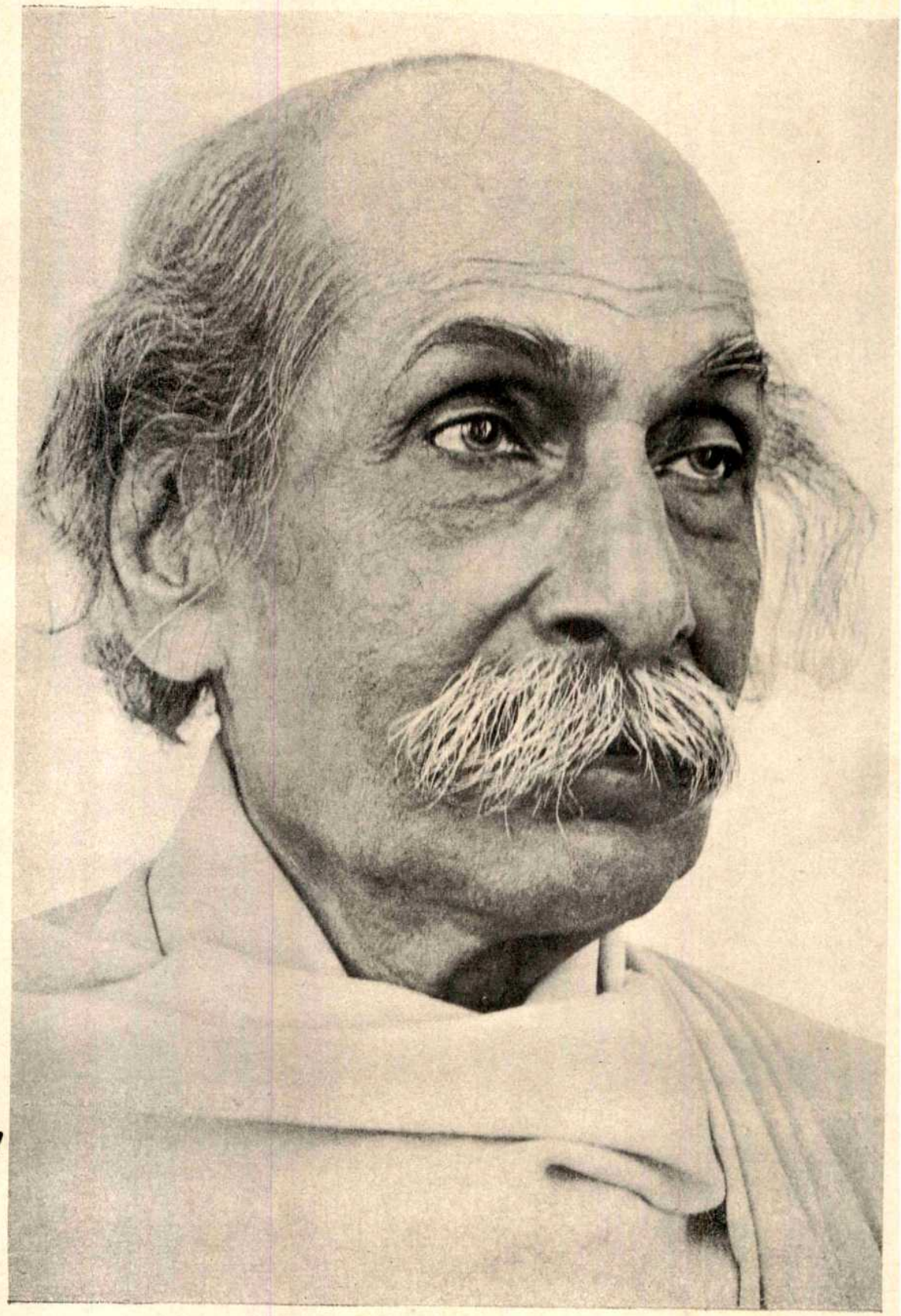
শ্রীঅরবিন্দ
সাবিত্রী ৩০৩
শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা ৩০৮

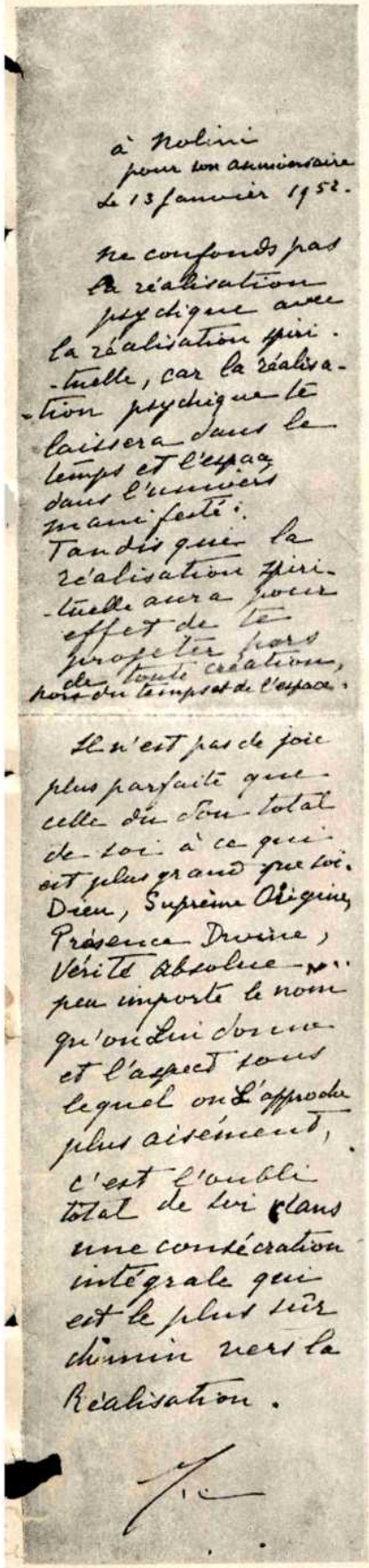
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
আশ্রম প্রসঙ্গে নলিনীদার ঘরোয়া কথা ৩০১
মারিয়ানা (ফরাসী নাটক —অনুবাদ) ৩১১

☆

মূল্য : দেড় টাকা
বার্ষিক সডাক : দশ টাকা

সম্পাদক : অমলেশ ভট্টাচার্য
প্রকাশক ও মুদ্রক : সাম্যকান্তি মৈত্র
সম্পাদকীয় কার্যালয় : শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮ শেক্সপীয়ার সরণী, কলিকাতা-৭১
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং 'শ্বস্তি' কার্যালয়, ৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত
ফোন : ৩৪-১৩৫১




à Nolini
pour son anniversaire
Le 13 janvier 1952.

Ne confonds pas
la réalisation
psychique avec
la réalisation spiri-
-tuelle, car la réalisa-
-tion psychique le
laissera dans le
temps et l'espace
dans l'univers
manifesté.
Tandis que la
réalisation spiri-
-tuelle aura pour
effet de le
projeter hors
de toute création,
des noms du temps et de l'espace.

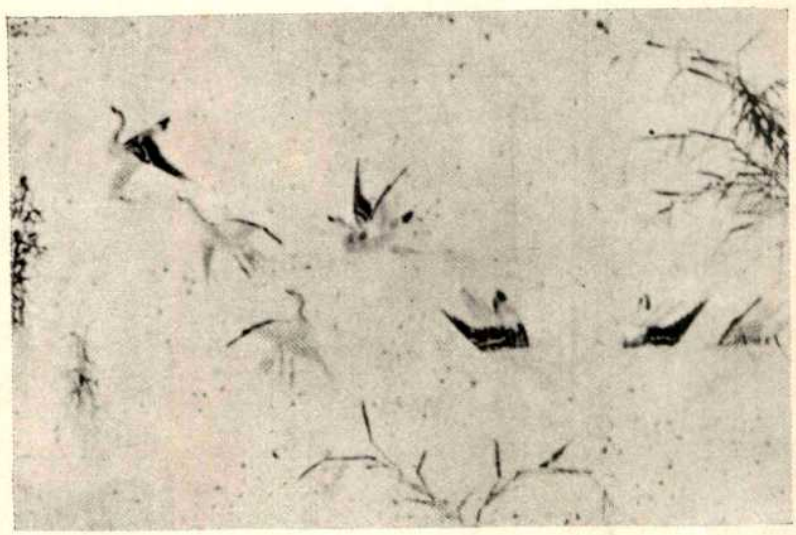
Il n'est pas de joie
plus parfaite que
celle du don total
de soi à ce qui
est plus grand que soi.
Dieu, Suprême Origine,
Présence Divine,
Vérité Absolue — n'importe
peu importe le nom
qu'on Lui donne
et l'aspect sous
lequel on L'approche
plus aisément,
c'est l'oubli
total de soi dans
une consécration
intégrale qui
est le plus sûr
chemin vers la
Réalisation.

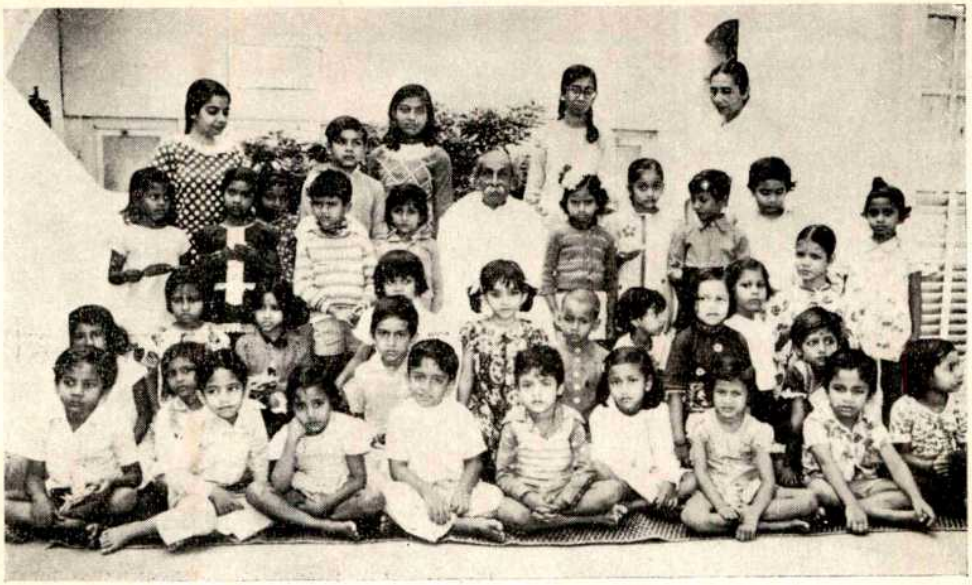
নলিনীদার জন্মদিনে শ্রীমা

১৩ই জানুয়ারী, ১৯৫২

চৈত্যসত্তার উপলব্ধি আর অধ্যাত্মসত্তার উপলব্ধি গুলিয়ে ফেলবে না : চৈত্যসত্তার উপলব্ধি তোমাকে দেশের ও কালের মধ্যে, বিশ্বলীলার মধ্যে ধরে রাখবে। অন্যপক্ষে অধ্যাত্ম উপলব্ধির ফল হবে তুমি নিষ্ক্রান্তি পাবে বিশ্বের বাহিরে দেশ ও কালের বাহিরে গিয়ে। তোমার চেয়ে বৃহত্তর যা তার কাছে পূর্ণ আত্মনিবেদনের চেয়ে অধিকতর আনন্দ আর কোথাও নাই। ভগবান, পরম সুখ, ভাগবত সান্নিধ্য, নিত্য সত্য—যে নামই দাও না কেন তাকে, যেরকম সুলভ আকারেই তার কাছে পৌঁছিতে চাও না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গের মধ্যে অখণ্ড আত্মবিস্মৃতি—এই হল পরম সিদ্ধির দিকে সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত পন্থা।

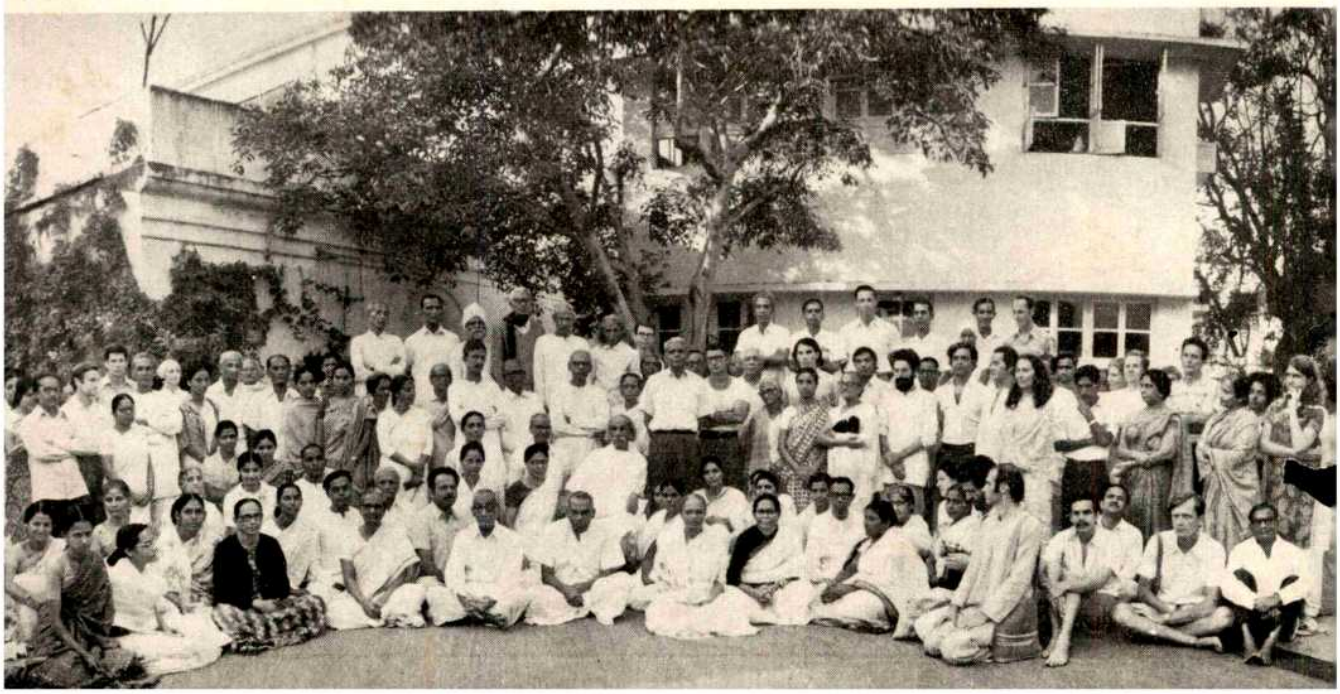
—শ্রীমা





জন্মদিনে আশ্রমের ছোটদের সঙ্গে নলিনীদা

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে জন্মদিনে নলিনীদা



১৩-১-৭৭

(নলিনীদার অষ্টাশীতিতম জন্মজয়ন্তীতে আশ্রমে
তাঁর ফ্লেঞ্চ ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি)

তোমরা আমার কাছে কোন ভাষণ আশা ক'রো না। আমার সুদীর্ঘ জীবনে অনেক তো বলেছি, লিখেছিও অনেক। এখন নীরব থাকব, নীরবতা স্বর্ণময়।

—নলিনীদা

You cannot expect me saying anything. I have said much, have written many things in my long long life. Now silence. Silence is golden.

—Nolinida

পৌষ ১৩৮৩ পঞ্চবিংশতি বর্ষ নবম সংখ্যা

আশ্রম প্রসঙ্গে নলিনীদার ঘরোয়া কথা

মা আমাদের বহুদিন আগেই বলেছিলেন, আশ্রম হল ভারতবর্ষের প্রতিভূ। তার মধ্যে প্রকট হয়েছে ভারতবর্ষের যা কিছু ভাল এবং সেই সঙ্গে যা কিছু মন্দ—তার যত মন্দ গুণাবলী, তার দুর্বলতা যত,যা কিছু কুটিল ও মিথ্যা, মসীময় ও অন্ধকার। এবং যেহেতু আশ্রম সব কিছুর সংহত কেন্দ্র, তাই এখানে তারা প্রকাশ পেয়েছে এক বিশেষ তীব্র রূপে।

এখন ঊর্ধ্ব হতে চাপ পড়েছে পরিবর্তনের এবং সেই উদ্দেশ্যেই যত অন্ধকার অঙ্গ, যা কিছুর পরিবর্তন প্রয়োজন, যা কিছুর পরিবর্জন দরকার তাদের খুলে প্রকট করে ধরা হয়েছে। তারা প্রকট হয়ে উঠেছে সর্বত্রই—আশ্রমে এবং আশ্রমের বাইরেও—সাধারণভাবে সমগ্র দেশেই সেই একই ব্যাধি, একই দুর্বলতা, সেই সব একই ভ্রান্তিময় ক্রিয়াকলাপ, কর্মধারা।

ভারতবর্ষে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে,শাসনতন্ত্র (ইন্দিরা তার নেত্রী) অথবা বলা যায় ইন্দিরা স্বয়ং ; এই সব ক্রিয়াকলাপ দমন ও সংস্কার করতে চেষ্টা করে চলেছে বাহ্য উপায়ের আশ্রয়ে—অনেকাংশে তার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেজন্য ইন্দিরাকে সে শক্তি ও সামর্থ্য দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আশ্রম সৃষ্টি হয়েছিল একটা সচেতন গোষ্ঠিকেন্দ্র হিসাবে যেখানে সব কিছু পরিবর্তিত হওয়া উচিত, কার্যত: সব কিছু সেখানে অবশ্যই পরিবর্তিত হতে হবে, বাহ্য চাপের ফলে বাধ্য হয়ে নয়, আন্তর প্রয়োজন ও প্রেরণার তাগিদে ভিতর হতে ; এবং সেই জন্যই আশ্রমকে এমন সমর্থ কর্তৃপক্ষের আশ্রয় দেওয়া হয়নি যারা এসব কর্মধারা দমন বা শাসন করতে পারে। এখানে পরিবর্তনটি হওয়া প্রয়োজন সচেতন এবং যেমন বলেছি ভিতর থেকে।

আর আমরা যারা এখানে আশ্রমে রয়েছি, তাদের প্রত্যেকেই আবার আশ্রমের এক একটি প্রতিভূ, এখানকার সকল ভাল এবং মন্দ উপাদান, সকল ভাল এবং মন্দ ক্রিয়াবলী কোন না কোন রূপে প্রত্যেকের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়ে আছে—এমনকি যাদের "শ্রেষ্ঠ" বলে গণ্য করা হয় তাঁর মধ্যেও এই সব ভ্রান্ত বৃত্তি ছায়া ফেলতে পারে। সুতরাং প্রত্যেকেরই—বিশেষ করে যারা তথাকথিত "শ্রেষ্ঠ" অর্থাৎ যারা অধিকতর সচেতন তাদের প্রত্যেকের—কর্তব্য হল যা কিছু মিথ্যা ও অন্যায় তা আবিষ্কার ও বর্জন এবং পরিবর্তন করা এবং যা কিছু সত্য

ও উত্তম তাকে পুষ্ট ও বর্ধিত করে ধরা এবং এই ভাবে আশ্রম পরিবেশে এবং তার বাইরেও এই সব উপাদান-গুলিকে পরিবর্তিত, রূপান্তরিত করতে সাহায্য করা ; এই হল একমাত্র সমাধান, একমাত্র প্রতিকার—ব্যক্তিগত ভাবে নিজের মধ্যে, নিজের চেতনায় ব্যাধি নিরাময় করা। তা যদি করা যায়, তবে ক্রমে একটি সচেতন গোষ্ঠী-চেতনা গড়ে উঠতে এবং পরিবর্ধিত পরিণত হয়ে উঠতে পারে এই আশ্রমেই তার এই সব জীবন্ত সচেতন কোষ বা বিন্দু নিয়ে এবং তা পরিবর্তিত করতে পারে শুধু নিজেদের অবস্থাই নয়, ভারতবর্ষের, সেই সঙ্গে পৃথিবীরও অবস্থান্তর ঘটাতে পারে।

আমি এসব কথা বলছি, স্মরণ রেখে সেই অন্তঃস্থ বীজমন্ত্র—সেই শক্তিশালী বীজ, যা থেকে গড়ে উঠবে, যা থেকে ভবিষ্যতের নূতন সৃষ্টি রূপ নেবে। মূল কেন্দ্রটিকে হয়ে উঠতে হবে এমন একটি বীজ—অন্ততঃ তার কেন্দ্র বিন্দুতে হতে হবে তার আপন নিজস্ব আন্তর কেন্দ্র এই সচেতন অন্তর-কেন্দ্রটিই তার জাগ্রত আত্মা।

মা-ও বলেছেন যে যেহেতু ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর প্রতিনিধি বা প্রতিভূ ঠিক যেমন আশ্রম প্রতিভূ ভারতবর্ষের এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এখানে আবার একই ভাবে প্রতিভূ আশ্রমের—সেই হেতু সকল বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করতে হবে ভারতবর্ষে। কারণ ভারতবর্ষের আছে সে ক্ষমতা, এবং বস্তুতঃ এ তার নিয়তি নির্বন্ধ। ভারতবর্ষ যেদিন তার সমস্যার সমাধান করতে পারবে, সারা বিশ্ব সেদিন দেখবে তার সব সমস্যার সমাধান স্বভাবতঃই হয়ে গেছে। আর প্রত্যাশা ছিল যে আশ্রমই ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের পথ দেখাবে। আশ্রম তার কর্তব্য সম্পাদন করবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে কি? তার জন্য সে প্রস্তুত? অন্ততঃ মায়ের তাই ইচ্ছা ছিল। এখন সবই নির্ভর করছে আশ্রমবাসীদের উপর।

অবশ্য সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে মায়ের সাহায্য সর্বদাই সঙ্গে আছে।

৯ই সেপ্‌টেম্বর, ১৯৭৬

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

২য় পর্ব—বিশ্ব পর্যটক

ত্রয়োদশ সর্গ—মনোময় পুরুষ

অবশেষে এল এক আকাশ নির্মুক্ত উদাসীন,
নীরবতা সেখানে শোনে বিশ্বগত কণ্ঠ,
প্রত্যুত্তর দেয় না তবু লক্ষ লক্ষ আহ্বানে ;
অন্তরাত্মার অন্তহীন জিজ্ঞাসা পায় না কোন সাড়া।
আকস্মিক সিদ্ধান্ত শেষ টেনে দেয় সকল উন্মুখী আশায়
গভীর বিরতি এক বিপুল প্রশান্তিমাঝে,
অন্তিম পদ চিন্তার সর্বশেষ পৃষ্ঠায়,
তারপর নির্বাক শান্তির অবকাশ আর শূন্যতা।
সেখানে থেমে গেল লোকরাজির ঊর্ধ্বগামী শ্রেণীপরম্পরা।
দাঁড়ায়ে সে তুঙ্গ ব্যোমপ্রসারে বিশাল বলয়ের উপরে
নিঃসঙ্গ নিয়ে আপন বিরাট মনোময় পুরুষ
তার বিশালতার ক্ষুদ্র এক কোণে ধারণ করে সমগ্র জীবনধারা।
সর্বেশ্বর, নিস্পন্দ নিঃসঙ্গ,
আপন সৃষ্ট জগতের সঙ্গে যোগাযোগ নাই তার,
কর্ণপাত করে না সে বিজয়ের বৈজয়ন্তী সঙ্গীতে,
অনুদ্বিগ্ন সে আপন ব্যর্থতায়,
শোনে শোকের চীৎকার, নির্বিকার সে,
সমানে দৃষ্টি তার পড়ে পাপের পুণ্যের পরে,
দেখে, এসেছে প্রলয় তবু অচল সে।
সমানে একই হেতু সকল জিনিসের, নিঃসঙ্গ দ্রষ্টা
বহুল রূপাবলীর অধীশ্বর,
কর্ম করে না তবে বহন করে চলে সকল চিন্তা-সকল কর্ম,
প্রকৃতির অগণিত ক্রিয়াবলীর সাক্ষী প্রভু
স্বীকৃতি দেয় প্রকৃতিশক্তির সকল গতিধারায়।

অশ্বপতির মন প্রতিফলিত করে এই বিপুল নিশ্চলতা।
সাক্ষী এই স্তব্ধতা মননপুরুষের প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা :
নিস্তব্ধ গভীরে লুক্কায়িত বাক্ হয় গঠিত,
লুক্কায়িত নীরবতা হতে কর্ম জন্মগ্রহণ করে
কণ্ঠমুখর মানসের এই শ্রমরত বিশ্বে ;
শাশ্বত বপন করে যে বীজ গোপনে ঘিরে রাখে তারে
নৈঃশব্দ্য, অন্তরাত্মার অলৌকিক জন্মস্থান।
ভগবানের প্রত্যাহৃত কালাতীত পরম স্তব্ধতায়
সাক্ষী পুরুষ আর সক্রিয় মহাশক্তি মিলেছে ;
নীরবতা জানে আপনি আপনাকে, চিন্তা গ্রহণ করে রূপ :
দ্বৈতশক্তি হতে স্বয়ম্ভু সৃষ্টি প্রকট হল।
স্তব্ধ আত্মার মধ্যে নিবাস করে অশ্বপতি, আত্মারও নিবাস তারই মধ্যে ;
তার নির্বাক কালাতীত যত অতলের শ্রুতি,
তার বিশালতা তার নিস্তব্ধতা হয়ে ওঠে তারই আপনার ;
তারই সঙ্গে একসত্তা হয়ে অশ্বপতি হয়ে ওঠে বিশাল, শক্তিময়, মুক্ত।
গড়ে তোলে যে আপনার কল্পিত দৃশ্যাবলী,
হারায় না আপনাকে যা-কিছু দেখে তার মাঝে,
সাক্ষী সে আপনার মাঝে আপনা রচিত নাটকের,
তেমনি দৃষ্টি দেয় জগতের পরে, নিরীক্ষণ করে চলে তার দিশারী চিন্তাধারা
নয়নে তাদের ছন্দায়িত জ্যোতির্ময় ভবিষ্যবাণী,
চলে যায় সেখানে শক্তিরাজি বাতাসের আগুনের পদভরে—
উঠে এসেছে তারা তার অন্তরাত্মার মৌন গহ্বর হতে।
সবই এখন যেন সে জেনেছে বুঝেছে ;
কোন বাসনা এল না, এষণারও নাই কোন প্রেরণা,
মহান্ চঞ্চল জিজ্ঞাসু হারাল তার কর্মভার ;
কিছুই কাম্য নয়, কিছুরই অভাব নাই।
সেখানেই সে রয়ে যেতে পারে আত্মাকে, নৈঃশব্দ্যকে লাভ ক'রে :
অন্তরাত্মা তার লভেছে শান্তি, লভেছে জ্ঞানে বিশ্বসমষ্টি।
সহসা তখন জ্যোতির্ময় অঙ্গুলি এক নির্দেশ করে
যা-কিছু সে দেখে স্পর্শ করে শ্রবণ করে অথবা অনুভব করে,
তার মনকে বুঝিয়ে বলে কিছুই জানা সম্ভব নয় ;
পৌঁছিতে হবে সেখানে জন্মে যেখানে সকল জ্ঞান।
সন্দিগ্ধ জ্যোতির্লেখা ছত্রভঙ্গ করে দেয় এই যা কিছু পরিদৃশ্যমান,

চিন্তার ইন্দ্রিয়ানুভবের মূলে গিয়ে অবধি আঘাত করে।
নির্জ্ঞানের বিশ্বে এক তারা বৃদ্ধি পেয়েছে,
আস্পৃহা তাদের অতিচেতন এক সূর্যের দিকে,
ঊর্ধ্বতর স্বর্গের রৌদ্রে আর বর্ষণে খেলে চলে তারা,
যতই তারা উঠে চলুক পৌঁছে না কভু সেখানে,
ওপারে চলে যায় না যত তীক্ষ্ণ হোক না তাদের দৃষ্টি।
সন্দেহ এক ক্ষয় করে দেয় ক্রমে চিন্তার যন্ত্রটিকে অবধি,
অবিশ্বাস ঘিরে ধরে মনের যন্ত্রাবলী যত ;
যা-কিছু সে গ্রহণ করে বাস্তবের সমুজ্জ্বল মুদ্রারূপে,
প্রমাণিত ঘটনা, স্থির অনুমান, সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তরূপে,
সুদৃঢ় মতবাদ অথবা সর্বসম্মত অর্থরূপে,
দেখা দেয় যেন প্রতারণা যত মহাকালের ধনভাণ্ডারে জমার হিসাবে
অথবা মহাসত্যের রাজকোষে মূল্যহীন সম্পত্তিরূপে।
অজ্ঞান এক স্বস্তিহারা সিংহাসনে
আচম্বিতে রাজশক্তির পোশাকে ভূষিত হয়ে
জ্ঞানের মূর্তি এক অনিশ্চিত বাক্যাবলীর ছদ্মবেশে
আর তুচ্ছ চিন্তা-রূপাবলী যত, উজ্জ্বল তবে নয় যথাযোগ্য।
অন্ধকারের শ্রমিক সে অর্ধ-আলোকে অন্ধপ্রায়,
যা সে জানে তা হল ভগ্ন দর্পণে প্রতিবিম্ব,
যা সে দেখে তা সত্য বটে কিন্তু দৃষ্টি তার অসত্য।
ভাবরাজি যত তার বিপুল ভাণ্ডারে
মৃদুমন্দ আরাব যেন ক্ষণিকের মেঘে—
নিঃশেষ হয়ে যায় ধ্বনির মধ্যে, রেখে যায় না কোন চিহ্ন।
দুঃস্থ কুটির এক দোলে যেন অনিশ্চিত বাতাসে ;
সূক্ষ্ম চতুর যে জালের চারিদিকে ঘুরে চলে সে
তাকে ব্রহ্মাণ্ডের বৃক্ষপয়ে ক্ষণতরে রেখেছে টাঙ্গিয়ে,
আরাব নিজের মধ্যে সংগৃহীত করে ধরে,—
এ হল তার কৌশলমাত্র জীবনের খাদ্য কীট যেন সংগ্রহের তরে,
চিন্তারাজি ক্ষীণজীবী উড়ে চলে ক্ষণিকের আলোকে
হারায় প্রাণ, মনের আড়ষ্ট রূপের মধ্যে বাঁধা পড়ে যখন,
তুচ্ছ লক্ষ্য যত মানুষের ক্ষুদ্র পরিমাপে দেখায় বিপুলকায়,
কল্পনার সমুজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গমালা,
ঊর্ণনাভের জালে বাঁধা ধারণা যত জীবন্ত নয় আর।

গড়ে তোলা সব সিদ্ধান্তের মায়াকুটির—
রচিত তা ধূলিরাজির বিলসন আর উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে,
গর্ভগৃহে তার বিরাজে সত্যবস্তুর মূর্তি শুধু,
হয়েছে সে সম্পুটিত উৎস তার নির্জ্ঞানের মধ্যে।
রয়েছে শুধু আভা এক প্রতীক ঘটনাবলীর,
তাদের প্রভার তলে গোপন রহস্যকে ঘিরে রাখে তারা,
মিথ্যা যত প্রতিষ্ঠিত গোপন সদ্বস্তুর উপরে
যেখানে তাদের প্রাণধারা যতদিন না কাল-কবলিত হয় তারা।
মন আমাদের নিহত অতীতের প্রেতাবাস,
ধারণাসব প্রস্তরীভূত হয়ে যায় পুরাতন সত্যের অপচ্ছায়া যেন,
ভগবানের স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়মের সূত্র দিয়ে বাঁধা
বিচারবুদ্ধির সাজান-গোছান দপ্তরে শ্রেণীবদ্ধ স্তূপ সব,
বিপুল হারান সুযোগ সব হয়েছে সমাহিত,
অথবা কর্মাগার যেন আত্মার জীবনের অপব্যবহার হয় শুধু
মানুষের হাতে স্বর্গের অবদান সব হয় অপচয়
তার কল্যাণে প্রকৃতির ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায়.
রঙ্গমঞ্চ যেন অজ্ঞানের প্রহসন দেখায়।
বিশ্ব যেন দীর্ঘ যুগ-যুগান্তরের ব্যর্থতাকাহিনী :
সবই নিষ্ফল হয়ে যায়, নির্বিঘ্ন প্রতিষ্ঠা কোথাও নাই।
ক্ষুরধার আলো এসে দোষ ধরিয়ে দিয়েছে
তাই বিচারবুদ্ধি গড়তে গিয়ে হারিয়েছে তার আত্মবিশ্বাস
তার চিন্তার সফল চাতুর্যে ও কৌশলে
যার ফলে অন্তরাত্মা হয়ে পড়ে বাক্-বৈখরীর বন্দী।
তার ঊর্ধ্বতম জ্ঞান হয় চমকপ্রদ অনুমান মাত্র
আর তার লোকরাজির গঠিত বিপুল বিজ্ঞান সৌধ
শুধু ক্ষণিকের আলোকসম্পাত যেন সত্তার আবরণ পরে।
এ হল চিত্রমাত্র ইন্দ্রিয়ের অঙ্কিত,
চিরন্তন রহস্যসকলের পরিবর্তে ছায়া শুধু,
বাস্তবের এক অস্পষ্ট রেখামূর্তি, সমতলের
ঊর্ধ্বতলের পরিকল্পনা বাক্‌রূপ স্থপতির অঙ্কিত
আরোপিত মহাকালের প্রতিচ্ছায়াদের উপর।
সদ্বস্তু স্বয়ং সংশয়ের ছায়াঘেরা ;
মনে হয় যেন পদ্মপত্র ভেসে রয়

বিশ্বনাস্তির রিক্ত জলরাশির উপর।
এই যে মহান্ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা মানসপুরুষ
তা হল শুধু একটা অর্ধদৃষ্টির প্রতিনিধি,
অবগুণ্ঠন এক টেনে দেওয়া হয়েছে অন্তরাত্মা আর মহাজ্যোতির মাঝে,
বিগ্রহমাত্র, ভগবানের জাগ্রতদেহ নয়।
স্তব্ধ চিন্ময়পুরুষ অবধি, চেয়ে দেখে যে আপনার কর্মাবলী,
সেও হল মহান্ অজ্ঞেয়ের এক অস্পষ্ট আনন ;
ছায়ামাত্র মনে হয় সেই বিশাল সাক্ষী আত্মাপুরুষ,
তার মুক্তি তার অচল প্রশান্তি হল
সত্তার শূন্য প্রত্যাহার এক কালকৃত বস্তু হতে,
নয় তা শাশ্বতের আত্মদৃষ্টি।
গভীর শান্তি রয়েছে সেখানে, কিন্তু নাই অনামা সে মহাশক্তি :
নাই সেখানে আমাদের মধুময়ী শক্তিময়ী শ্রীমাতা
যিনি তাঁর সকল সন্তানের জীবন তাঁর আপন বুকের মধ্যে ধবে রেখেছেন,
যিনি আলিঙ্গনে বাহুবদ্ধ করেছেন সমগ্র সৃষ্টি
অনন্তের অতল উল্লাসের মধ্যে,
যে আনন্দ সৃষ্টির জ্যোতির্ময় বীজ
অথবা সেই যে ভাগবত রভসের শুভ্র শিখায়িত আবেগ
যার হাসি ফুটে ওঠে সীমাহীন প্রেমাপ্লুত হৃদয়ের অগ্নিকুণ্ডে।
মনোময় পুরুষের অপেক্ষা বৃহত্তর চিন্ময় পুরুষ এক
মানুষী অন্তরাত্মাব এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে শুধু।
এখানে তো কোন নিঃসন্দেহ নির্দেশ নাই, নাই কোন নিশ্চিত পন্থা ;
ঊর্ধ্বগামী পথরাজি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে কোন অজ্ঞাতের মাঝে ;
শিল্পীর দৃষ্টি রচনা করেছে পারান্তরকে
বিপরীত রূপরেখায়, বিরোধী রঙের খেলায় ;
আংশিক অভিজ্ঞতা পূর্ণকে খণ্ডিত করেছে।
ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে সে, সব শূন্য সব স্তব্ধ ;
তত্ত্বময় চিন্তার সুনীল গগন
ঊর্ধ্বে মিলে যায় এক রূপহারা রিক্ততার মধ্যে।
নিম্নে দৃষ্টিপাত করে সে, সব অন্ধকার সব নির্বাক।
মাঝখানে শোনা যায় কোলাহল এক চিন্তাবৃত্তির আর প্রার্থনার,
সংঘর্ষ এক কষ্টশ্রম শেষ নাই বিরাম নাই তার ;
মিথ্যা অজ্ঞান আকূতি তোলে তার কণ্ঠ।

অস্পষ্ট আরাব, গতিধারা এক, আহ্বান এক,
পুঞ্জীভূত ফেনরাজি, অগণিত কণ্ঠরোল
দুলে চলে যায় প্রাণসাগরের ঊর্মিমালার উপর দিয়ে
এই মানুষী অজ্ঞানের তট বেয়ে বেয়ে।
তার চঞ্চল বিশাল বক্ষপরে
সত্তাসব ও শক্তিরাজি, রূপাবলী, ভাবনাশ্রেণী তরঙ্গমালা যেন
দ্বন্দ্বমত্ত আকৃতির জন্য প্রাধান্যের জন্য,
উঠে চলে ডুবে যায় উঠে চলে পুনরায় কালস্রোতে,
আর এই সুপ্তিহীন অস্থিরতার অতলে
রয়েছে মহাশূন্যতা এক শ্রমক্লিন্ন লোকরাজির জনক,
অতিকায় স্রষ্টা মৃত্যু, অচিন্ত্যময়ী রিক্ততা,
চিরকাল ধরে রয় অর্থহীন আরাব সেই,
চিরকাল সরিয়ে রাখে পরমবাক্যকে,
নিস্পন্দ, প্রশ্ন এবং উত্তর গ্রাহ্য করে না,
প্রশান্ত শয়ান কণ্ঠাবলীর আর গতিধারার তলদেশে
সেই অস্ফুট নিশ্চেতনার মূক অব্যবস্থা।
দুটি আকাশ, অন্ধকারের আর আলোকের,
বাধা দেয় তাদের সীমানা দিয়ে অন্তশ্চেতনার গতিপথে ;
চলেছে তা আপনাকে অবগুণ্ঠিত রেখে আত্মাপুরুষের আনন্ত্য হতে সরিয়ে
এক জগতের মধ্যে যেখানে রয়েছে জীবসব, ক্ষণিকের ঘটনাসব,
যেখানে মৃত্যু হয় জীবনের তরে, জীবন হয় মৃত্যু তরে।
পুনরাবর্তিত মৃত্যুর ফলে অমর সে,
তার কর্মাবলীর বলয়িত পথে পরিক্রমা তার,
তার চিন্তাচক্রের চারিদিকে ধাবমান সে,
তবু সে রয়ে যায় যেমন ছিল সে তার আদি স্বরূপে,
আরম্ভে ছিল যে জ্ঞান তার এখনও তার বেশি জানে না।
অস্তিত্ব হল একটা কারাগৃহ, লয় হল পরিত্রাণ।

(ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত)

অনুবাদ : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দের মূল ইংরাজী রচনার অনুবাদ "শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা"—অনুবাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। এখানে পাণ্ডুলিপির (অনুবাদকের আপন হস্তাক্ষরে) একটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র দেওয়া হল। পাণ্ডুলিপির চতুর্দশ পংক্তিতে পাশে শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্ত লিখিত মন্তব্য।

—সম্পাদক

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা*

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা ভারতের প্রাচীন ঋষিদেরই এই শিক্ষা হইতে আরম্ভ যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপাতদৃষ্ট রূপের অন্তরালে আছে একটি সত্যবস্তু—এক সত্তা ও চেতনা, সকল জিনিসের এক অদ্বিতীয় ও শাশ্বত আত্মা। সকল সত্তা সেই অদ্বিতীয় আত্মা বা স্বরূপের মধ্যে একীভূত—কিন্তু মনে প্রাণে দেহে তাহারা পৃথকভূত, চেতনার এক বিচ্ছিন্নতার জন্য, তাহাদের সত্য স্বরূপ ও বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞানতার জন্য। আন্তঃকরণিক এক সাধনার দ্বারা এই ভেদাত্মক চেতনার আবরণটি দূর করা যায়, সত্যকার স্বরূপকে, আমাদের ও সকলের ভিতরে রহিয়াছেন যে ভগবান তাঁহার সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়া যায়।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষায় বলে যে সেই অদ্বিতীয় সত্তা ও চেতনা এই এখানে জড়ের মধ্যে অন্তর্লীন; বিবর্তনের পথ ধরিয়া তাহা আপনাকে আবার নির্মুক্ত করিতে থাকে—যাহাকে নিশ্চেতন মনে হয় তাহার মধ্যে চেতনা আসিয়া দেখা দেয়, এবং একবার দেখা দিলে তাহা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বে উঠিয়া চলে, আর সেই সাথেই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর পরিপূর্ণতার দিকে আপনাকে প্রসারিত ও পরিণত করিতে থাকে। প্রাণ হইল চেতনার এই নির্মুক্তির প্রথম পদ; মন হইল দ্বিতীয়-কিন্তু মন পর্যন্ত আসিয়াই বিবর্তনের শেষ হয় নাই—বৃহত্তর কিছুর মধ্যে, অধ্যাত্ম ও অতিমানস চেতনার মধ্যে নির্মুক্তির অপেক্ষায় সে আছে। বিবর্তনের পরবর্তী পদটি সুতরাং হইবে অতিমানসের ও আত্মার বিকাশ, ইহাই হইবে চৈতন্যময় সত্তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। কেবল তবেই সকল জিনিসের মধ্যে অন্তর্লীন ভগবান সম্পূর্ণ নির্মুক্তি পাইবেন এবং জীবনের পক্ষে সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা প্রকট করা সম্ভব হইবে।

কিন্তু উদ্ভিদের মধ্যে, ইতর প্রাণীর মধ্যে কোন প্রকার সচেতন ইচ্ছাশক্তি ব্যতিরেকেই প্রকৃতি তাহার বিবর্তনের পূর্ব পূর্ব পদে উঠিয়াছে; মানুষের মধ্যে সে তাহার যন্ত্রের একটা সচেতন ইচ্ছাশক্তির সহায়ে বিবর্তনের ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। তবে এ কাজটি মানুষের মানস ইচ্ছাশক্তি দিয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব নয়—কারণ, মন কিছু দূর অবধি উঠিতে পারে, তারপর একই পাকে কেবল ঘুরিতে হয়। তখন প্রয়োজন একটা ধর্মান্তর, চেতনার একটা আবর্তন যাহার ফলে মনকে উর্ধ্বতর তত্ত্বে পরিবর্তিত হইতে হয়। এই প্রক্রিয়া পাওয়া যায় যোগের যে সুপ্রাচীন আন্তঃকরণিক অনুশীলন ও সাধনা তাহার মধ্যে। তবে অতীতে এই প্রয়াসের জন্য জগৎ হইতে নিবৃত্ত হইতে, স্বরূপের বা আত্মার সমুচ্চে বিলীন হইয়া যাইতে হইতে। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা এই যে উর্ধ্বতর তত্ত্বের অবতরণ সম্ভব, আর তাহাতে অন্তঃপুরুষকে কেবল জগতের বাহিরে লইয়া গিয়া নয়, পরন্তু জগতের মধ্যেই মুক্ত করিয়া ধরিবে, মনের অজ্ঞানতা বা অতিসীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিবর্তে আনিয়া দিবে এক অতিমানস সত্যাত্মক-চেতনা। এই চেতনাই হইবে আন্তর পুরুষের যথাযোগ্য বাহন এবং ইহাকেই আশ্রয় করিয়া আপনাকে অন্তর্মুখী ও কর্মমুখী দুই ভাবেই পাইতে পারিবে এবং এখনও তাহার রহিয়া গিয়াছে যে পাশব মানবত্ব তাহা অতিক্রম করিয়া এক দিব্য-তর গোষ্ঠিতে পরিণত হইতে পারিবে। যোগের চেতনা-অনুশীলনের সাধনাকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে—সেজন্য আধারের যাবতীয় অঙ্গকে খুলিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে তাহার মধ্যে উর্ধ্বতর এবং এখনও প্রচ্ছন্ন অতিমানস তত্ত্ব অবতীর্ণ হইয়া সক্রিয় হইয়া একটা ধর্মান্তর বা রূপান্তর আনিয়া দিতে পারে।

কাজটি অবশ্য অচিরাৎ বা অল্প সময়ের মধ্যে কিংবা অতি ক্ষীপ্র বা অলৌকিক কোন রূপান্তর দিয়া সম্পন্ন করা

---

*শ্রীঅরবিন্দের মূল ইংরাজী থেকে অনুবাদ

যায় না। সাধককে অনেক ধাপ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়- তারপরে তবে অতি-মানসের অবতরণ সম্ভব। মানুষের জীবন বেশির ভাগ তাহার বাহ্য মন প্রাণ দেহকে ধরিয়া চলিয়াছে ; কিন্তু মানুষের মধ্যে মহত্তর সম্ভাবনা সব লইয়া আছে এক আন্তর সত্তা, ইহারই চেতনায় তাহাকে জাগিতে হইবে। বর্তমানে এই জিনিসটিরই সে পায় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ প্রভাব, আর ঐটুকুই তাহাকে এক বৃহত্তর সৌন্দর্য সামঞ্জস্য শক্তি ও জ্ঞানের অনুসরণে নিরন্তর চলিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। সুতরাং যোগের প্রথম প্রক্রিয়া হইল এই আন্তর সত্তার আয়তনরাজি খুলিয়া ধরা, সেখান হইতে বাহিরের দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়া চলা, বাহ্য জীবনকে একটা আন্তর জ্যোতির ও শক্তির সহায়ে শাসিত করা। ইহারই ফলে সে নিজের মধ্যে আপন সত্যস্বরূপটি আবিষ্কার করে—দেখে তাহা মনপ্রাণদেহগত উপাদানে গঠিত এই স্থূল পাঁচমিশালী পদার্থটি নয়, ইহাদের অন্তরালে স্থিত সত্য বস্তুরই অংশ তাহা, অদ্বিতীয় ভাগবত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। আপন অন্তঃপুরুষের মধ্যে বাস করিতে তাহাকে শিখিতে হইবে, সত্যের অভিমুখে অন্তঃপুরুষের যে প্রবেগ তাহার দ্বারা আধারের অবশিষ্ট অঙ্গসব শুদ্ধ করিয়া, লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া ধরিতে হইবে। তারপরে তবে আধার আপনাকে উপরের দিকে খুলিয়া ধরিতে পারিবে, এবং উপর হইতে সত্যসত্তার এক উর্ধ্বতর তত্ত্ব অবতরণ করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎই পূর্ণ অতিমানস জ্যোতি ও শক্তি আসিয়া দেখা দেয় না। কারণ অতিমানস সত্যাত্মক চেতনা আর সাধারণ মানব মনের চেতনার মাঝে চেতনার অনেক ভূমি রহিয়াছে। এই অন্তর্বর্তী ভূমি সকল খুলিয়া ধরিতে হইবে, ইহাদের শক্তি মনপ্রাণদেহের মধ্যে নামাইয়া আনিতে হইবে। তবেই প্রকৃতির মধ্যে সত্যের চেতনা পূর্ণশক্তিতে কাজ করিতে পারিবে। এই আত্ম-অনুশীলনের বা সাধনার প্রক্রিয়া সুতরাং সুদীর্ঘ ও দুরূহ, কিন্তু ইহার যতটুকু হয় ততটুকুই লাভ—কারণ, উহাই পরিণামে মুক্তি ও সিদ্ধিকে অধিকতর সম্ভব করিয়া তুলিতেছে।

প্রাচীনতর পদ্ধতির এমন অনেক জিনিস আছে যাহা এখানে পথে চলিতে চলিতে দরকার হয়—এক বৃহত্তর প্রসারতার দিকে, স্বরূপের ও অনন্তের অনুভূতি অভিমুখে মনকে খুলিয়া ধরা, যাহাকে বলা হইয়াছে বিশ্ব-চৈতন্য তাহাতে জাগিয়া উঠা, বাসনাকে রিপুকে সম্পূর্ণ অধিগত করা ; বাহ্যিক তপস্যা যদিও মুখ্য কথা নয়, কিন্তু তবুও বাসনা এবং আসক্তি জয় করা, শরীর এবং তার দাবি, লোভ এবং সহজাত সব সংস্কারের উপর অধিকার বা তাহাদিগকে বশে রাখা অপরিহার্য। প্রাচীন পদ্ধতি সকলের যে যে মূলতত্ত্ব তাহাদের এখানে সম্মেলন হইয়াছে—জ্ঞানের পথ ধরিয়া এখানে আছে মনের রূপ-স্বরূপ বিবেক, হৃদয়ের পথে ধরিয়া আছে প্রেমভক্তি সমর্পণ আর কর্মের পথে এখানে ইচ্ছাশক্তিকে স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্য হইতে সরাইয়া লইয়া সত্যের দিকে, অহং অপেক্ষা এক বৃহত্তর সত্যের সেবায় প্রচালিত করা হইতেছে। সমগ্র সত্তাটি এমনভাবে প্রস্তুত করিয়া তোলা প্রয়োজন—যেন বৃহত্তর জ্যোতির ও শক্তির পক্ষে যখন স্বভাবের মধ্যে আসিয়া কাজ করা সম্ভব হইবে তখন সে তাহাতে সাড়া দিতে পারে, আপনাকে রূপান্তরিত করিতে পারে।

এই সাধনায় গুরুর প্রেরণা, এবং কঠিন কঠিন অবস্থায় তাঁহার সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণ ও উপস্থিত অপরিহার্য প্রয়োজন। তৎব্যতিরেকে এপথে বহু পদস্খলন ও ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়া না চলিয়া আর উপায় থাকে না, আর তাহাতে সাফল্যের সকল সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া যায়। গুরু তিনিই যিনি একটা উচ্চতর সত্তার ও চেতনার মধ্যে অধিরোহণ করিয়াছেন এবং ইহারই প্রকাশ বা প্রতিনিধিরূপে তিনি প্রায়শঃ গৃহীত হইয়া থাকেন। তিনি কেবল তাঁহার শিক্ষা দ্বারা এবং আরও বেশি স্বীয় প্রভাব ও দৃষ্টান্ত দ্বারাই সাহায্য করেন না—অধিকন্তু তাঁহার আছে অপরের মধ্যে তাঁহার নিজের উপলব্ধিকে সঞ্চারিত করিবার ক্ষমতা।

ইহাই শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা ও সাধনা-প্রণালী। কোন একটি বিশেষ ধর্মকে পরিপুষ্ট করা অথবা প্রাচীনতর ধর্মাবলি সব মিলাইয়া এক করা কিংবা নূতন একটি ধর্ম স্থাপন করা তাঁহার লক্ষ্য নয়। ইহার যে কোনটি তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে দূরে লইয়া যাইবে। তাঁহার যোগের একমাত্র লক্ষ্য এক আন্তর আত্মবিকাশ, এবং যাহারা এ যোগ অনুসরণ করিয়া চলিবে তাহারা প্রত্যেকে যথাসময়ে সর্বভূতস্থ অদ্বিতীয় আত্মাকে আবিষ্কার করিতে পারিবে, মানস চেতনা অপেক্ষা এক উর্ধ্বতর চেতনাকে, মানব প্রকৃতি রূপান্তরিত দেবায়িত করিয়া ধরিবে এমন এক অধ্যাত্ম ও অতিমানস চেতনাকে প্রকটিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবে।

অনুবাদ : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

মারিয়ানা

(Alfred de Musset কৃত *Les Caprices de Marianne* নাটকের অনুবাদ)

অনুবাদ-- শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ব্যক্তিগণ

ক্লোদিও (Claudio)—হাকিম

কেলিও (Cœlio)

অক্তাভ (Octave)

তিবিয়া (Tibia)—ক্লোদিওর অনুচর

মালভোলিও (Malvolio)—হেরমিয়ার গোমস্তা

সরাইখানার ছোকরা

মারিয়ানা (Marianne)—ক্লোদিওর পত্নী

হেরমিয়া (Hermia)—কেলিওর মাতা

সিযুতা (Ciuta)—জনৈকা বৃদ্ধা

ভৃত্যবৃন্দ

ঘটনা—নেপলস (Naples) শহরে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ক্লোদিওর বাটীর সম্মুখে একটি রাস্তা।

(মারিয়ানা উপাসনা-পুস্তক হাতে করিয়া বাটী হইতে বাহির হইতেছিল ; সিয়ুতা তাহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল।)

সিয়ুতা

ভদ্রে, আপনাকে একটা কথা বলতে পারি কি ?

মারিয়ানা

কি চান আপনি ?

সিয়ুতা

এই শহরের একটি ছেলে আপনার প্রেমে পাগল ; পুরো একটি মাস ধরে সে আপনাকে কথাটা জানাতে বৃথায় সুযোগ খুঁজে বেড়িয়েছে ; নাম তার কেলিও ; বনেদী ঘরের ছেলে সে, নিজেও দেখতে সুপুরুষ।

মারিয়ানা

হয়েছে, হয়েছে। আপনাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে গিয়ে বলবেন, সময় ও শ্রম তাঁর অযথা নষ্ট হচ্ছে, এ ধরনের কথা আমায় শোনাতে যদি তিনি আবার সাহস করেন তবে আমার স্বামীকে তা জানাবো।

(প্রস্থান)

কেলিও

(প্রবেশ করিয়া) কি হল, সিয়ুতা ? কি বললে ?

সিয়ুতা

তেমনি সাধ্বী, তেমনি গরবিনী সে। বললে, যদি বেশি বিরক্ত করা হয় তবে তার স্বামীকে জানিয়ে দেবে।

কেলিও

হায়! কি হতভাগ্য আমি! আমার এখন মৃত্যুই শ্রেয়। ওঃ! এমন নিষ্ঠুর রমণীও আছে! আর কোন্ উপায় আমার থাকতে পারে ? তুমি আমায় কি করতে বল, সিয়ুতা ?

সিয়ুতা

আমি তোমায় সবার আগে বলি, এখান থেকে সরে যেতে। ঐ যে তার পেছনে আসছে তার স্বামী।

(উভয়ের প্রস্থান। ক্লোদিও এবং তিবিয়া'র প্রবেশ)

ক্লোদিও

তুমি কি আমার অনুগত সেবক, আমার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর ? শোন তবে, আমায় একটা ভীষণ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

তিবিয়া

আপনার অপমান ?

ক্লোদিও

হ্যাঁ, আমারই। নইলে, এই বেহায়া সেতারগুলো আমার স্ত্রীর জানালার তলে গুন্‌গুন্ করা কিছুতেই ছাড়বে না। আচ্ছা, সবুর! এখানেই সব শেষ হচ্ছে না।—এদিকে ফেরো একটু ; লোকজন রয়েছে, আমাদের কথা শুনতে পাবে। তোমাকে যে গুণ্ডার কথা বলেছি আজ সন্ধ্যার সময় তাকে নিয়ে আসতে হবে।

তিবিয়া

কিসের জন্যে ?

ক্লোদিও

আমার বিশ্বাস, মারিয়ানা'র গুপ্ত প্রণয়ী আছে।

তিবিয়া

আপনার বিশ্বাস ?

ক্লোদিও

হাঁ। বাড়ীটার চারদিকে গুপ্ত প্রণয়ীর কেমন একটা

গন্ধ বেরিয়েছে। আমার ফটকের সামনে দিয়ে কেউ সহজভাবে চলে যায় না। সেতারের ঝন্‌ঝনানিতে কুটনীর আনাগোনা সব সরগরম হয়ে উঠেছে।

তিবিয়া

কেউ যদি আপনার স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে প্রেমের ছড়া গায় তা কি আপনি ঠেকিয়ে রাখতে পারেন?

ক্লোদিও

না, তা পারি নে; কিন্তু খিড়কী দোরের পেছনে আমি লোক বসিয়ে রাখতে পারি, আর তাকে দিয়ে যিনিই প্রথম ঢুকবেন তাঁর গর্দানটি নেওয়াতে পারি।

তিবিয়া

ছিঃ। আপনার স্ত্রীর প্রণয়ী কেউ নেই। তা হলে আমারও প্রণয়িনী আছে, আপনি বলতে পারেন।

ক্লোদিও

কেন তোমার তা থাকতে পারে না, তিবিয়া? তুমি দেখতে খুব কুচ্ছিৎ বটে, কিন্তু বুদ্ধি রাখ ঢের।

তিবিয়া

তা বটে, তা বটে!

ক্লোদিও

দেখ, তিবিয়া, তুমি নিজেই স্বীকার করছ। না, সন্দেহ করবার আর যো নেই, আমার অপমান জানাজানি হয়ে গেছে।

তিবিয়া

জানাজানি হল কেমন করে?

ক্লোদিও

বলছি জানাজানি হয়েছে।

তিবিয়া

কিন্তু সারা শহরটাতে আপনার স্ত্রী তো সতী-সাধ্বী বলে খ্যাত। তিনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না, এক উপাসনার সময় ছাড়া আর কখনও বাসা থেকে বেরই হন না।

ক্লোদিও

যা বলি আমি, তাই শোনো।—তিবিয়া, একটা ভয়ঙ্কর মতলব বসে বসে ফাঁদছি আমি। কি যন্ত্রণা,—আর বুঝি বাঁচিনে।

তিবিয়া

ও কি কথা।

ক্লোদিও

তোমাকে যা বলি তা অনুগ্রহ করে বিশ্বাস করে নিও।

(উভয়ের প্রস্থান)

কেলিও

(পুনঃপ্রবেশ করিয়া) ধিক্ তার জীবনে, ভরা যৌবনের মাঝে যে হতাশপ্রণয় নিয়ে মজেছে! ধিক্ তার জীবনে, যে একটা মধুর কল্পনার আবেশে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে, অথচ জানে না এ অলীক স্বপ্ন কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে, জানে না প্রতিদানে তার কিছু মিলবে কিনা। তরণীর উপর আরামে সে শুয়ে, আস্তে আস্তে তীর হতে সরে গিয়েছে, সুদূরে দেখছে মায়ার কানন, সবুজ প্রান্তর, তার স্বর্গের ক্ষীণ মরীচিকা। বাতাস তাকে নিঃশব্দে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, কিন্তু সত্যের স্পর্শে জেগে উঠে দেখবে, যে-তীর ছেড়ে এসেছে তা থেকে সে যতদূরে, লক্ষ্য-স্থান থেকেও ঠিক ততদূরে সে পড়ে আছে—আর সামনেও চলবার উপায় নেই, পিছনেও ফেরবার উপায় নেই।

(বাজনার শব্দ শোনা গেল)

ও কিসের সঙ্? অক্তাভকে দেখছি না?

(আক্তভের প্রবেশ)

অক্তাভ

বন্ধুবর মহাশয়, আপনার বিরহ-শ্রী আছেন কেমন?

কেলিও

অক্তাভ! কি পাগল তুই! গালের ওপর তোর যে একহাত পুরু লাল রং। তোর এ সাজ কেন? ভরা দিনের মধ্যে তোর লজ্জা করে না?

অক্তাভ

কেলিও। কি পাগল তুই! গালের ওপর তোর যে একহাত পুরু সাদা রং! তোর এ কালো পোশাক কেন? ভরা উৎসবের মধ্যে তোর লজ্জা করে না?

কেলিও

কেমন ধারা জীবন তোর। হয় তুই মাতাল, না হয় আমিই বা মাতাল।

অক্তাভ

হয় তুই প্রেমে পড়েছিস, না হয় আমিই বা পড়েছি।

কেলিও

চিরদিন যেমন, তেমনি সুন্দরী মারিয়ানার প্রেমে।

অক্তাভ

চিরদিন যেমন, তেমনি শীপ্রাদেশের মদের প্রেমে।

কেলিও

তোর বাসায় যাচ্ছিলুম, এই পথে তোর সঙ্গে দেখা হল।

অক্তাভ

আমি যাচ্ছিলুম আমার বাসায়। আমার বাসাটা আছে কেমন?

এই আটদিন তাকে দেখিনি।

কেলিও

তোকে আমার একটু উপকার করতে হবে।

অক্তাভ

কি বল, কেলিও বাছাধন, আমার। টাকা চাও? তা আর আমার নেই। বুদ্ধি চাও? আমি মাতাল। আমার তরোয়ালখানা চাও? এই ধর, একখানা ভোতা লাঠি। বল বল, আমায় নিয়ে যা খুশি কর।

কেলিও

কতদিন এ ভাবে যাবে? আটদিন বাসায় নেই! তুই মারা পড়বি, অক্তাভ।

অক্তাভ

কখখনো নিজের হাতে নয়; না, ভাই, কখ্খনো নয়। আমি মরতে রাজী, কিন্তু আমার নিজের গায়ে নিজে আমি হাত তুলবো না।

কেলিও

তোর যে জীবন, তা কি একরকম আত্মহত্যাই নয়?

অক্তাভ

মনে কর, দড়ির ওপর নাচওয়ালা একজন, পায়ে নাল-বাঁধা বুট জুতো হাতে লম্বা বাঁশ, পৃথিবী আর আকাশের মাঝখানে দোল খাচ্ছে, তার ডাইনে বাঁয়ে রয়েছে যত জরাজীর্ণ অস্থিচর্মসার ছোট্ট ছোট্ট চেহারা, যত শুকনো পিঁশে শ্বেতমূর্তি, চতুর দেনদারের দল, আত্মীয়-স্বজনের, বারবনিতার দল; বিকট রাক্ষসদের একটা পুরো পল্টন তার কাপড় ধরে ঝুলে পড়ছে, তাকে ফেলে দিতে চারদিক থেকে টানাটানি করছে; লম্বা লম্বা কথার বহর, বড় বড় শব্দের স্তূপ তাকে ঘিরে যেন কদমে ছুটছে; ভবিষ্যৎবাণী সব মেঘের মত কালো পক্ষ বিস্তার করে তাকে অন্ধ করে ফেলছে। তবুও লঘুপদে সে পুব হতে পশ্চিমে তার পথে চলেইছে। নীচের দিকে যদি তাকায়, তবে পা ফস্কে যায়। বাতাসের আগে সে চলেছে; চারিদিক থেকে যত হাতই প্রসারিত হোক না কেন, সে যে আনন্দের পাত্র নিজে হাতে ধরে রয়েছে, তা কেউ উল্টে ফেলতে পারবে না। ভাই, এই হচ্ছে আমার জীবন, আমার নিজের হুবহু চিত্র।

কেলিও

তুই পাগল, কি সুখী তুই!

অক্তাভ

তুই সুখী নোস্, কি পাগল তুই। আচ্ছা বল তো দেখি, তোর কিসের অভাব?

কেলিও

আমার অভাব শান্তির, সেই মধুর নির্ভাবনার—যার প্রসাদে জীবনটা হয়ে দাঁড়ায় একখানা আরসীর মত, তাতে সব জিনিসেরই ছবি এক নিমেষে ফুটে ওঠে, আবার সবই পিছলে পড়ে যায়। কিন্তু আমার কাছে এক একটা কর্তব্য মর্মান্তিক যন্ত্রণা। ভালবাসাকে তোমরা আর সকলে একটু ক্ষণিক আমোদ বলে মনে কর, আমার কিন্তু তাতে সমস্ত জীবনটা উদ্বাস্ত হয়ে পড়ে। ভাই রে, তুই কখনো জানবি নে, আমার মত করে ভালবাসার অর্থ কি? আমার কাজ-কর্ম সব আমি বিসর্জন দিয়েছি; একটা মাস ধরে দিনে রাত্তিরে এই বাসাটির চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আহা! চাঁদ যখন উঠতে থাকে, তখন ঐ বাগানটির ঐ কোণে, ঐ

ছোট ছোট গাছগুলির তলায় আমি আমার ক্ষুদ্র গানের দলটি জড় করি, নিজে তাল দিতে দিতে শুনতে থাকি তাদের মুখে মারিয়ানার রূপ-কীর্তন ; কি আবেশেই না তখন আমি মুগ্ধ হয়ে যাই! কিন্তু সে তো কোনদিন জানালায় এসে দেখা দিলে না, কোনদিনও তো ঘুলঘুলির উপর তার সুন্দর কপালটি ঠেস দিয়ে দাঁড়াল না!

অক্তাভ

কে মারিয়ানা? আমার আত্মীয়াটি কি?

কেলিও

সে-ই। বৃদ্ধ ক্লোদিওর স্ত্রী।

অক্তাভ

আমি তাকে কখনো দেখিনি, তবুও সে আমার আত্মীয়াই বটে। তোর কাজের ভার সব আমার উপর দিয়ে দে তো, কেলিও।

কেলিও

কত রকমে তাকে আমার ভালবাসা জানাতে চেষ্টা করেছি, সব বিফল। কন্‌ভেন্ট থেকে শিক্ষা পেয়ে সে বেরিয়েছে। পতির উপর অগাধ ভক্তি, কর্তব্যের উপর বড় নিষ্ঠা। তার বাসায় শহরের কোন যুবক যেতে পায় না, তার কাছেও কারো ঘেঁষবার জো নেই।

অক্তাভ

বটে! দেখতে কেমন—সুন্দরী? কি বোকা আমি! তুই যখন তাকে ভালই বাসিস, ওতে কি আর এসে যায়? আচ্ছা, আমার দ্বারা কি হতে পারে?

কেলিও

প্রাণ খুলে বলব? হাসবি না?

অক্তাভ

আমি না হয় হাসব, তুই প্রাণ খুলে বল্।

কেলিও

তুই তার আত্মীয়, সে-বাড়ীতে নিশ্চয়ই ঢুকতে পারবি।

অক্তাভ

পারব কি? তা জানিনে ধরে নে, ঢুকতে পারি। কিন্তু সত্য কথা কি, আমাদের স্বনামধন্য পরিবারটি পাটের গাঁট নয় অর্থাৎ আমাদের পরস্পরের গা-মাখামাখি একটু কম, ছোঁয়াছানি যা চলে, চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে। তবু যা হোক, মারিয়ানা আমার নাম জানে। তোর হয়ে তাকে কিছু বলতে হবে কি?

কেলিও

বিশবার তার মুখোমুখি হতে আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু কাছে গিয়ে বিশ বারই আমার পা টলে গেছে। বাধ্য হয়ে শেষে সিয়ুতা বুড়ীটাকে পাঠিয়েছি। তাকে দেখলে আমার গলা চেপে আসে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় হৃদ্‌পিণ্ডটা বুঝি ঠোঁট অবধি ঠেলে এল।

অক্তাভ

আমিও এ-রকমটি অনুভব করেছি। এমনি করেই, যখন গভীর অরণ্যের ভিতরে শুষ্ক লতাপাতার উপর দিয়ে শিকারী কুকুরটি অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে থাকে আর শিকারী শুনতে পায় তার পাঁজরা ঘেঁষে তৃণগুল্ম সব একখানা পাতলা ওড়নার মত সর্‌সর্ করে সরে যাচ্ছে,তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করে ওঠে, নিঃশব্দে, একটি পা না বাড়িয়ে দিয়ে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে তার অস্ত্রটি তুলে ধরে।

কেলিও

আমার এ অবস্থা কেন? লম্পটদের মধ্যে একটা পুরোনো কথা চলিত আছে না যে, সব মেয়ে-মানুষই এক ধরনের? তবে সব ভালবাসা এক ধরনের নয় কেন? বাস্তবিক অক্তাভ, তুই যেমনভাবে এ মেয়েটিকে ভালবাসবি, কিংবা আমিই আর একটিকে যেমনভাবে ভালবাসব,তেমনি-ভাবে একে কিন্তু আমি ভালবাসতে পারব না। তবুও ভেবে দেখলে মোটের উপর এ জিনিসটা দাঁড়ায় কি? দুটি নীল চক্ষু, দুখানি সিঁদুরে ঠোঁট, একখানি সাদা আলখেল্লা, দুখানি ফুটফুটে হাত। আচ্ছা, তোকে যে জিনিস উৎফুল্ল ও উত্তেজিত করে তুলবে, চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে নেয় তেমনি করে টেনে নেবে, আমাকে সে জিনিস বিষণ্ণ অবসন্ন করে ফেলে কেন? কে বলতে পারে—এতে আছে সুখ, আর ওতে আছে দুঃখ? সত্য যাকে বল, তা ছায়ামাত্র ;

কল্পনাই নাম দাও আর পাগলামীই নাম দাও—তা-ই ও-জিনিসটিকে একটা দিব্যমূর্তি দিয়ে গড়ে তুলেছে। পাগলামীই সৌন্দর্যের সার। প্রত্যেক মানুষ চলেছে একখানা স্বচ্ছ জাল দিয়ে মাথা হতে পা অবধি আপনাকে ঢেকে, সে মনে করছে কত বন, কত নদী, কত সুন্দর মুখ। তার দৃষ্টিতে সমস্ত প্রকৃতিই ঐ মায়াবী জালের আলো-ছায়া-সম্পাতে কত বিচিত্র হয়ে উঠছে। অক্তাভ! অক্তাভ। আমাকে তুই রক্ষা কর্।

অক্তাভ

তোর ভালবাসাকে আমি ভালবাসি, কেলিও! মদের মত তোর মাথার ভিতরে তা ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। আয় দেখি, তোকে আমি উদ্ধার করব। সবুর কর্ একটু, মুখে আমার হাওয়া লাগছে, বুদ্ধিও ফিরে আসছে। হ্যাঁ, মারিয়ানাকে আমি চিনি; সে আমায় না দেখেই ভয়ানক ঘৃণা করে। ছোট্ট পুতুলটি, ভগবানের নাম অনর্গল বিড়-বিড় করতেই লেগে আছে।

কেলিও

যা খুশি তোর তাই কর্, আমায় শুধু ঠকাস নে, এই এক ভিক্ষা তোর কাছে। আমায় ঠকানো খুবই সহজ; নিজে আমি যে কাজ করতে চাই না, পরে যে আবার সে কাজ করতে পারে এমন বিশ্বাস তো আমার হয় না।

অক্তাভ

আচ্ছা, তুই যদি দেয়াল টপ্‌কে পার হ'স?

কেলিও

আমার আর তার মাঝখানে আছে যে একটা মনের দেয়াল, সেটাকে আমি টপ্‌কে পার হতে পারিনে।

অক্তাভ

তুই যদি তাকে চিঠি লিখিস?

কেলিও

আমার চিঠি সে হয় ছিঁড়ে ফেলে, নয় ফিরিয়ে দেয়।

অক্তাভ

তুই যদি আর একজনকে ভালবাসিস? আয়, আমার সঙ্গে রোজালিন্দের ঘরে চল্।

কেলিও

আমার জীবনের দীপ যে মারিয়ানার কাছে; মুখের একটি কথায় সে তাকে নিবিয়ে ফেলতে পারে, জ্বালিয়েও তুলতে পারে। আমার পক্ষে, আর একজনের জন্যে বেঁচে থাকা, তার জন্যে মরার চেয়েও বেশি কঠিন। হয় তাকে আমি পাব, না হয় প্রাণ দেব। চুপ! ঐ যে সে রাস্তার মোড় ঘুরে আসছে।

অক্তাভ

তুই সরে যা, আমি তাকে ধরছি।

কেলিও

সত্যি সত্যি? ঐ রকম পোশাক নিয়ে? মুখটা মুছে ফেল্, তোকে যে পাগলের মত দেখাচ্ছে।

অক্তাভ

এই নে, হল তো? নেশা আর আমি, এমন বন্ধু আমরা দুজনে, ভাই কেলিও, যে আমাদের কখন ঝগড়া-ঝাঁটি হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সে চলে আমার কথায়, আমি চলি তার কথায়। ও-বিষয়ে কিছু ভয় করিসনে। ইস্কুলের ছেলেরাই ছুটির মধ্যে একটা দিনে ভোজ পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে বসে, নেশার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। কিন্তু আমার স্বভাবই যে মাতাল হয়ে থাকা; আমার পক্ষে, ভেবে-চিন্তে কিছু করা অর্থ না ভেবে-চিন্তে চলে যাওয়া; আমি এইভাবে এখনি রাজার সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে আসতে পারি, দেখ না, এই যেমন চল্লেম তোর প্রেয়সীর কাছে।

কেলিও

যেন কেমন কেমন বোধ হচ্ছে—না, তুই যাস্‌নে।

অক্তাভ

কেন?

কেলিও

কেন, তা বলতে পারিনে; আমার মনে হচ্ছে, তুই আমায় ঠকাবি।

অক্তাভ

এই তোকে ছুঁয়ে বলছি, আমার শক্তিতে যদি কিছু হয়, তবে মারিয়ান হবে তোরই, নয় তো কারো হবে না।

(কেলিওর প্রস্থান। মারিয়ানার প্রবেশ, অক্তাভ তাহার সম্মুখে গিয়া)

দেবি। আপনি মুখ ফিরিয়ে যাবেন না, রাণী! এই অধম দীনের উপর আপনার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

মারিয়ানা

আপনি কে?

অক্তাভ

আমার নাম অক্তাভ, আপনার স্বামীর আত্মীয়।

মারিয়ানা

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন? আসুন, ঘরে চলুন, তিনি ফিরে এলেন বলে।

অক্তাভ

তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে আসিনি, ঘরেও আমি চলব না। ভয় হচ্ছে, যে জন্যে এসেছি, তা বললে হয়তো এই মুহূর্তেই আবার আমায় বের করে দিবেন।

মারিয়ানা

তবে সে-কথা না-ই বললেন, আমাকেও আর দাঁড় করিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই।

অক্তাভ

কিন্তু না-বলেও আমার পারবার জো নেই, সুতরাং আপনিও দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনে যান. এই আমার ভিক্ষা। নিষ্ঠুর মারিয়ানা। তোমার চোখের চাহনি যে-বিষম ব্যাধির সৃষ্টি করেছে, তোমার মুখের কথা কি তার কিছুই উপশম করতে পারে না? কেলিও তোমার কি করেছে?

মারিয়ানা

আপনি কার কথা বলছেন? আমি কি ব্যাধি সৃষ্টি করেছি?

অক্তাভ

সে ব্যাধি বড় দারুণ, কারণ তার প্রতিকার নাই। বড় ভীষণ, কারণ এ ব্যাধি নিজের খেয়ে নিজে পুষ্ট, হিতাকাঙ্ক্ষীর হাত থেকে সঞ্জীবনী পানীয় পর্যন্ত ঠেলে ফেলে দেয়। এ ব্যাধি অমৃতের চেয়েও মধুর একটা হলাহলে ওষ্ঠাধর নীলবর্ণ করে ফেলে, মুক্তার মত কঠিন হৃদয়কেও এক অশ্রুবর্ষণে গলিয়ে দেয়। এ এমন ব্যাধি, পৃথিবীর যাবতীয় ওষুধ, মানুষের সমস্ত শাস্ত্র তাকে আরাম করতে জানে না। তাকে আহার দিয়ে পুষ্ট করছে ঐ বাতাসের এক দমকা, একটা শুষ্ক গোলাপের সৌরভ, একটা গানের অন্তরা। মৌমাছি যেমন বাগানের প্রতি কেওড়া থেকে তার মধু আহরণ করে, এ ব্যক্তিও তেমনি তার যাচনার চিবন্তন আহার চুষে নেয় চারিদিকে যা কিছু আছে সেই প্রত্যেক জিনিসটি হতেই।

মারিয়ানা

এ ব্যাধির নামটা আমায় বলবেন কি?

অক্তাভ

সে-নাম উচ্চারণ করবার যোগ্য যে, সেই যেন তা বলে। তোমার নিশীথের স্বপ্ন, ঐ সবুজ লেবুগাছ, এই শীতল জল-প্রপাত তোমাকে সে নাম শিখিয়ে দিক। এক মধুর সন্ধ্যায় তুমি যেন তাঁকে খুঁজতে বেরুতে পার, তা হলে তোমার নিজের অধরের উপরেই তাকে পাবে। তার থেকে তার নাম আলাদা নয়।

মারিয়ানা

মুখে বলতে তা কি এমনি বিপজ্জনক, তার ছোঁয়াচ এমনই ভয়ঙ্কর যে, যে জিহ্বা তার গুণকীর্তন করছে সে-ই তার ভয়ে সন্ত্রস্ত?

অক্তাভ

কানে শুনতে তা কি এমনি মধুর, বোন, যে তুমি জানতে চাচ্ছ? তুমি তো কেলিওকে তা শিখিয়েছ।

মারিয়ানা

সে তবে অজানিতে—আমি একেও চিনিনে, ওকেও চিনিনে।

অক্তাভ

তাদের দুটিকেই যেন এক সঙ্গে চিনতে পার, কখনো যেন তাদের তুমি আলাদা করে না দাও, এই আমার অন্তরের কামনা।

মারিয়ানা

সত্যি-সত্যি?

অক্তাভ

কেলিও আমার প্রাণের সখা—যদি তোমার ঈর্ষা উদ্রেক করা আমার উদ্দেশ্য হ'ত, তবে বলতাম, সে প্রভাতের মত সুন্দর তরুণ গরিমাময়,—আমার একথা তবুও মিথ্যা হ'ত

না। কিন্তু আমি যে চাই তোমার করুণা উদ্রেক করতে, তাই তোমাকে বলব, যেদিন থেকে তোমায় দেখেছে সেদিন থেকে সে মরণের মত শ্রীহীন।

মারিয়ানা

একি আমার দোষ যে সে শ্রীহীন?

অক্তাভ

একি তার দোষ যে তুমি শ্রীময়ী? সে যে তোমা বৈ আর কিছু জানে না। সবসময় তোমার বাড়ার চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। তুমি তোমার জানলার নীচে কাউকে কখনো গান করতে শোননি? মাঝরাত্রিতে কখনো ঐ ঘুলঘুলি, ঐ পর্দা তুলে দেখনি?

মারিয়ানা

ও জায়গাটা সকলেরই, রাত্রিতে ওখানে সবাই গান করতে পারে।

অক্তাভ

সবাই তবে তোমাকে ভালবাসতে পারে? কিন্তু তা তো বলবার যো নেই তোমায়। তোমার বয়স কত, মারিয়ানা?

মারিয়ানা

বেশ প্রশ্ন। যদি বলি আমার কেবল এই উনিশ বছর, তবে আপনার মতে আমার কি করা উচিত?

অক্তাভ

তা হলে, এখনও পাঁচ-ছ'বছর তুমি ভালবাসা পেতে পার, আট দশ বছর ভালবাসতে পার—আর বাকীটা ভগবানের জন্যে রেখে দিতে পার।

মারিয়ানা

বটে। তবে সময়ের আমার সদ্ব্যবহারই হচ্ছে। আমি ভালবাসি ক্লোদিও-কে—আপনার আত্মীয়, আমার স্বামীকে।

অক্তাভ

আমার আত্মীয় আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে গ্রামের মোড়লটি ছাড়া আর বেশি কিছু তৈরী করতে পারবেন না। ক্লোদিও-কে তুমি কখনও ভালবাস না।

মারিয়ানা

কেলিও-কেও না, একথা আপনি তাকে স্পষ্ট বলতে পারেন।

অক্তাভ

কেন তুমি কেলিও-কে ভালবাসবে না?

মারিয়ানা

কেন আমি ক্লোদিও-কে ভালবাসব না? সে আমার স্বামী।

অক্তাভ

কেনই-বা কেলিও-কে ভালবাসবে না? সে তোমার প্রণয়ী।

মারিয়ানা

আরও বলতে পারেন কি, কেনই-বা আমি বসে বসে আপনার কথা শুনছি? তবে আসুন এখন—রসিকতাটা বড় বেশিক্ষণ ধরে চলেছে। (প্রস্থান)

অক্তাভ

তাই তো! তাই তো! চোখদুটি কিন্তু তার বড়ই সুন্দর!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেলিও-র গৃহ

হেরমিয়া, কয়েকজন ভৃত্য, মালভোলিও

হেরমিয়া

ফুলগুলি যেভাবে বলেছি সেইভাবে সাজিয়ে রেখো। তারপর, বাজিয়েদের আসতে বলা হয়েছে কি?

জনৈক ভৃত্য

আজ্ঞে হাঁ, মা ঠাকরুণ। তারা খাওয়ার সময়েই এসে উপস্থিত হবে।

হেরমিয়া

ঘুলঘুলি সব বন্ধ, বড় অন্ধকার হয়েছে—আলো আসতে দাও, দেখো আবার রোদ্দুর যেন না পড়ে। বেশি ফুল আর বিছানার উপর ছড়াতে হবে না। রান্নাটা ভাল রকম হয়েছে তো! আমাদের প্রতিবেশিনী পেরগোলী-গৃহিণী আসছেন কি? ...বাছা আমার বেরিয়ে গেল কখন?

মালভোলিও

বেরিয়ে যেতে হলে আগে ঘরে ফেরা দরকার। রাত্তিরটা তিনি বাইরে-বাইরেই কাটিয়েছেন।

হেরমিয়া

কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই। কাল রাত্রে আমরা দুজনে একসঙ্গে খেয়েছি, তারপর সে আমায় সঙ্গে করে বাড়ীতে ফেরে। আচ্ছা, সকালে যে ছবিখানা কিনেছি, সেটা তার ঘরে টাঙানো হয়েছে?

মালভোলিও

আজ যদি তার বাপ বেঁচে থাকত, তাহলে সে আর এ-রকমটি হত না। লোকে দেখে বলবেই-বা কি, আমাদের ঠাকরুণটির বয়েস এখনও আঠারো বছর পেরোয়নি, আর তিনি তাঁর আদুরে ননী-গোপালটির জন্যে হাঁ করে পথ চেয়ে রয়েছেন!

হেরমিয়া

আজ তার মা বেঁচে আছে তাই সে এ রকমটিই হয়েছে, মালভোলিও। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, তার স্বভাব-চরিত্রের ওপর পাহারাদারী করবার ভার তোমায় কে দিয়েছে? মনে রেখো একটা কথা, কেলিও যেন চোখের সামনে কখন কোন অলক্ষুণে মুখ না দেখতে পায়। ভাগাড়ের কুকুর হাড়ের লোভানি পেলে তা চিবুবার জন্যে যেমন করে মুখ বুঁজে গর্-গর্ করতে থাকে, তেমনি ধরনের তোমারও গর্গরানি যেন কখনো তার কানের কাছে না পৌঁছোয়। তাহলে, বলে দিচ্ছি, তোমাদের কেউ আর এক রাত্রিও এখানে আশ্রয় পাবে না।

মালভোলিও

আমি কিছুর জন্যেই গর্-গর্ করিনে। আমার চেহারাও অলক্ষুণে নয়। আপনি জিজ্ঞেস করলেন, মনিবটি আমার কখন বেরিয়ে গেছেন; উত্তরে আমি বললেম, তিনি ফেরেননি। যেদিন থেকে তাঁর মাথায় লভ্ ঢুকেছে, সেদিন থেকে হপ্তায় চারটিবারও তাঁর দেখা পাওয়া যায় না।

হেরমিয়া

বেশ, তা এই বইগুলো ধুলোমাখা কেন? ও জিনিস-পত্তরগুলোই-বা এলোমেলোভাবে রয়েছে কেন? কিছু দরকার হলে আমাকেই নিজে হাতে সব কিছু করে নিতে হয় কেন? নিজের কাজ অর্ধেক করে ফেলে রেখেছেন, আর পাঁচজনকে তা সেরে নিতে হচ্ছে, তোমারই তো সাজে পরের কথায় সর্দারি করা! যাও, চুপ করো।

(কেলিও-র প্রবেশ)

এই যে বাছা আমার, এসো, এসো। আজকে তোমার কি ইচ্ছে হচ্ছে, বল তো?

(ভৃত্যদের প্রস্থান)

কেলিও

তোমার যা, তাই, মা।

(উপবেশন)

হেরমিয়া

তা বেশ, কিন্তু ইচ্ছের বেলায় এক ঘরে, অনিচ্ছের বেলায় নয়, এরকম ভাগাভাগি যে অন্যায়, কেলিও। আমার কাছ থেকে তোমার গোপন করবার কিছু থাকে, তা নয় থাকল,—কিন্তু তোমার বুক যাতে ক্ষয়ে যাচ্ছে, যাতে করে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তুমি উদাসী হয়ে পড়ছ, এমনতর জিনিস তো গোপন করবার নয়।

কেলিও

গোপন করবার আমার কিছু নেই। যদি কিছু থাকত তবে ভগবানকে বলতেম তাতে এমন ধরনের শক্তি দিতে যেন আমায় একটা পাথরের মূর্তি করে সে ফেলতে পারত।

হেরমিয়া

তুমি যখন দশ-বার বছরটির ছিলে, তখন তোমার সব কষ্ট, তোমার ছোটখাট বেদনা আমারই সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। আমারই এই চোখের একটি কঠোর বা কোমল দৃষ্টির উপর নির্ভর করে ফুটে উঠত তোমারও ওচোখে কান্না কি হাসি। তোমার ছোট্ট দেহটুকু কি একটা সূক্ষ্ম তার ধরে তোমার মায়ের হৃদয়খানি আঁকড়ে ছিল! আর এখন, বাছারে আমার, আমি তো শুধু একজন স্থবিরা আত্মীয়া মাত্র—তোমার দুঃখে শান্তি দেবার শক্তি আমার নেই; কিন্তু তাই বলে তার ভাগও আমি কিছু নিতে পারিনে, তা তুমি মনে ক'রো না।

কেলিও

মা, তোমারও তো এককালে রূপ ছিল। এই যে শুভ্র কেশদাম তোমার গরিমাময় ললাটের ওপর ছেয়ে পড়েছে,

এই যে দীর্ঘ বিলম্বিত বস্ত্রখানি তোমায় ঢেকে রেখেছে, সে সবের ভিতর দিয়ে এখনও যে চোখে লাগে সম্রাজ্ঞীর গতি-ভঙ্গি, কোন এক দেবীর সুঠাম অঙ্গের গঠন। মাগো! তুমিও তো ভালবাসা পেয়েছিলে! তোমার ঈষৎ-উন্মুক্ত গবাক্ষের নীচে বীণা মৃদুমন্দ্রিত হয়ে উঠেছিল—এমনি সব কোলাহল-মুখরিত প্রমোদ-উদ্যানে, এমন সব চঞ্চল উৎসবের ক্ষেত্রে তুমিও দেখিয়ে বেড়িয়েছ তোমার নিশ্চিন্ত গর্বিত যৌবন। নিজে কিন্তু তুমি কখনো ভালবাসনি; আমার পিতার একজন আত্মীয় তোমার প্রেমে প্রাণ দিয়েছে।

হেরমিয়া

কি সব কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ তুমি আমায়?

কেলিও

আহা! সে বেদনা যদি তোমার হৃদয় সইতে পারে, যদি তাতে চোখের জল তোমায় ফেলতে না হয়, তবে ঘটনাটি আমায় বল তো মাগো, সব খুলে বল তো দেখি।

হেরমিয়া

সেই প্রথম। তার আগে তোমার পিতা আমায় কখনো চোখে দেখেননি। তিনি আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন; তাই যুবক অর্শিনি যে আমায় বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছিল তা মঞ্জুর করিয়ে নেবার ভার তিনি গ্রহণ করলেন। পদমর্যাদা অনুসারে তাঁকে আমার পিতামহ আদর-অভ্যর্থনা করলেন, আর মুহূর্তের মধ্যেই দুজনে দুজনার অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন। অর্শিনি যোগ্য পাত্রই ছিল, তবুও তাকে আমি প্রত্যাখ্যান করলেম। তোমার পিতা তার হয়ে যেভাবে বক্তৃতা করলেন, তাতে দু-মাস ধরে অনবরত চেষ্টায় যে ভালবাসাটুকু আমার হৃদয়ে অর্শিনি জাগিয়ে তুলেছিল, তা সব পণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু আমার উপর টান তার যে কত গভীর ছিল, তখন তা বুঝতে পারিনি—আমার উত্তর পেয়ে সে তোমার পিতার কোলের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ল। এর পরে সে দূর বিদেশে চলে যায় এবং বহুকাল অনুপস্থিত থাকে, আর সে-অবস্থায় অনেক টাকাকড়িও করে। তাতে মনে হয় তার শোকও ক্রমে মুছে আসে। তোমার পিতা তখন ফিরে আর এক ভাব ধরলেন—অর্শিনির জন্যে যে জিনিস চেয়ে তিনি পাননি, নিজের জন্যে তাই চেয়ে বসলেন। তাঁর উপর আমার সত্যকার ভালবাসা ছিল, আর আমার আত্মীয়-স্বজনের মনে এমন শ্রদ্ধা তিনি জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইতস্ততঃ করবার উপায়ও আমার আর থাকল না। সেইদিনই বিবাহের পাকা কথা হল আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুভকর্ম সম্পন্ন হয়ে গেল। এই সময়ে অর্শিনি ফিরে এল। সে তোমার পিতার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলে আর মুখের উপর বললে যে তিনি বিশ্বাসঘাতক, নিজে পাবার জন্যেই অপরকে প্রত্যাখ্যান করিয়েছেন। তাঁর শেষ কথা এই, "আমার মৃত্যুই যদি তোমার ইচ্ছা, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।" এ কথায় ভয় পেয়ে তোমার পিতা আমার পিতার কাছে এলেন, অর্শিনির ভুল দেখিয়ে দেবার জন্যে তাঁকে সাক্ষী মানলেন—হায়! তার সময় হল না, লোকে গিয়ে দেখলে, অভাগা যুবক তার ঘরের মধ্যে ছোরার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে রয়েছে!

তৃতীয় দৃশ্য

ক্লোদিও-র বাগান

ক্লোদিও এবং তিবিয়ার প্রবেশ

ক্লোদিও

তুই ঠিক বলেছিস—স্ত্রী আমার পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। বেশি কি বলব, সে জাগ্রত সতীত্ব।

তিবিয়া

সত্যি সত্যি তা বিশ্বাস করেন?

ক্লোদিও

তুই ই বল্ না, তার খড়খড়ির তলায় কেউ যদি বসে গান গায়, তবে কি সে তা বন্ধ করতে পারে? আর এই গানের দরুন তার মনটাতেও ভিতরে ভিতরে যদি কিছু চাঞ্চল্য জেগে ওঠে, তবে সেজন্য তার স্বভাবটাই দায়ী। আর এক কথা, তার মায়ের মনটাও আজ নেড়ে-চেড়ে একটু দেখলেম, কিন্তু তিনিও সরাসরি আমারই মতে মত দিয়ে ফেললেন।

তিবিয়া

কি বিষয়ে?

ক্লোদিও

এই যে লোকে তার খড়খড়ির তলায় গান গায়।

তিবিয়া

গান গাওয়া তো দোষের নয়, আমিও তো সময়ে-অসময়ে বসে বসে গুন্‌গুন্‌ করি।

ক্লোদিও

কিন্তু ভাল করে গাইতে পারা একটু শক্ত ব্যাপার।

তিবিয়া

শক্ত আপনার আমার কাছে, আমাদের গলা নেই আর চর্চাও কখনো করিনি ; কিন্তু দেখুন তো থিয়েটারের লোক-গুলোকে, কেমন খাসা ও-কাজটা তারা সেরে ফেলে।

ক্লোদিও

জীবনটাই যে তারা কাটিয়ে দেয় ঐ পাটাতনের উপরে।

তিবিয়া

আচ্ছা, বলুন তো, বছরে কত আয় হতে পারে…

ক্লোদিও

কার ? শহর-কোটালের ?

তিবিয়া

না, এক-একজন গাইয়ের।

ক্লোদিও

তা কে জানে। আমার পদের যে মূল্য, তার তিন ভাগের এক ভাগ পায় শহর কোটাল, আর তার অর্ধেক পেয়ে থাকেন সহকারীরা।

তিবিয়া

আমি যদি বড় আদালতের বড় হাকিম হতেম আর আমার স্ত্রীর থাকত যদি নাগর, তবে তাদের আমি নিজেই দণ্ড দিতেম।

ক্লোদিও

কত বৎসর দ্বীপান্তর ?

তিবিয়া

ফাঁসি। ফাঁসির হুকুম জোরে পড়তে কি মজা।

ক্লোদিও

হাকিম নিজে তা পড়েন না, পেশকারে পড়ে।

তিবিয়া

আপনার আদালতের পেশকারের স্ত্রীটি খুব সুন্দরী।

ক্লোদিও

না, আমার আদালতের বড় হাকিমের স্ত্রী সুন্দরী। কালই তো তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছি।

তিবিয়া

পেশকারের স্ত্রীটিও সুন্দরী। আজ সন্ধ্যাবেলায় যে গুণ্ডাটার আসবার কথা আছে, সে পেশকারের স্ত্রীর জার

ক্লোদিও

কোন্ গুণ্ডা ?

তিবিয়া

আপনি যাকে চেয়ে পাঠিয়েছেন।

ক্লোদিও

তোকে বল্লেমই তো, এখন আর তার দরকার নেই।

তিবিয়া

কি বললেন ?

ক্লোদিও

আমার স্ত্রীর কথা।

তিবিয়া

ঐ যে তিনি স্বয়ং।

(মারিয়ানার প্রবেশ)

মারিয়ানা

তুমি তো বেশ চরে বেড়াও, কিন্তু এদিকে আমার কি হয়, তার খোঁজ রাখ কি ? তোমার এক আত্মীয় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

ক্লোদিও

কে সে ! নাম বল তো ?

মারিয়ানা

অক্তাভ। তিনি তাঁর বন্ধু কেলিও-র পক্ষ হয়ে আমার কাছে প্রেম জ্ঞাপন করতে এসেছিলেন। কে এ, কেলিও ? তুমি চেনো কি ? কিন্তু এর বন্দোবস্ত কর, যেন তিনি বা অক্তাভ কেউ আমার বাড়ীতে আর পা না দেন।

ক্লোদিও

কেলিওকে চিনি—আমাদের প্রতিবেশী হেরমিয়ার ছেলে। আচ্ছা, সে-কথার উত্তর তুমি কি দিলে ?

মারিয়ানা

আমি কি উত্তর দিলেম না দিলেম, তা নিয়ে কিছু দরকার নেই। যা বললেম, বুঝলে তো? তোমার লোকদের ডেকে বলে দাও, যেন তারা ও-লোকটি কি তার বন্ধুকে বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়। এদের হাতে আমার অপমানের সম্ভাবনা আছে, তাই দূরে থাকাই আমার পক্ষে মঙ্গল।

(প্রস্থান)

ক্লোদিও

কাণ্ডটা দেখে তুই কি বুঝলি, তিবিয়া? নিশ্চয়ই একটা ফন্দী কিছু এর ভিতরে আছে।

তিবিয়া

আপনি তাই মনে করেন?

ক্লোদিও

কি উত্তর দিয়েছিল মারিয়ানা তা বলতে চাইলে না কেন? প্রস্তাব করাটা বেয়াদবি নিশ্চয়ই কিন্তু উত্তরটাও তো জানার জিনিস। আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেলিওই ও-সব গানবাজনার পাণ্ডা।

তিবিয়া

ও লোক দুটির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র উপায়, ওদের কারুকে বাড়ীতে ঢুকতে না দেওয়া—

ক্লোদিও

সে আমি বুঝব। কথাটা কিন্তু শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে একবার জানাতে হবে। আমার মনে হয় আমার স্ত্রীটি আমায় প্রতারণা করছে। এসব গল্প একেবারে মন-গড়া, উদ্দেশ্য আমায় দিশেহারা করে দেওয়া, আমার সব ধারণা গুলিয়ে দেওয়া··· (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

একটি রাস্তা

অক্তাভ ও সিয়ুতার প্রবেশ

অক্তাভ

তুমি বলছ সব ছেড়ে ছুড়ে দিলে সে?

সিয়ুতা

আহা, বেচারী ছেলে! ভালবাসা কি তার কমেছে? বরং আরও বেড়েছে। সে কিন্তু মনে করছে তার দুঃখের কারণ ওটা নয়, আর একটা কি বস্তু। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় আপনার উপর আমার উপর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপর তার অবিশ্বাস জন্মে গেছে।

অক্তাভ

না, কখ্খনো না। এই পণ করলেম, আমি কিছুতেই ছেড়েছুড়ে দেব না। হ্যাঁ, আমি যেন দ্বিতীয় মারিয়ানা হয়ে উঠেছি। একগুঁয়ে হতে আনন্দ আছে বটে। কেলিও সফল হবে, নয়তো আমার জিভ খসে পড়বে।

সিয়ুতা

কেলিও-র ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি চলবেন?

অক্তাভ

হাঁ, আমার ইচ্ছা অনুসারেই চলব, আমার ইচ্ছা তার ইচ্ছার বড ভাই। কাজী ক্লোদিও বেটাকে জাহান্নামে পাঠাব; তার পা থেকে চুলটি অবধি প্রত্যেক অঙ্গ আমার দু'চক্ষের বিষ।

সিয়ুতা

আচ্ছা, আপনার উত্তর কেলিও-র কাছে আমি নিয়ে যাব, কিন্তু এর মধ্যে আমি আর নেই।

অক্তাভ

বন্ধুর শত্রুকে উৎসন্ন দিতে, কেবল নিজেকে কেন বন্ধুকেও যদি উৎসন্ন যেতে হয়, তা পর্যন্ত আমি করে ফেলতে পারি, এমন ধরনের লোক আমি।

(কেলিও-র প্রবেশ)

সেকি, কেলিও, তুই নাকি হাল ছেড়ে দিয়েছিস?

কেলিও

কি করতে বলিস তবে?

অক্তাভ

আমার উপর তোর অবিশ্বাস? তোর হয়েছে কি? তুই যে বরফের মত সাদা মেরে গেছিস? তোর মনে হচ্ছে কি বল্ দেখি?

কেলিও

ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। যাও, মারিয়ানার সঙ্গে দেখা কর গিয়ে। তাকে বলো, আমাকে প্রতারণা করার অর্থ আমাকে মেরে ফেলা,

আমার জীবন নির্ভর কচ্ছে তারই একটা চাউনির উপর।

(প্রস্থান)

অক্তাভ

কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত!

সিয়ুতা

চুপ করুন। সন্ধ্যা-আরতি বাজছে। বাগানেব দুয়ারটা ঐ খুলল। মারিয়ানা বাইরে চলেছে—ঐ যে আস্তে আস্তে এদিকে এগিযে আসছে।

(সিয়ুতার প্রস্থান, মারিয়ানার প্রবেশ)

অক্তাভ

সুন্দরী মারিয়ানা, তুমি নিশ্চিন্ত মনে এখন ঘুমুতে পার—কেলিও আর একজনকে তার হৃদয় দিয়েছে, তোমার জানালার তলে আর সে গান গাইবে না।

মারিয়ানা

কি পরিতাপ! কি দুর্ভাগ্য! তার মত মানুষের সঙ্গে আমার ভালবাসাবাসি হল না! দেখুন তো, ঘটনাচক্রে সব আমার কেমন উল্টে-পাল্টে গেল। আমি যে তাঁকে ভালবাসতে যাচ্ছিলেম।

অক্তাভ

সত্যি!

মারিয়ানা

সত্যি, এই বুকে হাত দিয়ে বলছি। আজ সন্ধ্যাবেলায় কি কাল সকালে, খুব দেরী হলে এই রবিবারেই আমি তাঁর হয়ে যেতেম। আপনার মত প্রতিনিধি যে পেয়েছে, সে কি আর না জিতে থাকতে পারে? কিন্তু বলতে হবে, আমার উপর আপনার বন্ধুর অনুরাগটা চীনা বা আরবীব মত কিছু হবে! কারণ দোভাষী ছাড়া একে অমনি বোঝা যায় না!

অক্তাভ

কর ঠাট্টা,ঠাট্টা কর, আর তোমাকে আমরা ভয় করিনে।

মারিয়ানা

অথবা ও ভালবাসাটি ছিল যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু, আর আপনি ধাই হয়ে তাকে বনের ধারে রেখে আসতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু শহরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন।

অক্তাভ

না, ধাই তা করেনি; সে কেবল শিশুটিকে সেই দুধের খানিকটা খেতে দিয়েছিল—যা তোমার ধাই তোমাকে নিশ্চয়ই মুক্ত হস্তে ঢেলে দিয়েছিল—তোমার মুখে এখনও তার এক ফোঁটা লেগে আছে, তোমার প্রতি কথায় তা বেরিয়ে আসছে!

মারিয়ানা

এমন অত্যাশ্চর্য দুধের নামটি কি?

অক্তাভ

উদাসীনতা! তুমি ভালও বাসতে জান না, ঘৃণাও করতে পার না। মারিয়ানা, তুমি যেন বাংলাদেশের গোলাপের মত, তাতে কাঁটাও নেই, গন্ধও নেই।

মারিয়ানা

চমৎকার বলেছেন। উপমাটা কি আগে থেকেই তৈরী করা ছিল? আপনি যদি আপনার বক্তৃতাগুলির পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে না ফেলেন, তবে অনুগ্রহ করে আমায় দেবেন, তোতাপাখীটিকে তা শেখাব।

অক্তাভ

ব্যথা লাগবার মত তোমায় আমি কি বললেম? গন্ধ না থাকলে ফুল যে কিছু কম সুন্দর হয়, তা নয়; বরং তার উল্টোই—সবচেয়ে সুন্দর ফুলকেই বিধাতা গন্ধহীন করে গড়েছেন। আর তোমারও- নারী-শিরোমণি ব'লে—যেদিন প্রস্তরমূর্তি গড়া হবে, সেদিন ভাস্কর্যের কি নিখুঁত আদর্শই না সৃষ্টি হবে, তখন বাকী থাকবে কেবল কোন দেবমন্দিরে তোমাকে স্থাপনার জন্যে একটি বেদী প্রতিষ্ঠা করা।

মারিয়ানা

মহাশয়, মেয়েদের অবস্থা দেখে আপনার কি কিছু দয়া হয় না? এই দেখুন না, আমারই কি রকম নিয়তি। নিয়তির লেখা, তাই কেলিও আমায় ভালবাসলে অথবা ভালবাসে বলে মনে করলে, সেই কেলিও তার বন্ধুদের বললে, সেই বন্ধুরা ব্যবস্থা দিলেন আমাকে তার উপপত্নী হতেই হবে, নতুবা আমার ফাঁসি। নেপ্‌ল্‌স্‌ শহরের যুবক-সম্প্রদায় অনুগ্রহ করে মহাশয়ের মত যোগ্য পুরুষকে

তাদের প্রতিনিধিরূপে আমার কাছে পাঠালেন আমার উপর এই পরওয়ানা জারী করতে,—উপরিউক্ত কেলিও মহাশয়কে আজ থেকে আট দিনের মধ্যে ভালবেসে ফেলতে হবে। আচ্ছা, কথাটা আপনিই একটু ভেবে দেখুন দেখি। যদি আমি রাজী হই, তবে লোকে কি বলবে? যে রমণী এমনধারা হুকুম ঠিক সময়-মত শর্ত-মত হুবহু পালন করতে যায়, সে কি অতি হীন-প্রকৃতির নয়? লোকে কি তাকে দাঁতে কেটে ছিঁড়ে ফেলবে না? চার আঙুল দিয়ে দেখাবে না? মাতালেরা তার নামে ছড়া বাঁধবে না? তারপর সে যদি অঙ্গীকারই পায়, তবে তার মত রাক্ষসী দুনিয়ায় নাই, সে যে পাথরের মূর্তির চেয়েও হৃদয়হীন। আর যে-লোক তার সঙ্গে কথা বলছে, হাতে উপাসনার বই দেখেও যে-লোক রাস্তার মাঝখানে তাকে দাঁড় করাতে সাহসী হয়েছে, সে লোকটিরও কি অধিকার নাই তাকে বলতে, "তুমি হচ্ছ বাংলার গোলাপ কাঁটাও নেই, গন্ধও নেই"?

অক্তাভ

বোনটি আমার! বোনটি আমার! রাগ ক'রো না।

মারিয়ানা

বলুন তো, দেবতা সাক্ষী করে যে-প্রতিজ্ঞা করা আছে, তার উপর নিষ্ঠা বড়ই হাসির জিনিস নয় কি? হাসির জিনিস নয় কি একটি বালিকার শিক্ষাদীক্ষা, একটি প্রাণের মর্যাদা-বোধ? সে বিশ্বাস করে নিয়েছে তার কিছু একটা মূল্য আছে, সে এই আশা পোষণ করছে যে, তার হৃদয়-কুসুম যদি শুকিয়েই ঝরে পড়ে, তবে আগে যেন সে দেখতে পায় অশ্রুতে অশ্রুতে তা ভরে গিয়েছে; সূর্যের একটুখানি আলো পেয়ে ফুটে উঠেছে, কার একখানা কোমল হাতের স্পর্শে দু'চারটি পাপড়ি মেলে দিয়েছে; কিন্তু এসবই কি স্বপ্ন নয় —সাবানের বুদ্‌বুদ্ মাত্র নয়? এ বুদ্‌বুদের উচিত নয় কি, রাজপুত্তুর হয়ে যিনিই আসুন, তাঁর প্রথম দীর্ঘ নিঃশ্বাসটি পড়তে পড়তেই উড়ে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া?

অক্তাভ

তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, কেলিওকেও ভুল বুঝেছ?

মারিয়ানা

মেয়েমানুষ মোটের উপর কি পদার্থ? এক মুহূর্তের ওয়াস্তা—একটা টুনকো পাত্র, তাতে আছে এক ফোঁটা শিশির, লোকে একটিবার তাকে মুখে তুলে ধরে আর দূর করে ফেলে দেয়! এ তো একটু আমোদ করা বই নয়। নারীর সম্মুখে যে পুরুষ চক্ষু নত করবে, মনে মনে বলবে, "এই যে একটি জীবন-ভরা মূর্তিমতী সুখ-শান্তি" আর পথ ছেড়ে দাঁড়াবে—যে পুরুষ এমন কাজ করবে সে কি কাঁচা শিক্ষানবীস মাত্র নয়?

(প্রস্থান)

অক্তাভ

তা না, তা না, তা রে রে না! কি অদ্ভুত মেয়ে!

(একটি সরাইখানার দরজায় ঘা দিয়া)

ওহে, কে আছ?

(সরাইখানার এক ছোকরা বেরিয়ে এলে তাকে)

এই যে, এই কোণটায় আমার জন্যে এক বোতল যা হয় কিছু নিয়ে এস।

ছোকরা

আপনার যেমন রুচি। লাক্রিমা ক্রিস্তি (খৃষ্টের অশ্রু) দেব কি?

অক্তাভ

আচ্ছা, তাতেই হবে। শোন, তুমি এই চার পাশের রাস্তা ক'টা একটু ঘুরে এস তো, কেলিও বলে কোন ভদ্র-লোককে দেখতে পাও কি না—তাঁর গায়ে কালো লম্বা কোট, আর পরনে তার চেয়েও কালো পেণ্টুলন। তাঁকে বলবে যে তাঁর একজন বন্ধু এখানে একলাটি বসে বসে লাক্রিমা ক্রিস্তি পান করছেন। তারপরে, তুমি একটু বড় বাজারে যাবে, গিয়ে একটি মেয়েকে নিয়ে আসবে—নাম তার রোজালিন্দ, রং লাল টকটকে, সব সময়ে জানালার ধারে বসে থাকে।

(ছোকরার প্রস্থান)

গলার নলীটাতে কি হল বুঝতে পাচ্ছিনে। আমি যেন ঠিক শ্মশান-যাত্রার মত করুণ-রসাত্মক হয়ে পড়েছি।

(মদ্যপান করিতে করিতে)

এখানে রাতের খাওয়াটাও শেষ করলে হয়। বেলা দেখছি গড়িয়ে এল। তারে তাক্! আরতিটা কি বদখৎ জিনিস! ঘুম পাচ্ছে কি আমার? বোধ হচ্ছে সর্বাঙ্গে খিল ধরেছে।

(ক্লোদিও ও তিবিয়া-র প্রবেশ)

তাত ক্লোদিও! বড় চমৎকার বিচারপতি আপনি। এমন অনর্গল যাচ্ছেন কোথায়?

ক্লোদিও

তার অর্থ, বৎস অক্তাভ?

অক্তাভ

তার অর্থ আপনি একজন হাকিম আর আপনার বাধুনী বড় সুন্দর।

ক্লোদিও

ভাষার না শরীরের?

অক্তাভ

ভাষার, ভাষার। আপনার পরচুলা বাগ্মিতায় ভরপুর, আর আপনাব দুখানি ঠ্যাং যেন দুটি মনোহর বন্ধনী।

ক্লোদিও

তবে তোমায় বলে রাখি, বৎস অক্তাভ, আমার দরজার কড়া দেখে স্পষ্টই বোধ হয় যে তার কৃপায় তোমার আঙুল-গুলোতে ফোস্কা পড়ে গেছে।

অক্তাভ

কোন্ আইনে, বিজ্ঞ কাজি?

ক্লোদিও

ঘন ঘন নাড়তে গিয়ে, চালাক ভাইটি!

অক্তাভ

তা হাকিম মশায়, স্বচ্ছন্দে তার ওপব নতুন রং ফেরাতে পার, আমার আঙুল ময়লা হবার কোন ভয় নেই।

ক্লোদিও

কোন্ আইনে, রসিক ভাইটি?

অক্তাভ

কখনও নাড়ব না বলে তিতকুট কাজি!

ক্লোদিও

কিন্তু তাও তোমাকে করতে হল, যেহেতু আমার স্ত্রী চাকরদের হুকুম দিয়েছেন যে, আর একটিবার গেলে পরেই যেন তোমার মুখের উপর কবাট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অক্তাভ

তোমার চশমা দেখছি কানা, দযাল কাজি! তুমি যে কার গুণ কার ঠিকানায় এসে গাইছ!

ক্লোদিও

আমার চশমা ঠিকই আছে, ওবে কথার ঝুড়ি। তুই আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে প্রেম ভিক্ষা করসনি?

অক্তাভ

কোন্ উপলক্ষে, সূক্ষ্মবুদ্ধি কাজি?

ক্লোদিও

তোমার বন্ধু কেলিও-র উপলক্ষে! ভায়া হে, দুঃখের বিষয়, আমি সব শুনেছি।

অক্তাভ

কোন্ কান দিয়ে, ধর্মাধিপ ধুরন্ধর?

ক্লোদিও

আমার স্ত্রীর কান দিয়ে, সে আমায় সব খুলে বলেছে; বুঝেছ লম্পট শিরোমণি!

অক্তাভ

একেবারেই সব? সে সুন্দর কানের ভিতর কিছুই থেকে যায়নি, বউ-পাগলা বুড়ো?

ক্লোদিও

হ্যাঁ, আছে, তোমার প্রাপ্য উত্তরটা, ভাঁটিখানার খুঁটি! আর তা বলবার ভার আছে আমার উপর।

অক্তাভ

তা শোনবার ভার আমার ওপর নেই, মূর্তিমান জবানবন্দী।

ক্লোদিও

তাহলে আমার দরজার কাছে সলা-পরামর্শ করতে যেও, সে-ই তোমাকে শুনিয়ে দেবে, নেংটে জুয়ারী!

অক্তাভ

তাকে আমি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাই, ফাঁসির হুকুম! তার কাছে না গিয়েও তো আমি বেশ আছি।

ক্লোদিও

তাই যেন পারিস, মদের জ্বালা। যা, তোর বহুৎ ধন-দৌলত হোক্।

অক্তাভ

সে বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাকিস, জেলখানার খিল! আমার ঘাড়ে কোনরকম আপদ-বালাই চাপবার জো-টি

নেই ; থিয়েটারে শ্রোতার দল দেখেছিস তো, সেইরকম নির্ভাবনায় আমি এখন নাক ডাকাচ্ছি।

(ক্লোদিও ও তিবিয়ার প্রস্থান)

অক্তাভ

(একাকী) ওটা কেলিও না, ঐ যে আসছে ওদিক দিয়ে ? কেলিও ! কেলিও ! মর্, লোকটা চলেছে কোথা ?

(কেলিও-র প্রবেশ)

জান কি, বন্ধু, তোমার রাজকন্যে কি মজার খেলাটাই খেলছেন আমাদের নিয়ে। তিনি তাঁর স্বামীকে সব বলে দিয়েছেন।

কেলিও

জানলি কি ক'রে ?

অক্তাভ

সে আর ভুল হবার জোটি নেই, এই আমি ক্লোদিওর কাছ থেকে সবে আসছি। কথা এই, মারিয়ানাকে যদি আর ত্যক্ত-বিরক্ত করতে মানস করি, তবে আমাদের মাথার ওপর তার দরজার হুড়কো পড়বে।

কেলিও

মারিয়ানার সঙ্গে তোর তো একটু আগে দেখা হয়েছিল, সে কি বললে ?

অক্তাভ

যা বললে তার মধ্যে এ সুসংবাদটির ইঙ্গিত কিছু ছিল বলে টের পাইনি, তবে তাতে ভাল কথাও বড় ছিল না। শোন্ কেলিও, তুই এ মেয়েটাকে ছেড়ে দে। কে আছ ? আর এক গেলাস !

কেলিও

কার জন্যে ?

অক্তাভ

তোরই জন্যে। দেখ্, মারিয়ানা একটা ভণ্ড তপস্বিনী। সকালবেলায় সে কি যে বললে তার কিছু যদি বুঝে থাকি। আমি যেন একেবারে বোকা বনে গেলেম, একটা কথারও জবাব দিতে পারলেম না। দূর হোক, ওদিকে আর মন দিসনে। কেমন, রাজী তো ? ও বেটিকে যদি আর কখনো একটা কথাও বলি, তবে যেন আমার মুণ্ডপাত হয়। বুক বেঁধে দাঁড়া, কেলিও, ওদিকে আর মন দিসনে।

কেলিও

আমি তবে যাই।

অক্তাভ

কোথা যাস।

কেলিও

রাত্তিরবেলা শহরে আমার একটু কাজ আছে।

অক্তাভ

তোর চেহারা দেখে মালুম হয়, তুই যেন গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিস। কেলিও, তুই ভাবছিস কি ? পৃথিবীতে আরও কত মারিয়ানা আছে। আয়, আমার সঙ্গে খেয়েদেয়ে একটু ফুর্তি কর, ও মারিয়ানাটাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দি।

কেলিও

না, এখন যাই ; আমি থাকতে পাচ্ছিনে, কাল দেখা হবে ভাই

(প্রস্থান)

অক্তাভ

কেলিও ! কেলিও ! শোন্ দেখি। একটা মারিয়ানাকেই খুঁজে এনে দিচ্ছি—সে বড় শান্ত হবে, বড় শিষ্ট হবে, বিশেষতঃ কোন পূজা-অর্চনার ধার ধারবে না। আঃ ! আপদ ঘণ্টাগুলো ! প্রাণটা টেনে-হিঁচড়ে না বের ক'রে থামবে না দেখছি !

(ছোকরার প্রবেশ)

ছোকরা

মশাই ! সে লাল টুক্‌টুকে মেয়েটি জানলার ধারে নেই ; আপনার নিমন্ত্রণ সে গ্রহণ করতে পারবে না।

অক্তাভ

চুলোয় যাক্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ! তবে কি লেখা আছে, আজকে একাই আমায় ভোজন নির্বাহ করতে হবে ? রাত তো দেখি যেন ঘোড়ায় ছুটে আসছে ! এখন করি কি ছাই ? বেশ ! বেশ ! আমার এতেই চলে যাবে।

(মদ্যপান)

আমার দুঃখগুলোকে এই মদের মধ্যে—তা না হয়, অন্ততঃ এই মদ্যটাকে আমার দুঃখগুলোর মধ্যে ডুবিয়ে দিতে

পারি। আঃ! না হোক, উপাসনা তো শেষ হল। ঐ যে মারিয়ানা ফিরছে। (মারিয়ানার প্রবেশ)

মারিয়ানা

আপনি এখানে? এর মধ্যেই বসে গেছেন। কি, একা একা মাতাল হওয়াটা বড় সুবিধা লাগে না, না?

অক্তাভ

জগৎশুদ্ধ সবাই আমায় পরিত্যাগ করেছে। তাই সেখানে জোড়া জোড়া দেখবার চেষ্টায় আছি; তাহলে অন্ততঃ আমিই আমার সাথী হতে পারব।

মারিয়ানা

সে কি? আপনার এ দারুণ নির্জনতা দূর করবার জন্যে? একজন বন্ধুও নেই, একটি মেয়ে-মানুষও নেই?

অক্তাভ

তবে মনের কথা বলব কি? রোজালিন্দ বলে একটি মেয়েকে ডেকে পাঠালেম—সে মাঝে মাঝে আমার কাছে থাকে। কিন্তু সে-ও নাকি আজ সম্ভ্রান্ত মহিলা হয়ে শহরে নিমন্ত্রণে বেরিয়েছে।

মারিয়ানা

বড়ই দুঃখের কথা, আপনার প্রাণটা ভয়ানক ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে নিশ্চয়ই।

অক্তাভ

তা আর বলবার নয়—এই প্রকাণ্ড ভরা-গেলাসের মধ্যে সে-ফাঁকটাকে যে ধরাতে এত চেষ্টা করছি তাও পারছিনে। তারপর আবার তোমার ঐ শব্দ আমার মাথার খুলি চৌচির করে দিয়ে বিকেলের খাওয়ার দফা পর্যন্ত শেষ করেছে।

মারিয়ানা

আচ্ছা, বলুন তো, আপনি যে মদ খাচ্ছেন তিনি কি ধান্যেশ্বরী?

অক্তাভ

তামাশা ক'রো না; ইনি স্বয়ং খৃষ্টের অশ্রু।

মারিয়ানা

আশ্চর্যের কথা, আপনি ধান্যেশ্বরী খান না। একবার খেয়েই দেখুন না।

অক্তাভ

কেন তা খেতে বলছ তুমি, শুনি?

মারিয়ানা

একবার আস্বাদ করবেন শুধু। আমি নিশ্চয় বলতে পারি দুটোর কোন পার্থক্য নেই।

অক্তাভ

হ্যাঁ, এই সূর্যে আর প্রদীপে যেমন।

মারিয়ানা

না, দুটো ঠিক একই জিনিস বলছি আমি।

অক্তাভ

কি যে কথা! আমাকে নিয়ে মজা করছ?

মারিয়ানা

আপনি তবে অনেকখানি পার্থক্য দেখছেন?

অক্তাভ

নিশ্চয়ই।

মারিয়ানা

আমার বিশ্বাস ছিল, মদ আর মেয়েমানুষ বুঝি একই ধরনের। মেয়েমানুষও কি এই শুভ্র বোতলটির মত ছিপি। আঁটা একটা বহুমূল্য পাত্র নয়? যেমন গুণ ও শক্তি, সেই অনুসারে তারও ভিতরে নাই কি একটা পাশবিক অথবা দিব্য মাদকতা? সে-জাতের মধ্যেও নাই কি ছোটলোকের মদ আর যে মদ হচ্ছে খৃষ্টের অশ্রু? কি নীচ ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ আপনাদের, আপনারা আবার কোন্ মুখে তাদের উপদেশ দিতে যান? ছোটলোকে যে মদ খায় আপনারা সে মদ খাবেন না, অথচ ছোটলোকে যে মেয়েমানুষ চায়, আপনারাও চান সেই মেয়েমানুষ। এই যে সোনালী পাত্রের মধ্যে রয়েছে একটা উদার কবিত্বময় তেজ, এই যে অলৌকিক রসধারা—আতপতাপিত ভিসুভিয়স তার ধাতু-স্রাবের উষ্ণতা দিয়ে তৈরী করেছে, তার বশে নাকি আপনারা সব শক্তি হারিয়ে টলতে টলতে সামান্যা গণিকার কোলে গিয়ে পড়বেন; কিন্তু সামান্য দরের মদ খেতে আপনাদেব লজ্জা হয়, গলা উল্টে আসে। জিভ আপনাদের বড় সৌখীন, কিন্তু প্রাণটা এত সস্তায় মসগুল হয়ে যায়।

আসি তবে মশাই। প্রার্থনা করি, রোজালিন্দ আজ রাত্রেই ঘরে ফিরবে।

অক্তাভ

অনুগ্রহ করে দুটিমাত্র কথা শুনে যাও, মারিয়ানা—আমার উত্তরটা খুবই সংক্ষিপ্ত হবে। আচ্ছা, বল দেখি এই যে বোতলটি রয়েছে, এর অনুগ্রহ পেতে কতটা সাধ্য সাধনা করতে হয়? তুমি বলছ, এ একটা দিব্য তেজে ভরপুর; চাষার সঙ্গে রাজার যে সাদৃশ্য, ছোটলোকের মদের সঙ্গে এর ঠিক সেই সাদৃশ্য। বেশ, তবুও এই দেখ তাকিয়ে একে নিয়ে যা খুশি করতে পার, কিছু আপত্তি করবে না! আমার তো বিশ্বাস, এ কোন দীক্ষা পায়নি, এর কোন ধর্মজ্ঞান নেই। দেখ তো কেমন শান্তশিষ্ট মেয়েটি এ! এক কথাতেই সে তার আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসেছে, গায়ে ধুলো-বালি-মাখা অবস্থাতেই সে ছুটে পালিয়েছে, নিজেকে বলি দিয়ে আমায় কিছুক্ষণের জন্য নির্ভাবনা করতে। একটুও তার দেরী হল না, সুরভিত রক্তিম সতীমুকুট তার ধুলোয় গড়িয়ে পড়ল—না, কথাটা আর ঢাকতে পারলেম না, প্রথম চুম্বনের তপ্ত আবেগে সে তার সবখানি নিয়ে আমার অধরের ভিতরে গলে যাবার উপক্রম করেছিল।

মারিয়ানা

আপনি মনে করেন কি, ও জিনিসটার দর আরও বেশী কিছু? কিন্তু বাস্তবিকই, আপনি যদি ওর এমন সত্যিকার প্রণয়ী হন, আর ওটি তৈরী করবার ব্যবস্থাপত্রখানা আপনার যদি হারিয়ে যায়, তবে আপনি কি তার একটি-মাত্র ফোঁটার জন্য আগ্নেয়গিরির মুখে অবধি ছুটে চলেন না?

অক্তাভ

ওর দর যা তাই, বেশীও নয়, কমও নয়। ও জিনিসটি জানে, খেতে সে বড় ভাল, আর সে তৈরীই হয়েছে খাবার জন্যে। বিধাতা তার উৎপত্তি স্থান একটা দুরারোহ পর্বত শৃঙ্গের উপরে কি একটা পুকুরের তলে লুকিয়ে রাখেননি, তিনি তাকে আমাদের পথের ধারে ধারে সোনালি রঙের স্তবকে লুকিয়ে রেখেছেন; সেখান থেকেই সে তার প্রেমের ব্যবসা চালাচ্ছে—পথিকের হাতখানা একটু ছুঁইয়ে বুলিয়ে দিচ্ছে, তার নিটোল গালটি সূর্যের আলোকে ধরে দেখাচ্ছে, চারিদিকে তার সন্ধ্যা-সকালে মৌমাছি আর ভোমরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুন্ গুন্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃষ্ণার অবসন্ন পথিক তার সবুজ ডালপালার তলে শুয়ে বিশ্রাম করতে পারে; সে তো কখনও পথিককে নিরাশ করে রাখেনি, যে মধুর অশ্রুবিন্দুতে তার বুকখানা ভরা তা তো কখনও দিতে সে অস্বীকার করেনি। হায় মারিয়ানা! সৌন্দর্য বিধাতার বড় ভীষণ দান। যে সৌন্দর্য বিজ্ঞতার বড়াই করে আসলে সে কৃপণমাত্র। নিষ্ঠুর যে সৌন্দর্য তার চেয়ে দুর্বল যে সৌন্দর্য তারই ওপর ভগবানের করুণা। আসি তবে বোন; কেলিও যেন তোমায় ভুলতে পারে।

(অক্তাভ সরাইখানায় আর মারিয়ানা নিজ-ভবনে চলিয়া গেল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভিন্ন একটি রাস্তা

কেলিও, সিয়ুতা

সিয়ুতা

দেখুন, অক্তাভকে বিশ্বাস করবেন না। সে না বলেছিল, মারিয়ানা তাকে বাসায় ঢুকতে দেয় না!

কেলিও

হ্যাঁ, ঠিকই তো। তাকে বিশ্বাস করব না কেন?

সিয়ুতা

এই একটু আগে, পথে যেতে যেতে, একটা সরাইখানার মধ্যে পর্দার আড়ালে তাকে মারিয়ানার সঙ্গে বসে কথা বলতে দেখেছি।

কেলিও

তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? সে হয়তো মারিয়ানার গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিল আর সুবিধা পেয়ে আমার সম্বন্ধে কিছু বলাবলি করছিল।

সিয়ুতা

আমার কথার অর্থ, তারা খুব বন্ধুভাবে আলাপ করছিল, যেন দুজনার মধ্যে খুব মাখামাখি আছে।

কেলিও

ঠিক বলছ, সিয়ুতা? তাহলে আমার মত সুখী কে আর? সে বোধহয় প্রাণ ঢেলে দিয়ে আমার হয়ে বলছিল।

সিয়ুতা

ভগবান আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

(প্রস্থান)

কেলিও

হায়, আমার কেন যুদ্ধবিগ্রহের যুগে জন্ম হল না। তাহলে মারিয়ানার নাম আমার পতাকায় এঁকে নিতেম, আমার রক্তে সে পতাকা রঞ্জিত করে দিতেম। আহা! লড়বার জন্যে যদি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পেতেম, একটা সেনা-বাহিনী যদি যুদ্ধে আহ্বান করতে পারতেম; আমার জীবন বিসর্জন দিয়ে যদি তার কিছু উপকার করতে পারতেম! আমি কথা বলতে জানিনে, আমি জানি কাজ করতে। আমার জিভ আমার হৃদয়ের অনুগত নয়। মূক যেমন ক'রে কারাগারে প্রাণত্যাগ করে, তেমনি হয়তো আমারও জীবন যাবে, কিন্তু প্রাণের কথা কখনো বুঝিয়ে বলা হবে না।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ক্লোদিও-র বাড়ী

ক্লোদিও, মারিয়ানা

ক্লোদিও

তুমি মনে কর কি আমি একটা কেলে হাঁড়ি, পৃথিবীতে আছি কেবল যত কাকগুলোকে ভয় দেখানোর জন্য?

মারিয়ানা

এমন সরস ভাবটা তোমার মনে এলো কি হেতু?

ক্লোদিও

তুমি মনে কর কি, একজন হাকিম কোন্ কথার কি মূল্য তা জানে না, সরল মন ভিখারীর মত লোকে তাকে যা তা বিশ্বাস করাতে পারে?

মারিয়ানা

আজ আবার কার সঙ্গে লাগল তোমার?

ক্লোদিও

তুমি মনে কর কি, তোমার নিজের মুখে আমি বলতে শুনিনি যে সেই লোকটা কি তার বন্ধু যদি আমার দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ায়, তবে যেন তাকে ঢুকতে না দেওয়া হয়? আর তোমার বিশ্বাস, তুমি তার সঙ্গে সন্ধ্যার পরে পর্দার আড়ালে বসে মুখ ছুটিয়ে আলাপ করবে, আর আমি সে জিনিসটাকে বেশ ভাল বলে মনে করব?

মারিয়ানা

তুমি আমাকে পর্দার আড়ালে বসে থাকতে দেখেছ?

ক্লোদিও

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এই যে চোখদুটো দেখছ এই দিয়েই, একটা শুঁড়িখানার পর্দার মধ্যে; একজন হাকিমের স্ত্রীর পক্ষে আলাপ-সালাপ করবার জন্যে শুঁড়িখানার পর্দার আড়াল খুব প্রশস্ত জায়গা নয়। নিজে যখন লজ্জা-সরম ত্যাগ করে বাইরে বাইরে চরে বেড়াচ্ছ, তখন ঘরের দরজা এঁটে বন্ধ করে রাখবে কোন্ প্রয়োজনে?

মারিয়ানা

তোমারই আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলা কবে থেকে আমার বারণ হয়েছে?

ক্লোদিও

যবে থেকে আমার আত্মীয়েরা তোমার প্রণয়ী হয়ে উঠেছেন।

মারিয়ানা

অক্তাভ! আমার প্রণয়ী! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে? জীবনে সে কারও সঙ্গে ভালবাসাবাসি করতে যায়নি।

ক্লোদিও

তার স্বভাব-চরিত্র অতি খারাপ, সে কেবল শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে।

মারিয়ানা

ঠিক এই কারণেই সে—তোমার মিষ্টি ভাষায়—"আমার নাগর" কখনো হতে পারে না। কিন্তু আমার খুশি আমি শুঁড়িখানার মধ্যে পর্দার আড়ালে বসে বসে অক্তাভের সঙ্গে আলাপ করব।

ক্লোদিও

বাড়াবাড়ি করে, শেষটা একটা বিশ্রী কাণ্ড-কারখানা করে ফেলতে আমায় বাধ্য ক'রো না। কি করছ ভেবে দেখ।

মারিয়ানা

কি কাণ্ড-কারখানা ? আমার জানতে বড়ই কৌতূহল হচ্ছে, কি কি তুমি করবে।

ক্লোদিও

তার সঙ্গে তোমার দেখাশুনা বন্ধ করব। একটা কথাও তার সঙ্গে বলাবলি করতে পাবে না, তা আমার বাড়ীতে হোক, কি আব কোন বাড়ীতেই হোক, কিংবা মাঠে-ঘাটেই হোক।

মারিয়ানা

অ্যাঁ, তাই নাকি, সত্যি ! এটা একটা নতুন কিছু বটে। দেখ, অক্তাভ তোমারও যেমন আত্মীয়, আমারও তেমনি আত্মীয় ; আমার যখন খুশি তখন তার সঙ্গে গিযে আলাপ করব, তা মাঠে-ঘাটেই হোক আর যেখানেই হোক—সে যদি এ বাড়ীতে আসতে চায, তবে এ বাড়ীতেই।

ক্লোদিও

তুমি যে এই শেষ-কথাটা মুখ ফুটে বললে, তা বেশ করে মনে রেখো। এর প্রাযশ্চিত্তের ব্যবস্থা আমি করছি, তুমি আমার ইচ্ছায় চলছ না।

মারিয়ানা

আমার নিজের ইচ্ছায় তো চলছি, তাই ভাল। যে ব্যবস্থা তোমার খুশি হয় কর। ভয় দেখাও কি ?

ক্লোদিও

মারিয়ানা, তর্ক এখন থাক। শুঁড়িখানায় পা দেওয়াটা যে সুবিধা নয় তা বুঝে নিও, নইলে আমাব স্বভাবের বিরুদ্ধে হলেও কি যে করে ফেলব ঠিক নেই কিন্তু।

(প্রস্থান)

মারিয়ানা

(একাকী) কে আছ ?

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

এই রাস্তা দিয়ে বরাবর ঐ সবাইখানায় যাও, গিয়ে দেখবে একটা টেবিলের পাশে একজন ভদ্রলোকের ছেলে বসে আছেন ; তাঁকে বলবে তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে, একটু কষ্ট করে যেন এই বাগানটার ভিতরে তিনি আসেন।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

হ্যাঁ, নতুন কিছু বটে। আমায় ভাবে কি ? দোষটা হল কোথায় ? এ পোশাকটা আজ কি পরেছি ? কি বিশ্রী ! ও কথার অর্থ ?—কি যে করে ফেলবে। কেন, কি করবে ? মা'র সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তাতেই কি হত ? সে যা বলবে মা তো তাতেই সায দেবে। ইচ্ছে হচ্ছে, কারো সঙ্গে হাতাহাতি করি ! ঠেঙিয়ে দি লোকগুলোকে।

(চেয়ারগুলি উল্টাইযা পাল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া)

আমি বাস্তবিকই দেখছি একেবারে নির্বোধ। ঐ যে অক্তাভ আসছে ! ওর সঙ্গে যদি তার এখন একবার দেখা হত !—উঃ, এই তবে শুরু হল নাকি, লোকে তো আগেই বলেছিল।—আর আমিও তো জানতেম, ওর অপেক্ষাতেই বসেছিলেম ! সবুর ! সবুর ! আমাব প্রাযশ্চিত্তেব ব্যবস্থা করবে—কি প্রাযশ্চিত্ত শুনি ? দেখি, কি বলতে চায় ?

(অক্তাভের প্রবেশ)

বসুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অক্তাভ

বসি কোথা ? চেয়ারগুলো যে আকাশে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎ হয়ে আছে। কি হয়েছিল এখানে ?

মারিয়ানা

কিছুই না।

অক্তাভ

কিন্তু বোন, চোখ তো তোমার বলছে অন্য কথা !

মারিয়ানা

আপনার বন্ধু কেলিও সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আমি আবার ভেবে দেখলুম। আচ্ছা, বলুন তো তিনি নিজে এসে সব খুলে বলেন না কেন ?

অক্তাভ

কারণ খুবই সোজা—সে চিঠি লিখেছিল, তা তুমি ছিঁড়ে ফেলেছ ; লোক পাঠিযেছিল, তুমি জবাব দাওনি ; তোমাব জানলার নীচে এসে ধন্না দিলে, তুমি ফিরেও তাকালে না। তারপর কি করে, গেল চুলোর দুয়োরে—কিন্তু চুলোয় যেতে হলেও এতখানি দরকার হয় না।

মারিয়ানা

অর্থাৎ তিনি আপনার শরণাপন্ন হলেন।

অক্তাভ

হ্যাঁ, তাই।

মারিয়ানা

বেশ, বলুন তবে তার কথা।

অক্তাভ

সত্যি ?

মারিয়ানা

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি! এই যে আমি শুনছি।

অক্তাভ

তুমি তামাশা করছ।

মারিয়ানা

কেমনতর উকিল আপনি ? বলে যান না, আমি তামাশাই করি বা যাই করি, আপনার তাতে কি ?

অক্তাভ

তুমি একবার এদিক আর একবার ওদিক দেখছ কি ? তোমার যে রাগ হয়েছে।

মারিয়ানা

আমার একজন প্রণয়ী চাই, অক্তাভ, প্রণয়ী না হোক, অন্ততঃ সাথী একজন। আপনি আমায় কি পরামর্শ দেন ? আপনার পছন্দেই আমাব হবে—কেলিও হোক আর যেই হোক, কিছু আসবে যাবে না ; কাল থেকে না, আজ এই রাত্তির থেকেই চাই ; যাবই মর্জি হবে আমার জানালার ধারে এসে গান করবে, সে-ই আমার ঘরের দবজা খোলা পাবে। আরে! আপনি কিছু বলছেন না যে ? আমি আপনাকে বলছি, আমার একজন নাগর চাই। এই নিন আমার ওড়না—যাকে খুশি তাকেই এটা দিয়ে পাঠাতে পারেন আমার কাছে।

অক্তাভ

মারিয়ানা, যে কারণেই হোক, এক মুহূর্তের জন্য যদি তোমার প্রাণে দয়ার উদ্রেক হযে থাকে, তুমি আমাকে ডাকলেই যদি, আমার কথা শুনতে রাজী হলে যদি, তবে কৃপা করে আর একটি মুহূর্ত এইভাবে থাক, আমাকে বলতে দাও—

(জানু পাতিয়া উপবেশন)

মারিয়ানা

কি বলতে চান আপনি ?

অক্তাভ

পৃথিবীতে কেউ যদি তোমাকে বোঝবার যোগ্য হয়ে থাকে, তোমার জন্যে বাঁচবার, তোমার জন্যে মরবার যোগ্য হয়ে থাকে, তবে সে মানুষ হচ্ছে কেলিও। আমার মূল্য বেশী কিছু নয়, কোন দিন ছিলও না ; আমি বিনয় করে বলছিনে, এটা সত্যি কথাই—প্রেমের মাহাত্ম্যকীর্তন করছি বটে কিন্তু সে দিব্য বৃত্তিটির ব্যাখ্যা করা আমার মত অক্ষম হতভাগার সাজে না। হায়, মারিয়ানা! যদি জানতে, দেবতার মত কোন্ বেদীর ওপর স্থাপিত হয়ে তুমি পূজিত হচ্ছ! এমন সুন্দর এমন তরুণ এমন নির্মল তুমি, তোমাকে কিনা একটা নিরিন্দ্রিয় নির্দয় স্থবিরের কাছে ধরে দেওয়া হয়েছে! তুমি যদি জানতে, কোন্ আনন্দের উৎস, কি একটা অফুরন্ত সুখের আকর নিভৃতে রয়েছে তোমার মধ্যে! যৌবনের এই নবীন উষার মধ্যে, জীবনের এই স্বর্গীয় শিশিরকণাটির মধ্যে, দুটি হৃদয়ের এই প্রথম মিলনের মধ্যে তার কষ্টের কথা বলব না ; তোমার অকরুণ ব্যবহার সত্ত্বেও সে তার মধুর বিধুর বিরহ নিয়ে পড়ে আছে, তা নিয়েই কোন অনুযোগ না করে শেষে জীবন বিসর্জন দেবে। সত্যি মারিয়ান, এতেই তার প্রাণ যাবে। আর তোমায় বলব কি ? আমার কথায় যে-শক্তি নেই, সে-শক্তি তাকে দিতে আমি কোন্ রসায়ন তৈরী করব ? প্রেমের ভাষা আমি জানিনে। দেখ, তোমার প্রাণের ভিতরে তাকিয়ে—তার ভাষা সেই বলবে! তোমার হৃদয় গলাতে পারে এমন শক্তি কোথাও আছে কি ? তুমি তো ভগবানকে ডাকতে জান, বল তো, এমন যন্ত্র আছে কি যা আমার বুক-জোড়া কথা প্রকাশ করে ধরতে পারে ?

মারিয়ানা

আপনি উঠে দাঁড়ান। কেউ যদি এসে পড়ে এখানে, সে কি আপনার কথা শুনে ভাববে না যে আপনি নিজের জন্যই ভিক্ষা চাচ্ছেন ?

অক্তাভ

মারিয়ান! মারিয়ান! দোহাই তোমার, আর তামাশা ক'রো না। এই বোধহয় প্রথম তোমার হৃদয়ে বিজলীর

আলো খেলে গেল! দাও, তাকে আসতে দাও, হৃদয়ের দুয়োর আর বন্ধ ক'রো না। এই করুণার খেয়ালটি এই দিব্য মুহূর্তটি চলে গেল বলে। তুমি কেলিও-র নাম মুখে নিয়েছ, তার কথা ভেবেছ পর্যন্ত, বলছ। আহা! এ যদি খেলাও হয়, তবুও তা আর নষ্ট ক'রো না, একজন মানুষের সুখ-শান্তি এর ওপর নির্ভর করছে।

মারিয়ানা

আপনি বলতে চান, তামাশা পর্যন্ত করবার অধিকার আমার নেই?

অক্তাভ

না, তুমি ঠিক বলছ। বন্ধুত্বের টানে কত কি যে ভুল করছি তা আমি জানি। আমি জানি, আমি কে; প্রাণে প্রাণে তা অনুভব করছি। ঠিকই তো, আমার মুখে ও-সব কথা তামাশার মত শোনায় বৈকি! আমার কথার আন্তরিকতা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হচ্ছে—আমি যে লোকের বিশ্বাস জন্মাতে পারি না সে-দুঃখ আজ এই মুহূর্তে যেমন অনুভব করছি আর বোধহয় তেমন করিনি!

মারিয়ানা

তা কেন হবে? দেখলেনই তো, আমি আপনার কথা শুনছি। কেলিওকে আমার পছন্দ নয়, তাকে আমি চাইনে। আর কারো কথা বলুন, আপনার যাকে ইচ্ছে হয়। আপনার বন্ধুদের মধ্যে থেকে আমার উপযুক্ত একজন সাথী পছন্দ করে দিন; আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, কেমন? দেখুন, আমি আপনারই কথা অনুসারে চলছি।

অক্তাভ

হায় নারী, শতবার তুমি নারী! কেলিওকে তোমার পছন্দ নয়, কিন্তু আর একটা যে হোক সে হোক তাকেই তোমার পছন্দ! যে মানুষ তোমায় একটি মাস ধরে ভালবেসে আসছে, যে তোমার পায়ে পায়ে চলছে, যে তোমার মুখের একটি কথায় হাসতে হাসতে প্রাণ দেবে, সে হল তোমার অপছন্দ! সে তরুণ, সুপুরুষ, ধনী, সব বিষয়েই তোমার উপযুক্ত, কিন্তু তাকে তোমার অপছন্দ; আর যে কেউ একটা হোক তাকেই তোমার পছন্দ!

মারিয়ানা

আপনাকে যা বললেম, তাই করবেন, নয়তো আমার সাথে আর দেখা করতে আসবেন না। (প্রস্থান)

অক্তাভ

তোমার ওড়নাখানা বড় সুন্দর, মারিয়ানা, আর তোমার ঐ অভিমানের টুকরোটুকু শুভমিলনেরই একটি বাঁধন। কথাটা তো বুঝতেই পাচ্ছি—ওটুকু দেমাক আমারও বোধহয় আছে। এখন দরকার সামান্য একটু জুয়াচুরী—তাতে কেলিওরই হবে লাভ।

চতুর্থ দৃশ্য

কেলিও-র বাড়ী

কেলিও, একজন ভৃত্য

কেলিও

নীচে দাঁড়িয়ে আছে, বলছ? উপরে আসতে বল। যাও, শীগগির নিয়ে এস।

(অক্তাভের প্রবেশ)

কি ভাই, খবর কি?

অক্তাভ

এই ছেঁড়া কাপড়টা বাঁধ্ তোর ডান হাতে। নে তোর বীণ, তোর তলোয়ার—তুই মারিয়ানার প্রণয়ী।

কেলিও

দোহাই তোর, আমায় নিয়ে আর খেলিসনে।

অক্তাভ

বড় সুন্দর রাত। দিনান্তে চাঁদ উঠতে যাচ্ছে। মারিয়ানা একলা, তার দরজা আধ-খোলা। তোর বড় ভাগ্যি, কেলিও।

কেলিও

সত্যি?—সত্যি? অক্তাভ, তুই আমার প্রাণ—নয়তো তোর দয়া নেই।

অক্তাভ

তুই এখনও রওনা হ'স নি? তোকে বলছি কি, সব ঠিক-ঠাক। জানলার তলে একখানা গান শুধু। মুখটা একটু ঢেকে নিস, বৌ-পাগলার চণ্ড চরেরা আবার না চিনে ফেলে। তুই ভয় করিসনে, তবেই লোকে ভয় করবে। মারিয়ানা যদি বাধাও দেয় তবে দেখিয়ে দিবি, ও-সবের সময় চলে গেছে।

কেলিও

ওঃ, ভগবান। আমার যে বুক কাঁপছে।

অক্তাভ

আরে, আমারও তো—আমার আধপেটা খাওয়া হয়েছে শুধু। পুরস্কারস্বরূপ যাওয়ার সময় বলে যাস, যেন আমার জন্যে এখানে খাবার এনে দেওয়া হয়।

(উপবেশন)

চুরুট আছে? কাল সকালে এখানে আবার দেখা হবে। ওঠ্, ভাই ওঠ্। রওনা হ'। ফিরে এসেই কোলাকুলি করিস এখন। ওঠ্ ওঠ্, রাত হয়ে যাচ্ছে।

(কেলিও-র প্রস্থান)

অক্তাভ

(একাকী) হে ভগবান! স্বর্গের খাতায় আজকের রাত্রিটা ধর্মতঃ আমারই নামে তুমি জমা করে নিও। স্বর্গ বলে সত্যসত্যই কিছু আছে কি? বাস্তবিক, মেয়েটি বেশ সুন্দর, তার রূপটুকুও তাকে মানিয়েছিল ভাল। কিন্তু কেন এ রূপ? তা কে জানে! আমি যে নম্বর ডেকেছি, ঠিক সেই নম্বরটাই কি করে কাগজে উঠল, তা জেনে আর লাভ কি? লোকের কাছ থেকে মেয়েমানুষ ভাঙিয়ে নিয়ে আসা তো আমার নিত্যনৈমিত্তিক খেলা। সে মেয়েমানুষ যদি মারিয়ানই হয়, তাতে আর আমার কি এল গেল? কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে ভোজন; কেলিও তো উপোস করেই আছে। মারিয়ান, আমি যদি তোকে ভালবাসতেম, তুই আমায় কি না ঘৃণা করতিস, আমায় দেখে কি কখেই না দরজায় খিল দিতিস, আমার তুলনায় তোর ও হতচ্ছাড়া স্বামীটাও তোর কাছে কিনা পরম সুপুরুষ বলে মনে হত! কিন্তু কেন এ-রকম হয়? এই চুরুটের ধোঁয়া বাঁ-দিকে না গিয়ে ডানদিকে কেন যায়, সব জিনিসেরই কারণ ঐ রকমই। পাগল! এক-শ বার পাগল! বেঁধে রাখতে হয় তাকে, যে নিজের আশার কথাগুলোই কেবল ভাবে, নিজের পক্ষের যুক্তিগুলোই কেবল দেখে। কিন্তু ভগবান যে একটা দাঁড়ি-পাল্লা ধরে আছেন; সে-দাঁড়িপাল্লায় ভুলটি হবার জো নেই। তবে তার বাটখারাগুলো সবই ফাঁপা, কোনটার মধ্যে আছে একটা টাকা, কোনটার মধ্যে বা বিরহের দীর্ঘশ্বাস, এটার মধ্যে আছে মাথার বেদনা, ওটার মধ্যে সুসময় কি দুঃসময়—মানুষের সব কাজই পাল্লায় উঠছে নামছে ঐ ওজনের খাম-খেয়াল অনুসারে।

জনৈক ভৃত্য

(প্রবেশ করিয়া) মশায়, আপনার নামে এই একখানা চিঠি আছে; খুব জরুরী, তাই আপনার এখানে নিয়ে এসেছে। চিঠি যিনি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আপনি যেখানেই থাকুন না, আজ রাতেই ওটা আপনার হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

অক্তাভ

আচ্ছা, দেখি তো।

(পড়িতে পড়িতে) "আজ রাতে আসবেন না। আমার স্বামী বাড়ীটাকে গুণ্ডা দিয়ে ঘিরে রেখেছে। আপনাকে যদি তারা পায়, তবে আর রক্ষা নেই।

—মারিয়ান"

অক্তাভ

হায়রে কপাল! আমি করেছি কি? আমার জামা! আমার টুপিটা। হে ভগবান। আর একটুখানি সময় দাও। এস, তুমি—তোমরা যে যেখানে আছ, এস, চল সকলে আমার সঙ্গে! তোমাদের মনিবের জীবন-সংশয়।

(বেগে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

ক্লোদিও-র বাগান—রাত্রিকাল

ক্লোদিও. দুইজন গুণ্ডা, তিবিয়া

ক্লোদিও

প্রথমে ঢুকতে দিও, তারপর যেই এই ঝোঁপটার কাছে আসবে অমনি পড়বে গিয়ে।

তিবিয়া

যদি ঐ দিকটা দিয়ে ঢোকে?

ক্লোদিও

তবে দেয়ালের কোণটায় দাঁড়িয়ে থাক।

একজন গুণ্ডা

যে আজ্ঞে।

তিবিয়া

ঐ যে আসছে। দেখুন, দেখুন, ছায়াটা তার কি প্রকাণ্ড! লোকটা বেশ লম্বা-চওড়া।

ক্লোদিও

চল, আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই—সময় হলেই লাগাব।

(কেলিও-র প্রবেশ)

কেলিও

(ঘুলঘুলিতে ঘা মারিয়া) মারিয়ানা। মারিয়ানা। আছ কি?

মারিয়ানা

(জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া) পালাও, অক্তাভ। আমার চিঠি তবে তুমি পাওনি?

কেলিও

হা ভগবান! কার নাম শুনলেম?

মারিয়ানা

বাড়ীটা গুণ্ডায় ঘিরেছে। আমার স্বামী সন্ধ্যাবেলা তোমাকে এখানে ঢুকতে দেখেছে, আমাদের কথাবার্তাও শুনেছে। আর যদি এক মিনিট দাঁড়াও, তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

কেলিও

একি স্বপ্ন? আমি কেলিও?

মারিয়ানা

অক্তাভ! অক্তাভ! দোহাই তোমার, আর দাঁড়িয়ে থেকো না। এখনও বোধ হয় পালিয়ে বাঁচতে পার। কাল, দুপুরবেলা গীর্জায় এস, আমিও থাকব।

(ঘুলঘুলি বন্ধ হইল)

কেলিও

মৃত্যু! তুমি যখন এসেছ, তখন আমাকে উদ্ধার কর। অক্তাভ! বিশ্বাসঘাতক অক্তাভ! এর প্রায়শ্চিত্ত তোর যেন করতে হয়। তুই জানতিস, আমার কপালে এখানে কি আছে—নিজে না এসে আমায় পাঠিয়েছিস। আচ্ছা, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। মৃত্যু! এই তোমার জন্যে কোল পেতে দিয়েছি—এতদিনে আমার দুঃখের শেষ।

(প্রস্থান। বাগানের ভিতরে চাপা কণ্ঠস্বর, আর দূরে একটা কোলাহল শোনা গেল)

অক্তাভ

(বাহিরে) খোল, না হয় দরজা ভাঙলেম।

ক্লোদিও

(দরজা খুলিয়া, বগলের নীচে তলোয়ারখানা রাখিয়া) কি চাও তুমি?

অক্তাভ

কেলিও কোথায়?

ক্লোদিও

এ বাড়ীতে তার শোওয়ার যে অভ্যাস আছে, তা তো আমার মনে হয় না।

অক্তাভ

তুমি যদি তাকে খুন করে থাক, ক্লোদিও, তবে সাবধান! এই হাতে তোমার ঘাড়টি আমি মটকে দেব।

ক্লোদিও

তুমি পাগল, না তোমায় ভূতে পেয়েছে?

অক্তাভ

তুমিই পাগল, তোমাকেই ভূতে পেয়েছে; নইলে এ সময়ে তলোয়ার বগলে করে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

ক্লোদিও

যদি চাও, বাগানটা খুঁজে দেখ, আমি তো কাউকে ঢুকতে দেখিনি। আর যদিই বা কেউ ঢোকবার চেষ্টা করে থাকে, তবে তাকে দরজা না খুলে দেবার অধিকার বোধ হয় আমার আছে।

অক্তাভ

(তার লোকদের প্রতি) এস, খোঁজ চারদিকে।

ক্লোদিও

(তিবিয়াকে জনান্তিকে) যেমন বলেছি, তেমনি সব হয়েছে তো?

তিবিয়া

আজ্ঞে, নিশ্চিন্ত হোন্—যত খুশি খুঁজতে পারে।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

সমাধি স্থান

(একটি সমাধির পাশে অক্তাভ ও মারিয়ানা)

অক্তাভ

পৃথিবীতেই আমিই শুধু তাকে চিনেছিলাম। এই যে শ্বেত-শুভ্র মর্মর পাথরখানি, একটা দীর্ঘ কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা—এই তার আসল ছবি। এইভাবেই একটা স্নিগ্ধ বিষাদের ছায়া তার কোমল প্রেমিক হৃদয়ের অনুপম গুণরাশি ঢেকে রেখেছিল। এই মূক জীবনখানির যত রহস্য, তা কেবল আমারই কাছে কিছু গোপন ছিল না। কত দীর্ঘ রজনী আমরা দুজনে এক সঙ্গে কাটিয়েছি, উষর মরুভূমির মাঝে শ্যামল ক্ষেত্রের মত সে-সব যেন জেগে আছে; সমস্ত জীবনে যে কয়েক বিন্দু শীতল শিশিরকণা আমার প্রাণে পড়েছিল, তা ঢেলেছে সেই ক'টি রাত। কেলিওই ছিল আমার জীবন, কেলিওর সঙ্গে তা স্বর্গে চলে গেছে! আর এক যুগের মানুষ সে; ভোগ কাকে বলে সে জানতো, তবুও সে একলা থাকতেই চাইত; কল্পনা যে কি ভুল করায়, তা সে জানতো, তবুও বাস্তব ছেড়ে কল্পনার দিকেই ছিল তার আকর্ষণ। যে রমণী তাকে ভালবাসতে পারত, সে বড় সুখী হত।

মারিয়ানা

তোমাকে যে রমণী ভালবাসবে, অক্তাভ, সেও কি সুখী হবে না?

অক্তাভ

আমি ভালবাসতে জানিনে; তা জানতো কেলিও। যে ভস্মটুকু এই সমাধির ভিতর রয়েছে, পৃথিবীতে এক তাকেই আমি ভালবাসতেম, এক তাকেই ভালবাসব। সে-ই শুধু জানত নিজের প্রাণে যে আনন্দের উৎস রয়েছে তা কি করে নিঃশেষে আর একটি প্রাণের মধ্যে ঢেলে দিতে হয়। অপার নিষ্ঠার ক্ষমতা এক তারই ছিল; যে রমণীকে সে ভালবাসত, তার জন্যে সমস্ত জীবন সে-ই কেবল উৎসর্গ করে দিতে পারত, সেই রমণীর জন্যে তেমনি সহজেই সে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারত। আমি তো লম্পটমাত্র, আমার হৃদয় নেই, নারীর মর্যাদা আমি বুঝিনে। আমি দিতে পারি যে রকম ভালবাসা, আমি ফিরেও পাই তেমনি ভালবাসা—স্বপ্নের মত একটা ক্ষণিক নেশা। সে যেসব গুপ্ত রহস্য জানত, আমি তা জানিনে। আমার হাসি নটীর মুখোসের মত। হৃদয় আমার স্থবির। ইন্দ্রিয় আমার অবসাদগ্রস্ত—ভোগ আর তারা চায় না। কিন্তু কি কাপুরুষ আমি, তার মৃত্যুর প্রতিশোধ এ পর্যন্ত নেওয়া হল না।

মারিয়ানা

নাই হল—তোমার জীবনকেও আবার বিপন্ন করবে কেন? তারপর, ক্লোদিও তো তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধের বয়স তার পার হয়ে গেছে; আর তুমিও তার কিছু করতে পারবে না—শহরে তার অপ্রতিহত প্রভাব।

অক্তাভ

কেলিও কিন্তু আমার মৃত্যুর শোধ নিত,—সে যেমন করে আমার জন্যে মরেছে, আমি যদি তেমনি করে তার জন্যে মরতেম। না, এ আমারই সমাধি। আমাকে তার এই হিম-শীতল পাথরের নীচে শুইয়ে রেখেছে; আমার জন্যেই তারা তলোয়ারে শাণ দিয়েছিল, আমাকেই তারা খুন করেছে। বিদায়, আমার যৌবনের আমোদ, খোশখেয়াল, পাগলামী—বিদায়, ভিসুভিয়সের কোলে আমার সে মুক্ত উল্লসিত জীবন। বিদায় কলমুখরিত উৎসব-মধুর-সন্ধ্যা সম্মিলন, সোনালী জানালা-তলে প্রেম-গান! বিদায়, নেপ্‌ল্‌স শহর! বিদায় নেপ্‌ল্‌স শহরের রমণীকুল, মশালের আলোতে সঙের মিছিল, বনের ছায়াতলে পান-ভোজন। বিদায় ভালবাসা! বিদায় বন্ধুত্ব। পৃথিবীতে আমার স্থান শূন্য হল।

মারিয়ানা

কিন্তু আমার হৃদয়ে তো নয়, অক্তাভ। কেন বলছ তুমি, বিদায় ভালবাসা?

অক্তাভ

আমি তোমাকে ভালবাসি না, মারিয়ান—ভালবাসত কেলিও।

সমাপ্ত

—রচনাবলী—

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র বাংলা রচনা-সংগ্রহ একত্রে আটখণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, যোগ, ইত্যাদি জীবনের মর্মসত্যের বাস্তব বিশ্লেষণে এবং শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের জীবন-সাধনার গভীর ভাব-অবগাহনে তা সিদ্ধ-স্নাত।

সুদৃশ্য মনোটাইপে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ডবল-ডিমাই সাইজের পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার প্রতিটি বৃহৎ খণ্ড রেক্সিন ও বোর্ড বাঁধাই, মুদ্রণ ও গ্রন্থন পারিপাট্যে সৌন্দর্যে চিত্তাকর্ষক।

প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত। প্রত্যেকটির মূল্য—২৫·০০ টাকা।

সম্পূর্ণ রচনাবলীর গ্রন্থসূচী

সাহিত্য ও শিল্পকলা

প্রথম খণ্ড : ১। সাহিত্যিকা, ২। রূপ ও রস, ৩। আধুনিকী, ৪। শিক্ষা ও দীক্ষা, ৫। রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় খণ্ড : ১। শিল্পকথা, ২। কবির্মনীষী-১ম, ৩। কবির্মনীষী-২য়, ৪। কবির্মনীষী-৩য়

তৃতীয় খণ্ড : ১। বাংলার প্রাণ, ২। মৃতের কথোপকথন, ৩। গানের গান, ৪। ফরাসী ষোড়শী, ৫। মারিয়ানা (ফরাসী নাটিকা), ৬। তিন্তাজিলের মৃত্যু (ফরাসী নাটিকা), ৭। অনুবাদমালা (কবিতা)

দেশ-সমাজ-রাজনীতি

চতুর্থ খণ্ড : ১। ভারত-রহস্য, ২। ভারতে হিন্দু ও মুসলমান, ৩। স্বরাজের পথে, ৪। স্বরাজ-গঠনের ধারা, ৫। শ্রীঅরবিন্দ ও বর্তমান যুদ্ধ, ৬। আদি লেখা

পঞ্চম খণ্ড : ১। ভাবীসমাজ, ২। বোলশেভিকি, ৩। নীট্‌শের বাণী, ৪। নারীর কথা, ৫। স্মৃতির পাতা-১ম, ৬। স্মৃতির পাতা-২য়

ধর্ম-সাধনা—জ্ঞান-বিজ্ঞান

ষষ্ঠ খণ্ড : ১। ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা, ২। বেদমন্ত্র, ৩। উপনিষদ—কথা ও কাহিনী, ৪। নব্যবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান

সপ্তম খণ্ড : ১। পূর্ণযোগ, ২। দেবজন্ম, ৩। সাধকের কথা, ৪। চেতনার অবতরণ, ৫। আলোর পথে-১ম, ৬। আলোর পথে-২য়, ৭। এ যুগের সাধনা, ৮। তিন কাহিনী, ৯। কালের আহ্বান

অষ্টম খণ্ড : ১। ভারতের নবজন্ম, ২। কর্মযোগী, ৩। মা, ৪। যোগসাধনার ভিত্তি, ৫। যোগের পথে আলো, ৬। চিন্তাকণা ও দৃষ্টিনিমেষ, ৭। চিন্তাবলী ও সূত্রাবলী ৮। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী', ৯। শতাব্দীর প্রণাম

শৃণ্বন্তু ঃ ৬৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮, শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০৭১

The National Tape Loom Co.

Manufacturers of SILK, COTTON & GLASS TAPES

7, LYONS RANGE

3rd Floor, Room No. 2

Calcutta-1

Phone : Office : 22-3718/5066

Phone : 22-3891
22-4467

Our Homage to

Nolinida

B. K. DUTT & CO.

52, Netaji Subhas Road,

Calcutta-1

Dealers in : All kinds of Paints, Varnishes & Marine Stores.

Mfrs. of : JANATA BRAND All purpose Paints.

Stockists of : All kinds of Leakproof Treatment Materials that solve the Problems.

THE COLLECTED WORKS
OF
NOLINI KANTA GUPTA

Volume One
Volume Two
Volume Three
Volume Four
Volume Five

VOLUME SIX IS IN PRESS

The collected works of SRI NOLINI KANTA GUPTA, shed a new light on the pressing problems of Man and his future. In the context of the present bewildering conditions of the world, they have a special relevance, and it is hoped that they will aid the modern man in his search of new hope for a new life of unity and harmony.

size : Double demy
pp : 406

Cloth Binding with attractive art-paper jacket.

Price Rs. 15·00 Each

Available at :

SRINVANTU
63, College Street
Calcutta-700073
34-1351

Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700012
34-2376

Published by : Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry-2

নলিনীদা-র জন্মদিনে
শ্রদ্ধাঞ্জলি—

শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
শ্রীমতী মানসী গুহঠাকুরতা

Even the profoundest and surest political instinct is not wisdom.

—Sri Aurobindo

★

Cargo Surveyors
Analytical Chemists
Gram : JUTASPECTA
Telex : NOPROB CA 2414
Phone : 240046/47

ESKAPS (INDIA) PRIVATE LTD.
30, Chowringhee Road
Calcutta-700016

Smiles are a richer wealth than tears.

—**Sri Aurobindo**



The Hooghly Mills Co. Ltd.

MANUFACTURERS & EXPORTERS

10 Clive Row

Calcutta-1

Telegraphic Address
"VICTO" Calcutta

Telephone No
22-5451 (2 Lines)
Codes : Acme & Bentley's
Second Phrase

Our Homage to

Nolinida

ELLORA ENTERPRISE
ELLORA CHEMICAL INDUSTRIES
57/2A, College Street
Calcutta-700073

Phone : 34-3720

SRINVANTU PUBLICATIONS

সাবিত্রী—শ্রীঅরবিন্দ	...	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪·০৫
মধুময়ী মা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২·০০
মধুময়ী মা (২য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	..	২·০০
মধুময়ী মা (৩য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২·০০
কবির্মনীষী (৩য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪·৫০
Light of Lights—Nolini Kanta Gupta	..	8 00
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	..	১·৫০
শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' উপাখ্যান—শ্রীমণিবিষ্ণু চৌধুরী	...	৩·৫০
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র রচনাবলী (৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ)...		**যন্ত্রস্থ**
রচনাবলী : প্রথম খণ্ড : সাহিত্যিকা	...	২৫·০০
রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড : শিল্পকথা	...	২৫·০০
আলবার পদাবলী—শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	...	১০·০০
মায়ের অবতরণ কেন ?	...	·৫০

With best Compliments of :

SHEWBUXRAI ONKARMULL

Manufacturers of

Sodium Silicate, Commercial Transparent, etc.

35, Chittaranjan Avenue,

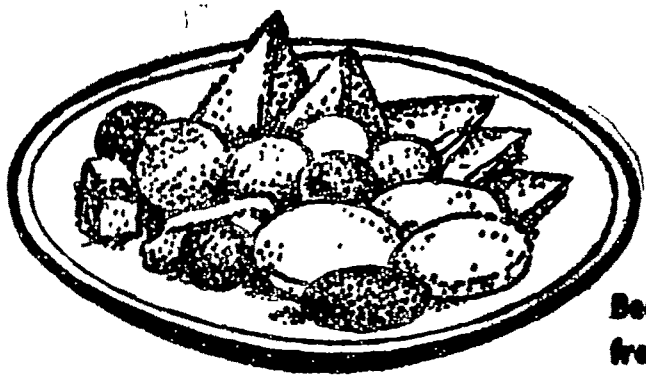
Calcutta-700012

Phone : Office : 23-2558

Factory : 35-1011

Telephone

VANASPATI COOKS A DELICIOUS MEAL— SO WHOLESOME TOO.



Because it's fresh and pure and enriched with Vitamin A and D

Always ask for Telephone Vanaspati. People love its taste. It's a delicious cooking medium. So good for curries, fried foods, western and oriental cooking. It's economical and so pure. Always fresh, it's enriched with Vitamin A and D for extra goodness. Remember to ask for :

Telephone

VANASPATI

cooking medium that's wholesome.



A produce of Swalka Vanaspati Products Ltd.



মাসিক সঞ্চয়ের সহজ পথ, গড়বে সুখের ভবিষ্যৎ

১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদী

ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপোজিট

★প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে, ২৫ বছর পরে পাবেন ১,৩৩,৮০০ টাকা

প্রতিমাসে সঞ্চয় তো করবেনই কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। ভেবে দেখুন কি ভাবে ও কতটা সঞ্চয় করলে আপনার ও আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটতে পারে আর আপনিও নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

।। মাসিক সঞ্চয় ও আয়ের তালিকা ।।

মাসিক সঞ্চয়	১০ বছর পরে পাবেন	১৫ বছর পরে পাবেন	২০ বছর পরে পাবেন	২৫ বছর পরে পাবেন
১০৲	২০৬৬৲	৪১৮০৲	৭৬৬০৲	১৩,৩৮০৲
২০৲	৪১৩২৲	৮৩৬০৲	১৫,৩২০৲	২৬,৭৬০৲
৫০৲	১০,৩৩০৲	২০,৯০০৲	৩৮,৩০০৲	৬৬,৯০০৲
১০০৲	২০,৬৬০৲	৪১,৮০০৲	৭৬,৬০০৲	১,৩৩,৮০০৲

প্রতিমাসে যতটা সম্ভব সঞ্চয় করুন। এই প্রকল্পে আপনার সঞ্চয় থেকে আয় অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১ ✱ ফোন : ২৩-৯৭৮৪-৫-৬,
অথবা যে কোন শাখা অফিস

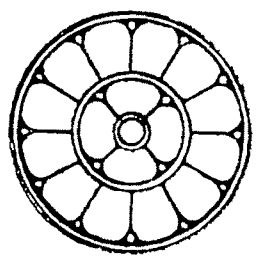
Progressive/UIB 12/75

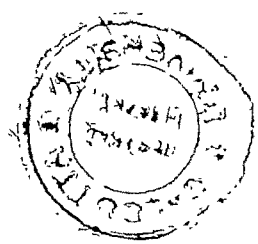
প্রচ্ছদপট মুদ্রক ॥ কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস ॥ কলিকাতা ৯

শ্রমিক

অতীতে মানুষ যা করেছে চিরকাল তারই পুনরাবৃত্তি করে চলা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ হল অভিনব সিদ্ধি, অচিন্তাপূর্ব ঈপ্সিতা সব অর্জন করা।

—শ্রীঅরবিন্দ





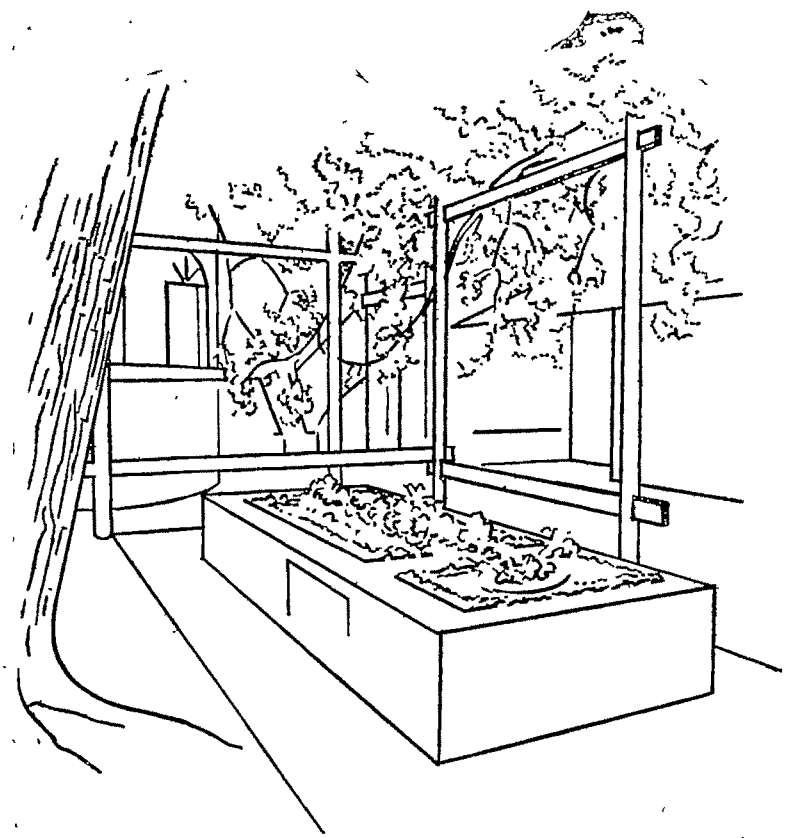
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা :

শ্রী লক্ষ্মী কান্ত বসু

পঞ্চবিংশতি বর্ষ ○ একাদশ সংখ্যা ○ ফাল্গুন ১৩৮৩

শ্রীঅরবিন্দ

পঞ্চবিংশতি বর্ষ : একাদশ সংখ্যা
ফাল্গুন : ১৩৮৩



সূচী—

শ্রীঅরবিন্দ
সাবিত্রী ৩৬৯
আদর্শ মানব ঐক্য ৩৭৫
ভবিষ্যতের কবিতা ৩৮২

শ্রীমা
মায়ের মন্ত্র ৩৬৭
মায়ের ঘরোয়া কথা ৩৭৬

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
গোব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ ৩৭৩

শ্রীদিলীপকুমার রায়
পারের পারী (কবিতা) ৩৮৭

জগদীশ চন্দ্র দাশ
কয়লার মধ্যেও হরি আছেন
(কবিতা) ৩৮৮

অমলেশ ভট্টাচার্য
'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে আরো
যৎকিঞ্চিৎ ৩৯০

সম্পাদক : অমলেশ ভট্টাচার্য
প্রকাশক ও মুদ্রক : সাম্যকান্তি মৈত্র

সম্পাদকীয় কার্যালয় : শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮ শেক্সপীয়ার সরণী, কলিকাতা-৭১
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে
মুদ্রিত এবং 'শৃঙ্খল' কার্যালয়, ৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত
ফোন : ৩৪-১৩৫১

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক সডাক : দশ টাকা

ফাল্গুন, ১৩৮৩ পঞ্চবিংশতি বর্ষ একাদশ সংখ্যা

মায়ের মন্ত্র

দ্বিতীয় ভাগ

১৭ই জুলাই

প্রত্যেকেই শুধু দায়ী যেন তার আস্পৃহা অকপট হয়।

১৮ই জুলাই

আমাদের নিজেদের ক্রমোন্নতির সঙ্গে আমাদের মধ্যে ক্রমেই বেড়ে ওঠে অপরের সম্বন্ধে একটা উদার সহজ বোধ।

১৯শে জুলাই

সকল অভ্যাসকে একযোগে দূর করা কঠিন, তাদের সম্মুখীন হতে হবে একে একে একটা স্থির দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে।

২০শে জুলাই

যখন তুমি ভাগবত প্রেমের সংস্পর্শে এসেছ তখন সেই প্রেমকেই তুমি দেখবে সর্ববস্তুতে সর্ব ঘটনায়।

২১শে জুলাই

সকল আন্তরিক প্রার্থনাই পূর্ণ হয়, সকল ডাকই সাড়া পায়।

২২শে জুলাই

অপরের ভুল দেখে ক্রুদ্ধ হওয়ার পূর্বে নিজের ভুল সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকবে।

২৩শে জুলাই

এস আমরা নিজেরাই এগিয়ে চলি, অন্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই হল শ্রেষ্ঠ উপায়।

২৪শে জুলাই

ভগবানের প্রেম ও জ্ঞান সর্বদাই যেন আমাদের চিন্তাকে আমাদের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে।

২৭শে জুলাই

পৃথিবীতে আমরা রয়েছি ভগবানের ইচ্ছা প্রকাশ করে ধরতে।

২৮শে জুলাই

আমাদের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনুযোগ করা ভুল কারণ সে সব হল আমরা নিজেরা যা তারই বাহ্য প্রকাশ।

২৯শে জুলাই

সকল সংশয় আমরা দূর করব এ স্থির সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে কারণ সে সবই হল আমাদের ক্রমোন্নতির পরম শত্রু।

৩০শে জুলাই

বিশ্বাসের অভাবই আমাদের সীমাবদ্ধ করে রাখে।

৩১শে জুলাই

সর্বদা সত্যসন্ধ থাকব, এর চেয়ে বৃহত্তর সাহসের আর কিছু নাই। [ক্রমশ]

অনুবাদ : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

২য় পর্ব—বিশ্ব পর্যটক

১৪শ সর্গ—বিশ্ব আত্মা

(২)

কণ্ঠহীন সমাহিতির জঠরান্তরে নিমজ্জিত যেন
এই সব জীবেরা ছিল একদিন পৃথিবীর পরে রূপধারণ করে, এখন
আসীন তারা
অধ্যাত্মসুপ্তির দীপ্ত কক্ষতলে।
জন্মমৃত্যুর অনুবৃত্তি পার হয়ে গিয়েছে,
পার হয়ে গিয়েছে তাদের প্রতীক কর্মাবলীর ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চ,
পার হয়ে গিয়েছে তাদের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে স্বর্গ নরক যত ;
ফিরে এসেছে তারা বিশ্বের অতল অন্তরাত্মার আশ্রয়ে।
সংহত হয়েছে তারা পূর্ণগর্ভ এক প্রশান্তিমাঝে :
পুরুষের প্রকৃতির রূপান্তর এনে দিয়েছে যাদুকর সুপ্তি এক।
সমাহিতিমাঝে তারা তাদের অতীতের আত্মসত্তাসব সংগৃহীত করে রেখেছে,
অন্তরিত স্মৃতির ভবিষ্যদর্শী ধ্যানগর্ভে
নবরূপায়ণের পূর্বাহ্ন-প্রতিমা যেন,
আগামী নিয়তির ধারা তারা এঁকে রেখেছে মানচিত্র যেন :
আপন অতীতের উত্তরাধিকারী তারা, আপন ভবিষ্যতের আবিষ্কর্তা,
আপনাদের ভাগ্য তারা আপনারাই করে নির্বাচন,
নবজীবনের অভিযানে অপেক্ষায় রয়েছে তারা।
একই ব্যক্তিপুরুষ রয়ে যায় জগতের পর জগৎ পার হয়ে,
চিরকাল একই রয়ে যায় বহু আকারের মাঝে
বহির্মুখী মন যদি-বা পরিচয় পায় না তার,

অজানা নাম গ্রহণ ক'রে অজানা দেশ-দেশান্তরে
কালের ধারা অতিক্রম করে পৃথিবীর জীর্ণ পৃষ্ঠার পরে
চিত্র এঁকে যায় তার প্রচ্ছন্ন সত্তার ক্রমবর্ধমান আকৃতির,
অভিজ্ঞতা দিয়ে শিক্ষা করে পুনরায় আত্মচেতনায় জ্ঞাত যা,
যতদিন সে অধিগত করে না তার জীবন্ত সত্য আর ভগবানে।
আবার তাদের সম্মুখীন হতে হবে জন্মের লীলাসমস্যার,
শোক-পুলক নিয়ে অন্তরাত্মার পরীক্ষণ,
চিন্তা ও প্রেরণা প্রোজ্জ্বল করে অন্ধ ক্রিয়াকে,
অভিযান হবে তার ঘটনাচক্রের পথে পথে
অন্তরের গতিধারা আর বাহিরের ঘটনাবলীর আশ্রয়ে,
যাত্রা তার আত্মার অভিমুখে বস্তুরাজির রূপাবলী পার হয়ে।
উপনীত সে সৃষ্টির নাভিস্থলে।
অবস্থা হতে অবস্থান্তরে ভ্রমে জীবপুরুষ,
এখানে এসে লাভ করে তার যাত্রারম্ভের নীরব প্রশান্তি
সেই রূপহারা শক্তি সেই স্তব্ধ স্থিরতা
আর বিশ্বআত্মার ধ্যানমগ্ন তীব্র আবেগের মাঝে।
যা কিছু সৃষ্টি হয় পুনরায় ধ্বংস পায়,
সবই অদ্বিতীয়ের প্রশান্ত চিরজাগ্রত দৃষ্টি
গড়ে তোলে বারবার নির্বন্ধবশে, বারবার জীবন ধরে সে :
বলধারা, জীবনধারা, জীবকুল আর ভাবনা যত
সংগৃহীত হয় কিছুকাল সেই স্তব্ধতার অন্তরে
সেখানে তাদের উদ্দেশ্যকে তাদের গতিপ্রবাহকে নূতন করে ঢালে,
তাদের প্রকৃতিকে দেয় নূতন গঠন, নূতন কাঠামোয় তৈরী করে রূপ তাদের।
নিত্য পরিবর্তন হয় তাদের, পরিবর্তনে নিত্য বৃদ্ধি লাভ করে,
মৃত্যু-কবলিত তবু ফলপ্রসূ অবস্থা পার হয়ে এক
সুদীর্ঘ সুপ্তির পুনর্গঠন-গর্ভে
ফিরে আসে তারা তাদের যথাস্থানে দেবতাদের লীলাধারামাঝে
বিশ্বকালক্রমে যতদিন তাদের কর্ম পূর্ণ না হয়।

এই হল জগৎসৃষ্টির গঠনকক্ষ।
একটা অবকাশ রাখা হয়েছে কর্ম হতে কর্মান্তরে,
জন্ম হতে জন্মান্তরে, স্বপ্ন হতে জাগ্রত স্বপ্নান্তরে,

একটা বিরতি যেখানে নূতন শক্তি সংগ্রহ করা হয় কর্মের জন্য অস্তিত্বের জন্য।
ওপারে রয়েছে আনন্দের শান্তির লোকসব,
মূক জন্মস্থান সব আলোকের আশার ভালবাসার,
শিশুর দোলনা যেন স্বর্গীয় পুলকে আরামে পূর্ণ।
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠ প্রসুপ্ত
সেখানে সনাতন মুহূর্তের চেতনা এল তার ;
জ্ঞান তার নির্মুক্ত এখানে ইন্দ্রিয়ের পরিচ্ছদ হতে,
ঐক্যবোধে জ্ঞান তার চিন্তা বিনা বাক্য বিনা,
সত্তা তার দেখে আপনাকে অবগুণ্ঠন ফেলে দিয়ে,
আয়ুরেখা তার নেমে আসে আত্মাপুরুষের আনন্ত্য হতে।
নির্মল আন্তর আলোকের পথ ধরে,
বিরাট সব সত্তাদের ভিতর দিয়ে একাকী,
অনামা দেবতাদের অনিমেষ দৃষ্টিতলে,
অন্তরাত্মা তার চলে যায়, নিঃসঙ্গ সচেতন শক্তি এক,
পথ বেয়ে যাত্রা আরম্ভ যেখানে প্রতি যাত্রাশেষে
উত্তীর্ণ হয় সে ক্রমে পার হয়ে নির্বাক নিস্পন্দ স্তব্ধতা এক
মানুষী ও দিব্য সকল বস্তুর উৎসস্থানে।
সেখানে দেখে সে বিপুল মিলনমূর্তি এক
মৃত্যুহীন দ্বৈতাদ্বৈত বিগ্রহ এক,
একই সত্তা দুটি দেহে আলিঙ্গনবদ্ধ,
দুটি সংযুক্ত অন্তরাত্মার যুগ্মক্রিয়া,
আসীন তারা নিমগ্ন গভীর সৃজন-আনন্দে ;
মহানন্দের সমাহিতি তাদের ধারণ করেছে চলমান জগৎ।
পশ্চাতে তাদের প্রদোষের আলোছায়ামাঝে দাঁড়িয়ে অদ্বিতীয় এক
জন্ম দিয়েছে তাদের মহা-অজ্ঞেয়ের গর্ভ হতে।
চিরদিন অবগুণ্ঠন তলে শক্তিময়ী অপেক্ষায় রয়েছেন জিজ্ঞাসু পুরুষের ;
অতন্দ্র দ্রষ্টা তিনি ঊর্ধ্বতম অনাসদ শিখরের পরে,
দিশারী তিনি অদৃশ্য পথের যাত্রীদের,
পরম নিঃসঙ্গের উন্মুখী দুর্গম পথে প্রহরী এই শক্তিময়ী।
সুদূর-প্রসারিত প্রতি মণ্ডলের আরম্ভে
তাঁরই সামর্থ্য দিয়ে পূর্ণ করে ধরেন বিশ্বসূর্যমণ্ডল যত
শাসনকর্ত্রী তিনি, প্রেরণাদাত্রী প্রত্যেকের বহুবিধ কর্মাবলীর,
তাঁরই চিন্তাপটে ফুটে ওঠে প্রত্যেকের রঙ্গমঞ্চের প্রতীক।

সকলের ঊর্ধ্বে তিনি সকলকে ধারণ করে রয়েছেন,
একমাত্র সর্বশক্তিময়ী মহাদেবী চিরদিন অবগুণ্ঠিত—
এই বিশ্বই তাঁর দুর্ভেদ্য মুখোশ ;
যুগ-যুগান্তর পদক্ষেপ তাঁর গতিপথে,
সকল ঘটনাবলী তাঁরই চিন্তার চিত্রমালা,
সকল সৃষ্টি তাঁরই অন্তহীন কর্মকাণ্ড।
পথিকবরের অন্তঃপুরুষ এই শক্তিময়ীর শক্তির আধার ;
আপন সংকল্পের অতল আবেগে বাকহারা
তারই অভিমুখে প্রসারিত করে ধরে সে প্রার্থনারত যুগলহস্ত।
সেই মুহূর্তে হৃদয়াবেগের অমোঘ প্রত্যুত্তরে দেখা দিল অঙ্গভঙ্গি এক
ছড়িয়ে পড়েছে যেন জগৎসব
আর তাঁর অঞ্চলের প্রদীপ্ত রহস্যের ভিতর থেকে
ঊর্ধ্ববাহু এক অর্ধনির্মুক্ত করে ধরে সনাতন আবরণকে।
জ্যোতি দেখা দিল এক প্রশান্ত অবিনশ্বর।
তাঁর নয়নযুগলে মুগ্ধকর প্রহেলিকা
তাদের বিপুল জ্যোতির্ময় গভীরে টেনে লয় তাকে,
চেয়ে দেখে সে মুখমণ্ডলের এক অপরূপ রেখাচিত্র।
বিমূঢ় সে তাঁর দুঃসহ আলোকে আর আনন্দে,
নিজে সে অণুকণা এক তাঁরই অন্তহীন সত্তার
অভিভূত সে তাঁরই শক্তির মাধুর্যে আর বৈদ্যুত ঔজ্জ্বল্যে,
তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে চলে সে তাঁর সুখসার মহাসাগরের তট অভিমুখে,
স্বর্ণাভ গভীর চিন্ময় মদিরায় সম্বিতহারা সে,
তার অন্তরাত্মার দীর্ণ স্তব্ধতা ভেদ করে উৎক্ষিপ্ত হয়
আরাধনার আকাঙ্ক্ষার তীব্র কণ্ঠ এক
আর তার সীমাহীন মানসের সমর্পণ
আর আত্মদান তার স্তব্ধ হৃদয়ের।
লুণ্ঠিত সে পদতলে তাঁর অচেতন, ভূশায়ী।

[চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত]

অনুবাদ : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আদি লেখা

গোব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ

['প্রবর্ত্তক', অষ্টম বর্ষ—১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৯]

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

গোঁড়া হিন্দুরা হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব যে গোব্রাহ্মণে ভক্তির কথা সর্বদা নির্দেশ করিয়া থাকেন সেই গোব্রাহ্মণ যে গোরক্ষিণী সভা ও ব্রাহ্মণসভার গোব্রাহ্মণ নয় অর্থাৎ গরু ও বামুন নয়, এই কথাটাই আজকার প্রবন্ধে আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সেই সঙ্গে আরও আমরা দেখিব যে জড়জগতে বিজ্ঞানে যেমন Degradation of Energy শক্তির অপগতি বলিয়া একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছে সেই রকম মনের তত্ত্ব অনুভূতির জগতেও একটা সত্যের ক্রমক্ষয়ের ধারা মানুষের মধ্যে কেমন চলিয়া আসিয়াছে।

গোব্রাহ্মণে ভক্তি—এই চলিত কথার মূল যদি আমরা একটু খোঁজ করি তবে দেখিয়া আশ্চর্য স্তম্ভিত হইব কি কথা কি কথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা মহান সার্বজনীন সনাতন সত্য লৌকিক আয়তনের মধ্যে পড়িয়া ক্ষুদ্র মতবাদে (Creed) পরিণত হইয়াছে। একটা শক্তির উৎস নগণ্য আচারে পর্যবসিত হইয়াছে। একটা মন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে শুধু কথার কথা। গো, ব্রাহ্মণ ও নম—এই তিনটি বাক্যই লোকে মুখের যে অর্থ ও অভিব্যঞ্জনা গ্রহণ করিয়াছে, প্রাচীন ঋষিদের মুখে তাহাদের সে অর্থ সে অভিব্যঞ্জনা মোটেও ছিল না।

ঋক্‌বেদই হিন্দুধর্মের মূল। বৈদিক ঋষিরাই যেসব সত্য সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন—যে মন্ত্র দেখিয়াছিলেন ও সৃষ্টি করিয়াছিলেন আমরা এখন পর্যন্ত সেই সব সত্য সেই সব মন্ত্র লইয়াই চলিয়াছি কিন্তু সে সত্য সে মন্ত্রসকলের প্রাণ আমরা হারাইয়াছি, আমরা শুধু কথাটি ধরিয়া আঁকড়িয়া পড়িয়া আছি। তাই কোথাও প্রাণের অভাবে দেহ, কোথাও দেহের অভাবে দেহের ছায়া, কোথাও-বা ছায়ারও অভাবে একটা মরীচিকা, কল্পনা লইয়া সনাতন হিন্দুত্বকে ঠিক ঠিকই বজায় রাখিয়াছি মনে করিতেছি।

ঋক্‌বেদ গো-র নাম প্রায় কথায় কথায় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই গো কি পদার্থ? ঋক্‌বেদের নিজেরই কথা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া তবে আমরা দেখাইতেছি। বৈদিক গাভী অর্থাৎ গো "শুভ্রবর্ণ এবং তাহাতে তিন প্রকার জ্যোতি নিহিত।" এই জ্যোতির্ময় বস্তুটির সহিত সকল প্রধান প্রধান দেবতারই আছে নিবিড় নিত্য সম্বন্ধ। প্রথমতঃ উষা ও সূর্য। উষা হইতেছেন গোসম্পন্না—গোমতী। ধেনুবৎ, ধেনুই হইতেছেন উষা। আবার "অরুণ ভানু যখন উদয় হইতে থাকেন তখন উষার দেবতারা শুক্ল গোবৃন্দকে রথে সংযুক্ত করেন।" সুতরাং বৈদিক গো যে আলো, কিরণ, জ্যোতিরেখা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই জ্যোতি কি কেবলই স্থূল আলো? ঋষি বলিতেছেন "উষা দেবতারা যেই গোবৃন্দকে রথে সংযুক্ত করিয়া দিলেন অমনি প্রাণীর অন্তরে জ্ঞান ফুটিয়া উঠিল।" এই জ্ঞান যে আবার নিশাবসানে নিদ্রাভঙ্গ নহে তাহাও বুঝি যখন দেখি ঋষি উষাকে বলিতেছেন জ্যোতিষ্মান্ সত্যের চালয়িত্রী, উদ্বোধয়িত্রী ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানাং অচেতী। এই উষাই

আবার "কুটিলকে ঋজু, অল্পকে বিরাট, মৃত কাহাকেও সঞ্জীবিত করিয়া ধরিতেছে।"

এই যে জ্যোতি বা গো তাহা আবার ইন্দ্রের দান। ইন্দ্র হইতেছেন গোপতি। "ইন্দ্রই সূর্যকে বাহির করিয়া গোরাজী উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।" এই ইন্দ্র কে? ইন্দ্র হইতেছেন তিনি যিনি তেজোবলে দিবসের আলো প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছেন। তিনি 'সুমতি"দিগের জনক, তিনিই মেধাবী। তিনি সত্যবান, সত্যের নিবাস, তিনি মতিমান, তিনি প্রাজ্ঞ, তিনি বিদ্বান, তিনি কবি। এই ইন্দ্রই উষার আগমনে, সূর্যের আবির্ভাবে, সকল সিদ্ধি সম্পদ প্রদান করিতেছেন, "পর্বতের মধ্যে লুক্কায়িত দুগ্ধস্রাবী গো উন্মুক্ত করিয়াছেন, সকল অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছেন।"

বৈদিক অগ্নির সহিতও আছে গো-র অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। "অগ্নি গো-র পথ আবিষ্কার করিয়া, খুলিয়া খুলিয়া চলিয়াছেন"। "নিত্যদুগ্ধ তেজস্বিনী গোরাজীই আবার অগ্নিকে জ্যোতির্ময় ধারা পান করাইয়া সতেজ করিতেছেন।" অগ্নি হইতেছেন "বহুল গোযুক্ত ঋদ্ধির ঈশ্বর" এবং সেইজন্যই তিনি সর্বভূতজ্ঞ, জাতবেদা। ঋষি বিশ্বামিত্র বলিতেছেন ধেনু হইতেছে দ্যুলোকবাসী, সেই দ্যুলোকের ধেনুই অগ্নির অশ্ব। "অগ্নির আবাস ঋতের সদনে—সত্যের শক্তি যেখানে স্বধর্মে ও স্বকর্মে প্রতিষ্ঠিত—এবং সেই ঋতের সদনে অগ্নিকে সেবা করিতেছে গো, তাই অগ্নির জ্বালা আমাদের কাছে ছড়াইয়া আসিয়া পড়িতেছে।" বৈদিক অগ্নি কে? বৈদিক অগ্নি হইতেছেন চিৎশক্তি—শুদ্ধ প্রাণশক্তির তপঃ তেজ—"কবিক্রতু"—দিব্য দৃষ্টির অটুট সৃষ্টিশক্তি। তাই তো অগ্নি আমাদের জরাগ্রস্ত গোরাজীকে নবযৌবন দিতেছেন, অগ্নির নির্মল ও দীপ্ত তেজে আমাদের গোবৃন্দ রক্ষিত হইতেছে, পুষ্ট হইতেছে, সমৃদ্ধ হইতেছে।

তারপর আনন্দের দেবতা সোম, তিনি কাহার আশ্রয়ে চলিয়াছেন? "যে যাজ্ঞিক-সাধক গোধন অন্বেষণ করেন তাহারই জন্য সোমধারা ক্ষরিত হইতেছে। সোমধারা চলিয়াছে যে বিশালপথে, সেই পথেই মানুষের প্রথম প্রভাত হইতেছে, দ্যুলোক খুলিয়া যাইতেছে, গোলোকে হইতেছে। এই গোধন—দিব্যজ্ঞানের এই জ্যোতিলেখা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, এই অন্তরাত্মার গোধনে যাঁহারা ধনিষ্ঠ তাঁহারাই গোতম। তাই গোতমেরা মানুষকে, সাধককে ডাকিয়া বলিতেছেন, "গোমুখের নিকট যাও তাহাদের স্তুতি কর"।

এখন, ব্রাহ্মণ কে? 'ঋগ্বেদের ব্রাহ্মন হইতেছেন ব্রহ্মবিদ্ ও ব্রহ্মকৃৎ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে পাইয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈদিক ব্রহ্ম অর্থ মন্ত্র। তাই ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি হইতেছেন মন্ত্রের অধিপতি। মন্ত্র কাহাকে বলি? মন্ত্র হইতেছে সত্যের বাঙ্ময় প্রকাশ। ঋষি দীর্ঘতমা তাই ব্রাহ্মণ আখ্যা দিতেছেন তাঁহাদিগকে যাঁহারা বাক্‌রহস্য অধিগত করিয়াছেন। বাক্ বা মন্ত্র কেবল কথা নয়, শুধু অর্থহীন শব্দ বা সূত্রাকারে সাধারণ ভাষা মাত্র নয়। বাক্ বা মন্ত্রে রূপ পাইতেছে সত্যের ছন্দ ও গতি। নিখিল সৃষ্টির মূলে, বস্তুর আদি সত্তার মধ্যে আছে একটা প্রাণশক্তির আবেগ, একটা স্পন্দন, একটা মূর্ছনা; সত্যের আছে একটা মুখ ফুটিয়া কথা কহিবার, আপনাকে প্রকাশ করিবার প্রেরণা—তাহাই সত্যের বাণী, তাহাই বাক্, তাহাই মন্ত্র, তাহাই ব্রহ্ম। তাই ঋগ্বেদ বলিতেছেন, "যাঁহার অন্তরাত্মায় ব্রহ্মণস্পতি অধিষ্ঠিত সেই ব্রাহ্মণ সকল দেবশক্তির আশ্রয়, বৃহৎ সত্যের মূর্ত প্রতিষ্ঠান ও বিগ্রহ। ব্রহ্মণস্পতি যে সকল বিচিত্র ও সনাতন প্রজ্ঞান মন্ত্রের মধ্যে ফুটাইয়া ধরিয়াছেন।" ব্রহ্মণস্পতি বা মন্ত্রশক্তি হইতেছে প্রকাশের শক্তি অর্থাৎ যে শক্তি সত্যের জ্ঞানকে রূপের মধ্যে উচ্চারিত করিয়া ধরিতেছে। "সূর্য যেমন আপন জ্যোতি হইতে কিরণ-রাজী বিচ্ছুরিত করিতেছেন, ব্রহ্মণস্পতিও তেমনি আপনার প্রকাশের তেজ হইতে ঋতম্ভর মন্ত্ররাজী উৎপাদন করিতেছেন।" তাই ব্রহ্মণস্পতি "দেবগণের সাধারণী শক্তি, তিনি প্রকাশাত্মিক শক্তি-সমূহের রাজা, তিনি মন্ত্ররাজীর অধিপতি, তিনি কবিদিগেরও কবি।" ইন্দ্রের কথা পূর্বে আমরা বলিয়াছি। ইন্দ্র হইতেছেন জ্ঞান শক্তি আনন্দময় দিব্য মনের অধিষ্ঠাত্রী পুরুষ। সেই "ইন্দ্রকে উপচিত সমুন্নত করিয়া ধরিতেছেন ব্রহ্মাণঃ—ব্রহ্মসিদ্ধেরা"।

গো ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিতেছি—গো ও ব্রাহ্মণের এমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কেন, কেন গো ও ব্রাহ্মণকে এমন করিয়া সমান আসন ও মর্যাদা দেওয়া হইল তাহা আর ধাঁধা, প্রহেলিকা, কষ্ট-কল্পনা বলিয়া বোধ হইবে না। বৈদিক ঋষি নিজেই বলিয়া দিতেছেন "ব্রহ্মণস্পতি অজ্ঞান ও মূক অন্ধকারকে অদৃশ্য করিয়া দিয়াছেন, জ্ঞানাদিত্যকে প্রকাশ

করিয়া ধরিয়াছেন, দিব্য বোধের উজ্জ্বল জ্বালা গোরাজী উদ্ধার করিয়াছেন। ইন্দ্রের যে সুনৃত বাক্—যে ব্রহ্মশক্তি —তাহা সম্যক্ সুনৃত, তাহা ভূমার প্রকাশ, তাহা গোদায়ী।

পরিশেষে, "নমঃ" শব্দটিও তাহার পুরাতন শক্তিমান বৈদিক অর্থটি পরিত্যাগ করিয়া আধুনিকের মনে একটা নিতান্ত দুর্বল ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। "নমঃ" শব্দের লৌকিক অর্থ "নমস্কার"—সেইজন্য বা শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের জন্য একটা শারীরিক ক্রিয়া। কিন্তু বৈদিক ঋষিরা "নমঃ" শব্দে বুঝিতেন অন্তরাত্মার একটা প্রণতি, সমস্ত আধারের একটা অকুণ্ঠ সমর্পণ, দেবশক্তির হস্তে আপনাকে নিঃশেষ ঢালিয়া দেওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া। "নম" অর্থ নীচের নিত্য নৈমিত্তিক গতি প্রবৃত্তি সত্তাকে উপরের ধর্মের নিকট উৎসর্গ করা। এই নমঃ শক্তির বলেই দেবতাকে জাগাইতে হয়, জ্যোতিকে নামাইতে হয়, সত্যের স্বরূপকে রূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

গো ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ—কারণ, আমার প্রাকৃত স্বভাব অজ্ঞানতমসে আচ্ছন্ন,কারণ, দিব্যবাণীর গতিছন্দ ও রূপরেখা সে স্বভাবকে গঠিত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেছে না। প্রাকৃত স্বভাব হইতেছে অসুর—বৃত্র—সে আপনার ক্ষুদ্র অজ্ঞান-অহঙ্কারের পাহাড় তুলিয়া ধরিয়া "সত্যং ঋতম্ বৃহৎ"-কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই অসুরের চাই বলি—নমঃ। বজ্রী ইন্দ্র—দিব্যমন—তাহার অগ্নিতেজ লইয়া, সত্যের বাণী হুঙ্কারে ছড়াইয়া, সূর্যের আলোকে দিক উদ্ভাসিত করিয়া সেই বৃত্র বা আবরণী শক্তিকে ছিন্ন দীর্ণ করিয়া দিতেছেন। এই উপরের দিব্য শক্তিরাজী যাহাতে সহজে নামিয়া আসে সে জন্যে যাজ্ঞিক সাধকের, ঋত্বিকের চাই পদে পদে নমঃ। এই পার্থিব লোকে, এই মর্ত্য আধারে চাই দেবলোকের অমৃত-নিস্যন্দিনী জ্যোতি-রেখা, চাই প্রতি কর্মে প্রতি এষণায় দেববাণীর অনবদ্য সার্থকতা—তাই গো ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

এ এক আশ্চর্য রহস্য যে মানুষ ভগবানকে ভালবাসতে পারে অথচ মানুষকে ভালবাসতে পারে না; তাহলে কার প্রতি তাদের ভালবাসা?

—শ্রীঅরবিন্দ

মায়ের ঘরোয়া কথা

"NOEL"

(ফরাসীতে বড়দিনের উৎসবকে বলে "নোয়েল")

শুক্রবার ২৫.১২.৫৩

পবিত্র আজ মাকে ধরল, অমৃতর কতকগুলি কাগজে সই করতে হবে। মোটর গাড়ির লাইসেন্স প্রভৃতির ব্যাপারে।

মা বললেন, আজ বড়দিন। ছুটির দিন। তবু তোমাদের জন্যে বুঝি তাদের অফিস খোলা থাকবে? কি বুদ্ধি তোমার

পবিত্র বলল, আমি তোমার কাছে ধরে দিলাম। এখন তোমার ইচ্ছামত তুমি যেদিন খুশি সই করে দিও।

মা বললেন, আমার ইচ্ছামত? আমি যদি আমার ইচ্ছামত করি তাহলে তো তোমাদের পৃথিবী উল্টে যাবে।

পবিত্র বলল, তা গেলেই-বা তাতে কি এসে যায়?

মা হেসে বললেন, তাই বটে।

এবার সে আর একটি বিষয় উত্থাপন করল। ওয়াটার-ম্যান কলমের জন্যে দশ স্টার্লিংয়ের বিল সই করতে হবে।

মা শুনে অবাক, জিজ্ঞাসা করলেন, কে আনতে দিয়েছে? কার কলম? দশ স্টার্লিং! বলে কি সব। একি হীরে বসানো কলম? হলেই হল! যেন অলঙ্কারের সামিল দাম আদায়ের ব্যাপার। হয়তো বলবে, দশ বছর চলবে। কিন্তু দুবছর না যেতেই দেখবে পুরনো হয়ে গেছে। যারা একটাকা বা পাঁচসিকে দিয়ে কলম কিনে, দুচার মাস চালিয়ে আবার একটা নতুন কেনে, তারা ঢের বেশী লাভবান হয়! জাপানীরা এ বিষয়ে সত্যিই খুব বুদ্ধিমান। তাদের মত হল, যতদূর সম্ভব সস্তায় মাল উৎপাদন করবে। তাহলে মানুষ বারে বারে সহজেই কিনতে পারবে এবং দিব্যি নতুন নতুন জিনিস উপভোগ করতে পারবে। গাড়ির বেলাতে দেখ, বিশ পঁচিশ হাজার টাকার গাড়ি কেনো, তারা তোমায় বলবে, এ গাড়ি দশ বছরেও পুরনো হবে না। কিন্তু আসলে তা নয়। তার চেয়ে খুব কম দাম দিয়ে কেনো, অল্পদিন চলুক, তারপর আবার একটা নতুন কিনতে পারবে।

আজ ক্রিশ্‌মাস্-ডে। একটু বিশেষ খুশি হবার কারণ ঘটল। ব্যালকনিতে আসতে আসতে মা বললেন, পবিত্র নেই কি? (বললাম আছে, তাকে ডেকে দিলাম)

মা সুধালেন, কে তৈরী করে আমার "অ্যাস্‌পারাগাসের সস্?" (sauce d'asperge) পবিত্র ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, ও।

মা তখন নাম ধরে ডেকে বললেন, এই বোতলটিতে আছে নুন। তোমার নুনের বদলে এইটি ব্যবহার করবে। (দেখলাম রং কালো, পাউডার করা। জিজ্ঞাসা করলাম, মরিচের গুঁড়োও কি এতে মেশানো আছে?)

মা বললেন, না, শুধুই নুন। দেখো, যেন তাই বলে মরিচের গুঁড়ো মেশাতে ভুলো না। তাহলে sauce-এর কোনই আস্বাদ থাকবে না। এই বলে ছোট্ট বোতলটি দিলেন হাতে। লেখা রয়েছে তার গায়ে Salary Salt। এমন দিনের এমন কৃপা অবশ্যই জীবনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ এনে দিল।

* * *

শনিবার ২৬.১২ ৫৩

গতকাল রাত্রে খেলার মাঠে Christmas এর উৎসব উপলক্ষে নৃত্য-গীতাদির অভিনয় চলছিল, তখন ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি ও দমকা বাতাস মিলে অনুষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ নষ্ট না করে দিতে পারলেও, যথেষ্ট অসুবিধা ঘটাল। এই বিষয়ে গতরাত্রেই আশ্রমে ফিরে মা বলেছিলেন, কোন একটা বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাব তিনি সকাল থেকেই

টের পেয়েছিলেন, তবে সেটা তত গুরুতর নয় বলে তিনি তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেননি। প্রকৃতির শত্রুতার বিনিময়ে প্রচণ্ড মূল্য আদায়ের ইঙ্গিত ছিল না। অর্থাৎ যখন প্রকৃতি বিরোধিতা করতে বদ্ধ পরিকর, তখন তাকে থামাতে গেলে, সে বিনিময়ে চায় প্রচণ্ড মূল্য। এক্ষেত্রে ততটা হাঙ্গামার লক্ষণ দেখা দেয়নি বলেই তিনি বিশেষভাবে শক্তি প্রয়োগ করেননি। তাই উৎসবটি, প্রচণ্ডভাবে না হলেও, বেশ খানিকটা অসুবিধার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল। নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি-বিশেষের অথবা কোন কোন ব্যক্তির দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল এর পিছনে।

আজ ব্যালকনির পরে এই কথারই জের টেনে মা বললেন :

গতকালের প্রাকৃতিক দুর্যোগটা তো প্রত্যক্ষই ইচ্ছাকৃত। তা না হলে এমনটা হতেই পারত না। সকালে তো আকাশ ছিল সম্পূর্ণ পরিষ্কার। জানি না, কার অন্তরের বিশেষ অনিচ্ছা এই দুর্যোগের শক্তিটিকে আবাহন করেছিল।

"Hier c'était exprès sans aucun doute ! Cela n'a pas plu le matin."

পবিত্র ঠাট্টা করে বলল, C'est pourquoi il a plu le soir ! সকালে পড়েনি, তাই সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়ল।

মা একটু বিব্রত বোধ করে বললেন,

"O Pavitra ! Hier j'ai dit à quelqu'un par fantaisie, que la nature n'est pas chrètienne !

দেখ কাণ্ড পবিত্রর ! গতকাল ঠাট্টা করে আমি এক-জনকে বলেছিলাম, প্রকৃতি খৃষ্টান নয়।

পবিত্র হেসে বলল, মা, এ বছরে সে নয় ! (অর্থাৎ এ বছর প্রকৃতি খৃষ্টান নয়, নইলে বৃষ্টি হ'ত না)

মা আরও একটু হেসে বললেন, সেও তাই বলেছিল।

* * *

রবিবার ২৭.১২.৫৩

অপ্রত্যাশিতভাবে মা নাম ধরে ডেকে বললেন, তোমার বন্ধুদের কে একজন এসে ওদের কয়েকটা জিনিস নিয়ে যেতে চায়। সে বলেছে, তারা যাবার সময় নিয়ে যেতে পারেনি, কারণ তখন পারমিট্ ছিল না। এখন ছাড়পত্র পেয়েছে, তাই জিনিসগুলি দিতে হবে। লোকটি কিন্তু কোন লিখিত পত্র আনেনি, আমরাও তাকে চিনি না। সুতরাং তাকে বলা হয়েছে চিঠি না আনলে তাকে জিনিসগুলি দেওয়া সম্ভব নয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ বন্ধুদের কথা উল্লেখ করছ তুমি ? আমি তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

মা বললেন, ও, হ্যাঁ, তোমার তো প্রচুর বন্ধু আছে বিশ্বময়। তোমার "বিশ্ববন্ধু" নাম হওয়া উচিত ছিল। তারপর মা বললেন, ওই ওরা। যখন যায় এগুলি নিয়ে যায়নি। এ লোকটি মাদ্রাজ থেকে আসছে বললে।

মাকে বললাম, ওদের এ ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। যা জানি তা হচ্ছে, সেই কাকা আর এম্ ব্যাসির সেই প্রতিনিধির আসার কথা ছিল বড়দিনে, কিন্তু কেউই আসেনি।

মা বললেন্ রবীন্দ্রর কাছে এ লোকটির বিষয় খোঁজ করে দেখতে পার।

* * *

সোমবার ২৮.১২.৫৩

ব্যালকনির ঠিক আগে, মায়ের দরদালানে কেউ ছিল না দেখে, সেই সুযোগে একজন মাকে বলল, অমুক এক পত্র লিখেছে। বিস্ময় প্রকাশ করেছে, আশ্রমের এই আবহাওয়ায় থেকে, কি করে তাকে অমন স্নেহ প্রীতিপূর্ণ চিঠি সে লেখে। এবং প্রার্থনা জানিয়েছে যেন তার এই ভাবটি বজায় থাকে। মাকে সে আরও বলল, লোকেরা তার সম্বন্ধে নানা কথা বলে। কেউ নাকি গিয়ে কন্সালের বাড়িতে বলে এসেছে, সে মাকে ঠিক ঠিক টাকাকড়ি দেয় নি। তারপর, তার কে এক বড়লোক বন্ধু এসে আশ্রমে উঠে ছিল। সে নাকি ওদের বাড়িতে যেতে চাইলে, লোকেরা তাকে বলেছিল, ওদের আবহাওয়া বড় খারাপ। ওদের ওখানে আমরা নিয়ে যেতে পারব না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মা শুনে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, এ সবই রাবিশ্। এমন কোন ঘটনার কথা আমি জানি না। তবে এসব নিয়ে মত্ত হবার কারণটা কি ? লোকের কথায় চঞ্চল হতে গেলে তো আর তার শেষ নেই। এগুলো তার নিজের অন্তরের দোষগুলোকে ঢাকবার অছিলা হতে পারে।

* * *

মঙ্গলবার ২৯.১২.৫৩

সমস্যাপূর্ণ একটি তর্কালোচনা হল। নতুন এঞ্জিনিয়ার 'লুই' পবিত্রদের লরী মেরামতের কারখানার জন্যে অন্য-দিকে নতুন একটি দরজা ফোটানোর প্রস্তাব সমর্থন করে না। তার বক্তব্য হল, যদি দুদিন বাদে আবার ভেঙে ফেলে নতুন করে ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে বেশি খরচা করে কিছু না করাই উচিত।

মায়েরও মত তাই। তিনি পবিত্রর সহকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন সে আর একটা দরজা অন্যদিকে ফোটাতে চাইছে। তার যুক্তি হল, দুটো লরীকে একই সঙ্গে ঢোকাতে পারা যাবে না, যদি অন্যদিক দিয়ে আর একটিকে বের করে দেবার পথ করা না হয়।

মা-ও সেটা বুঝতে পারলেন। তাই বললেন, দুটো নয় তিনটি Lorry-র কথা ভেবে রাখ। দরজা না ফোটালেই যদি না হয়, তো তাই কর। তবে ভাল করে বিবেচনা করে কর। কিন্তু কে লুইকে বললে যে V. G. H.-এ (Vegetable Garden House বহুদিন হল, সে নাম বদলে গেছে) নতুন রান্না ঘর হবে? আমি মোটেই চাই না যে আশ্রমের এত কাছে রান্নাবাড়ী আসুক।

তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট বলল, সে কথা আমি জানি না, তবে তুমি যেমনটা অনুমোদন করবে আমরা তাই মেনে নেব।

মা বললেন, সে তো জানা কথা। কিন্তু তবু তোমাদের স্বমত সকলের আগেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন, ওখানে নতুন রান্নাঘর করার কথা! কি করে এমন কথা উঠল? [ক্রমশ]

[জনৈক সাধকের ডাইরি থেকে]

ভগবানের যে দাস হয় সে কিছুটা বড়, কিন্তু যে কৃতদাস হয় সে আরো বড়।

—শ্রীঅরবিন্দ

আদর্শ মানব ঐক্য

শ্রীঅরবিন্দ

ষষ্ঠবিংশতি পরিচ্ছেদ

শাসনব্যবস্থাগত একত্ব

(১)

আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ সম্বন্ধে যেসব প্রচলিত মতবাদ রয়েছে, প্রায় সর্বত্রই গোড়াতেই স্বীকার করে নেওয়া হয় যে নেশনসব তাদের পৃথক পৃথক সত্তা এবং স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করে চলবে, আন্তর্জাতিক করণীয়ের জন্য রেখে দেবে শুধু যুদ্ধ-নিবারণ, সঙ্কটজনক বাদ-বিসংবাদের নিয়ন্ত্রণ আর যেসব আন্তর্জাতিক সমস্যা সাধারণ উপায়ে তারা মীমাংসা করতে পারে না সেইসব বিষয়। কিন্তু পরিণতি যে এখানেই থেমে যাবে তা সম্ভব নয়; প্রথম পদক্ষেপ অবশ্যম্ভাবীরূপে দ্বিতীয় পদক্ষেপের অভিমুখে নিয়ে যাবে এবং তা চলবে একই গন্তব্যের অভিমুখে। যেরকম কর্তৃপক্ষই প্রতিষ্ঠিত হোক না, সত্যকার কর্তৃত্ব যদি তার কিছুমাত্রায় থাকে, শুধু আলাপ-আলোচনার জন্য সভাসমিতি নয়, তবে বাধ্য হয়ে তাকে ক্রমে অধিকতরভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে এবং তার শক্তির মাত্রাও ক্রমবৃদ্ধি লাভ করবে। নিবার্য বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষ পরিহার করা, আরম্ভে প্রথম ক্ষমতাহ্রাসের ফলে নূতন কর্তৃপক্ষ যেসব বিপত্তি এবং বিপর্যয় ফেটে পড়বার পূর্বেই সময়োচিত হস্তক্ষেপ করতে না পারায় নিবারণ করতে অক্ষম হয়েছিল সে সকলের পুনরাবর্তন এখন থেকে বন্ধ করা, একটা সমবেত উদ্দেশ্যে সকল ক্রিয়াকলাপে সুসঙ্গতি স্থাপন করা—এই মূল প্রেরণাসব নিয়েই মানবজাতিকে এগিয়ে চলতে হবে শিথিলবন্ধ ঐক্য থেকে দৃঢ়বন্ধ ঐক্যের দিকে, বৃহৎ এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে স্বেচ্ছাকৃত আনুগত্যের থেকে প্রায় সকল ক্ষেত্রে অবশ্যকর্তব্য আনুগত্যের অভিমুখে। শক্তিমান নেশনসকলের আপন আপন উদ্দেশ্যে এই আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষকে কাজে লাগাবার বাসনা, দুর্বল নেশনদের নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য তার কাছে অনুযোগ-অনুরোধ করতে পারার প্রয়োজনবোধ, নেশনগত আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ ও বিপ্লবের বাস্তব সংঘাত অথবা ভাবী আশঙ্কা—এ সকলই আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষকে অধিকতর ক্ষমতা আয়ত্ত করতে এবং তার স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মের পরিধি প্রসারিত করে ধরতে সাহায্য করবে। বিজ্ঞান, চিন্তাশক্তি এবং ধর্মবাদ এই তিন বলধারা আধুনিক যুগে ক্রমেই জাতিগত পার্থক্যসব মুছে দিয়ে চলেছে এবং মানবজাতিকে প্রাণে এবং আন্তর চেতনায় একটা ঐক্যের দিকে নির্দেশ দিয়েছে; এই ত্রিধারা, জাতিগত সীমাবদ্ধ, সংঘর্ষ ও বিভেদে ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে এবং পরিবর্তনের জন্য তাদের প্রবল প্রভাব বিস্তার করবে। ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে যে বিপুল সংঘর্ষ তা সত্বরই বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠতে পারে এবং ফলে তাতে এমন একটা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে যা এমন এক অনিবার্য পরিণাম নিয়ে আসতে পারে বা বর্তমান সংকটকে এমন রূপ দিতে পারে যার ফলে কার্যতঃ রূপান্তরটি সুসম্পন্ন হয়ে যাবে*।

আপাততঃ আমরা ধরে নিয়েছি যে একটা দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ বিশ্বরাষ্ট্র যার অন্তর্গত হবে নেশনসব যেন তার প্রদেশ হিসাবে—এই হবে শেষ পরিণাম। সর্বপ্রথমে আন্তর্জাতিক

---

* বাহ্যতঃ মনে হতে পারে ফ্যাসিস্টবাদের ব্যাপক প্রসার এই পরিণতি রোধ করতে পারে শ্রেণীগত সংগ্রাম দূর করে দিয়ে, কিন্তু ফ্যাসিস্টদেশ সকলেও এখনও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যে এই প্রশ্নের সমস্যার এই মীমাংসা শুধু একটা সাময়িক ব্যবস্থা, একটা তৎকালীন বিবর্তিমাত্র নয় কি না, অথবা ফলতঃ তা পাকা মীমাংসা নয়।

কর্তৃপক্ষকে নিজের হাতে তুলে নিতে হবে আন্তর্জাতিক বাদ-বিসংবাদ এবং পরস্পরের মধ্যে অর্থনীতিক চুক্তি ও সম্বন্ধের বিধিসব সুব্যবস্থা করবার জন্য, এইভাবে আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ তার যাত্রা শুরু করবে সালিসী বিচারক এবং প্রয়োজনমত অবস্থায় কর্মকর্তা হিসাবে; ক্রমে তা পরিণত হবে সংবিধায়ক গোষ্ঠীরূপে এবং পরে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্মকর্তা হিসাবে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নূতন রকমের বিপ্লব-বিপর্যয় পরিহার করতে হলে তার আইন-প্রণয়ন হবে একান্ত প্রয়োজন; কারণ, বিপুল একটা যুদ্ধ এবং বিপর্যয়ের পরে যেরকমেরই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এবং বিশ্ব-শৃঙ্খলায় আমরা উপস্থিত হয়ে থাকি না কেন তা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় হতে পারবে এ কথনই আশা করা যায় না। অন্যায়, অসাম্য, অস্বাভাবিক ব্যাপার সব, কলহের অথবা অসন্তুষ্টির হেতুসব থেকেই যাবে জাতিতে জাতিতে, মহাদেশের ও মহাদেশের মধ্যে সম্বন্ধে। তা পরিণামে নিয়ে যেতে পারে নবতর সংগ্রাম ও বিক্ষুবণের দিকে। এই ধরনের জিনিস সব নেশন-রাষ্ট্রে নিবারিত হয় আইনপ্রণেতা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতায়; তারাই বর্তমান বিধিব্যবস্থার মধ্যে নিরন্তর পরিবর্তন সাধন করে চলেছে নূতন নূতন ভাবনার নূতন স্বার্থের নূতন শক্তিধারার এবং নূতন প্রয়োজনের দাবি অনুসারে,—ঠিক এরকমটি হতে হবে নূতন বিশ্বরাষ্ট্রের গঠনে। এই আইন-প্রণয়নক্ষমতা যতই তার ক্রিয়াবলী, অধিকার ও প্রয়োগপদ্ধতি পরিণত করে প্রসারিত করে সুশৃঙ্খলিত করে ধরবে ততই তা হয়ে উঠবে জটিলতর এবং বাধ্য হয়ে তাকে বহুক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং পৃথক জাতিগত সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দিতে হবে অথবা তার পরিবর্তে আপন সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে হবে। এর অর্থ হবে আবার, তার কার্যকরী ক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি এবং একটা আন্তর্জাতিক কার্যনির্বাহক সংগঠনের ক্রমোদ্ভব। গোড়ায় তাকে হয়তো আবদ্ধ থাকতে হবে আশু এবং সর্বপ্রধান সমস্যা ও বিষয় নিয়ে যে সকলের উপর তার আধিপত্য একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু স্বভাবতঃই তাকে তার হস্ত প্রসারিত করে ধরতে হবে প্রায় সকল বিষয়বস্তুর উপরই যাদের মনে হবে রয়েছে একটা আন্তর্জাতিক ফলাফল এবং প্রাধান্য। অনতিবিলম্বেই তাকে আক্রমণ করতে হবে অধিকার করতে হবে সেসব ক্ষেত্র পর্যন্ত যেখানে নেশনসকল আপন আপন ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে বর্তমানে ঈর্ষাবান। পরিণামে তা নেশনগত জীবনের সমগ্র ব্যবস্থাই কবলিত করবে ও আন্তর্জাতিক শাসনের অধীন করে ধরবে—মানব-জাতির ঐক্যবদ্ধ জীবনের, তার সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সংগঠন, শিক্ষা ও কর্মক্ষমতার সুশৃঙ্খলার স্বার্থে। বর্তমানে যেসব স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র নেশন রয়েছে তাদের প্রথমে পরিণত হতে হবে আমেরিকার সম্মিলিত রাজ্য বা জর্মন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাষ্ট্রসংগ্রহের মত। অন্তিমে তাদের হয়তো হতে হবে মানবজাতির এক অভিন্ন নেশনের কতকগুলি বিভিন্ন ভূখণ্ড বা অঞ্চলের মত।

এই ধরনের কোন চূড়ান্ত পরিণতির পথে বর্তমানের বাধা হল প্রবল জাতীয়তাবাদ, গোষ্ঠীগত পৃথকসত্তার বোধ, সমবেত স্বাধীনতার সহজাত প্রেরণা, স্বকীয়তার গর্ব, স্বকীয়তার আনন্দ, অহংসর্বস্ব আত্মতৃপ্তির বিবিধ সুযোগ, মানবধর্মকে জাতিগত ধর্মের অনুগত করে রাখবার প্রবল প্রেরণা। তবে আমরা ধরে নিয়েছি আন্তর্জাতিকতার এই নবজাত ধর্ম বেগে বৃদ্ধিলাভ করে চলবে, আপন অনুগত করে রাখবে জাতীয়তাবাদের অতীত আদর্শ অতীত মনোভাব এবং প্রাণাবেগ, উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করবে এবং অধিকার করবে মানুষের সমগ্র মন। বৃহত্তর জাতিগত গোষ্ঠী যেমন নিজের অধীন করে রেখেছে এবং ক্রমে আত্মসাৎ করে চলেছে সকল ক্ষুদ্রতর কুলগত উপজাতিগত এবং আঞ্চলিক গোষ্ঠীসব, বৃহত্তর সাম্রাজ্য-গোষ্ঠী এখন যেমন চলছে ক্রমে ক্ষুদ্রতর নেশনগত গোষ্ঠীসব অনুগত করে এবং বৃদ্ধির সুযোগ যদি পায় তবে পরিণামে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে, তেমনি আমরা মেনে নিয়েছি যে ঐক্যবদ্ধ মানব-জাতির অখণ্ড মানুষ-গোষ্ঠী অনুরূপভাবে আপনার অনুগত করে রাখবে এবং আত্মসাৎ করে ধরবে সকল ক্ষুদ্রতর বিচ্ছিন্ন মানবীয় গোষ্ঠীসব। কেবল আন্তর্জাতিক আদর্শ, এক অখণ্ড মানবজাতির আদর্শ গড়ে উঠলেই জাতীয়তাবাদ দূর হয়ে যেতে পারে, অবশ্য বাহ্যিক একত্বসাধনের পুরাতন কৌশল, বলপ্রয়োগের বা দমনের ফলে, যদি আর সম্ভব না হয়; কারণ যুদ্ধের পথ সব একান্ত ধ্বংসসাধন করে প্রমাণ হয়েছে এবং কোন একটি সাম্রাজ্যের এমন উপায় নাই বা সামর্থ্য নাই অবশিষ্ট জগৎকে পদানত করে রাখতে দ্রুতগতিতে অথবা রোমকপদ্ধতির মত মন্থর গতিভরে। সন্দেহ নাই,

উন্নত জাতিগত রাষ্ট্রের পূর্বেকার প্রাচীন ক্ষুদ্রতর এবং কম আত্ম-সচেতন গোষ্ঠীদের বিচ্ছিন্নতার চেয়ে জাতীয়তাবাদ অধিকতর একত্বসাধনের প্রবলতর অন্তরায়। তবুও এই মনোভাবটি এখনও প্রবল সমবেত মানুষী মনে. এখনও জাতির মধ্যে এনে দেয় একটা অটুট প্রাণশক্তি এবং যেখানে মনে হয় এ জিনিসটি লোপ পেয়ে গিয়েছে সেখানেও ফিরে আবার দেখা দিতে পারে। কিন্তু বর্তমানে হল একটা বিপুল পরিবর্তনের যুগের আরম্ভ এবং বর্তমান মতিগতির ধরনধারণ থেকে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে সক্রিয় হয়ে উঠেছে কেবল ভাবধারা নয় শক্তিধারাও, অধিকতর শক্তিমান তারা, কারণ তারা হল ভবিষ্যতের শক্তি, বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত শক্তি নয়। এরা জাতীয়তাবাদকে আপনার অধীন করে ধরতে পারে, আমাদের কল্পনার অতীত আশু ভবিষ্যতেই। [ক্রমশ]

অনুবাদ : **শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত**

কান্নার চেয়ে হাসি অনেক দামী জিনিস।

—**শ্রীঅরবিন্দ**

ভবিষ্যতের কবিতা

শ্রীঅরবিন্দ

নবম অধ্যায়

ইংরাজী কাব্যের ধারা (১)

এইগুলিই হল ইংরাজী কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তার অন্তরের ক্রিয়াশীলশক্তি। এগুলি বুঝে নিচ্ছি আমরা, কারণ, একটা সাহিত্য কোন্ পথে প্রবাহিত হয়েছে এবং কোন্ রূপ গ্রহণ করেছে, সেটা বোঝবার জন্যে আগে আমাদের দেখা দরকার, এই সাহিত্যের মধ্যে প্রথমে নেপথ্যে থেকেছে এবং পরে রঙ্গমঞ্চে এসে আত্মপ্রকাশ করেছে যে মূল ভাব ও মূল ধাত, সেটা কি? কাব্য যে ক্ষেত্রটি অধিকার করে, সেটা একটা সব জাতিরই সাধারণ ক্ষেত্র; কিন্তু প্রত্যেক জাতির নিজস্ব বিশিষ্ট ভাব ও সৃজনীপ্রতিভা আছে, সেইটাই নির্দেশ করে দেয় কোন্ বিশেষ এলাকায় সেই জাতি সবচেয়ে বেশি সাফল্যলাভ করবে, তার প্রবণতা বা দৃষ্টি-কোণ এবং সৃষ্টির রূপই কি হবে। ইংরাজী কবিপ্রতিভার মধ্যে মূল ভাবের যে জটিলতা এবং পরস্পর-বিরোধী শক্তির যে সম্মিলন সাধিত হয়েছিল, সেইটাই স্পষ্টতঃ পূর্বাবধি করে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল যে ইংরাজী কাব্য তার সমগ্র ক্ষেত্রটির উপরে একটার পর একটা দুঃসাহসিক অনুসন্ধান চালিয়ে যাবে; কিন্তু তার অন্তর্নিহিত প্রাথমিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তার যে সীমা আছে সেইটাই ইঙ্গিত করে যে, জীবনের বাস্তব বা কাল্পনিক উপস্থাপনাতে তার অনায়াস সাফল্যলাভ হতে পারে, কিন্তু জীবনের বুদ্ধিগত বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রচনায় তার সাফল্য হবে কঠিনতর, আর তারপক্ষে সবচেয়ে কঠিন হবে এসবের অতীত বস্তুর, অতীন্দ্রিয় সত্যের বা আত্মার ঊর্ধ্বতর সত্যের প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা। পক্ষান্তরে, তা সত্ত্বেও এই বাধাটি যদি একবার জয় করা যায়, তাহলে এই সাহিত্যে কাব্যভাষার শক্তির যে, গভীরতর তীব্রতার বিকাশ সাধিত হয়েছে, তার জোরেই এসব জিনিসের অত্যুত্তম প্রকাশ সম্ভব হয়ে উঠবে; ল্যাটিন ভাষাগোষ্ঠীর কবিতার রীতিনীতির খুব বেশি অনুকরণ না করেই এসব অতীন্দ্রিয় বিষয়বস্তুর অনেকটা উপযুক্ত প্রকাশভঙ্গি অর্জন করা সম্ভব হবে। ল্যাটিন গোষ্ঠীর ভাষা-গুলিকে কল্পদৃষ্টির উপযুক্ত সহজাত অভিব্যক্তিতে নয়, বরং একটি স্বচ্ছ সমুচ্চ বুদ্ধিনিষ্ঠতার ছাঁচে ঢালা হয়েছে। আধুনিক ফরাসী ভাষায় বুদ্ধিনিষ্ঠতার গণ্ডির বিরুদ্ধে একটা অবিশ্রান্ত সংগ্রাম আমাদের চোখে পড়ে, এবং মালার্মের মত কবিকেও দেখি তিনি ফারাসী ভাষার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রাঞ্জলতার পক্ষে যাকে প্রকাশ করা একান্তই অসম্ভব সেই অনির্বচনীয়কে জোর করে প্রকাশ করার দুর্মর চেষ্টায় ফরাসী ভাষার ছাঁচটি ভাঙার কাজে একেবারে উঠে-পড়ে লেগেছেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় এরকম কোন গণ্ডির প্রতিবন্ধক দেখা যায় না। অনুভূতির গভীরতা, ব্যঞ্জনার বিস্তার, অসীমের দ্বার উন্মোচন করার শক্তি আগে থেকেই তার মধ্যে রয়েছে এর জন্যে উপযুক্ত প্রতিভা যে চিত্তের আছে সে এই শক্তিকে জাগ্রত করে সেই মহত্তম উদ্দেশ্যে তাকে কাজে লাগাতে পারে। সুন্দর সুচারু গদ্যরচনার পক্ষে এ ভাষার স্বভাবজাত যোগ্যতা খুই কম, কিন্তু কবির পক্ষে প্রয়োজনীয় সব-রকমের নিবিড় আলো ছায়া, সব রকমের উচ্চতা ও গভীরতা, অতলান্ত অনুভূতির নিভৃত গৃহকোণ এই ভাষার রয়েছে।

এটি কেমন করে সংঘটিত হল সেটা আমাদের দেখতে হবে; কারণ এটা মোটেই সহজে সম্পন্ন হয়নি, বরং শুধু কঠোর চেষ্টা ও অন্বেষণার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা প্রথমে দেখতে পাই যে, কবিপ্রতিভার সামনে যে ক্ষেত্রটি রয়েছে তাকে ইংরাজীকাব্য অধিকার করেছে ধাপে

ধাপে, আমাদের ক্রমবিকাশমান বোধের স্বাভাবিক সিঁড়িটি ধরেই সে উপরে উঠে গেছে। একটা একেবারেই বাহ্য, প্রত্যক্ষ এবং অগভীর বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গি নিয়েই তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপরে এগিয়ে সে গেল গভীরতর প্রাণময় কবিতার দিকে, শক্তি, সৌন্দর্য, বিস্ময়বোধ ও স্বতঃ-উৎসারিত মননের কবিতার দিকে, জীবনের আনন্দ ও বেদনা, আসক্তি ও আবেগ, জীবনের বিচিত্র রাগ ও রঙে ভরা কবিতার দিকে। এর মধ্যে জীবনের ও জগতের বাহ্য-উপস্থাপনাও গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু বাহ্য উপস্থাপনার অতিরিক্ত তার মধ্যে গতিশীল এবং কল্পনাময় বিষয়ও ভরে দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে ইংরাজীকাব্য ল্যাটিন জাতির রহস্য, তার জীবন, জগৎ ও ভাববস্তুর প্রাঞ্জল পরিমিত ও বুদ্ধিনিষ্ঠ আলোচনার রহস্য আয়ত্ত করার দিকে ঘুরল। তারপরে এল একটা চমৎকার উজ্জ্বল প্রয়াস—প্রকৃতি ও মননের মাধ্যমে, জীবন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত চিৎসত্তার মাধ্যমে এবং তাদের গহনতর রসগত অভিব্যঞ্জনার মাধ্যমে তাদের নেপথ্যচারী অধ্যাত্মসত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা। এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হতে পারেনি, তার আংশিক কারণ হল—এর জন্যে সঠিক বুদ্ধিগত প্রস্তুতি ছিল না কিংবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও উপলব্ধির জন্যে উপযুক্ত ভিত্তিও ছিল না; এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও উপলব্ধি শুধু সেইটুকুই দেওয়া সম্ভব ছিল যতটুকু কবির একক ব্যক্তিগত সংবোধি আপন স্বাধীন চেষ্টায় অর্জন করতে পারত। আরো একটি আংশিক কারণ হল, যুক্তির যুগে স্খলিত হয়ে আসার পরে আধ্যাত্মিক কবিতার স্বতঃউৎসারিত কিংবা ঘনীভূত ভাষা সব সময় পাওয়া যেত না; অথবা যদি-বা পাওয়া যেত, তাকে নিরাপদে ধরে রাখা যেত না। সেইজন্যে বুদ্ধি-প্রধান, কলা-সচেতন বা মননধর্মী কবিতার আর একটা যুগে আমরা সরে এলাম, সে কাব্যের ব্যাপ্তি অনেক বেশি, কিন্তু তার শিকড় যেমন খুব গভীরে নেমে যায়নি, তার শাখা-পল্লবও খুব ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। অংশতঃ এরই ভিতরে ছড়িয়ে এবং অংশতঃ এ থেকে গুটিয়ে আসার ফলে সাম্প্রতিক এবং সমসাময়িক কাব্যের প্রবণতাগুলি জন্মলাভ করেছে, অন্ততঃ তাকে দেখে মনে হয় এই কাব্য তার ভাষা ও ছন্দের যথাযথ ইন্দ্রজাল নিয়ে গভীরতর সত্যের অভিব্যক্তির রহস্য ভেদ করতে এগিয়ে চলেছে।

ইংরাজী কাব্যধারার প্রথম সুনির্দিষ্ট সূত্রপাত দেখি চসারের কাব্যে যখন ইঙ্গ-স্যাক্সন্ চিত্তের অমার্জিত কৃচ্ছ্রতা ফরাসী প্রভাবকে আত্মসাৎ করে তার দ্বারা স্বীয় ভাষা ও রসবোধকে পরিশীলিত পরিশুদ্ধ করতে পেরেছিল। এই ধারায় যেসব প্রতিবন্ধক দেখা দেয় তার এইটাই বৈশিষ্ট্য যে, যেমন তার সূচনায়, তেমনি তার গতিপথের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে, কিংবা অন্ততঃ এই কাব্যপ্রবাহের নব-রূপায়ণের প্রথম তিনটি উপলক্ষ্যে, তাকে একটা শিক্ষানবীসির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, কোন একটা বিদেশী কৃষ্টি ও কাব্যের প্রভাবে পড়ে প্রতিবারেই প্রায় নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হয়েছে, এতখানি কাব্যিক মৌলিকতা, শক্তি ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকবারে যাত্রা শুরু করার জন্যে বাইরে থেকে একটা ইঙ্গিতের তীব্র আলোকরশ্মি তার প্রয়োজন হয়েছে। সমস্ত আধুনিক সাহিত্যেই একসময়-না-একসময় এই রকমের বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু একবার গড়ে উঠার পর এবং আত্মকর্তৃত্ব লাভ করার পর বাহ্য প্রভাবের ছাপ তারা কম বেশি হাল্কাভাবেই এবং গৌণ সাহায্য হিসাবেই গ্রহণ করে। কিন্তু ইংরাজীতে সমগ্র পরিকল্পনাটাই বিদেশী শিক্ষার আওতায় ঢেলে সাজানো হয়। যেমন, চসার ইংরাজী কাব্যকে প্রথম রূপ দিয়েছিলেন ফরাসী রোমান্সের আদর্শে ও ইটালীয় দীক্ষাগুরুদের সৃষ্টির সাহায্যেই। এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্যিকেরা নতুনের সূত্রপাত করেছিলেন ফ্রান্স ও ইটালী থেকে আগত নব-জাগরণের প্রভাব এবং স্পেন থেকে আগত একটা পার্শ্ব-স্রোতের উপরে নির্ভর করেই। মিল্টন সোজাসুজি গিয়েছিলেন ক্লাসিক আদর্শের কাছে। রেস্টোরেশন যুগ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীও সমসাময়িক ফরাসী কবি ও সমালোচকদের কাছ থেকে সবিনয়ে কৃত্রিম-ক্লাসিক কাঠামো গ্রহণ করেছিল। তবু অবশ্য এই পর-নির্ভরতা ছিল শুধুই বাহ্যবিষয়ে; কাব্যের আত্মিক ব্যাপারে কিছু স্বজাতীয় বৈশিষ্ট্য থেকেই গিয়েছিল, সেইটা নিয়েই এই কাব্যধারা দ্রুত একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, এবং তারপর একটা মৌলিকশক্তি ও রীতি এই ধারায় জন্ম নিয়েছে; কিন্তু জাতির গতিশীল প্রাণশক্তি এত বিরাট ছিল যে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তা কোন আমূল রূপান্তরে গিয়ে পৌঁছায়নি।

এই কাব্যের গোড়ার দিকের প্রথম ভাব-প্রেরণা ও

রচনাশৈলী,—চসারে যা ফুটে উঠেছে,—তা তখনই একটি ইংরাজী সুর-স্বাতন্ত্র্য ধ্বনিত করে তুলেছিল। এই ভাব-প্রেরণাটি হল সাধারণ মানবজীবন ও মানব-চরিত্রের কাব্যিক পর্যবেক্ষণ—তাতে কোন পূর্বার্জিত ধারণা নেই, নেই বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা; এই জীবন ও চরিত্র কবির ব্যক্তিগত মনের মধ্যে ও কবির নিজস্ব ধাতের মধ্যে যেভাবে প্রতিফলিত হয়, শুধু সেইটুকুই আছে এই পর্যবেক্ষণে। চসারের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে নিজের উপরে নয়, তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুর উপরে, এবং এই বিষয়বস্তুর হল জীবনেরই বাহ্যক্রিয়া। জীবনের এইসব বাহ্যক্রিয়া তাঁর সামনে দিয়ে ভেসে গেছে এবং তার এই ভেসে যাবার পথে এই জীবনপ্রবাহে ও জীবনরসে, প্রাণখোলা হাসি কিংবা লঘু-সুলভ করুণরসে স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি লাভে তাঁর চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে গেছে। জীবনের যে রূপটি তিনি দেখেছেন, তার সঙ্গে তিনি কিছুই যোগ করে দিতে চাননি, কিংবা তার তলায় কি আছে বা তার বাহ্যরূপের নেপথ্যে কি প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা তিনি দেখতে চাননি; যে সব নরনারীর বাহ্যরূপ, জীবনক্রিয়া এবং আপাত-দৃশ্যমান্ চরিত্র বৈশিষ্ট্য তিনি এতখানি তৎপর ও সনিরীক্ষ বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন, তাদের আত্মার দিকে কিংবা তাদের মনের গহনে দৃষ্টিপাত করেননি। তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেননি, এই বিপুল জীবনপ্রবাহের তাৎপর্য কি, এর অন্তরে কোন্ শক্তি সক্রিয় রয়েছে? এ থেকে তিনি কোন মহৎ কাব্য-ভাবও আহরণ করেননি। জীবনকে ব্যাখ্যা করতে তিনি উদ্যোগী হননি, জীবনের একটা স্বচ্ছ সুখী উপস্থাপনাই ছিল তাঁর কাজ। তার স্বাভাবিক বর্ণ এবং পরিচিত রূপরেখা নিয়ে এই জীবন সেখানে সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে একেবারে স্পষ্ট সূর্যালোকের মধ্যে, বাহ্য ক্রিয়াবলীর জন্যে তার একটা নিজস্ব আকর্ষণ যথেষ্টই আছে; কবিকে তাই চিত্রিত করতে হয়েছে, প্রাঞ্জল কাব্যভাষায় এবং ছন্দে তাকেই রূপ দিতে হয়েছে। তাঁর শুধু প্রয়োজন ছিল এই জীবনকে কাব্যের উপাদানে রূপান্তরিত করার, আর প্রয়োজন ছিল তাঁর নিজের যে সুখী কাব্যিক মেজাজের সূর্যালোকের মধ্যে এই জীবনকে তিনি অভিষিক্ত করেছেন তাকেও কাব্যের উপাদান করে নেবার। একে তিনি যে রূপ দিয়েছেন তার নিজস্ব একটা সীমা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কারুকৃতির মধ্যে কোন ঘাটতি নেই, তার নৈপুণ্য যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি তা তৃপ্তিদায়ক,—যদি অবশ্য আমাদের কাছে তার যা দেবার আছে তার অতিরিক্ত কিছু আমরা তার কাছ থেকে দাবি না করি। ফরাসী রোমান্স-কাব্য থেকে চসার শিখেছিলেন স্বচ্ছন্দতা, স্বচ্ছতা এবং প্রসাদগুণ, আর মহান্ ইটালীয় স্রষ্টাদের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন পর্যাপ্ত বল ও প্রকাশভঙ্গির ঘনপিনদ্ধতা যেটা ফরাসী পদ্য তখনো পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর কাব্যভাষা কিংবা ছন্দঃস্পন্দন কোনটির মধ্যেই ইটালীয়দের নমনীয় মহিমা এবং উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্য কিছুমাত্র ছিল না। তাঁর ভাষা হল এক অনায়াস স্বচ্ছ, প্রবহমান্ ধারা; এ কোন বদ্ধ কূপ নয়, বরং একটি স্রোত,—কারণ এর মধ্যে কোন গভীরতা নেই। এ হল সেই বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষার স্রোত যে ভাষা নিষ্কলঙ্ক আরশীর বুকে প্রতিফলনের মতই বাহ্য জীবনের স্বচ্ছ প্রীতিপ্রদ কাব্যিক উপস্থাপনার পক্ষে একেবারে উপযুক্ত, যে ভাষা কখনো-কখনো তৎপর এবং অব্যর্থ প্রকাশভঙ্গিতে উন্নতিলাভ করে বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই কাব্যবাণীর একটা আদিম শক্তি, একটা অবদলিত অবনমিত নিম্নমানের কাজ-চালানো-গোছের যথাযথতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। মাত্র একবার কি দু'বার ঘটনাক্রমে চসার কবিতার একটা স্মরণীয় পংক্তি রচনা করে ফেলেছেন, অথচ দান্তে এবং পেত্রার্ক তাঁর দীক্ষাগুরু-দের মধ্যেই ছিলেন।

অন্য কোন মহৎ কাব্যসাহিত্যেরই সূচনা একেবারে এরকমের ছিল না। অন্য সাহিত্যগুলিও বাহ্যজীবনের কাব্য দিয়েই সূচিত হয়েছিল, গ্রীকের সূচনা হোমরের কাব্য দিয়ে ল্যাটিনের সূচনা ইনিয়াসের ঐতিহাসিক মহাকাব্য দিয়ে, ফরাসীর সূত্রপাত চার্লমেন-চক্র এবং আর্থুরীয় চক্রের সামন্ততান্ত্রিক রোমান্স দিয়ে। কিন্তু এগুলির কোনটিতেই গ্রীস বা রোমের জীবনধারা বা সামন্ততান্ত্রিক জীবনের শুধু পর্যবেক্ষণলব্ধ উপস্থাপনাই শৈল্পিক উদ্দেশ্য হয়ে উঠেনি। হোমর সর্বদা মানব জীবনকে উপস্থাপিত করেছেন কর্ম ও আবেগের একটা উচ্চগ্রামের তীব্রতার মধ্যে, আর অন্য কোন পরিবর্তনের মধ্যে না এনে তিনি তাকে ঢেলেছেন সৌন্দর্যের কাঠামো এবং দিব্য সৌষম্যের মধ্যে। ফিডিয়াস্ মর্মর প্রস্তর দিয়ে দেবতার মূর্তি গড়ার ইচ্ছায় মানুষের

আকৃতি নিয়ে যা করেছিলেন, হোমর মানব জীবনকে নিয়ে তাই করেছেন। যখন আমরা ইলিয়াড ও অডিসি পাঠ করি, তখন সত্যিসত্যিই আমরা এই পৃথিবীতে আর থাকি না, আমরা এমন এক পৃথিবীতে উঠে যাই যে পৃথিবী জীবনের বৃহত্তর গতিচ্ছন্দে ঊর্ধ্বায়িত ; এবং যতক্ষণ আমরা সেখানে থাকি ততক্ষণ আমরা একটি আরো জ্যোতির্ময় বাতাবরণের মধ্যে একটি মহত্তর দৃষ্টিলাভ করি এবং অনুভব করি আমরা প্রায়-স্বর্গীয় কোন স্তরে উঠে এসেছি। ভার্জিলের মত ইনিয়াসেরও লক্ষ্য ছিল রোমের আত্মাকে কাব্যবাণীর ছাঁচে মূর্ত করে তোলা। তাই ক্যাথলিক ও সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের আত্মা জীবনকে রূপান্তরিত করে তার একটা আদর্শ চিত্র তুলে ধরে। সেটা তার মহিমাটুকু হারিয়েছে ভাষা ও ছন্দঃপ্রবাহের অক্ষমতার জন্যে এবং তার গঠন শৈথিল্য ও আকৃতিব বিরক্তির দৈর্ঘের জন্যে। চসারের কাব্য-প্রক্রিয়ার মধ্যে এরকমের কোন মহৎ ভাব, কোন ঊর্ধ্বায়নী প্রেরণা বা আদর্শ ছিল না। জীবনকে যে তিনি রঞ্জিত করেছেন তা বস্তুধর্মীই হোক আর কল্পনাধর্মীই হোক, সেটা একই সূত্রের অধীন ছিল। এই সূত্রটি হল বাহ্যজীবনকে প্রতিফলিত করা। যে পর্যবেক্ষণশীল চিত্ত নিজেকে কবিতার একটা উজ্জ্বল আরশী করে রাখে, সেই চিত্তে হবে বাহ্যজীবনেরই প্রতিফলন। তাতে কল্পনার একটু ছোঁয়া কখনো-কখনো থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে।

ইংরাজী কাব্যের আত্মা এই ভাবে প্রথম একটা বলিষ্ঠ সুর, ইংরাজীর নিজস্ব বিশিষ্ট সুর, ধ্বনিত করে তোলার পর, এবং ফরাসী ও ইটালীয় প্রভাবের দ্বারা শুদ্ধীকৃত ইঙ্গ-স্যাক্সন চিত্ত তার নিজস্ব পথে এবং অপরিবর্তিত স্বধর্মে যতদূর যেতে পারে ততদূর এগিয়ে যাবার পর, হঠাৎ একটা বিরতিতে এসে পৌঁছাল। এই বিরতির অনেক বাহ্য কারণ দেখানো যেতে পারে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোনটিই পর্যাপ্ত কারণ নয়, যেহেতু আসল কারণটি ছিল এই যে, এই বহির্মুখীনতার পথে সেই কাব্যধারা বিকাশ লাভ করেছিল বলে একটা অন্ধগলির 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' দিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না। অনুমান করা যেতে পারে, এই ভাবেই কাব্যের ক্ষেত্রে ওলন্দাজ শিল্পকলা এক সময় প্রচণ্ড বহির্মুখীনতার পথে গিয়ে তারই মধ্যে নিজেকে বন্দী করে ফেলেছিল ; অবশ্য তার সেই বহির্মুখীনতা একটু উন্নত ধরনের ছিল বটে, কিন্তু তবু মনোভাবের দিক থেকে সেটাও ছিল একান্তই স্থূল এবং বাহ্য। ইংরাজী কাব্যের সামনে আরো মহান্ কর্তব্য ছিল এবং সেই জন্যে সে একটি নতুন আলো এবং একটি বলিষ্ঠ প্রেরণার পথ চেয়ে বসেছিল। তবু এই বহির্মুখী মনোভাব এবং বাহ্যসৃষ্টি প্রক্রিয়া ইংরাজচিত্তের সহজাত স্বধর্ম এবং এর অনেক পরিবর্তন-পরিমার্জন হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যে এর গভীর ছাপ থেকেই গেছে। রিচার্ডসন্ থেকে ডিকেন্স পর্যন্ত—এইটিই হল ইংরাজী কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি-পদ্ধতি ; এটি শেকস্‌পীয়রের নাটক ছাড়া এলিজাবেথীয় যুগের অন্য নাটকেও প্রবেশ করেছে এবং নাট্যকাব্যের অন্য মহিমময় পর্বগুলির মহত্তর সৃষ্টির সঙ্গে তাকে সমান হতে দেয়নি। ইংরাজী আখ্যান কাব্যেও এটি তার গণ্ডির ছায়া ফেলেছে। অথচ এই আখ্যান কাব্যের উচিত ছিল 'ফেয়ারী কুইনে'র প্রতীক-ধর্মিতা থেকে এবং মার্লোর প্রাণময় তীব্রতা থেকে নতুন করে যাত্রা শুরু করে হয় সেই সীমার গণ্ডি ছেড়ে স্বতন্ত্র পথে সরে যাওয়া, না হয় অনেকখানি ঊর্ধ্বতর শিল্পপ্রেরণা মিশ্রিত করে তাকে অন্ততঃ রূপান্তরিত করা। অনেক উদাহরণের মধ্যে কেবল একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, এই বহির্মুখীনতা বেদনাদায়ক-ভাবে টেনিসনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে, অথচ তাঁর নিজের মধ্যে জীবনকে হুবহু তুলে ধরার সত্যিকার কোন প্রবণতাই ছিল না। তাঁর পথে দাঁড়িয়ে এই বহির্মুখীনতা তাঁর সূক্ষ্ম আত্মগত ও মরমিয়া ভাবধারাটি রূপায়িত করতে বাধা দিয়েছে, অথচ তাঁর প্রথম সহজাত সংবোধি এই আত্মমুখী মরমিয়া ভাবটিই তাঁর 'লেডি অব শ্যালট্' ও 'মর্‌তে দ আর্থার'-এর মত রচনাগুলিতে আবিষ্কার করেছিল। এর বদলে আজ আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে 'প্রিন্সেস্' ও 'এনক্‌আর্ডেন্' নিয়ে এবং 'আইডিল্‌স্ অব্ দি কিং'-এর নয়নাভিরাম খুঁটিনাটি বর্ণনা নিয়ে। এই বর্ণনায় ভিক্টোরীয় যুগের বৈঠকখানার বাবুদের এবং বিবিদের ছবি পাই, তাঁরা কেল্‌টিয় মধ্যযুগের রাজপুরুষ ও রাজ-মহিলাদের মত ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁদের জলসাঘরে মিলিত হয়েছেন। এই ছবির মধ্যে এসব কিছুরই একটা তাৎপর্য আছে ; কিন্তু সেই তাৎপর্যের কিছুই আমাদের

কাছে ধরা দেয় না, কারণ সেটা জীবনের বাহ্য কলরোলের অনুকরণকারী একটা কৃত্রিম উৎকট সুরের মধ্যেই হারিয়ে যায়। নিশ্চয়ই, জাতীয় প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল ; কারণ জাতির যেটা নিজস্ব প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য, সেটা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, কাব্যেও তেমনি, আত্মপ্রকাশ করবেই। কিন্তু ইংরাজী কাব্য অন্যশক্তিদের দুয়ারও তো খুলে দিয়েছিল এবং সে যদি বাহ্যজীবনের রূপকে সর্বদা এই শক্তিদের সহায়তায় উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারত, তাহলে, পৃথিবীর কাছে তার সৃষ্টির মূল তাৎপর্য আরো ব্যাপক হত এবং তার বস্তুবীক্ষার শক্তি কখনো তার ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্যের চেয়ে কম হত না। কিন্তু এখন যেমনটি ঘটছে তাতে এই জাতীয় প্রবণতা মহাশক্তিধর কবিদেরও তাঁদের নিজস্ব অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণতা সাধন থেকে অনবরতই দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

যে নতুন আলো এবং প্রেরণা ইংল্যাণ্ডে কবি-আত্মার নীরবতাকে ভঙ্গ করে প্রথম তাকে স্বাধীন ও সমৃদ্ধ ভাষার মধ্যে মুক্তি দিল, সেটা এসেছিল ফ্রান্স ও ইটালীর নবজাগরণ থেকে। নবজাগরণের অনেক তাৎপর্য ছিল এবং বিভিন্ন দেশে এর বহুবিচিত্র অর্থ হত, কিন্তু সর্বত্র সর্বোপরি একটি জিনিস বোঝাত, সেটা হল জীবনের প্রত্যেকটি উদ্যোগে সৌন্দর্য ও আনন্দের আবিষ্কার। মধ্যযুগের জীবন ছিল বলিষ্ঠ, একরকমের গভীর বিষণ্ণ শক্তির মধ্যে সে জীবন অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু সর্বদাই যেন তার উপরে ছিল মহাকালের করাল ছায়া, দুঃখের মধ্য দিয়ে একটা পরলোকের কামনা তার উপরে যেন বোঝার মত চেপেছিল। একদিকে ধর্ম অন্যদিকে রাজশক্তি—এই দুইয়ের মাঝখানে একটা শাণিত ক্ষুরধার পথের উপর দিয়ে চলেছিল সেই যুগের জীবন। নবজাগরণ নিয়ে এল এই বোঝা এবং এই বাধ্যতা থেকে মুক্তির চেতনা, জীবনের দিকে সে দৃষ্টিপাত করল এবং তাকে ভালবাসল খুবই বেশি। দেহ, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সৌন্দর্যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি কর্ম, ভাষা এবং চিন্তার সৌন্দর্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল, যে চিন্তার সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ সে চিন্তা শুধু চিন্তার জন্যে নয়, সেটা জীবনেরই একটা শক্তিরূপে তাকে মুগ্ধ করল। হেলেনীয় আদর্শই এখানে তার বলিষ্ঠ মানবীয় চেতনা এবং মানবিক উপাদান নিয়ে ফিরে এল, তার কাছে মানবীয় কোন উপাদানই অপরিচিত নয়। তবে প্রথমে সেটা ছিল একটা আদিম হেলেনীয় আদর্শ, বল্গাহীন অমিতাচারী সে, প্রাণশক্তিতে উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল, সমস্ত শম-যমের অতীত অত্যধিক আনন্দে মাতোয়ারা।

এলিজাবেথীয় যুগের কাব্য হল এই শক্তি, এই জীবন-তৃষ্ণা, এই জীবন-বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ; যেসব দেশের কোন অতীত ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি কিংবা অমিতাচারের উপরে কোন সহজাত সংযম বোধ ছিল না সেই সব দেশের সমকালীন কাব্যের চেয়ে এই কাব্য হল অনেক বেশি বীর্যবান্, বিশৃঙ্খল ও অসংযত। এর জন্ম শক্তি ও সৌন্দর্যের এমন এক বিশৃঙ্খলা থেকে, যার মধ্যে রূপ আপনা থেকেই আবির্ভূত হয় এবং আকার নেয় আপন অন্তরেরই একটা তাগিদে ; এর জন্যে যুগ ও ব্যক্তির সহজাত প্রতিভার দেওয়া জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন সুস্পষ্ট জ্ঞানের নির্দেশ নেই। একে বুদ্ধিগত শক্তির উজ্জ্বলসূত্রে কেবলই বিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ভাব ও মৌল চারিত্র্যে এটা আদৌ বুদ্ধিগত কোন জিনিস নয়। বুদ্ধির কাছে এ হল অতিমাত্র প্রাণিক, অতিমাত্র অস্থির ও উত্তেজিত ; কারণ এর মেজাজটি হল ভোগব্যাকুল, ইন্দ্রিয়বিহ্বল, শাসনে শিথিল ; এর ভাষা কখনো মাধুর্যে বিগলিত, কখনো-বা চড়া সুরে প্রচণ্ড, বিচিত্ররাগের সাধনায় তন্ময়, চিত্রকল্পে ও বাক্‌চাতুর্যে মত্ত ; এ হল মধুর বা উগ্র বর্ণের একটা কিংখাব, তার নানা রং-এর শিখা, সোনালি আর রূপালি রং-এর সুতো।

এলিজাবেথীয় যুগের কাব্য জাতিকে একটা নতুন ইংরাজী ভাষা দিয়েছিল, সে ভাষা ছিল প্রকাশ সামর্থ্যে সমৃদ্ধ, তার ছিল অনন্যসাধারণ কাব্যিক তীব্রতা, ঐশ্বর্য এবং প্রাচুর্য, কিন্তু নব-সংগঠনের সময় সচরাচর যে বিশৃঙ্খলা এবং অতিরেক দেখা দেয় তাতে সেটাও ছিল পুরোমাত্রায়ই। কর্ম ও চরিত্র, আবেগ ও ঘটনা এবং গতির উল্লাসে পূর্ণ নাট্যসাহিত্য আর অপূর্ব মাধুর্য, ঐশ্বর্য এবং শক্তিতে সমৃদ্ধ গীতিকাব্য ও রোমান্টিক কাব্য হল তার বলিষ্ঠ ফলশ্রুতি। এখানে জাতীয় চিত্তের দু'টি দিক তার সমগ্র শক্তি নিয়ে, অথচ প্রাণময়, ইন্দ্রিয়ানুভূতিময় এবং কল্পনাময় কাঠামোর সীমাটি বজায় রেখে, প্রথম আত্মপ্রক্ষেপ করেছে,—এই দুটি দিকের মধ্যে একটি প্রাধান্যলাভ করেছে বিশুদ্ধ কবিতায়, অন্যটি সাধারণতঃ নাটকে ; কিন্তু দুটিই শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যিক ও নাট্যিক প্রতিভার একটি পরম সংঘটনের মধ্যে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। সামগ্রিক-ভাবে এ হল ইংরাজী কাব্যপ্রতিভার মহত্তম যুগ,—যদিও সে প্রকাশ উর্ধ্বতম আত্মার এবং আদর্শের প্রকাশ নয়।

[ক্রমশ]

অনুবাদক : **রামেশ্বর শ'**

পারের পারী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(কয়াজি নার্সিং হোম)

যতই বলি : "ধরব শিরে সব বিধানই নিয়ন্তা তোমার,
পৌরুষেও তুমি আছ—গাও নি কি ঝঙ্কারি গীতার গানে ?"
তবু যেমনি নোয়াই মাথা (হায় বে মায়া পৌরুষ অহঙ্কার !)—
"করিস নে রে ভাবের ঘরে চুরি"—কে সে শাসায় গহন প্রাণে ?

উপরভাসা দৃষ্টি দেখে ঢেউয়ের নাচন, কানে কেবল শোনে
"আয় আয় আয়" ছলছলানি, রোমে রোমে পুলককমল হাসে।
কেউ কি জানে—তারপরে সে উল্লাসেও কে অতৃপ্তি বোনে ?
ডুব দিতে চাই কোন্ অতলে, কিসের টানে, কোন্ মানিকের আশে ?

পারের রশি দেয় খসিয়ে কার সে-অকূল বাঁশির সুরধুনী
মূর্ছনা যার এক নিমেষে মনকে করে ঘরছাড়া বৈরাগী ?
ভয়াল তুফান বজ্রে তখন ধ্রুবতারার আশীর্বাণী শুনি :
কে সে অচিন—যার বিরহে ব্যথায়ও আনন্দে নিশি জাগি ?

এসব যে নয় কল্পনা নাথ, জানি তোমার অদর্শনেও আমি—
যখন কালো বেদনায়ও তোমার আলো ঝরে, অন্তর্যামী !

কয়লার মধ্যেও হরি আছেন

জগদীশ চন্দ্র দাশ

আকাশ থেকে কণা কণা কালো এসে
যদি সব আলো ঢেকে দেয় ?
যদি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্ধকার বাসা বাঁধে ?
আলোর অণুগুলি যদি কালোর অণু হয়ে যায় ?
যদি কালো আলো ছাড়া আর কিছুই না জ্বলে ?
যদি আলোকে দেখতে অন্ধকারের প্রদীপ জ্বালাতে হয় ?
তাহলে কেমন হয় ?

যেমন কালো কাকও আছে সাদা কাকও আছে।
সাদা কোকিলও আছে কালো কোকিলও আছে।
কালা সোনাও আছে সাদা সোনাও আছে।
আলোর নদীও আছে কালোর নদীও আছে।
চাঁদের আকাশ আছে, চাঁদ ডুবে গেলে যে আকাশ তাও আছে।
মা কালীও আছেন রাঙা দুর্গাও আছেন।
আমি সুরাপান করি না সুধা খাই মা কালী বলে।
অমৃতের সমান বিষও চেটে চেটে খাওয়া যায়।
শিব খেয়েছেন।
গরলও সরল হতে পারে।
দধীচির মতন দিয়েও বাঁচা যায়।
মরণের মধ্যে যে জীবন
সেই জীবনের কোন মরণের ভয় নাই।
যা চাইলে পাওয়া যায় না তা না চেয়ে বাঁচাই বাঁচা।
কালা আদমীদের ময়লা হওয়ার ভয় নেই।
তাই হীরা না হয়ে কয়লা হয়ে থাকলেই বা ক্ষতি কি ?

অস্তসূর্যের আকাশ ভাল, উদয়ের আকাশের চেয়ে।
যেখানে সব আলো নিভে যায়,
সব আলো ডুবে যায়,
সব আলো হারিয়ে যায়।
যে নিভে গেছে তার আর নিভবার ভয় কি ?
যে মুছে গেছে ?

হীরা না হলুম, হরি যেন হতে পারি।
কেননা কয়লার মধ্যেও হরি আছেন।

'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে আরো যৎকিঞ্চিৎ

অমলেশ ভট্টাচার্য

"শতাব্দীর সঙ্গীত বন্দে মাতরম্" এই নামে 'শৃণ্বন্তু'-র গত ভাদ্র ১৩৮৩ সংখ্যাতে আমার একটা লেখা প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে লেখাটি সম্পর্কে বহু পাঠক তাঁদের উৎসাহ ও কৌতূহল জানিয়ে একাধিক পত্র আমাদের দপ্তরে পাঠিয়েছেন। তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত সম্বন্ধে আমরা আরো কিছু দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংবাদ ও ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান পেয়েছি। সেগুলি 'শৃণ্বন্তু'-র পাঠকদের উপহার দেওয়ার জন্যই এই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার অবতারণা।

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতকে মন্ত্র বলে এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষি বলে প্রথম শ্রীঅরবিন্দই অভিনন্দিত করেন: "Among the Risis of the later age we have at last realised that we must include the name of the man who gave us the reviving mantra which is creating a new India, the mantra *Bande Mataram*". (*Bande Mataram*, 16th April, 1907)।

এরপর থেকেই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম ঋষি বঙ্কিম রূপে জাতীয় জীবনে এক পূজার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। পরবর্তী কালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, "বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু করিয়াছেন· ·সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছেন। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা —জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালবাসা - জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই যে কার্য করিয়াছেন ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই। সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র— বন্দে মাতরম্।" ('বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ ১৭৩)

কিন্তু মন্ত্র কাকে বলে, ঋষি কে ?

যিনি তাঁর অন্তরদৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন সত্যের এক বাণীমূর্তি, যা মানুষের অন্তরতম সত্তাকে জাগ্রত করে, তার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে, তার মনকে আলোকিত করে, এবং তার প্রাণে এমন এক সামর্থ্য এনে দেয়, যার বলে মানুষ অসাধ্যকে সাধন করে, অসম্ভবকে সম্ভব করে। বঙ্কিমচন্দ্র এমনি একটি মন্ত্রের উদ্‌গাতা, শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "A momentous vision had to be revealed ; and it is his eyes which the Almighty first unseals" (*Ibid*)। মন্ত্রদ্রষ্টা বঙ্কিমের এই মন্ত্র দেশের অন্তরাত্মা থেকে জেগে উঠে এক দৈব মুহূর্তে সারা দেশকে দীক্ষিত করে তুলল দেশপ্রেমে।

কিন্তু তার আগে ?

মন্ত্র যখন জাগেনি তখন ?

তখনও দেশের অন্তরাত্মার গভীরে, আমরা বলতে চাই, এই 'বন্দে মাতরম্' অজপা মন্ত্র হয়ে ইতিহাসের বুকে স্পন্দিত হচ্ছিল, অন্ধকারের ভিতরে আলো যেমন, ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন যেমন !

'আনন্দ মঠ'-এর সন্তান দলের কণ্ঠে নয়, উপন্যাসের কল্পলোকের রোমাঞ্চের মধ্যে নয়, জাগ্রত ইতিহাসের বাস্তব আলোকে এই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি আমরা প্রথম শুনেছি, বঙ্কিমেরও একশ বছর আগে, পূর্ণিয়া, বীরভূম, উত্তর বঙ্গের গভীর অরণ্যের কান্তারে কান্তারে, ইংরাজ বণিক শাসনের বিরুদ্ধে একদল বিদ্রোহী সন্ন্যাসীর কণ্ঠে। তারাও ভবানন্দ

জীবানন্দের মত মাতৃভূমির মুক্তিসাধনায় দীক্ষিত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। বৃহত্তর বঙ্গের সেই অধ্যায় যা "সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ" বলে পরিচিত।

১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রান্তরে ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীন বাংলার উদ্ধত কামানের গর্জন তখনকার মত থেমে গেলেও, সেই বারুদের আগুন সম্পূর্ণভাবে নিভে যায়নি। কয়েক বছরের মধ্যেই সমগ্র বাংলা ও গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে একদল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও দেশের সর্বহারা কৃষকেরা মিলিতভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের সামনে তৎকালীন ইংরাজ শাসক দিশাহারা হয়ে ওঠে। ১৭৬৩ সালে এই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ দেখা দেয় প্রথমে ঢাকায়। সরকারী ইতিহাস ও 'গেজেটিয়ার' রচয়িতা এবং ভারতের ইংরাজ শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত L. S. S. O' Malley তাঁর *History of Bengal, Bihar & Orissa under British Rule* গ্রন্থের ১০৭পৃষ্ঠায় এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের সংখ্যা দিয়েছেন "প্রায় বিশ লক্ষ"।

অরণ্য পর্বত কাঁপিয়ে বিদ্রোহীদের কণ্ঠে কণ্ঠে সেদিন সর্ব প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল তাদের সেই দুর্জয় রণহুঙ্কার "ওঁ বন্দে মাতরম্"। বিদ্রোহীদের নায়কগণ স্বাধীনতার মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এই মন্ত্র "ওঁ বন্দে মাতরম্"। ঢাকার রমনার কালীবাড়ীর মহারাষ্ট্রবাসী পূজারী সন্ন্যাসী বিদ্রোহী-দের কণ্ঠে এই মন্ত্র শুনেছিলেন। এই বিবরণ আছে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায়। এই ঘটনার আরো উল্লেখ দেখতে পাই সুপ্রকাশ রায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'-এ (পৃ. ২০, ২৩ এবং ২৫)। ঢাকার ইংরেজ কুঠি আক্রমণ ও বিদ্রোহীদের প্রথম জাগরণের কাহিনী দিয়েছেন কেদারনাথ মজুমদার তাঁর 'ঢাকার বিবরণ' গ্রন্থে (পৃ.১১৫-১৬) এবং যতীন্দ্রমোহন রায় তাঁর 'ঢাকার ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃ. ২১৮)।

অপর একজন ইংরাজ লেখক Lester Hutchinson তাঁর *Empire of the Nabobs* গ্রন্থে (১২২ পৃষ্ঠায়) লিখছেন যে, বাংলার এই সব বিদ্রোহী সন্ন্যাসী ও ফকির দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরল, বিদেশীর কবল থেকে দেশের মুক্তি সাধন ও ধর্মরক্ষার আদর্শ। তারা বলত, দেশের মুক্তি সাধন পরম ধর্ম, আর পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য চাই সর্বস্বত্যাগ, দেশমাতার প্রতি অচলা ভক্তি, দুষ্কৃতের বিনাশ ও ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য চাই সন্ন্যাস গ্রহণ, প্রবল বিদেশীশক্তির বিরুদ্ধে চাই দেশের সঙ্ঘশক্তি। Hutchinson সাহেব বলছেন, এই সব বিদ্রোহীদের আদর্শ ছিল, ত্যাগ, ভক্তি, সন্ন্যাস ও সঙ্ঘশক্তির দ্বারা দুষ্কৃতের বিনাশ। Hutchinson সাহেব শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন যে, "এই বিদ্রোহের একশ বছর পরে বাংলা দেশে যে সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম দেখা দেয় এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ তারই অগ্রদূত।" (*The Empire of the Nabobs*, page 114),

তাহলে এ তো দেখছি আমরা ইতিহাসের বুকে এক জীবন্ত 'আনন্দ মঠ'। এবং বঙ্কিমের 'আনন্দ মঠ' যেন এই ইতিহাসেরই একটি দলিল। *Encyclopaedia Britannica*-তে (Vol VI, page 910) 'আনন্দ মঠ' সম্পর্কে স্পষ্টই বলছে, "The story deals with the sannyasi (i.e. fakir or hermit) rebellion of 1772 near Purnia, Tirhut and Dinapur..."

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য প্রথম প্রথম সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সঙ্গে 'আনন্দ মঠ'-এর মূল সুরের অনুপ্রেরণার ও পটভূমির সাদৃশ্যের কথাটা এড়িয়ে গিয়ে* বলেছিলেন, "আনন্দ মঠ প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিক-তার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দ মঠের ভবিষ্যত সংস্করণে সন্ন্যাসি-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।" (১৮৮৪ সালে 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের

* মনে রাখতে হবে বঙ্কিম তখন হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের পার্সোনাল এ্যাসিসটেন্ট। দেশে তখন 'আনন্দ মঠ' নিয়ে সাড়া পড়ে গেছে, বিশেষ করে 'বন্দে মাতরম্'গান খানি নিয়ে। এবং 'আনন্দ মঠ'কে বেআইনী ও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করার জন্য সরকারী মহলে তখন আলোচনা চলছে। কেশব সেনের বাড়ীতে একদিন বিকালে বঙ্কিম নিজেই একথা বলেছেন (কেশব সেনের জীবনী দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বঙ্কিমের পক্ষে তখন সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের সঙ্গে পুস্তকের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা স্পষ্ট স্বীকার না করার কারণ অনুমান করা যায়।

"বিজ্ঞাপনে" বঙ্কিমের উক্তি ; 'বঙ্কিম রচনাবলী', সাহিত্য পরিষদ্, পৃ. ৪৪)

পরবর্তী তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম বলছেন, "এবার পরিশিষ্টে বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল।

"আরো দেখিবেন যে, দুইটি ঘটনার সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে। যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল। আর Captain Edward নামের পরিবর্তে Major Wood নামে উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না —কেননা, উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।"

কিন্তু আমাদের কথা হল, ঘটনাগুলি যে ঐতিহাসিক তা বঙ্কিমও স্বীকার করছেন। কেবল সেই ইতিহাসের পটভূমি উত্তর বঙ্গের পরিবর্তে বীরভূম বলে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। আর ইতিহাসের Captain Edward উপন্যাসে হয়েছেন Major Wood, তাতেই কি উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা চলে যায় ?

এই প্রসঙ্গে *The London Times* (28th December 1937) থেকে একটি মন্তব্য উল্লেখ করতে চাই, "Scribner's (of New York) have, justifiably, interpreted the subject more liberally by the inclusion of novels the background of which is laid in a recognizable historical period even though no single character in the book may have a genuine historical prototype"— এটি উদ্ধৃত করে আচার্য যদুনাথ সরকার 'আনন্দ মঠ'-এর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন, "এই কথাটি যদি স্বীকার করি, তবে 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'সীতারাম' পর্যন্ত ঐ শ্রেণীর উপন্যাস সাতখানিকে নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক উপন্যাস নাম দিতে হয়। তাহাদের কোনটায় কল্পিত চরিত্র বেশি, কোনটায় ইতিহাসে পরিচিত চরিত্র বেশি (যেমন, 'রাজসিংহ'), কিন্তু সবগুলিতেই সেই অতীত যুগের সমাজ, ঘর-বাড়ীর, মানব-চিন্তার, আচার-ব্যবহারের অনেকাংশে সত্য চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কিন্তু এগুলিতে পদে পদে খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করা হয় নাই, কারণ এরূপ সত্যের চিত্রের উপর বঙ্কিম ইচ্ছা করিয়া এক 'অলোক-আলোকের' রং ফলাইয়া দিয়াছেন…"

তাহলে আমরা দেখছি, বঙ্কিমের এই 'অলোক-আলোকে' ইতিহাস রূপান্তরিত হয়েছে 'আনন্দ মঠ'-এ। এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পালের উক্তি আমরা স্মরণ করতে পারি তার 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থের "বঙ্কিম সাহিত্য" প্রবন্ধে (পৃ. ৭৯) বলছেন, "আনন্দ মঠে তিনি দেশমাতৃকাকে মহা-বিষ্ণুর বা নারায়ণের অঙ্কে স্থাপন করিয়া আমাদের দেশ-প্রীতি ও স্বদেশ সেবাব্রতকে সাধারণ মানবপ্রীতি এবং বিশ্ব-মানবের সেবার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন।…আনন্দ মঠে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য কুশলতা সহকারে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিণাম দেখাইয়া এই কথাটাও প্রচার করিয়া গিয়াছেন।"

'আনন্দ মঠ' যে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে রচনা করা তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সন্তানদলের রণকৌশল, দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগ করে সংগ্রাম, তাদের সন্ন্যাস ব্রত, তাদের বৈরাগ্য, তাদের ভক্তি ও সঙ্ঘশক্তি— এসবই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সরকারী বিবরণের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। এ বিষয়ে আমরা উৎসাহী পাঠকদের *Captain Rennel's Letter to the Collector*, February 1776 30th October, 1776 এবং *Letters and Records* (Long's Selection) [পৃ.৫২৬] পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। সরকারের ডেপুটি কালেকটর হিসাবে এইসব পুঙ্খানু-পুঙ্খ সরকারী বিবরণ বঙ্কিমের না জানার কথা নয়। আরো উল্লেখযোগ্য যে, 'আনন্দ মঠ'-এর পরই বঙ্কিম যে উপন্যাস খানি লিখলেন সেটি 'দেবী চৌধুরাণী' (রচনা কাল ১৮৮২, পুস্তকাকারের প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪) বঙ্কিমের এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীও সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের নায়ক-নায়িকা ; যেমন, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, গুডল্যাণ্ড সাহেব, লেফ টন্যাণ্ট ব্রেনান, প্রভৃতি। পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম নিজেই লিখছেন, " 'দেবী চৌধুরাণীর'ও [আনন্দ মঠের ন্যায়] এইরূপ একটু ঐতিহাসিক মূল আছে। যিনি বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হণ্টার সাহেব কর্তৃক এবং গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালার 'Statistical Account' মধ্যে রংপুর জেলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।" সেই সঙ্গে বঙ্কিম, আমরা

অনুমান করতে পারি সরকারী কোপ এড়াবার জন্য এই কথা কটাও জুড়ে দিয়েছেন, "পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দ মঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।"

কিন্তু বঙ্কিমের কথা মত আমরা হণ্টার সাহেবের *Statistical Account* পড়ে এবং Glazier সাহেবের *Report on the District of Rangpur* (পৃ.৯৬) দেখে নিম্নোক্ত বর্ণনা পাই :

'We catch a glimpse from the Lieutenant's report of a female dacoit by name Devi Chaudhurani, also in league with [Bhawani] Pathak. She lived in boats, had a large force of barkandazes in her pay, and committed dacoities on her own account, besides receiving a share of the booty obtained by Pathak. Her title of Chaudhurani would imply that she was a zamindar, probably a petty one, else she need not have lived in boats for fear of capture."

এইসব বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, ১৭৮৯ সালে রংপুরের বিশাল 'বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল' বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের নায়ক কৃপানাথের নেতৃত্বে সন্ন্যাসীরা দখল করে নেয়। কয়েকটি সংকীর্ণ পথ ব্যতীত এই জঙ্গলে প্রবেশের কোন পথ ছিল না। সেই পথগুলি বিদ্রোহীরা ছাড়া আর কেউ জানতও না। কৃপানাথ তার ২২জন সহকারী সেনাপতি নিয়ে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে ২২টি ঘাঁটি করে তার নেতৃত্ব করতেন। রংপুরের কালেকটর ম্যাকডোয়াল সাহেব তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই জঙ্গল ঘিরে আক্রমণ করে। সন্ন্যাসী সেনার সঙ্গে অনেকগুলি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের পটভূমি এই রংপুর জেলার অরণ্য অঞ্চল (বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল কি ?)।

Glazier সাহেবের এইসব বিবরণের (Glazier : *Ibid*, p. 42) সঙ্গে 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'আনন্দ মঠ'-এর ঘটনা পরিবেশ মিলিয়ে নিলেই আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তখনই আমরা বুঝতে পারি পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী বাংলার অরণ্যে পর্বতে বিদ্রোহী-সন্ন্যাসীদের কণ্ঠের জয়ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করে জীবানন্দ যখন বলে ওঠে—

"টিলার ওপিঠে শত্রু। আজ এই স্তূপ শিখরে, এই নীলাম্বরী যামিনী সাক্ষাৎকার, সন্তানরা রণ করিবে। দ্রুত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে। বল, বন্দে মাতরম্।

তখন কানন প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া গীতধ্বনি উঠিল, 'বন্দে মাতরম্'। ধীরে ধীরে সন্তানেরা পর্বত শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল মহেন্দ্র সিংহ অতিদ্রুত বেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে তূর্যনাদ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে নীলাকাশ পটে কামান শ্রেণীর সহিত, ইংরাজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল—

তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বং হি প্রাণা শরীরে।"

* * *

কিন্তু ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেমে যায়। তবু ইতিহাস কালজয়ী। সেদিন যেমন ছিল, তেমনি আজো আছে জলপাইগুড়ি জেলার জঙ্গলে বিদ্রোহীদের মাটির দুর্গ। তার চারিদিক ট্রেঞ্চ কেটে সুরক্ষিত করা। সেই দুর্গপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আজো বর্তমান। (*Bennel's Journal*, February, 1766)। আছে সেই রংপুর, হয়তো আজো আছে তার সেই 'বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল'। সেই গভীর অরণ্যকন্দরে এখনও হয়তো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছে কৃপানাথের সন্তানদলের দুর্মদ জয়ধ্বনি "ওঁ বন্দে মাতরম্"।

তাদের সেই ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে জেগে ওঠে 'আনন্দ মঠ'-এর সন্তানদল। ভারতের আকাশে এই ধ্বনির কম্পন কোনদিনই থেমে যায়নি। সেই অজপা মন্ত্র আবার জাগ্রত হল বঙ্কিমের কণ্ঠে। স্বদেশী যুগে এই মন্ত্র মেঘগম্ভীর বজ্রনাদে জাতির অন্তরাত্মার জয়ধ্বনি হয়ে উঠল। ইতিহাসের দু'শ বছর ধরে আমরা দেখছি এই 'বন্দে মাতরম্' ইংরাজের কাছে একটা আতঙ্ক একটা ত্রাসের স্মৃতি বহন করে এসেছে। তাই যেখানেই এই ধ্বনি উঠেছে, তা সে নিরীহ বালকের

কণ্ঠেই হোক আর নিরস্ত্র গ্রামবাসীর কণ্ঠেই হোক, ইংরাজ রাজশক্তি ভয়ে জিঘাংসায় উন্মত্তের মত আঘাত হেনেছে। তথাপি আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীর কাছে এই দুটি কোমল শব্দ 'বন্দে মাতরম্' পরস্পরের প্রীতির, শুভেচ্ছার ও সম্ভাষণের ভাষা হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাবের *The Tribune* পত্রিকায় (২৫শে নভেম্বর, ১৯০৫) লিখেছে, "They have adopted as their cheering cry, the words *Bande Mataram* which has no formidable meaning than 'Hail Mother!'... And can *Bande Mataram* be abolished by help of terrorism? Even in the Panjab when educated gentlemen meet each other his salutation now-a-days frequently is *Bande Mataram*. How many soldiers the authority must have to stop the mouths of countless millions of India? The people of East Bengal have sympathy of all India."।

প্রাণ ভোমরায় টান পড়লে রাক্ষসরা যেমন দিশাহারা হয়ে পড়ত, তেমনি 'বন্দে মাতরম্' শুনলেই ইংরাজ তার হিতাহিত জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে বিচলিত হয়ে এমন সব কাণ্ড করত যা কোন সভ্য জাতির পক্ষে কলঙ্কের বস্তু। আমরা এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেব:

রংপুর জেলা স্কুলের প্রায় দু'শ ছাত্রকে ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করে ফাইন করা হয়। তাদের অপরাধ? তারা একটা মিটিং-এ যোগ দিয়েছিল যেখানে 'বন্দে মাতরম্' গান করা হয়েছিল।

ঢাকার চিফ্ সেক্রেটারী ১ ই নভেম্বর (১৯০৫) একটা ফতোয়া জারি করে দিলেন এই বলে যে, সমগ্র পূর্ববঙ্গে, বরিশালে, মৈমনসিংহে, রংপুরে, নোয়াখালিতে কেউ 'বন্দে মাতরম্' বলতে পারবে না। এমনকি বৃদ্ধ বা শিশুকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। ছাত্রদের স্কুল থেকে expelled করা হয়েছে। বেত মেরে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সেই সময়কার সংবাদপত্রের রিপোর্টে বলছে, "whipping triangle has been posted outside the Magistrate's Court (in Barisal)"।

The Amrita Bazar Patrika-র সাংবাদিক প্রতিনিধি বরিশাল থেকে লিখছেন, "The Police threatened with flogging if any body was found shouting *Bande Mataram*"।

ব্রিটিশ সরকার যে কতখানি দিশাহারা হয়ে পড়েছিল তার একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন হাস্যকর নমুনা পাওয়া যায় Inspector of School, Dacca Division-এর ১৮ই জানুয়ারির (১৯০৬) একটা সার্কুলারে। তাতে কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলের হেড মাস্টারকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে: আপনার স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে নিজের নিজের খাতায় পাঁচশ বার এই কথা লিখতে হবে যে, "বন্দে মাতরম্ বলে চিৎকার দেওয়াটা মূর্খের এবং বর্বরের কাজ, এতে সময় নষ্ট হয়"। প্রত্যেকটি ছাত্রকে খাতায় সুন্দর করে পাঁচশ বার এই কথা লিখতে হবে। তারপর তাদের সেই সব খাতা স্কুল ইন্স্পেকটরের কাছে পাঠাতে হবে। তার প্রত্যেকটিতে হেড্ মাস্টার মশায় সার্টিফিকেট লিখে দেবেন যে ছাত্ররা নিজের হাতে লিখেছে কথাগুলি—"each is the unaided work of the boy whose writing it purports to be"। (K. C. Ghosh, *The Roll of Honour*, page 84)

এছাড়া রাস্তায় বা পাড়ায় কোন ছেলে যদি 'বন্দে মাতরম্' বলেছে, অমনি সেখানে পুলিশ এসে সেই তল্লাটের সকলকে নির্বিচারে মারধর করতে শুরু করেছে। গৃহবধূরাও বাদ যাননি। এই রকম অমানুষিক বর্বরতার কথা তখনকার সংবাদপত্র খুললেই যত্রতত্র চোখে পড়ে। নমুনা হিসাবে একটা উল্লেখ করি: কলকাতার শ্যামপুকুর থানা এলাকায় ১৯০৬ সালের ২৮শে নভেম্বরের ঘটনা। সংবাদপত্র লিখছে, "Some young boys gave vent to their youthful enthusiasm and shouted the offensive words, *Bande Mataram*, as was rather common in such circumstances, they disappeared from the scene, some reported the matter to the police, the sub-Inspector of the thana rushed to the scene with a large number of constables and began to assault the residents of the locality not excluding some female inmates in private

dwellings"। (K. C. Ghosh, *Ibid.* pages 84-85)

এমন ঘটনা তখন পাড়ায় পাড়ায় ঘটত। মৈমনসিংহের একটি সংবাদ : "...a high official appeared with a large number of constables and struck whomsoever they met in Burrabazar (Mymensingh). They even pulled down men who were standing on the verandas of private dwellings. The District Superintendent of Police personally dealt blows on many boys and innocent men."। (K. C. Ghosh : *Ibid*, page 86) এমনি করে পুলিসের উন্মত্ত লাঠি কত কিশোর বালকের তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে, বুটের বর্বর পদভারে দলিত হয়েছে সাধারণ কত নারী-পুরুষের সম্ভ্রম ও লজ্জা। তবুও 'বন্দে মাতরম্' তারা বন্ধ করতে পারেনি। সমগ্র বাংলায় যখন পুলিশের এই তাণ্ডব চলেছে নৃশংসভাবে তখন সুদূর পাঞ্জাবের একটি নির্ভীক সংবাদপত্র *Punjabee* রুখে দাঁড়িয়ে বলছে (২২শে নভেম্বর, ১৯০৫), "The kind of persecution to which they are subjected both in Bengal and out of Bengal is more than human flesh and blood could bear, 'Vengeance is mine, said the Lord, I'll repay'. But 'Vengeance is also ours' oppressed nations trodden down to dust are apt at times to say. This has again and again been attested by the history of the human race, and history, as we all know, is apt to repeat itself"।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর *Bande Mataram* পত্রিকায় (১লা আগস্ট, ১৯০৭) লিখলেন, স্বৈরাচারীর রক্তচক্ষু কোনদিন জাতির ভবিষ্যতকে রোধ করতে পারে না। অস্ট্রিয়ানরা ভ্রূকুটি হেনেছে, তথাপি ইতালী স্বাধীন হয়েছে। ব্রিটিশের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে আমেরিকা স্বাধীন হয়েছে। স্পেনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে কিউবা স্বাধীন হয়েছে। জয়-পরাজয়ের ভিতর দিয়ে আমরাও আমাদের লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছাব—"The Despots' frown never marred the destiny of a nation. The Austrians frowned but Italy is free; the Britishers frowned but the American colonists are free, the Spaniards frowned but Cuba is free. The seeming weakness of a subject people always turned into invincible strength through the inspiring ideal of freedom. Even if these persecutions bring about a temporary demoralisation, we must not lose heart. Now losing, now winning, we shall proceed to our goal"।

"ওদের আঁখি যত রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে"

গাইলেন রবীন্দ্রনাথ।

এমনকি খাস ইংরেজ Sir Evan Jones *The National Review* পত্রিকায় লিখলেন, "If once the tolerant millions are fully imbued with hatred of the British our rule has gone.

"Our army may be strong, but it will be impossible to hold hundreds of millions in check if they are determined to get rid of us."

স্যার এভান জোন্‌সের এই কথা 'নবশক্তি' পত্রিকায় (২৪শে জুলাই ১৯০৭) উদ্ধৃত করা হয়েছিল। তাঁর এই কথা যে কত সত্যি পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষী। শুধু *The National Review*-তেই নয়, *The London Times*-এও আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠল। এবিষয়ে আমার পূর্বের প্রবন্ধে ('শৃঙ্খল', ভাদ্র ১৩৮৩) কিছু আলোচনা করেছি। *The London Times*-এ Mr W.H. Lee সাহেব 'বন্দে মাতরম'-এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন (আমরা সেই অনুবাদ সংগ্রহ করেছি এবং এই সঙ্গে মুদ্রিত হল)। দেশে বিদেশে সর্বত্র তখন শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মুখে একটি মাত্র নাম 'আনন্দ মঠ' 'বন্দে মাতরম্'। বিভিন্ন ভাষায় 'আনন্দ মঠ'-এর একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হতে লাগল, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু ও কানাড়ী ভাষায় 'আনন্দ মঠ'-এর একাধিক সংস্করণ বেরিয়ে গেল। স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ 'আনন্দ-

মঠ'-এর কয়েকটি পরিচ্ছেদ অনুবাদ করেন এবং বাকীটা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ অনুবাদ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাছাড়া 'বন্দে মাতরম্' গানখানিরও ইংরেজী অনুবাদ করেন শ্রীঅরবিন্দ, একটি গদ্যে ও আর একটি পদ্যে। সেই অনুবাদ দুটি আজ জগদ্‌বিখ্যাত। পণ্ডিত হরিনাথ দে ল্যাটিনে ও ইংরাজীতে 'বন্দে মাতরম্'-এর অনুবাদ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, হরিনাথ দে এক সময় শ্রীঅরবিন্দের কাছে ল্যাটিন শিক্ষা করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই একথা বলেছিলেন তাঁর একান্ত সচীব ও পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সেক্রেটারী শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তকে। বর্তমান লেখক তাঁরই কাছ থেকে এই কথা জেনেছেন। তাছাড়া নলিনীকান্তের কলেজ জীবনের প্রায় সমসাময়িক ঔপন্যাসিক নরেশ সেনগুপ্ত 'আনন্দ মঠ'-এর ইংরাজী অনুবাদ করেন *Abbey of Bliss* নামে। এছাড়া, একটা দুর্লভ জিনিস আমরা সংগ্রহ করেছি। শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসু ১৮৮৮ সালে একটি গ্রন্থ লেখেন *Old Hindu's Hope* or *A Proposal for the Establishment of a Hindu National Congress* নামে। সেই গ্রন্থের ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠায় তিনি 'বন্দে মাতরম্' গানের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেই অনুবাদটিও এখানে পুনর্মুদ্রিত হল। তাছাড়া, সাংবাদিক বসন্তকুমার রায় 'আনন্দ মঠ'-এর ইংরাজী অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত 'বন্দে মাতরম্' গানের ইংরাজী অনুবাদ ও পণ্ডিত হরিনাথ দে কৃত অনুবাদটিও আমরা এই সঙ্গে পুনর্মুদিত করলাম।

ভ্রম-সংশোধন

'শৃঙ্খল'র গত মাঘ সংখ্যাতে ৩৬৫ পৃষ্ঠায় "কেমনে পেলাম মায়ের চরণ" লেখাটিতে শ্রীঅরবিন্দের চরণে আঘাত লাগার ঘটনার উল্লেখ আছে। এই দুর্ঘটনা ঘটে ১৯৩৮ সালে, ১৯৪২ সালে নয়। ১১ ফেব্রুয়ারী আশ্রম আক্রমণের যে উল্লেখ আছে তা ঘটেছিল ১৯৬৫ সালে, ১৯৫৬ সালে নয়।—সম্পাদক

BANDE MATARAM

(Addressed to India)

Translated by Sri Raj Narayan Bose

I worship thee, O Mother !
Thee the nice-watered, bearing nice fruits, cooled by zephyrs,
Verdant with the corn-plant,
Whose nights are cheered by the silver moonlight,
Whose bosom is decked with trees, bearing flowers in full bloom,
The smiling, the melodiously-speaking,
The giver of happiness, the giver of boons, the Mother.
Thou art terrible with the shouts of two hundred millions
And sharp swords seized by four hundred millions of hands ;
Who says, Mother, thou art weak ?
I bow before thee, endowed with great strength, the salvatress,
The vanquisher of enemies, the Mother.
Thou art knowledge, thou art religion,
Thou art the heart, thou the vitals,
Thou the life in the body.
Thou art the strength of our arms,
Thou art the feelings of love and veneration in our hearts ;
Thine is the image
Set up in temple after temple.
Thou art Durga, bearing the ten weapons,
Thou art Lakshmi who dwellest in the lotus bud,
Thou art Saraswati, the giver of knowledge,
We pay homage to thee ;
We adore thee, O Mother !

The goddess of fortune, the pure and the peerless,
The nice-watered, bearing nice fruits, the Mother ;
We adore thee again and again,
The verdant, the simple, the well-decked,
All bearing, all cherishing, the Mother.

From : *Old Hindu's Hope or A Proposal for the Establishment of a Hindu National Congress* Calcutta. Printed and Published by G. C. Bose & Co., Bose Press, 1888, pp. 45-46.

BANDE MATARAM

(Translated by W.H. Lee, I.C.S.)

My Mother-land I sing !
Her splendid streams, her glorious trees,
The Zephyr from the far-off Vindhyan heights
Her fields of waving corn,
The rapturous radiance of her moonlit nights,
The trees and flowers that flame afar,
The smiling days that sweetly vocal are
The happy blessed Mother-land !
Her will by seventy million arms upheld,
Her strength no man scorn :
Thou art my head, thou art my heart,
My life and soul art thou !
My song, my worship and my art
Before thy feet I bow !
As Durga, scourge of all thy foes,
As Lakshmi, bowered in flower
That in the water grows,
As Vani, wisdom, power,
The source of all our might,
Our every temple doth thy form uphold
Unequalled, tender, happy, pure
Of splendid streams, of glorious trees,
My Mother-land I sing !
The stainless charm that shall endure
And verdant banks and wholesome breeze
That with her praises sing !*

* From : *The London Times*, 18th September, 1906

BANDE MATARAM

Hail thee mother ! To her I bow,
Who with sweetest water o'erflows
With dainty fruits is rich and endowed
And cooling whom the south wind blows ;
Who's green with crops as on her grow ;
To such a mother down I bow !

With silver moon beams smile her nights
And trees that in their bloom abound
Adorn her ; and her face doth beam
With sweetest smiles, sweet's her sound !
Joy and bliss she both bestow ;
To such a mother down I bow.

Resounding with triumphal shouts
From seventy million voices bold
With devotion served by twice
As many hands that ably hold
The sharp and shining rapier bold.
—Thou a weakling we are told ![1]

Proud in strength and prowess thou art,
Redeemer of thy children thou ;
Chastiser of aggressive foes ;
Mother, to thee thy child I bow.

Thou art knowledge, thou my faith,
Thou my heart and thou my mind,
Nay more, thou art the vital air
That moves my body from behind.

Of my hands thou art the strength,
At my heart devotion thou,
In each temple and each shrine,
To thy image it is we bow.

Durga bold who wields her arms
With half a score of hands,
The science-goddess, Vani too,
And Lakshmi who on lotus stands,-
What are they but, mother thou,
To thee in all these forms I bow !

To thee ! Fortune-giver, that art
To fault unknown, beyond compare,
Who dost with sweetest waters flow
And on thy children in thy care
Dainty fruits dost rich bestow,
To thee, mother, to thee I bow !

To thee I bow, that art so green
And so rich bedecked ; with smile
Thy face doth grow ; thou dost sustain
And hold us—still unknown to guile !
Hail thee mother ! To thee I bow !*

* *The Abbey of Bliss* (Tr. of *Anandamath*, by NARESH CHANDRA SEN GUPTA)

PP.32-33. 891.443 C 392 Se. a. (C. U. L)

1. Another reading would give : "why art thou so weak with so much strength ?"

BANDE MATARAM

Here is a fairly literal version of this national song, by an esteemed correspondent* of our, keeping as far as possible the spirit and the rhyme -system of the original··· ··

"Mother, hail !
Thou with sweet springs flowing,
Thou fair fruits bestowing,
Cool with zephyrs blowing,
Green with corn-crops growing,
Mother, hail !

Thou of the shivering-joyous moon-blanched night,
Thou with fair groups of flowering tree-clumps bright,

Sweetly smiling,
Speech-beguiling,
Pouring bliss and blessing,
Mother, hail !

Though now seventy million voices through thy mouth sonorous shout,
Though twice seventy million hands hold thy trenchant sword-blades out,
Yet, with all this power now,
Mother, wherefore powerless thou ?
Holder thou of myriad might,

* Supposed to be HARINATH DE

From : *Indian Mirror*, Saturday November 11, 1905.

I salute thee, saviour bright,
Thou who dost all foes affright,
Mother, hail !

Thou sole creed and wisdom art,
Thou our very mind and heart,
And the life-breath in our bodies,
Thou, as strength in arms of men,
Thou, as faith, in hearts, dost reign,
And the form from fane to fane
Thine, O Goddess !
For, thou hast the ten-armed *Durga's* power.
Riches thrones thee in her lotus-bower,
Wisdom thee with deity doth dower,
Mother, hail !

Lotus-throned one, rivalless,
Radiant in thy spotlessness,
Thou whose fruits and waters bless
Mother, hail !

Hail, thou, verdant, unbeguiling,
Hail, O decked one, sweetly smiling,
Ever bearing,
Ever rearing,
Mother, hail."

BANDE MATARAM

"Mother, hail !
Thou with sweet springs flowing,
Thou fair fruits bestowing,
Cool with zephyrs blowing,
Green with corn-crops growing,
Mother, hail !

Thou of the shivering-joyous moon-blanched night,
Thou with fair groups of flowering tree-clumps bright,
Sweetly smiling
Speech beguiling
Pouring bliss and blessing,
Mother, hail !

Though now three hundred million voices through thy mouth sonorous shout,
Though twice three hundred million hands hold thy trenchant sword-blades out,
Yet with all this power now,
Mother, wherefore powerless thou ?
Holder thou of myriad might,
I salute thee, saviour bright,
Thou who dost all foes affright,
Mother, hail !

Thou sole creed and wisdom art,
Thou our very mind and heart,
And the life-breath in our bodies,
Thou as strength in arms of men,

Thou as faith in hearts dost reign.

Himalaya-crested one, rivalless,
Radiant in thy spotlessness,
Thou whose fruits and waters bless,
Mother, hail !
Hail, thou verdant, unbeguiling,
Hail, O decked one, sweetly smiling,
Ever bearing,
Ever rearing,
Mother, hail !*

*Translated anonymously, when it was illegal even to utter the word Bande Mataram.

From : Dawn Over India
By
BANKIM CHANDRA CHATTERJI
Translated and adapted from Bengali by
BASANTA KOOMAR ROY
Author of *Rabindranath Tagore*-pp.55-56
E 891 43 O 392d.

BANDE MATARAM

Here is a fairly literal version of this national song, by an esteemed correspondent[1] of our, keeping as far as possible the spirit and the rhyme-system of the original .....

"Mother, hail !
Thou with sweet springs flowing,
Thou fair fruits bestowing,
Cool with zephyrs blowing,
Green with corn-crops growing,
Mother, hail !

Thou of the shivering-joyous moon-blanched night,
Thou with a fair groups of flowering tree-clumps bright,
Sweetly smiling,
Speech-beguiling,
Pouring bliss and blessing,
Mother, hail !

Thou now *seventy*[2] million voices through thy mouth sonorous shout,
Though twice *seventy*[2] million hands hold thy trenchant sword-blades out,
Yet, with all this power now,
Mother, wherefore powerless thou ?
Holder thou of myriad might ;

Isalute thee, saviour bright,

Thou who dost all foes affright,
Mother, hail !

Thou sole creed and wisdom art,
Thou our very mind and heart,
And the life-breath in our bodies,
Thou, as strength in arms of men,
Thou, as faith, in hearts, dost reign,

And the form from fane to fane
Thine, O Goddess !
For, thou hast the ten-armed *Durga's* power.
3 Riches thrones thee in her lotus-bower,
Wisdom thee with deity doth dower,
Mother, hail !

Lotus-throned one, rivalless,

Radiant in thy spotlessness,
Thou whose fruits and waters bless
Mother, hail !

Hail, thou, verdant, unbeguiling,
Hail, O decked one, sweetly smiling,
Ever bearing,
Ever rearing,
Mother, hail !

From : *Indian Mirror*, Saturday, November 11, 1905.

1. Supposed to be Harinath De.
2. 'three hundred'
3. Replaced by "Himalaya-crested one, rivalless"

The text of Harinath De with the changes indicated gives the translation by Basanta Koomar Roy

—রচনাবলী—

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র বাংলা রচনা-সংগ্রহ একত্রে আটখণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, যোগ, ইত্যাদি জীবনের মর্মসত্যের বাস্তব বিশ্লেষণে এবং শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের জীবন-সাধনার গভীর ভাব-অবগাহনে তা সিদ্ধ-স্নাত।

সুদৃশ্য মনোটাইপে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ডবল-ডিমাই সাইজের পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার প্রতিটি বৃহৎ খণ্ড রেক্সিন ও বোর্ড বাঁধাই, মুদ্রণ ও গ্রন্থণ পারিপাট্যে সৌন্দর্যে চিত্তাকর্ষক।

প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য—২৫·০০ টাকা।

সম্পূর্ণ রচনাবলীর গ্রন্থসূচী

সাহিত্য ও শিল্পকলা

প্রথম খণ্ড : ১। সাহিত্যিকা, ২। রূপ ও রস, ৩। আধুনিকী, ৪। শিক্ষা ও দীক্ষা, ৫। রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় খণ্ড : ১। শিল্পকথা, ২। কবির্মনীষী-১ম, ৩। কবির্মনীষী-২য়, ৪। কবির্মনীষী-৩য়

তৃতীয় খণ্ড : ১। বাংলার প্রাণ, ২। মৃতের কথোপকথন, ৩। গানের গান, ৪। ফরাসী ষোড়শী, ৫। মারিয়ানা (ফরাসী নাটিকা), ৬। তিন্তাজিলের মৃত্যু (ফরাসী নাটিকা), ৭। অনুবাদমালা (কবিতা)

দেশ-সমাজ-রাজনীতি

চতুর্থ খণ্ড : ১। ভারত-রহস্য, ২। ভারতে হিন্দু ও মুসলমান, ৩। স্বরাজের পথে, ৪। স্বরাজ-গঠনের ধারা, ৫। শ্রীঅরবিন্দ ও বর্তমান যুদ্ধ, ৬। আদি লেখা

পঞ্চম খণ্ড : ১। ভাবীসমাজ, ২। বোলশেভিকি, ৩। নীট্‌শের বাণী, ৪। নারীর কথা, ৫। স্মৃতির পাতা-১ম, ৬। স্মৃতির পাতা-২য়

ধর্ম-সাধনা—জ্ঞান-বিজ্ঞান

ষষ্ঠ খণ্ড : ১। ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা, ২। বেদমন্ত্র, ৩। উপনিষদ—কথা ও কাহিনী, ৪। নব্যবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান

সপ্তম খণ্ড : ১। পূর্ণযোগ, ২। দেবজন্ম, ৩। সাধকের কথা, ৪। চেতনার অবতরণ, ৫। আলোর পথে-১ম, ৬। আলোর পথে-২য়, ৭। এ যুগের সাধনা, ৮। তিন কাহিনী, ৯। কালের আহ্বান

অষ্টম খণ্ড : ১। ভারতের নবজন্ম, ২। কর্মযোগী, ৩। মা, ৪। যোগসাধনার ভিত্তি, ৫। যোগের পথে আলো, ৬। চিন্তাকণা ও দৃষ্টিনিমেষ, ৭। চিন্তাবলী ও সূত্রাবলী (অষ্টম খণ্ডের এই প্রথম সাতখানি গ্রন্থ শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী রচনাবলী অনুবাদ) ৮। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী', ৯। শতাব্দীর প্রণাম

শ্রীগুরু : ৬৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩। ফোন : ৩৪-১৩৫১
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮, শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০৭১। ফোন : ৪৪-৩০৫৭

THE COLLECTED WORKS
OF
NOLINI KANTA GUPTA

Volume One
Volume Two
Volume Three
Volume Four
Volume Five

VOLUME SIX IS IN PRESS

The collected works of SRI NOLINI KANTA GUPTA, shed a new light on the pressing problems of Man and his future. In the context of the present bewildering conditions of the world, they have a special relevance, and it is hoped that they will aid the modern man in his search of new hope for a new life of unity and harmony.

size : Double demy
pp : 406

Cloth Binding with attractive art-paper jacket.

Price Rs. 15·00 Each

Available at :

SRINVANTU
63, College Street
Calcutta-700073
34-1351

Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700012
34-2376

Published by : Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry-2

Ellora Chemical Industries

Manufacturers of
Plastic Solution, Rubber
Solution and all Kinds of
Thinner etc.
and Order Suppliers

20 A, Patuatola Lane
Calcutta-9

Phone : 34-3720

Ellora Enterprise

Please Contact
For
Art Paper
&
Art Board

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone : 34-3720

Even the profoundest and surest political instinct is not wisdom.

—Sri Aurobindo



Cargo Surveyors
Analytical Chemists
Gram : JUTASPECTA
Telex : NOPROB CA 2414
Phone : 240046/47

ESKAPS (INDIA) PRIVATE LTD
30, Chowringhee Road
Calcutta-700016

Smiles are a richer wealth than tears.

—Sri Aurobindo



The Hooghly Mills Co. Ltd.

MANUFACTURERS & EXPORTERS

10 Clive Row

Calcutta-1

Telegraphic Address
"VICTO" Calcutta

Telephone No
22-5451 (2 Lines)
Codes : Acme & Bentley's
Second Phrase

The National Tape Loom Co.

Manufacturers of SILK, COTTON & GLASS TAPES

7, LYONS RANGE
3rd Floor, Room No. 2
Calcutta-1

Phone : Office : 22-3718/5066

সকল স্বার্থপরতা দূর করতে হবে যদি আমরা ভগবানের কাজে সত্যকার সেবক হতে চাই।

—শ্রীমা

শ্রীসুবোধকুমার বিশ্বাস

SRINVANTU PUBLICATIONS

সাবিত্রী—শ্রীঅরবিন্দ	...	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪·০০
মধুময়ী মা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২·০০
মধুময়ী মা (২য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২·০০
মধুময়ী মা (৩য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২·০০
কবির্মনীষী (৩য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪·৫০
Light of Light—Nolini Kanta Gupta	...	3 00
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	..	১·৫০
শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' উপাখ্যান—শ্রীমণিবিষ্ণু চৌধুরী	...	৩·৫০
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র রচনাবলী (৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ)	...	যন্ত্রস্থ
রচনাবলী : প্রথম খণ্ড : সাহিত্যিকা	...	২৫·০০
রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড : শিল্পকথা	...	২৫·০০
আলবার পদাবলী—শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	...	১০·০০
মায়ের অবতরণ কেন ?	...	·৫০

॥ 'শৃণ্বন্তু'-র নিয়মাবলী ॥

বৈশাখ হতে 'শৃণ্বন্তু'-র বর্ষ আরম্ভ। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া চলে। বার্ষিক চাঁদা সডাক দশ টাকা, ষাণ্মাসিক পাঁচ টাকা, প্রতিসংখ্যা এক টাকা। ছয় মাসের কমে গ্রাহক তালিকাভুক্ত করা হয় না।

প্রতি বাংলা মাসের ৯।১০ তারিখে 'শৃণ্বন্তু' প্রকাশিত হয়, যথাসময়ে পত্রিকা না পেলে ১৫ দিনের মধ্যে জানালে ভাল হয়।

ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তন করতে হলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশি দিনের জন্য হলে 'শৃণ্বন্তু' অফিসে জানাবেন। চিঠিপত্রাদিতে যোগাযোগের সুবিধার জন্য গ্রাহকগণ যেন তাঁদের নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সর্বদা উল্লেখ করেন।

'শৃণ্বন্তু'-র চাঁদা মনিঅর্ডার যোগে অথবা পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টও গ্রহণ করা হয়। ভি. পি.-তে পত্রিকা পাঠান হয় না।

বাৎসরিক চাঁদা শেষ হয়ে গেলে তিন মাস অপেক্ষা করা হয় এবং কাগজ যথানিয়মিত পাঠান হয়ে থাকে এরই মধ্যে গ্রাহক যদি চাঁদা না পাঠান বা কোন কিছু জ্ঞাত না করান তাহলে পত্রিকা পাঠান সম্ভব নয়।

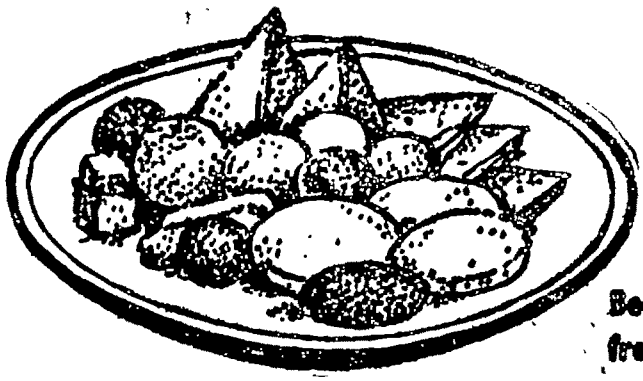
লেখকদের প্রতি আবেদন, তাঁরা যেন রচনার নকল রেখে পাঠান। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়।

কর্মাধ্যক্ষ : 'শৃণ্বন্তু'

Telephone

VANASPATI COOKS A DELICIOUS MEAL—

SO WHOLESOME TOO.



Because it's fresh and pure and enriched with Vitamin A and D

Always ask for Telephone Vanaspati. People love its taste. It's a delicious cooking medium. So good for curries, fried foods, western and oriental cooking. It's economical and so pure. Always fresh. It's enriched with Vitamin A and D for extra goodness. Remember to ask for :

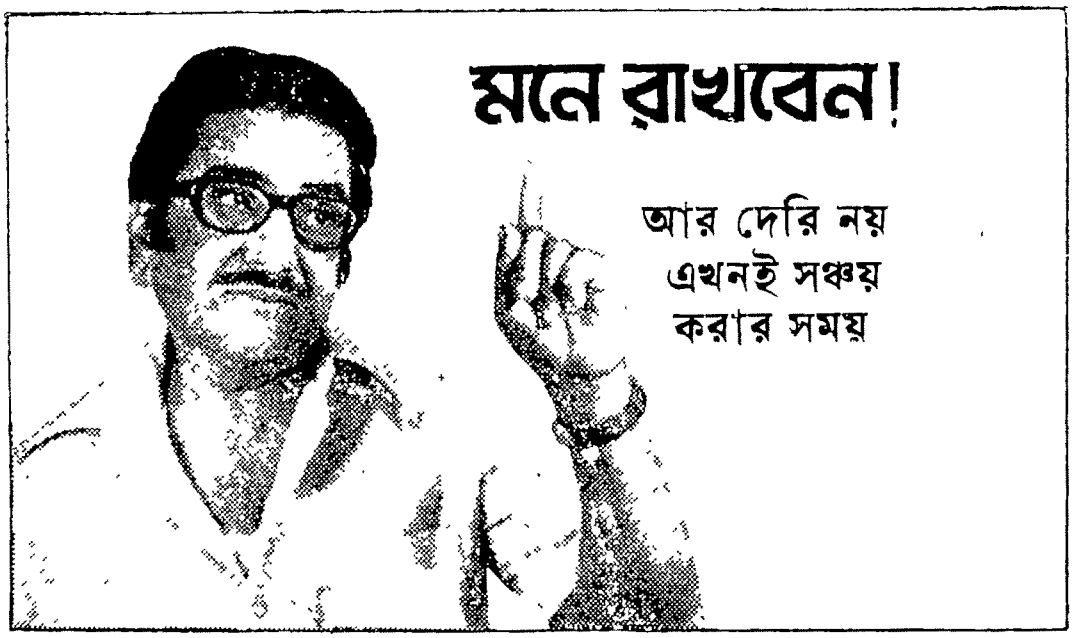
Telephone

VANASPATI

cooking medium that's wholesome.



A produce of Swalka Vanaspati Products Ltd.



আপনার নিশ্চিন্ত সুখের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে

ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট

১৫ বছর পরে
৪১,৮০০৲ টাকা পেতে হলে প্রতিমাসে
১০০৲ টাকা সঞ্চয় করুন
অথবা
২০ বছর পরে ৩৮,৩০০৲ টাকা পেতে হ'লে প্রতিমাসে
৫০৲ টাকা সঞ্চয় করুন।

॥ এই প্রকল্পের অন্যান্য সঞ্চয়-ব্যবস্থা নিচের তালিকায় পাবেন ॥

মাসিক সঞ্চয়	১০ বছর পরে পাবেন	১৫ বছর পরে পাবেন	২০ বছর পরে পাবেন	২৫ বছর পরে পাবেন
১০৲	২০৬৬৲	৪১৮০৲	৭৬৬০৲	১৩,৩৮০৲
২০৲	৪১৩২৲	৮৩৬০৲	১৫,৩২০৲	২৬,৭৬০৲
৫০৲	১০,৩৩০৲	২০,৯০০৲	৩৮,৩০০৲	৬৬,৯০০৲
১০০৲	২০,৬৬০৲	৪১,৮০০৲	৭৬,৬০০৲	১,৩৩,৮০০৲

এই প্রকল্পে আপনার সঞ্চয় দ্রুত হারে বেড়ে উঠবে!

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ·

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১
অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিস

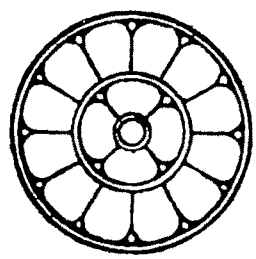
Progressive-UIB-6/76

প্রচ্ছদপট মুদ্রক ॥ কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস ॥ কলিকাতা ৯

শ্রীমা

অতীতে মানুষ যা করেছে চিরকাল তারই পুনরাবৃত্তি করে চলা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ হল অভিনব সিদ্ধি, অচিন্তাপূর্ব ঈপ্সিতা সব অর্জন করা।

—শ্রীঅরবিন্দ



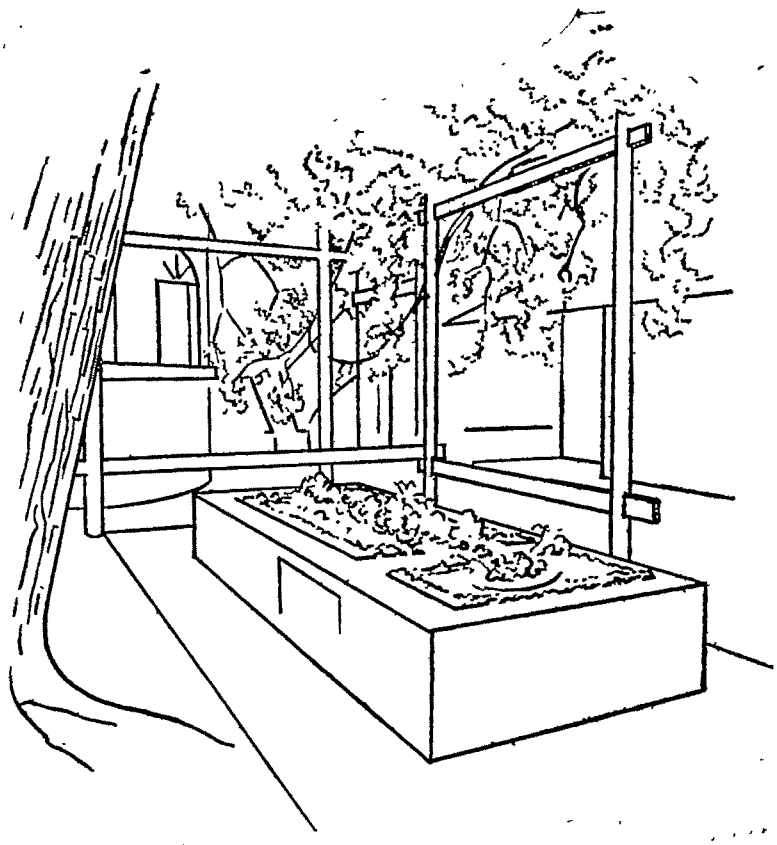
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা :

শ্রী নলিনী কান্ত গুপ্ত

পঞ্চবিংশতি বর্ষ • দ্বাদশ সংখ্যা • চৈত্র ১৩৮৩

শৃঙ্খল

পঞ্চবিংশতি বর্ষ : দ্বাদশ সংখ্যা
চৈত্র : ১৩৮৩



সূচী—

শ্রীঅরবিন্দ

বেদের অনুবাদ
(অপ্রকাশিত রচনা) ৪০৯
সাবিত্রী ৪১২
ভবিষ্যতের কবিতা ৪২৪

শ্রীমা

মায়ের মন্ত্র ৪১১
মায়ের ঘরোয়া কথা ৪১৫

শ্রীললিনীকান্ত গুপ্ত

দ্যৌ মে পিতা মাতা পৃথিবী ৪১৭

শতদল

পত্রালোচনা ৪২১

সম্পাদক : অমলেশ ভট্টাচার্য
প্রকাশক ও মুদ্রক : সাম্যকান্তি মৈত্র

সম্পাদকীয় কার্যালয় : শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮ শেক্সপীয়ার সরণী, কলিকাতা-৭১
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে
মুদ্রিত এবং 'শৃঙ্খল' কার্যালয়, ৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত
ফোন : ৩৪-১৩৫১

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক সডাক : দশ টাকা

চৈত্র, ১৩৮৩ পঞ্চবিংশতি বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা

শ্রীঅরবিন্দের অপ্রকাশিত রচনা

বেদের অনুবাদ

শ্রীঅরবিন্দ

আনন্দ সরসীতে সোমরস পান করুন বৃত্রহন্তা ইন্দ্র, সোমপানে করুন আত্মায় বলধারণ, সোমপানে করুন মহৎ বীরকর্মের ইচ্ছা। আনন্দময় বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর।

অনন্তদিকপতি সর্ববরদায়িন! ঋজুতার জন্মভূমি হইতে আবহমান এস, সোমদেব! সত্যবলে সত্যবাণীর গর্ভে শ্রদ্ধায় তপস্যায় তুমি সমদ্ভূত। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর!

পর্জন্যের সর্বদানে এই মহৎ দেবতা বর্ধিত, সূর্য-দুহিতার সর্বজ্ঞানে এই মহৎ দেবতা আনীত, গন্ধর্বের রসগ্রহণে এই মহৎ দেবতা গৃহীত, গন্ধর্বেগ্রহণে সোমরসে সে পরমরস বিহিত। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর।

সত্যজ্যোতির্ময় তুমি, বাক্যে ব্যক্ত কর সত্যধর্ম, সত্যকর্ম তুমি, ব্যক্ত কর সত্যসত্তা, রাজা সোমদেব তুমি, বাক্যে ব্যক্ত কর সত্যশ্রদ্ধা। ধাতার হস্তে তোমার নির্দোষ সৃষ্টি, সোমদেব। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর।

বিশাল উগ্র আনন্দের পূর্ণ নানাবিধ প্রবাহ সত্য সত্তায় সঙ্গম করিতে ধাবিত, মিলনেচ্ছায় পরস্পরে পড়িতেছে রসময়ের অসংখ্যরস। হৃদ্‌গত সত্যমন্ত্রে তুমি পূত, হৃদ্‌গত সত্যমন্ত্রে দ্যুতিমান, হে দেবতা। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর।

মনের যে উচ্চ চূড়ায় ছন্দের গতিতে মন্ত্রদ্রষ্টার চিন্তা বাক্যে উদ্গত, সেইখানে সোমনিঃসারণে সোমরস প্লাবনে আনন্দের সৃষ্টি আনন্দে স্বর্গীয় মহিমা। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর।

যে ধামে অবিনাশ্য জ্যোতি, যে ধামে স্বর্লোক নিহিত, হে আবহমান সোমদেব, সেই ধামে আমাকে তুমি স্থান

দাও অমর অক্ষয় লোকে। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর।

যে ধামে সূর্যতনয় ধর্মরাজ রাজা, যে ধামে দ্যুলোকের আরোহণীয় সানুর চূড়া, যে ধামে প্রবল বিশ্বনদী সকলের উৎস, সেই ধামে আমাকে অমর করিয়া তোল। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর।

সে ধামে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ দ্যুলোকের ত্রিদিবে স্বর্লোকের ত্রিপুট আনন্দধাম, যে লোকের অধিবাসী আত্মাগণ নির্মল জ্যোতির্ময়, সেই ধামে আমাকে অমর করিয়া তোল, বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর।

যে ধামে কামনা অতিকামনার নিঃশেষ প্রাপ্তি, যে ধামে মহৎ সত্যের নিবাস ভূমি, যে ধামে সকল প্রেরণার স্বভাবের তৃপ্তি, স্বপ্রকৃতি পূর্ণ, সেই ধামে আমাকে অমর করিয়া তোল। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর।

যে ধামে সকল আনন্দ সকল প্রমোদ, যে ধামে সকল প্রীতি সকল সুখ ক্রীড়া চিরতরে আসীন, যে ধামে কামের সর্বকামনার নির্দোষ সুখাস্বাদন, সেই ধামে আমাকে অমর করিয়া তোল। বিশাল প্রবাহে বহিয়া ইন্দ্রকে প্লাবিত কর।

মায়ের মন্ত্র

দ্বিতীয় ভাগ

(২)

১লা আগস্ট

নূতন কথা দরকার নূতন ভাব প্রকাশের জন্য—নূতন রূপ দরকার নূতন শক্তি ধরে দেবার জন্য।

২রা আগস্ট

আমাদের সাহস, আমাদের ধৈর্য (সহ্যশক্তি) হবে আমাদের আশার মত বিপুল আর আমাদের আশার সীমা নাই।

৩রা আগস্ট

ভগবানের চেতনায় নীচে থেকে ক্ষুদ্রতম বস্তু সব মিশে যায় গিয়ে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতম মহত্তম সব জিনিসের সঙ্গে।

৪ঠা আগস্ট

যুগ যুগান্তের একান্ত আস্পৃহা আমাদের নিয়ে এসেছে এখানে ভগবানেব কাজ করবার জন্য।

৫ই আগস্ট

যখনই কোন বিপত্তি এসে ঘিরবে, তখনই আমাদের স্মরণ করতে হবে যে আমরা এখানে রয়েছি কেবল মাত্র ভগবানেরই ইচ্ছা পূরণ করবাব জন্য, আর কিছুর জন্য নয়—

৬ই আগস্ট

ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের যখন পূর্ণ সাযুজ্য, তখন পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে আমাদের শান্তি, আমাদের আনন্দ।

৭ই আগস্ট

বাহিরের আবরণটির পিছনে রযেছে সর্বাঙ্গসুন্দর চেতনার সাগর—সেখানে গিয়ে আমরা ডুব দিতে পারি।

৮ই আগস্ট

বাধা কিন্তু যাই হোক যদি আমরা শান্ত থাকতে পারি সমস্যা মীমাংসা হবেই।

৯ই আগস্ট

এই পৃথিবী এখনও অজ্ঞান এবং মিথ্যার শাসনাধীন তবে কাল পূর্ণ হয়েছে, সত্যের প্রকাশ এখন হবে।

১০ই আগস্ট

সকল দুর্ভোগ ঘটে সমতার অভাবে—সুতরাং আমাদের সমতা বজায় রাখতে হবে সতর্কে, সদাসর্বদা, সকল ঘটনাবলীর মধ্যে।

১১ই আগস্ট

একমাত্র ভাগবত চেতনাই হবে আমার দিশারী—

১২ই আগস্ট

একমাত্র ভাগবত চেতনাই হল আমাদের সত্যকার সহায় সত্যকার সুখ।

১৩ই আগস্ট

আমরা কখনও ভুলে যাব না যে আমরা এখানে রয়েছি অতিমানস সত্যের ও জ্যোতির সেবা করবার জন্য আর আমাদের ভিতরে এবং পৃথিবীর পরে তার আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে সব তৈরী করে তুলবার জন্য।

১৪ই আগস্ট

শ্রীঅরবিন্দ সর্বদা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জ্ঞান দিয়ে পথ দেখিয়ে রক্ষা করে চলেছেন, তাঁর করুণায় আমরা যেন সাড়া দিতে পারি আমাদের পূর্ণ নিষ্ঠা নিয়ে।

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

২য় পর্ব—বিশ্ব পর্যটক

১৫শ সর্গ—বৃহত্তর জ্ঞানের রাজ্যসব

(১)

অন্তরাত্মার অপারমেয় এক মুহূর্তের পরে
ফিরে এল সে আবার এই যত বাহ্যক্ষেত্রে
উঠে এল কালহীন অতল হতে যেখানে গিয়েছিল ডুবে,
শোনে পুনরায় মুহূর্তদের মন্থর পদক্ষেপ।
একদিন যা-কিছু ছিল ইন্দ্রিয়ানুভবের, জীবনযাপনের বিষয়, এখন
সবই তারা সুদূরে অন্তর্হিত ;
আপনি আপনার কাছে শুধু একমাত্র দৃশ্যবিষয়।
সাক্ষীপুরুষের এবং তাঁর বিশ্বসৃষ্টির ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে সে সীমাহীন সব
নীরবতার রাজ্যে
অপেক্ষায় রয়েছে সেই কণ্ঠের বাণী যে বহন করে, জগৎসব যে
গড়ে তোলে।
ঘিরে তারে জ্যোতি এক বিশাল নির্বিকল্প,
সনাতন দৃষ্টির হীরকশুভ্রতা ;
স্তব্ধ রয়েছে এক চেতনা, সর্বরূপহীন,
নির্মুক্ত, নির্বাক, বিধি বা বিধানের বাধা নাই কোন,
আপন সত্তা ও আনন্দ নিয়ে নিত্য তৃপ্ত সে ;
অস্তিমাত্র শুধু আপন শান্তিমাঝে সঞ্জীবিত
অদ্বিতীয় চিন্ময়তার মুক্ত অসীম প্রতিষ্ঠার উপরে।
মানসের মণ্ডল হতে উঠে এসেছে সে,
ফেলে এসেছে প্রকৃতির বর্ণের ছায়ার লীলাক্ষেত্র ;
নিবাস এখন তার আত্মসত্তার বর্ণহীন শুভ্রতা।
এ হল নির্বিশেষ চিন্ময়লোক
অর্থ তার হতে পারে শূন্য অথবা সকল জিনিসের পূর্ণ সমষ্টিসংখ্যা,

অবস্থা এক যেখানে সকলের শেষ আবার সকলের আরম্ভ ।
সকলই সে হয়ে উঠেছে যা-কিছু রূপ দেয় অদ্বিতীয়ের ;
সমুচ্চ বিশাল শিখর এক যেখান হতে চিন্ময়পুরুষ সকল জগৎ দেখে চলে,
প্রশান্তির বিশাল জ্যোতির্ময় আবির্ভাব, প্রজ্ঞানের নিস্তব্ধ আপন নিলয়,
সর্বজ্ঞানের নিঃসঙ্গ স্থিতি,
আশ্রয় যেন সনাতনের শক্তিগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়বার,
বিশ্ব-আনন্দের ভবনে শুভ্র প্রাঙ্গণ যেন।
এখানে আসে সেই চিন্তা চিন্তাশক্তির অতীত যা,
এখানে সেই স্তব্ধকণ্ঠ আমাদের শ্রবণে যা ধরে না,
সেই জ্ঞান যার আশ্রয়ে জ্ঞাতা হয় জ্ঞাত,
সেই প্রেম, প্রেমিকা ও প্রেমিক যেখানে এক অভিন্ন ।
সকলে স্থান পেয়েছে এক আদি পরিপূর্ণতার মাঝে,
স্তব্ধ সকলে সমগ্র সিদ্ধি নিয়ে, সৃষ্টি আরম্ভ করে নাই তারা
রয়েছে তারা তাদের বিশ্বভূত কর্মাবলীর মহিমান্বিত স্বপ্ন নিয়ে ;
এখানেই উদ্ভব অধ্যাত্ম জন্মের
এখানেই সীমার সরীসৃপগতি থেমে গিয়েছে অসীমের কাছে এসে ।
সহস্র পথধারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে শাশ্বতের মধ্যে
অথবা কণ্ঠে সঙ্গীত ছুটে চলেছে ভগবানের অনবগুণ্ঠিত মুখমণ্ডলের
সাক্ষাতে।
জ্ঞাত পথিকবরকে মুক্তি দিয়েছে তার বন্ধনী শৃঙ্খল হতে,
উপনীত এখন সে অজ্ঞেয়ের তোরণে।
তারপর হানে এক অপরিমেয় বহির্দৃষ্টি
অন্তরাত্মার অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে ধ'রে তার আপন বিশুদ্ধ বিশাল
প্রসারতার অন্তরে,
দেখে সে চিন্ময়ের রাজ্যের ঔজ্জ্বল্য,
তার সীমাহীন কর্মাবলীর মহিমা আর বিস্ময়,
তার প্রশান্তি হতে উৎসারিত প্রবেগ আর আবেগ,
তার গতি এবং তার বিশ্রান্তির উল্লাস,
আর লোকাতীত জীবনধারার বহ্নিমধু অত্যাশ্চর্য ;
লক্ষ্যমুখী অভিন্ন গ্রহণসামর্থ্য
রয়েছে তার এক অদ্বিতীয় বিরাট সর্বভূত দৃষ্টির,
রয়েছে তার অক্ষুরন্ত কর্মধারা কালশূন্য কালক্রমে,

আকাশ এক আপনি যে আপনার আনন্ত্য।
একই প্রজ্বলন্ত আত্মার বহুগুণিত অপরূপ রূপ,
আনন্দের প্রত্যুত্তরে দেয় আনন্দ, প্রেমের প্রত্যুত্তরে প্রেম,
সবই সেখানে ভাগবত আনন্দের চলন্ত ভবনরাজি ;
সনাতন অদ্বিতীয় এক হয়ে তারা বাস করে একের মধ্যে।
শক্তিধারা সেখানে হল ভাগবত সত্যের বিপুল প্রস্ফুরণ
বস্তুরাজি সব তার বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম রূপাবলী ;
চিন্ময়পুরুষ লুকায়ে রয় না আর আপনার দৃষ্টি হতে,
সকল প্রাণস্পন্দন পুলকের সাগর
সকল সৃষ্টি আলোকের প্রকাশ।
আপন আন্তর নিস্পন্দ নীরবতা হতে
চলে এল পথিকবর প্রবেগের প্রশান্তির ক্ষেত্রে সব
দেখে, শক্তিসঙ্ঘসব দাঁড়িয়ে জগতের ঊর্ধ্বে,
পার হয়ে এল সে মূল আদিচিন্তার রাজ্য সব
খোঁজে সে সৃষ্ট বস্তুর শেষ শিখর
বিশ্বপরিবর্তনের সর্বশক্তিমান উৎস।
জ্ঞান তখন ডেকে নেয় তারে তার রহস্যাবৃত তুঙ্গস্থানে
যেখানে চিন্তা বিধৃত বিশাল অন্তর্মুখী সংবেদনের মধ্যে
আর হৃদয়ানুভব ভেসে চলে শান্তির সাগর পার হয়ে
দৃষ্টি ঊর্ধ্বে উঠে চলে কালের স্পর্শের ওপারে।
আদি সৃষ্টিক্ষম দ্রষ্টাদের সমকক্ষ,
সহচর তার সর্বপ্রকাশক দীপ্তি,
চলে সে লোকাতীত সত্যের রাজ্য পার হয়ে
অন্তর্মুখী, বৃহৎ, বহুধাভিন্ন অভিন্ন এক।
সেখানে দূরত্বের মাপ হল আপন বিপুল আত্মাপুরুষের পরিসর ;
মনের কল্পরচনা থেকে মুক্ত
কালের ত্রিধাভেদকারী পদক্ষেপ আর বিপর্যস্ত করে না ;
তার অনিবার্য নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ,
তার ক্রমপ্রকট ধারার সুদীর্ঘগতি,
অন্তঃপুরুষের একই বিশাল দৃষ্টি ধরে রেখেছে আপনার মধ্যে।

অনুবাদ : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

মায়ের ঘরোয়া কথা

বুধবার ৩০.১২ ৫৩

আজও ভীষণ বিতর্কমূলক কথা। পবিত্রর কারখানার প্রতিনিধি ক্ষেপে গিয়ে একটি Precision Instrument এনে, মাকে দেখিয়ে বলল, ১/১০০০ এক ইঞ্চির হাজার ভাগের একভাগ পর্যন্ত নিখুঁত মাপতে পারে যন্ত্রটি। এরই সাহায্যে জীপ গাড়ীর সিলিণ্ডার "বোরিং" করে দেওয়া হয়েছে, অমুকের জন্যে। স্বয়ং বিশ্বনাথদা তাকে সাহায্য করেছেন সে কাজে এবং কাজটি অন্যান্যবারের চেয়ে ঢের বেশি উৎরেছে। অমুকও নিজে তা দেখে ভাল মত দিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন পরে সেই লোকই আবার দোষ দিচ্ছে যে, ভাল boring হয়নি।

মা তার কথার মাঝেই, তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এখন সত্যি কোন্‌টা? Boring ঠিক করে করা হয়েছে? প্রমাণ করতে পার? তা যদি হয়, তবে অমুকের ওকথা বলার কারণ কি?

* * *

গতকালেরও আগের দিন কারখানার প্রতিনিধি মাকে বলল যে, মোটরে মাদ্রাজ পৌঁছে দিতে তারা গাড়িভাড়া একশ পঁচিশ টাকা নেয়। কিন্তু এটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, বরং একশ টাকা যুক্তিযুক্ত হয়। কারণ সব মিলিয়ে টাকা ৩০৲ বা ৩৫৲ এর বেশি পড়ে না। (১৯৫৩ সালের কথা) কলকাতায় বার আনা মাইল হিসেবে ট্যাকসি ভাড়া নেয়।

মা বললেন, পণ্ডিচেরী তো কলকাতা নয়, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন? তাছাড়া এ ক্ষেত্রে সুবিধা অসুবিধার প্রশ্নও তো আছে।

ইতিমধ্যে আর একজন, যার এসব বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতাই নেই, মাঝ থেকে বলে বসল, পণ্ডিচেরী থেকে কেউ ট্যাকসি ভাড়া করে মাদ্রাজ যেতে চাইলে ১২৫৲ টাকা পড়ে।

মা তৎক্ষণাৎ তার ভুল সংশোধন করে বললেন, ১৫০৲ টাকা লাগে।

* * *

আজ সকালে 'তারা'-র দল যখন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচে যাবে, তখন মা তাদের মনে করিয়ে দিলেন, আজ সন্ধ্যায় তোমাদের প্রশ্নের পালা—"Education"-এর দ্বিতীয় অধ্যায়, (অর্থাৎ খেলার মাঠের ক্লাশে) কার কার প্রশ্ন তৈরী আছে, জিজ্ঞাসা করলেন। শিশুটিকেও জিজ্ঞাসা করলেন ঠাট্টা করে।

Tu as une question? (আজই প্রথম সে মাকে প্রণাম করতে শিখেছে, পায়ে মাথা রেখে। মা-ও সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। অপূর্ব মুহূর্ত সেটি। ছোটয় আর বড়য় সে আত্মার সংযোগ। জগতের পরিচিত দৃশ্যপথে বিরল)।

* * *

বর্ষ শেষ

বৃহস্পতিবার ৩১,১২.৫৩

সকালেই মা দিলেন নতুন বছরের ডায়েরী।

AGENDA (1954) প্রতিদিনের পাতায় ফরাসীতে মায়ের বাণী সমেত, মায়েব কোন না কোন একটি বাক্য লেখা। গত বছরে মা আমাকে একটি দিযেছিলেন, কয়েক দিন পরে। এবারে দিলেন বর্ষ আরম্ভের আগেই।

রাত্রিবেলা খেলার মাঠে হল লটারী। আমি প্রথমবারে পেলাম না কিছুই। তবে দ্বিতীয় দফায় পেলাম একটি ডায়েরী, ছোট্ট সংস্করণ, শ্রীঅরবিন্দের বাণী সমেত। দাতব্য করলাম সেটি অবশ্য একজনকে, সে পায়নি বলে দুঃখ

করছিল।

রাত্রে এসে মাকে একটা পত্র লিখলাম, পুরনো বছরের সকল পাওয়ার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আর নতুন বছরের প্রার্থনা করে। পত্রটি যখন রাখছি, মায়ের সামনে পড়ে গেলাম, তখন রাত সাড়ে-দশটা হবে। মা চলতি পথেই জিজ্ঞাসা করলেন—Qu'est-ce que vous voulez' কি চাই তোমার ?

—বললাম কিছুই না, শুধু এটি রাখছি।

মা বললেন, Un peu plus de travail। Vous croyez que je n'ai rien à faire।

—অর্থাৎ আরও খানিকটা কাজ বাড়ানো। তোমার বুঝি ধারণা যে আমার আর কোন কাজ নেই ?

আমি হাসতে হাসতে পত্রটি তবু রেখে চলে এলাম।

লিখতে ভুলেছি, আজ সকলে মা নিচে নামলেন Special Blessings দিতে। নতুন বছরের Message দিলেন।

1954

My Lord, here is Thy advice to all, for this year : "Never boast about anything, let your acts speak for you."

—The Mother

(হে প্রভু, এ বৎসরে সকলের জন্যে এই তোমার বাণী : দম্ভ করে কিছু বোল না—তোমার কাজই তোমার হয়ে বলুক কথা।)

—শ্রীমা

[জনৈক সাধকের ডাইরি থেকে]

সাহস আন আর বিশ্বাস রাখ—আমি আছি তোমার সঙ্গে।

—শ্রীমা

দ্যৌ মে পিতা মাতা পৃথিবী

['ভারতী' ৪২ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৫]

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রথমে কি, আগা না গোড়া, উপর না নীচ, ভিতর না বাহির ? কোন জিনিস গড়িতে বা আয়ত্ত করিতে হইলে পা হইতে আরম্ভ করিব না মাথা হইতে আরম্ভ করিব ? মূল হইতে ক্রমে শিখরে আরোহণ করিব, না শিখর হইতে মূলে নামিয়া আসিব ? পূর্বে কোন্‌টি, পরেই বা কোন্‌টি—কতরা পূর্বা কতরা পরায়োঃ ?

নীচ হইতে মূল হইতেই তো আরম্ভ করা উচিত। ভিতই যদি ঠিক না হইল তবে ইমারত দাঁড়াইবে কোথায় ? প্রতিষ্ঠা যদি পাকা হয়, তবেই তো তাহার উপর স্থায়ী কিছু খাড়া করা যায়। জিনিস যাহাকে ধরিয়া ভর করিয়া আশ্রয় করিয়া থাকিবে তাহারই প্রতি সর্বপ্রথমে মনোযোগ দেওয়া যে কর্তব্য এতো অতি সহজ সাধারণ কথা। বাহির হইতেছে প্রতিষ্ঠা, বাহিরকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ভিতর। কাজেই আগে চাই বাহির, তারপর ভিতর। বাহির হইতেছে যাহা বেশি জানা, বেশি স্পষ্ট; আর ভিতরটা সন্দেহের জায়গা, সেখানকার সবই আবছায়া। যেটার উপর কিছু দখল আছে, সেইটা দিয়া শুরু করা বুদ্ধিমানের কার্য। যাহাই গড়ি না কেন সেখানে একটা সত্য থাকিবেই, কারণ গোড়ায় একটা পরিচিত সুদৃঢ় সর্ববাদিসম্মত সত্য দিয়া আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু প্রথমেই যদি অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ি তবে হাত পা ভাঙিয়া অন্ধকারের মধ্যেই চিরকাল গুমরাইয়া মরিতে হইবে, ইহারই সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং কার্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ হইতেছে জানা হইতে ক্রমে অজানার দিকে বাহির হইতে ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করা। ছোট যাহা নিকটের যাহা শিক্ষা নবীসের কাছে সেইটাই প্রধান কথা। বৃহৎ যাহা দূরের যাহা সেটাকে আয়ত্ত করিতে হয় কাছের চারিপাশের ছোট ছোট জিনিসকে আয়ত্ত করিয়া, ইহারাই তো প্রতিষ্ঠা।

প্রতিষ্ঠা পাকা কর, তাহার উপর জিনিস গড়িয়া তোল, জিনিস চিরস্থায়ী হইবে একথা শুনায় ভাল, মনে হয় স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু ইহার কারণ হইতেছে এই যে, মানুষের দৃষ্টি একান্ত স্থূলের উপর আবদ্ধ, স্থূলের সহিত মিলাইয়াই তাহার সকল কল্পনা খেলিতে চায়। যে সত্যটি প্রধানতঃ খাটে স্থূল জিনিসের সম্বন্ধে, তাহাকে সে ধরিতে চায় বিশ্বসত্য বলিয়া। গোড়া হইতে আগা, ভিত হইতে চূড়ায় ওঠা ইমারত গড়িবার বেলায় ঠিক ঠিক পদ্ধতি হইতে পারে। কিন্তু জগতের সব জিনিস ইমারতের মতনই নিখুঁত নিরেট হয় তাহা কে বলিতে পারে ? আর যে-সব জিনিস একান্ত নিখুঁত নিরেট নয়, তাহারা যদি গোড়ার ভিতের উপর নির্ভর করিয়া না থাকে, অনেক সময়ে যদি মাথার উপর ভর করিয়াই চলে, তাহাই-বা অসম্ভব কি ? উপনিষদ এই রকমের একটা কথা বলিতেছেন না ?—ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখঃ ?

সৃষ্টির সব জিনিসই যে স্থূল জগতের নয় একথাও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। জড়জগৎ ছাড়া স্পষ্টই আমরা দেখি আছে প্রাণের জগৎ, মনের জগৎ। বস্তুতঃ সূক্ষ্ম জগতের সংখ্যাই বেশি আর প্রাধান্যে ইহারাই বড়। আর সূক্ষ্ম জগতের—মনের, প্রাণের জিনিস সব আদৌ স্থানু নহে, তাহাদের ধর্মই হইতেছে গতি, চঞ্চলতা। তাহারা স্থির হইয়া কোথাও বসে না, কিছুকে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না, তাহারা চলে ভাসিয়া ভাসিয়া, বাষ্পবৎ উড়িয়া ঘুরিয়া।

সুতরাং এসকল জিনিস গড়িতে হইলে কোথা দিয়া আরম্ভ করিতে হইবে ? প্রতিষ্ঠা নয়, যাইতে হইবে উৎসে।

প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির অর্থই এই। স্থূল হইতে স্থূলের যে পরিণতি তাহা সৃষ্টি নয়। স্থূলের যে পরম্পরা তাহার মধ্যে প্রকৃত কার্যকারণের সম্বন্ধ নাই। সকল স্থূলই হইতেছে কার্য, কারণ রহিয়াছে উহার এক অতীত প্রদেশে। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, ভাব হইতে বস্তু, ইহাই সৃষ্টির ক্রম। স্থূল, বস্তু হইতেছে প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সূক্ষ্ম, ভাব হইতেছে উৎস। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, বস্তু হইতে ভাব, বাহির হইতে ভিতর—এটা উজানের পথ, স্রোতের প্রতিকূল ধারা। কিন্তু সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে, ভাব হইতে বস্তুর দিকে, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে যে গতি তাহা সহজ স্বাভাবিক অনুকূল স্রোত।

প্রতিষ্ঠার, বাহিরের উপর জোর দেওয়ার অর্থ জড়বাদ। দেহটাই আসল, মূল কারণ, প্রাণ মন এবং আত্মা (যদি কিছু থাকে) এই দেহেরই পরিণাম বা Function মাত্র—এই ধারণা ভিতরে ভিতরে আছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি দেহ অধিকৃত হইলে প্রাণ-মন অধিকৃত হইবে, বাহিরকে ঠিক ঠিক বুঝিলে ভিতরটাও আপনা হইতেই বোধগম্য হইবে। কিন্তু সত্য হইতেছে ইহার বিপরীত। আত্মাই মূল কারণ, আত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে মন-প্রাণ। দেহ হইতেছে সকলের শেষ নিম্নতম সৃষ্টি। এই আত্মাই প্রকৃত মূল, এখানে সকল জিনিস রহিয়াছে বীজভাবে। উপনিষদ জগতের যে চিত্র দিয়াছে তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নয়, তাহা মোটেই কবিকল্পনা নয়। সাধারণতঃ আমরা মনে করি এই যে বাহিরের স্থূল জগৎ, এইটিই হইতেছে মূল গোড়া, ইহা ঊর্ধ্বে উঠিয়া চলিয়াছে, শাখা প্রশাখা তুলিয়া দিয়াছে আকাশের দিকে আর আর জগতের দিকে। মানুষ দাঁড়াইয়া আছে দেহের উপর, এখান হইতেই প্রাণকে মনকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে আত্মার দিকে। কিন্তু এটি দেখিবার ভুল। আত্মাই উৎস আত্মাই মূল, আত্মাই সৃষ্টিকে ধরিয়া রাখিয়াছে, আপনার সমুচ্চের গুহাহিত গর্ভ হইতে নীচের দিকে মেলিয়া দিয়াছে মনের প্রাণের দেহের সৃষ্টির এই বহু-পল্লবিত বাহু।

ধর্মসাধনাও এই জড়বাদের হাত এড়াইতে পারে নাই। এক্ষেত্রে একটা খুব সাধারণ হিতোপদেশ আমাদের দেওয়া হয়—শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং। শরীরই হইতেছে প্রতিষ্ঠা, আত্মাকে মনকে এই শরীরই ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং আগে শরীরটি ভাল থাকা চাই, সুস্থ সবল নিরাময় হওয়া চাই, তবেই ধর্ম কর্ম যাহা-কিছু সম্ভব। নতুবা রোগে যে জীর্ণ, সকল রকম অস্বচ্ছন্দতায় যে খিন্ন, তাহার কাছে আত্মার কথা, ভগবানের কথা উপহাস মাত্র। সেই জন্যেই দেখি প্রচলিত সকল রকম যোগসাধনাতে প্রথমে শরীর, শরীর সম্বন্ধীয় যাহা তাহারই উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দেহশুদ্ধি দিয়া আরম্ভ করিয়া সাধককে ক্রমে চিত্তে, মনে উঠিতে হয়, সকলের শেষে অধ্যাত্মের মধ্যে পৌঁছিতে হয়। হঠযোগ (আসন ও প্রাণায়াম) হইতেছে যোগের অধ্যাত্ম-সাধনার মূল প্রতিষ্ঠা, অবশ্য-করণীয় কর্তব্য, এটিকে ছাড়িয়া অন্য পথ নাই।

কিন্তু ধর্ম-জীবনে বা যোগ-সাধনার এটি উল্টা পথ। আগেই হইতেছে সাধকের মন—তাহার আত্মা, তারপর শরীর। রোগজীর্ণ শরীর লইয়া যে ভগবৎ চিন্তা করিতে পারে না, রোগমুক্ত হইলেই যে সে ভগবানে স্থিরনিবিষ্ট হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। যাহার অন্তরাত্মায় ভগবানের স্পর্শ পড়ে নাই, সে সুখী সুস্থ হইলেও ভগবানকে মনে করিতে পারিবে না। কিন্তু যে পাইয়াছে এই স্পর্শ, তাহাকে সুখে-দুঃখে, রোগে-স্বাস্থ্যে বাধ্য হইয়া ভগবানকে ভাবিতে হইবে। যোগ-সাধনারও গুপ্তরহস্য এইখানে, গোড়াতেই প্রথমেই ধরিতে হইবে অধ্যাত্ম সত্তা, এই জিনিসটি অধিগত হইলে তুমি এক নিভৃত তপঃশক্তির অধিকারী হইবে। এই তপঃশক্তির উচ্ছ্বসিত বন্যা তোমার আধারকে ছাপাইয়া চলিবে এবং উহারই তেজে ও উহারই চাপে তোমার মন তোমার চিত্ত তোমার দেহ শুদ্ধ হইয়া উঠিবে, নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিবে। কায়াসিদ্ধি যোগ-সাধনার গোড়ার উপকরণ নয়, শেষ ফল মাত্র।

সেই রকম ছোট যাহা কাছের যাহা, সেটা হইতেছে দূরের যাহা বৃহৎ যাহা, তাহারই একটা রূপ প্রকাশ বা প্রযোগ। বড় জিনিস কঠিন জিনিস প্রথমে ধর, দেখিবে ছোট জিনিস সহজ জিনিস আরও কত সহজ সরল হইয়া গিয়াছে, আপনা হইতেই কেমন সম্পাদিত হইয়া চলিয়াছে। যে যত ঊর্ধ্বে আপনার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, বাধ্য হইয়া তাহাকে সেই অনুপাতে শক্তি

প্রয়োগ করিতে হইতেছে; অল্পশক্তিসাধ্য যে কর্ম সে-সব কোন বিশেষ যত্নেরই অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু অল্প লইয়া যে আছে তাহার ততখানি শক্তি ব্যয় করিবার প্রয়োজনও হইতেছে না, অবসরও জুটিতেছে না। শুধু তাহাই নয়, ছোট জিনিস কেবল তখনই সুনিষ্পন্ন হয়, যখন বৃহতের প্রভা ও আবেগ তাহার পিছনে জাগ্রৎভাবে রহিয়াছে। আসল কথা এই, যে জিনিসকে আমরা বলিতেছি দূরের অজানার, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেইটাই মানুষের বেশি কাছে বেশি জানা। অন্তরের দিক দিয়া দেখিলে দেখি ভিতরটাই আগে, কাছে, বাহিরটাই পশ্চাতে সুদূরে। মানুষ যদি কিছুর উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে তবে তাহা আত্মার সমুচ্চ শিখরে।

আত্মাই আগে, মনই আগে তারপর দেহ, ভিতরই আগে তারপর বাহির, আগে শিখর তারপর মূল, আগে উৎস তারপর প্রতিষ্ঠা—ইহাই হইল অধ্যাত্মবাদীর কথা। অধ্যাত্মবাদী যাহা বলিতেছেন তাহা খুবই সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া জড়বাদীর কথা কি মোটেই প্রণিধানযোগ্য নয়, সেখানে কি কিছু সত্য পাওয়া যায় না? আমরা বলি জড়বাদের মধ্যেও একটা সত্য, গভীর সত্যই আছে, কার্যতঃ সেটিকে যতই বিকৃত করিয়া ফেলা হউক না কেন। ফলতঃ অধ্যাত্মবাদী আর জড়বাদী দুইজনে হইতেছেন দুই অতিমাত্রা। প্রত্যেকেই চাহিতেছেন একটা বিশুদ্ধ অমিশ্র সত্য, সৃষ্টিকে একটি মাত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্ তত্ত্বের মধ্যে ঢালিয়া সহজ সরল করিয়া ধরিতে। কিন্তু সত্য জিনিসটি বড়ই মিশ্র জটিল দ্বন্দ্বপূর্ণ, সৃষ্টির রহস্য একটি কথায় শেষ করিয়া ফেলা যায় না। মিল একটা অবশ্য কোথাও আছে, থাকিবেই। কিন্তু সে মিল আমাদের মনে হয় ঐক্যে ততখানি নাই যতখানি আছে সামঞ্জস্যে।

জড়বাদীর ভুল এইখানে যে মানুষকে তিনি কেবল জড় বা জড়ের দাস বলিয়া দেখিতেছেন। অধ্যাত্মবাদী এই ভুলটি সংশোধন করিয়া বলিতেছেন, মানুষের উপর জড়ের বাহির-প্রভাব যতই থাকুক না কেন, আপাততঃ এটিকে যতই অবাধ অটুট মনে হউক না কেন, ইহারই মধ্যে এই ঘন তমিস্রা ভেদিয়াই খেলিয়া উঠিতেছে ভিতরের আত্মার বিজলী চমক। জড়ের সহায়ে নয়, এই ভিতরের আলোকেই আশ্রয় করিয়া—তাহা যতই ক্ষণিক যতই চঞ্চল হউক না—ইহারই ধ্যান করিতে হইবে, একাগ্রচিত্ত হইতে হইবে, ক্রমে ইহাকে স্থির প্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা যদি পারি তবে জড়ের জড়ত্ব সহজেই দূর হইতে থাকিবে, আপনা হইতেই নবরূপে গঠিত হইতে থাকিবে। অথবা বেদ যেমন বলিতেছেন, পৃথিবী মানুষের মাতা বটে, কিন্তু তাহার পিতা হইতেছে স্বর্গ—সন্তানের উপর মাতার দাবী যতই থাকুক না, পিতার দাবীও যে আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না; শুধু তাহাই নয়, এক দিক দিয়া দেখিলে মাতা অপেক্ষা পিতার দাবী বেশি। এসব কথা সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু অধ্যাত্মবাদীর ভুল এইখানে যে পিতার অধিকার সাব্যস্ত করিতে গিয়া, মাতার অধিকারকে অবশেষে তিনি অস্বীকার করিয়া ফেলিতেছেন। ভিতরকে উপরকে আত্মাকে ধরিতে হইবে, সেখান হইতেই নামিয়া আসিতে হইবে, কিন্তু যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে তাহা হইতেছে না ততক্ষণ বাহিরটা নীচটা দেহটাকে লইয়া কি করিতে হইবে? পারমার্থিক সত্য হিসাবে যাহাই হউক ব্যবহার-হিসাবে পৃথিবীর দিকেই মানুষের টান বেশি। তাহার অন্তরাত্মায় এক মুহূর্তের জন্য স্বর্গের দ্যুতি ফুটিয়া উঠিলেও সমস্ত দিনটিই যে তাহাকে পার্থিব জাল-জঞ্জালের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হয়! তবে কি স্বর্গের উপলব্ধিটুকুকেই কেবল আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে আর পৃথিবীর অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, "মায়া মু মতিভ্রমো মু" বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে? না, চক্ষু বন্ধ করিয়া সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে হইবে? অধ্যাত্মবাদী ফলতঃ তাহাই করিতে বলেন।

আমরা বলি ইহারও প্রয়োজন নাই। মানুষের উপর এতখানি জোর-জবরদস্তি সহিবে না। আর মাতা পৃথিবীও তাহা মানিবেন না। মানুষ যদি কেবল দেবতাই হইবে, তাহার যদি শুধু থাকিত আত্মা তবে অবশ্য কোন কথাই ছিল না। কিন্তু সে যে অমর্ত্য মর্ত্য আত্মা ও দেহ এক সঙ্গে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পথ জ্ঞানীরও পথ হইতেছে যুগপৎ পৃথিবী ও স্বর্গের সেবা করা, আত্মার ও দেহের তৃপ্তি সাধন করা—একসাথেই ভিতর ও বাহিরকে উপর ও নীচকে গড়িয়া তুলা। ভিতর বাহিরকে সৃষ্টি করিতেছে, অধ্যাত্মবাদীর এই মহান সত্য হইতে মহত্তর, বৃহত্তর সত্য হইতেছে ভিতর ও বাহির একসঙ্গেই সৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে,

উভয়েরই মধ্যে উভয়কেই ঘিরিয়া রহিয়াছে যে একটা পূর্ণ অখণ্ড সমগ্র কিছু তাহারই প্রেরণায়। আত্মা শরীরকে গড়িয়াছে, এ সত্য হইতে গভীরতর সত্য হইতেছে আত্মা ও শরীর দুইটিই আর একটি তৃতীয় জিনিসের বিভূতি যাহা "পূর্ণস্যপূর্ণং"—গীতা যাহার নাম দিয়াছে "পুরুষোত্তম", বেদ যাহাকে বলিয়াছে পিতার পিতা পিতৃপ্পিতা। কারণ এমন কাল যেমন ছিল না, থাকিতে পারে না যখন শুধু শরীরকেই পাই, আত্মার অস্তিত্ব কিছু পাই না, সেই রকম এমন কালও নাই, থাকিবে না যখন দেখি আছে আত্মা, শরীর নাই। শরীর যেমন পরে ক্রম বিবর্তনের ফলে আত্মাকে গড়িয়া তুলে নাই, আত্মাও তেমনি পরে শূন্য হইতে শরীরকে গড়িয়া ধরে নাই। এক অখণ্ড সত্তায় পরস্পর পরস্পরের সহিত বিধৃত, সৃষ্টির এক অখণ্ড আবেগ উভয়কে নিত্য প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছে।

তাই বলিয়া ঐ দুই-এর মধ্যে যে পার্থক্য নাই তাহা নয়। পার্থক্য আছে, কিন্তু এ পার্থক্য অর্থে এমন নয় যে উভয়ে একান্ত বিসম্বাদী, উভয়ের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম, এক সঙ্গে তাহারা থাকিতে পারে না। পার্থক্য এই যে একটির মধ্যে মৌলিক বস্তুটির যতখানি জাগ্রৎ প্রকাশ হইয়াছে আর একটির তাহা হয় নাই, হইতে চলিয়াছে মাত্র। কিন্তু তবুও উভয়ের মূল্য সমান, উভয়ের উপরই সমান জোর দিতে হইবে। শুধু উভয়ের ধর্মগত পার্থক্য অনুসারে জোর দিতে হইবে পৃথক রকমে। ভিতরের যে জোর তাহা ভিতরেরই অর্থাৎ ভাবগত, সেই সঙ্গে বাহিরের একটা সাধনা একটা কর্ম চাই যেটা বস্তুগত। এই দুইকে সর্বদা মিলাইয়া ধরিয়া চলিতে হইবে, দেখিতে হইবে ভিতরটি কতখানি মূর্তিমান হইয়া উঠিতেছে বাহিরে, বাহিরের মধ্যে কতখানি ফুটিয়া উঠিতেছে ভিতরের প্রভা।

সুতরাং যখন বলি যাও ভিতরে, দূরে, অজানার শিখর-ভাগে, তার অর্থ এমন নয় যে যতক্ষণ তাহা হইতেছে না ততক্ষণ বাহিরের, কাছের, জানার, প্রতিষ্ঠার জিনিস সব ভুলিয়া যাও বা অবজ্ঞা কর। তাহা নয়, খণ্ড জিনিস স্থূল জিনিস লইয়াই থাক ; কারণ, জীবনটি এ সকলেরই সমষ্টি, কার্যক্ষেত্রে এসকল লইয়া থাকিতে হইবে—নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। কিন্তু দেখ তাহার মধ্যে বৃহতের সূক্ষ্মের প্রভাব জাগিয়া উঠিতেছে কি না, তাহারা ইহাদেরই বিগ্রহ হইতেছে কি না। অন্তরের সাধনা কর, কিন্তু তাহার যেন গতি হয় বাহিরের দিকে, বাহিরের সাধনা কর তাহার যেন মুখ থাকে ভিতরের দিকে, এই যুগল সাধনা যুগপৎ চাই। মানুষের খণ্ডতা চায় এক সময়ে একটিকেই ধরিয়া চলিতে, কিন্তু উহারা যে কখনো একটি ছাড়া আর-একটি থাকিতে পারে না, উহাদের কেহই পূর্বে, কেহই পরে নয়—

অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গ্রভীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনি।
তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা ন্যন্যং চিক্যুর্ণ নি চিক্যুরন্যং ॥

নীচ চলিয়াছে উপরের দিকে আপন স্বধর্মের অটুট আবেগে, অমরের প্রতিষ্ঠান মরেরই সহিত একাধারে। অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া উহারা একসাথে চলিয়াছে, দুই জনে দুই ভঙ্গিমায়। লোকে কিন্তু এটিকে জানিলে ওটিকে জানে না, আবার ওটিকে জানিলে এটিকে জানে না।

পত্রালোচনা

শতদল

ভগবৎ-বিশ্বাসীর মত ভগবৎ-অবিশ্বাসীরও দৃঢ়তা থাকতে পারে—যুধিষ্ঠিরের দৃঢ়তার থেকে দুর্যোধনের দৃঢ়তা কিছু কম ছিল না, যদিও একটি হল ন্যায়-ধর্মের দৃঢ়তা আর অন্যটি অন্যায়-অধর্মের। অসুরের দৃঢ়তা, সকল প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে অটল থাকবার সামর্থ্য, প্রবল; নির্মম কঠিন পাষাণ যেমন সব প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে সেসবকে অগ্রাহ্য করে অচল অটল দৃঢ়তার সঙ্গে বর্তে থাকে কত কাল ধরে। আর, নাস্তিকতাই তো আস্তিকতার দিকে প্রথম অজ্ঞান পদক্ষেপ। "ভগবান নেই, ভগবান মানি না" যে বলছে, তার ভিতরে গভীরে গোপনে আপন অজ্ঞাতেই একটা অস্পষ্ট বোধের অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছে যে ভগবান আছেন; তারই বহিঃপ্রকাশ এই সরব অস্বীকার,—দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত ঘনান্ধকার কক্ষে কণামাত্র আলোর সঞ্চারে অন্ধকারের জীব যত চামচিকে বাদুড়দের ঝটাপটির মত।

আর সুখ, দুঃখ? প্রকৃত সুখ কি, প্রকৃত দুঃখই-বা কি সেটাই তো বেশির ভাগ সময় আমরা বুঝি না। অর্থের প্রাচুর্য, ক্ষমতার প্রাচুর্য, বিলাসব্যসনের প্রাচুর্য থাকলেই আমরা মনে করি লোকটা কি সুখী! আর তার অভাব হলেই বা অভাব দেখলেই মনে করি দুঃখ। কিন্তু এ-দেখা বেশির ভাগই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত—সকল প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও মানুষ হতে পারে সব থেকে দুঃখী, নিঃস্ব, কাঙাল, আবার সকল দৈন্য-অভাবের মধ্যে থেকেও মানুষ হতে পারে সত্যকার সুখী, অন্তরের ঐশ্বর্যে ভরপুর। বলা যেতে পারে যে কমিউনিস্টরা তো ভোগ-বিলাস অর্থ-ক্ষমতার প্রাচুর্য চায় না, তারা চায় বরং ধনীর ভোগবিলাস অর্থ-ক্ষমতার ভাণ্ডার থেকে ছিনিয়ে এনে গরীবকে দিতে, চায় তাকে বাঁচাতে। কিন্তু শেষ লক্ষ্য তাদের: 'সবাই সমভাবে ভোগের অধিকারী হব'—ভোগই লক্ষ্য, বরং বলা যায় সব মানুষের সমভাবে সম্যক্ ভোগ। এই ভোগসর্বস্ব আদর্শ মানুষকে বেশি দূর নিয়ে যায় না, বড়জোর নিয়ে যায় পশুজীবনের চরম চরিতার্থতায়,—এর থেকে উঠে দাঁড়াতে হবে মানুষত্বে—তারপর আরও ঊর্ধ্বে দেবত্বে, দেব-মানবত্বে। সে অনেক পথ—দূরের পথ—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' দুর্গম পথ—তবে মানুষ সেপথে যাবে কেন? কারণ ভোগের ক্ষণস্থায়ী আপাতসুখে মানুষ তৃপ্তি পায় না—আর এই অতৃপ্তিই তাকে নিয়ে চলে অন্য কিছুর খোঁজে, সব কিছু পিছে ফেলে সত্যকার তৃপ্তির সন্ধানে—তাঁর সন্ধানে। ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই সুখ—তবে এটা যতখানি ভিতরের ততখানি বাইরের নয়। ত্যাগী মানেই যে কৌপীন সম্বল করে ভিক্ষাব্রতী হতে হবে তা নয়—সব কিছুর মধ্যে থেকেও ত্যাগী বা বরং বলা উচিত অনাসক্ত হওয়া যায়; যেমন, রাজর্ষি জনক, যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। এঁরা কেউই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, অথচ অনেক কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর থেকেও বহু উচ্চমার্গে যোগসিদ্ধির মধ্যে ভগবদ্‌গত চেতনায় নিত্য ছিল এঁদের স্থিতি।

আর আনন্দ? 'পাগলের গো-বধেই আনন্দ', মদ্যপের মদ্যপানে আনন্দ, রাজনীতিকের কূটবুদ্ধির চালে আনন্দ, জুয়াড়ীর জুয়াখেলায় আনন্দ, ব্যবসায়ীর অর্থোপার্জনে আনন্দ, বিজ্ঞানীর নব নব আবিষ্কারের আনন্দ, কবির শিল্পীর সৃজনানন্দ, ঋষির সত্যদর্শনের আনন্দ, ভগবৎ-প্রেমিক সাধুসন্তের ভক্তের তদগত তন্ময়তার আনন্দ। কে কিসে আনন্দ পায় তাই নিয়ে হল কথা। আর, যে ভক্তকে দেখা যাচ্ছে পরের পর নানা বিপদে পড়তে, নানা দিক থেকে নানা আঘাত বাধাবিপত্তির ঢেউ অনবরত এসে পড়ছে তার উপর—তা কি উদ্দেশ্যে ভগবান তার উপর এনে

ফেলছেন আমরা তার কি বুঝি ? এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে যায় : এক ব্রাহ্মণ পরম বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুগতপ্রাণ —সংসারে তাঁর আপন বলতে আর কেউ নেই, শুধু শিবরাত্রির সলতে আদরের ধন নয়নের মণি একটি পুত্র ছাড়া। ব্রাহ্মণ খুবই দরিদ্র। একের পর এক স্ত্রী-কন্যাদির মৃত্যুর আঘাত তিনি বুক পেতে নিয়েছেন নীরবে সয়েছেন বিষ্ণুনাম স্মরণ-মননে তাতেই আরো নিবিষ্ট হয়ে সকল অন্তর দিয়ে, দারিদ্র্যের কশাঘাতও তাঁকে বিচলিত করতে পারে না, ভগবৎ-পাদপদ্মে পরমনির্ভরে তাঁর সব দুঃখ সোনা হয়ে ওঠে। শুধু তাঁর পুত্রকে ক্ষণকের জন্যেও চোখের আড়াল করতে পারেন না। এমনি সময় একদিন এই ছেলেটিও হঠাৎ মারা গেল। তখন বিষ্ণুলোকে দেবর্ষি নারদ ভগবান বিষ্ণুকে প্রশ্ন করলেন : প্রভো! আপনি ভক্তবৎসল, পরমকরুণাময়, এ আপনার কি রকম বিচার ?

—কেন নারদ ? কি হল ?

—ওই যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত, আপনি ছাড়া আর কিছু ও জানে না, তাকে এরকম আঘাত আপনি দিলেন কি করে ? তার আদরের ধন নয়নের মণি একমাত্র পুত্রকে ছিনিয়ে নিলেন তার কাছ থেকে ?

—দেখ নারদ, আমি ওকে ভালবাসি বলেই ওর শেষ আসক্তির বন্ধনটুকুও ছিন্ন করে দিয়েছি। ওই পুত্রের প্রতি স্নেহাসক্তিই ছিল ওর পূর্ণ-আত্মনিবেদনের পথে শেষ বাধা—সেটুকু সরিয়ে দিয়েছি বলেই ও এখন পুরোপুরি আমাতেই সমর্পিত হবে, অনন্যচিত্ত হয়ে শুধু আমাকেই চাইবে আর তখনই আমাকে পুরোপুরি পাবে।

সুতরাং মায়ের ভক্তের বিপদ-আপদ ঝড়ঝাপ্টার আঘাত কেন আসছে বাইরে থেকে দেখে বিচার করা কঠিন —হয়তো "আঘাত করে নেবে জিনে পরাণটি তোমার··· ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার"। আর মায়ের ফটোর সামনে বসে যে অশ্রুধারা বয় তা যে সবসময় দুঃখের আঘাতের বেদনায় তা তো না-ও হতে পারে,—হতে পারে মা "আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করিয়া আমার মাটির ঢেলা" তাঁর "রচনার খেলা" যে শুরু করেছেন, প্রতিটি আঘাত যে আমায় সচেতন করে দিচ্ছে আমার মধ্যে কি রয়েছে এখনও অজ্ঞান, অশুদ্ধ বিকৃত আর তাকে মায়ের আলোয় এনে ধরছি যাতে তা মায়েরই আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে, হতে পারে সেই কৃতজ্ঞতাপ্লুত আনন্দের এই অশ্রুধারা। আর যদি তা দুঃখের আঘাতের বেদনারও হয়, যদি তাতে সচেতনতা বা স্বতঃউপলব্ধির আলোকোদ্ভাস না-ও থাকে তাহলেও ক্ষতি নেই—মায়ের কাছে বসে যদি নীরব অশ্রুপাতে জানান যায় : "মাগো! তোমায় এত ডাকি, যথাসাধ্য তোমায় স্মরণ করেই চলি তবুও কেন এত বিপদ-আপদ, এত ঝড়ঝাপ্টা ? আমায় বুঝিয়ে দাও, আমায় সচেতন করে তোল, দাও আলোর সন্ধান"; তাহলে "দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই" নামবে তখনই "বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ" এসে থামবে। মা আসবেন, চোখের জল মুছিয়ে বুঝিয়ে দেবেন কেন এই দুর্দৈবের আবর্ত, কি করে তা থেকে রক্ষা পেতে হবে, কি করতে হবে কোন্ পথে চলতে হবে এখন।

ভুল আমরা করি, মানুষমাত্রেই ভুল করে, কারণ মানুষ এখনও অপূর্ণাঙ্গ অপূর্ণ, শত দোষত্রুটিতে পরিপূর্ণ। যে পথে যাওয়া উচিত সে পথে না গিয়ে ভুল পথে অন্যপথে অপথে বিপথে চলি, এটা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে কথা হল, কিভাবে ভুল পথে যাচ্ছি, যেতে যেতে আমার মনোভাব আন্তর প্রতিক্রিয়া কি রকম হচ্ছে—মাকে ডাকতে পারছি কি না। যদি অজ্ঞানতাবশে ভুল পথে যাই তাহলে সেটা যে ভুলপথ তা মা বুঝিয়ে দেবেন, যদি অন্তরে মাকে ডাকি স্মরণ-মনন করি। যদি জ্ঞানতঃ ভুল পথে চলি, জানি আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে তবুও যদি আগুনে হাত গুঁজে দিই এবং এই গুঁজে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই এই দুর্বল হতাশ মনোভাব যদি এসে যায়, তাহলে অতলে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া—অন্ততঃ বেশ কিছু-কালের বা কয়েক জন্মের মত—আর উপায় থাকে না। তবে যদি জ্ঞানতঃ ভুলপথে চলেছি যেন "বলাদিব নিয়োজিতঃ"; জানি এপথে যাওয়া উচিত নয় তবু পেরে উঠছি না সে-নিম্নগতি রোধ করতে, নীচে নামতে নামতেও অপথে বিপথে চলতে চলতেও মাকে ডাকছি নিরন্তর : "মাগো! পারছি না নিম্নগতি রোধ করতে; তুমি এসো, এসো বিশ্ববিপদনাশিনী, এসো, আমার নিম্নাভিমুখী গতির পথরোধ করে দাঁড়াও এসে, মাগো, রক্ষা কর আমায়।"— তাহলে মা প্রায় সবসময়েই ডাকে সাড়া দেন, ভূপতিত বিপর্যস্ত অতলে নিমজ্জমান সন্তানকে আবার তুলে ধরেন

আলোয়, ঊর্ধ্বের চেতনায়, তাঁর অপার করুণাভরে—কারণ তিনি যে মা, ভগবতী জননী হলেও, জননী !!

তবে 'ইচ্ছেমত উল্টোপাল্টা কাজ করব' ব্যাপারটা জ্ঞানতঃ অপথে চলার, এবং সেই চলাকালীন মাকে স্মরণ মনন প্রায় হয় না—আর হলেও হয় চালাকির, 'যা খুশি এখন করি তো, মাকে ডাকলেই মা আমায় তুলে ধরবেন, চিন্তা কি'—তাই পরে অনেক নাকানিচোবানি খেয়ে মাকে ডাকলে তখন বেশ খানিকটা কৃতকর্মের ফলভোগের পর তবে উদ্ধার—তাও পেতে বেশ দেরি হয়। হয়তো এ-জন্মটা বৃথাই কেটে গেল—জন্মান্তরেও কি হবে রইল অনিশ্চিত হয়ে। সুতরাং সবই নির্ভর করে, ভুলপথে চলাটা কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, আর তখন আন্তর ভাবটি কি, মায়ের সঙ্গে আমার যোগ রয়েছে কি না, তাঁকে স্মরণ করতে অন্তর দিয়ে ডাকতে পারছি কি না।

সবশেষের কথা, এসব বেশি না ভেবে শিশুর মত সরল অকপট নিষ্ঠায় 'মা' 'মা' মন্ত্র জপ করতে পারলে তাই সব-কিছু বিপদ-আপদ থেকে আমাদের রক্ষা করে অভীষ্ট পথে নিয়ে চলবে—যদি আমরা শান্ত থাকি, থাকি ধৈর্য ধরে।

সাধনার জন্য চাই ধৈর্য, অধ্যবসায়, সহ্যগুণ, ইচ্ছাশক্তির অবিচল প্রয়োগ, আর সবচেয়ে অনিবার্যরূপে ভগবৎ-কৃপার উপরে অটুট ও পরিপূর্ণ ভরসা।

—শ্রীমা

ভবিষ্যতের কবিতা

শ্রীঅরবিন্দ

দশম অধ্যায়

ইংরাজী কাব্যের ধারা (২)

এলিজাবেথীয় যুগের ইংরাজী কাব্যের অনেক সৃষ্টিই সুন্দর, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বলিষ্ঠ সৃষ্টিও। কিন্তু তাই বলে আমরা তার এক-একটি পংক্তি, তার এক একটি বাক্যাংশ এবং চিত্রকল্পের সৌন্দর্যে বিভোর না হয়ে, কিংবা একটা অখণ্ড সংগীতের টুকরো-টুকরো অংশে বা কাব্যিক সমৃদ্ধি ও শক্তির বিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তিতে মশগুল না হয়ে—অর্থাৎ তার খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টিপাত না করে, বরং তাকে যদি সামগ্রিকভাবে একটা নিটোল শিল্পসৃষ্টি রূপে বিচার করি, তাহলে দেখতে পাব, ইংরাজী কাব্যের এই সমৃদ্ধতম যুগটিও ত্রুটি ও ব্যর্থতার একটি সুস্পষ্ট ছাপ বহন করে। মুহূর্তের জন্যেও সামগ্রিকভাবে এই যুগটিকে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে চমৎকারিত্বের পরাকাষ্ঠারূপে গ্রীক ও রোমীয় কাব্যের মহান্ পর্বগুলির পাশে বসান যায় না। এছাড়াও, কিন্তু, কাব্যের ধারায় যেসব কালপর্ব প্রাণশক্তিতে মূলত এ-যুগের চেয়ে ক্ষীণ, তাদের সঙ্গে তুলনায়ও রসগত আবেদনে এবং উৎকর্ষে এই যুগটির ঘাটতি রয়েছে। এ-যুগের রচনার অর্থগৌরব খুব বেশি নেই; এবং তার বিপুল প্রাণস্রোতে যদি-বা গতি থাকে, তবু আত্মার শাশ্বত পূর্ণতা তার নেই, আবার তার আত্মার পূর্ণতা যেটুকু-বা আছে, তার অঙ্গ সৌষ্ঠব সেটুকুও নেই। শিল্পসৃষ্টির মহান্ যাদুকর শেক্সপীয়র জীবনের অনবদ্য কাব্য-রূপায়ণ সাধন করে এবং তাঁর কাব্যের যাদুশক্তি দিয়ে এই সাধারণ ঘাটতিটুকুকে ঢেকে রেখেছেন। যে যুগকে তিনি নিজের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছেন তা তাঁরই উপস্থিতির দ্বারা মহিমান্বিত হয়েছে। আর যাঁরা তাঁর কাছাকাছি ছিলেন, তাঁদের ম্লানতর মূর্তিগুলি তাঁরই খ্যাতি ও জ্যোতির আভায় আলোকিত হয়েছে। তাতে তাঁরা নিজেরা যা, তার চেয়েও বেশি ঐশ্বর্যবান্ বলে প্রতিভাত হয়েছেন। শেক্সপীয়র হলেন এযুগের ব্যতিক্রম, তিনি নিজেই যেন কবিশক্তির এক বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল। সমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনার ধরাছোঁয়ার বাইরে তিনি; তার কারণ অবশ্য এ নয় যে, এই সূর্যে বড়গোছের কলঙ্ক নেই, তার কারণ বরং এই যে, তাঁকে যখনি সামগ্রিকভাবে দেখি, তখনি এসব কলঙ্ক তাঁর জ্যোতির মহিমায় কোথায় মিলিয়ে যায়! স্পেন্সার ও মার্লো উচ্চাঙ্গের কবি, একদিকে একটি চূড়ান্ত ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বড়। কিন্তু এ যুগের আর যাঁরা আছেন তাঁদের উচ্চ মর্যাদার মূল কারণ এ নয় যে, তাঁদের প্রতিভা উচ্চস্তরের ছিল, বরং তার কারণ এই বলতে পারি যে, এ-যুগের সাধারণ ঊর্ধ্বায়নী শক্তিই তাঁদের তুলে ধরেছিল। আর এই শক্তির অনেক দোষ, অনেক ত্রুটি এবং গুরুত্বপূর্ণ সীমাও ছিল যাকে তাঁদের সৃষ্টি এড়িয়ে না গিয়ে বরং বাড়িয়েই তোলে। ইংরাজী কাব্যের এই স্বর্ণযুগের সোনাটুকু দিয়ে প্রায়ই অতি সুন্দর সমৃদ্ধ কারুকার্য ফলানো হয়েছে, কিন্তু সবটা মিলিয়ে একটি নিটোল পূর্ণাঙ্গ শিল্পবস্তু তৈরী হয়েছে খুবই কম; এই সোনাটুকু অনবরতই খাদের পিণ্ডে হারিয়ে গেছে, এবং সামগ্রিকভাবে সেখানে উপরে-উপরে যত স্বর্ণরেণু ছড়ান আছে, তত মানবাত্মার গভীরতর হিরণ্যমূর্তির প্রকাশ হয়নি।

এলিজাবেথীয় যুগের সৃষ্টির এই ত্রুটি বিশেষ করে দৃশ্যমান্ হয়ে উঠেছে তার সেই অংশে, যেটাকে এর মহত্ত্বের প্রধান কারণ বলে বড়াই করা হয়, অর্থাৎ তার নাট্য-

সাহিত্যে। শেক্‌স্‌পীয়র ও মার্লোকে আলাদা করে দেখা যেতে পারে; কিন্তু এ যুগের অবশিষ্ট নাট্যসৃষ্টির সাধনা যত জোরদার, তার সিদ্ধি তত মহৎ ও খাঁটি নয়। জীবনের তার এত যে প্রাণোচ্ছল উপস্থাপনা, তাতেও তো এই সৃষ্টি জীবন্ত হয়ে উঠেনি। এই সৃষ্টি একান্তই নিষ্প্রাণ, অথবা, শ্রীযুক্ত কাজিন্সের কথায় বলা যায়, এই সৃষ্টি গ্রন্থাগারে ধূলি-চাপা অমরত্বকেই শুধু বজায় রেখেছে। অতি সাম্প্রতিককালে পণ্ডিত ও সমালোচকরা এই নাট্য-সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং কেউ-কেউ আবার তার প্রশংসায় পঞ্চমুখও হয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'তিন জন বিখ্যাত লেখক তাকে গ্রন্থগারের এই ধূলি-চাপা অমরত্বই দিয়েছেন। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, এই নাট্য-সৃষ্টির কোন গুণই ছিল না, বরং বলা যায় এক দিয়ে কতকগুলি খুব আকর্ষণীয় গুণই তার ছিল। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারদের মধ্যে প্রত্যয়-দৃঢ় এবং প্রচণ্ড গুণপনা ছিল, এবং কারো-কারো মধ্যে সত্যিকারের প্রতিভাও ছিল; তাঁরা এমন একটি যুগের ভাষা ব্যবহার করতে পারতেন, যে যুগে সাহিত্যিক ভাষার শক্তি সকলেরই আয়ত্তে ছিল, এবং লোকে ভাষার ব্যবহার করত ভাবপ্রকাশের একটি সম্পূর্ণ নতুন ও সমৃদ্ধ মাধ্যম হিসাবে, ব্যবহার করত অকৃপণ-ভাবে, কৌতূহলের সঙ্গে, ভাষার অভিনব প্রকাশসামর্থ্যে মুগ্ধ হয়ে। নাট্যিক রূপবন্ধের প্রথম কতকগুলি উপকরণ, নাটুকে ধাত এবং তার কয়েকটি প্রাথমিক গুণ,—যাদের কল্যাণে নাট্যসৃষ্টি সম্ভব হয়ে উঠে,—সে যুগের সাহিত্যিক ভাবধারার মধ্যে ছিল, এবং সে যুগের নাট্যকারেরা সকলেই কম-বেশি পরিমাণে এগুলি আয়ত্ত করেছিলেন এবং এ-গুলিকে ব্যবহারও করতে পারতেন। প্রাণময় স্তরের সৃষ্টির একটা বিশেষ সামর্থ্য, খুব স্বচ্ছন্দে প্রচুর ঘটনা ও গতিসৃষ্টির ক্ষমতা এবং উচ্ছ্বসিত সংলাপ রচনার খুব বেশি শক্তি তাঁদের ছিল। আর ছিল গদ্য এবং পদ্য উভয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করার শক্তি এবং মঞ্চের উপরে সক্রিয়ভাবে বিচরণশীল ও নিপুণভাবে নির্মিত মানবীয় মূর্তিগুলির মুখে জীবনাবেগের ভাষা বসিয়ে দেবার সহজাত দক্ষতা। সেটা সম্পূর্ণস্বাভাবিক-করবার ক্ষমতা তাঁদের যদি না-ও থেকে থাকে তবু সেই সময়ের মত অন্ততঃ তাঁদের সৃষ্ট সেই মানবীয় মূর্তিগুলিকে দেখে জীবন্ত বলেই ভুল হত,—সেই বিভ্রম সৃষ্টির ক্ষমতা অন্ততঃ তাঁদের ছিল। এবং জীবনের ও আচরণের একটা আধা-কাল্পনিক আধা বাস্তব উপস্থাপনার প্রবল প্রবণতা তাঁদের মধ্যে স্পষ্টতঃই ছিল। বিশেষতঃ, তখন এমন একটা সময় ছিল যখন জীবন, মানুষ ও কর্মসম্বন্ধে একটা জীবন্ত আগ্রহ দেখা দিয়েছিল,—জীবনধারণ, অনুভব ও মননের শুধু প্রাণিক ক্রিয়ার জয়যাত্রা, আর তার বিস্ময় ও আবেদনের ব্যাপারে তখন নতুন করে কৌতূহল দেখা দিয়েছিল। এবং এ-যুগের নাট্যকাবদের সৃষ্টি এই সজীবতা ও এই জীবন রসে ভরা। অনেকে মনে করতে পারেন, মহৎ নাট্যকাব্য সৃষ্টির পক্ষে এসবই হল একেবারে যথেষ্ট। এবং নিশ্চয়ই, এসবের অতিরিক্ত আর কিছুর দরকার যদি আমাদের না-থাকে তাহলে আমরা এলিজাবেথীয় যুগের নাটককে একটি মুখ্য স্থান দেব, হয়তো, গ্রীক এবং অন্য যে-কোন নাটকের 'চেয়েও উচ্চতর স্থান দেব। কিন্তু এসব জিনিস যথেষ্ট হল শুধু সেইসব নাটক রচনার পক্ষে যেগুলি তাদের কালে বেঁচে থাকবে শুধু রঙ্গমঞ্চে এবং গ্রন্থাগারে। এসব জিনিস শুধু নিজেরাই মহৎ নাট্যসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার জন্যে আরো কিছু দরকার, যা আমরা পাই শেক্‌স্‌পীয়র, রেসিন, কর্নেই, মলেয়ার এবং ক্যাল্ডারনে, আর পাই মহান্ গ্রীকদের মধ্যে, সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র-মার্লো ছাড়া এলিজাবেথীয় যুগের অন্যান্যরা ছিলেন শক্তিশালী লেখক এবং নাটুকে-ব্যক্তি, তাঁরা সত্যিকারের প্রেরণাধন্য নাট্যকবি এবং স্রষ্টা নন।

নাট্যকাব্য কেবল জীবন, কর্ম এবং প্রবৃত্তির উপস্থাপনা নিয়েই বাঁচতে পারে না, তাতে এসবের চিত্রণ যতই খাঁটি, প্রাণপূর্ণ এবং অপর্যাপ্ত হোক না কেন। এর চেয়েও মহত্তর একটা কিছু হল তার লক্ষ্য, খুবই কঠোরতর হল তার সাফল্যের সর্ত। সূচনাতেই তার চাই জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যাকারী একটি কবি-দৃষ্টি, এইটাই হবে তার সৃষ্টির উৎস বা কেন্দ্রস্বরূপ। সেই দৃষ্টিতে থাকবে জীবন এবং মানবসত্তা সম্পর্কে একটা ব্যক্ত বা অব্যক্ত ধারণা। আর এর যেটা বাহ্য আধার, সেই প্রাণময় উপস্থাপনাটি সব দিকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে গড়ে উঠবে এই ব্যাখ্যাকারী কবি-দৃষ্টি থেকেই,—সেটা স্বত:স্ফূর্ত সৃষ্টির প্রেরণায় হতে পারে, যেমন শেকস্‌পীয়রে হয়েছে, কিংবা একটি বোধিলব্ধ

শৈল্পিক সংকল্পের চাপেও হতে পারে, যেমন গ্রীকদের ক্ষেত্রে হয়েছে। উপস্থাপনার মধ্যে এই ব্যাখ্যাকারী কবি-দৃষ্টি ও জীবন সম্পর্কে কবির ধারণা দেখে মনে হবে যে, সেটা মানবাত্মার বিশেষ-বিশেষ প্রাণপ্রকৃতি অথবা তার ব্যষ্টিগত প্রতিনিধিদের আন্তর জীবন থেকে জন্ম নিয়ে সংলাপের ক্রমিক অগ্রগতির মাধ্যমে ঘটনার ক্রমিক অভিব্যক্তিতে পরিণতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে সংলাপ হল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, কারণ কবি এরই মাধ্যমে আত্মিক ক্রিয়াকে প্রকাশ করে থাকেন। আর বাহ্যক্রিয়া ও ঘটনা হল দ্বিতীয় মাধ্যম; সেটিও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ততটা অপরিহার্য নয়; এমনকি যেটুকু না হলেই নয়, সেইটুকুতে তাকে কমিয়ে আনা যেতে পারে। বাহ্য ঘটনার গুরুত্ব শুধু এই জন্যে যে, তার সাহায্যেই কবি আমাদের কাছে আন্তর ক্রিয়ার পরিণামকে দৃশ্য ও প্রত্যক্ষ করে তোলেন। খুব মহৎ নাট্যসৃষ্টির সবকটিতেই সত্যিকার গতি ও পরিণতি হল বস্তুতঃ মনস্তাত্ত্বিক, এবং বাহ্যক্রিয়া—এমনকি যখন তা উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে তখনো—এবং তার চূড়ান্ত পরিণাম —এমনকি যদি তা সোচ্চার ও প্রচণ্ড হয় তাহলেও—হল মনস্তাত্ত্বিক ঘটনারই প্রতীক, অথবা তারই চরম পরিণতির অবস্থা। সর্বশেষে, এই সব কিছুকেই একটা ঘনপিনদ্ধ নাটকীয় রূপবন্ধের মধ্যে, পরস্পরনির্ভর সম্পর্কগুলির সার্থক গ্রন্থনার মধ্যে ঢালতে হবে। এই সম্পর্কগুলি হল আত্মার সঙ্গে আত্মার, কথার সঙ্গে কথার, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্পর্ক। এদের গ্রন্থনা যত ঘনবদ্ধ, যত অপরিহার্য হবে, ততই ভাল; কারণ এইভাবেই সমগ্র সৃষ্টির সত্য আমাদের কাছে ধরা দেয়। এবং যদি জিজ্ঞাসা কর, এক কথায়, এই সমগ্র নাট্যসৃষ্টির মূল তাৎপর্যটা কি, তাহলে আমার মনে হয়, আমরা বলতে পারি, মানবাত্মার জীবনে বিশ্বব্যাপী কর্মযজ্ঞের একটি যে অংশ রূপায়িত হয়, কবি তাকে প্রত্যক্ষ-দর্শন করেন—কবি কর্তৃক জীবনের এই কর্মময় রূপদর্শন, এক দিক দিয়ে ব্যাপকতর অর্থে এইটাই হল নাটক। এই কর্ম-দৃষ্টির চরমবিন্দুতে এসে নাটক হয়ে উঠে এস্‌কিলীয় তত্ত্বের কাব্যিক রূপায়ণ বা দৃশ্যরূপ; সেই তত্ত্বটি হল,—'মানুষকে তার কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে।' এটি যেমন আন্তর অর্থে সত্য, তেমনি বাহ্য অর্থে। এর যে অর্থ, সেটা যেমন কষ্ট করে বুঝে নিতে হয়, তেমনি সহজে সাদা চোখেও ধরা পড়ে—সেই কর্মফল জিনিসটা মানসিক ব্যাপারে ঘটুক বা প্রাণিক ব্যাপারেই ফুটে উঠুক, এই তত্ত্বটি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক দুঃখ ও বিপর্যয়ের মাধ্যমে, কিংবা এটা লাভ করুক একটা হাস্যমধুর পরিণতি অথবা এটা হারিয়ে যাক সৌন্দর্য ও আনন্দের মধ্যে, নাটকে জীবনের উপস্থাপনা বিয়োগান্তক হোক, মিলনান্তক হোক, কিংবা বিয়োগ-মিলনান্তক বা হাস্যরসাত্মক যা-ই হোক না কেন। এসব সর্ত পূরণ করা খুবই শক্ত, এবং সেই জন্যেই মহৎ নাট্যকার-দের সংখ্যা পৃথিবীতে এত কম,—সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে এঁদের সংখ্যা কোন রকমে ডজন-খানিকের বেশি হবে না। নাট্যকাব্যের বিঘ্নসঙ্কুল ক্রমবিকাশকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া গীতিকাব্যের চেয়ে কিংবা আখ্যান কাব্যের চেয়ে চিরকালই বেশি দুরূহ; কারণ গীতিকবিতা হল কাব্যের নিজস্ব সহজাত প্রকাশ, আর আখ্যানকাব্য তার সহজতর পরিবৃদ্ধি; কিন্তু নাটক হল এক দুরূহতর শিল্পসাধনা।

নাট্যকাব্যের এক-একটি যুগে এই সমস্ত জটিল সর্ত কতখানি উপলব্ধি করা হয়েছিল অথবা বোধিলব্ধ প্রেরণায় সেগুলিকে কতখানি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল তার দ্বারাই সেই যুগের মহত্ত্বের পরিমাপ করা যেতে পারে। কিন্তু এলিজাবেথীয় যুগে বিপুল নাট্যসৃষ্টির মধ্যে এর উপলব্ধি আদৌ নেই, এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ যদি আদৌ হয়ে থাকে, তবে তা-ও হয়েছে শুধু বিরল-ক্ষেত্রে, ত্রুটিপূর্ণভাবে, এবং সেটা কাকতালীয় যোগাযোগে মাত্র। মনে হয় শেক্‌স্‌পীয়র নিজে এই সর্তগুলিকে দিব্য রূপদান করে-ছিলেন এবং শৈল্পিক বুদ্ধি দিয়ে সেগুলিকে অধিগত না করে বরং প্রতিভার যে অগ্নিশিখায় জীবনের উপাদানকে গলিয়ে শিল্পের ছাঁচে ঢালা হয়, তার মধ্যে সেগুলিকে ধারণ করে-ছিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট নাট্যকারদের মধ্যে সাধারণতঃ জীবনরহস্যের ব্যাখ্যাকারী কবিদৃষ্টির কোন আলো কিংবা নাটক সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। তাঁদের বিয়োগান্তক এবং মিলনান্তক উভয়বিধ নাটকই এত বহির্মুখী যে পীড়া-দায়ক মনে হয়; তাঁদের নাটক জীবনকে তুলে ধরে কিন্তু আদৌ ব্যাখ্যা করে না; এই নাটক হল ঘটনার প্রচণ্ডতার মাধ্যমে সামাজিক রীতি-নীতি, প্রবৃত্তি ও আবেগ এবং জীবনের বাহ্য উপস্থাপনামাত্র; এর সংলাপের যে ভাষা তা-ও কানের ভিতর দিয়ে মরমে গিয়ে পৌঁছায় না, তার

গতি বাইরের দিকে। সব মিলিয়ে গোটা ব্যাপারটাই একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ যুগের বিয়োগান্তক নাটকগুলি হল যুক্তিহীন ; মিলনান্তক নাটকগুলির না আছে ভাবের ব্যাপ্তি, না আছে ভাবের সূক্ষ্মতা ; মিলনান্তক ও বিয়োগান্তক নাটককে আবার মিশ্রিতও করা হয়েছে, অথচ শেক্‌স্‌পীর বিয়োগান্তক ও মিলনান্তক নাটককে এক সঙ্গে মিশিয়ে তাদের মধ্যে যেমন একটি শৈল্পিক যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছেন, তেমন যোগসূত্রও অন্য নাট্যকারদের মিশ্রণের মধ্যে নেই। ফলে দুইয়ের সহ-অবস্থানের কোন যৌক্তিকতাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবন্ত সত্তার মত তাদের পারস্পরিক কর্ম করে চলে না, সেগুলি হল মানুষের সব বাহ্য মূর্তি, জনবহুল রঙ্গমঞ্চে তারা নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে বেড়াচ্ছে, তারা শুধু জীবনতরঙ্গের তোলপাড় মাত্র। আর, সেসব নাটকের রূপবন্ধও শুধু সংলাপ ও ঘটনার[১] পরম্পরা ছাড়া আর বেশি কিছু নয়। এমন রূপবন্ধ তো সেই সব গল্প কথায় প্রায়ই চোখে পড়ে যেগুলিতে শুধু ক্রমবর্ধমান বেদনাদায়ক কিংবা সুখকর পরিণতি দেখান হয়, আর সেই পরিণতিও আসে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে আসতে বাধ্য বলে নয়, বরং গল্পকে একটা পরিসমাপ্তির মধ্যে মুক্তি দিতে হবে বলে কিংবা গল্পটি বিয়োগান্তক হলে তাকে একটা প্রচণ্ড সশব্দ বিস্ফোরণের মুখে এসে পৌঁছাতে হবে বলে। তাঁদের মূলগত ঘাটতিগুলি পূরণের জন্যে এইসব কবিরা বাধ্য হয়ে ঘটনা ও পরিস্থিতির স্তূপ জড় করেছেন এবং উদ্দাম ও প্রায়ই স্থূলভাবে পল্লবিত উক্তি ও অতিরঞ্জিত আবেগ দিয়ে আমাদের বিদ্ধ করেছেন। এটি তাঁদের করতে হয়েছে জীবনের আবেগকে বারে-বারে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত নানাখণ্ডে ছিন্নভিন্ন করে, প্রায় সর্বদাই আবেগের সুর অত্যাধিক চড়িয়ে এবং কতকগুলি দিক দিয়ে তাদের খুব বেশি কাজে লাগিয়ে। যে জীবনের উপস্থাপনায় তাঁদের শক্তি নিহিত রয়েছে, সেই জীবন সম্পর্কে একটা আগ্রহ তাঁরা আমাদের উপরে চাপিয়ে দিতে চান, আমাদের ভুলিয়ে নেবার জন্যে তাঁরা স্তূপাকারে জমাতে চান আকর্ষণীয়, কৌতুকপ্রদ চমকপ্রদ এবং ভয়াবহ জিনিস সব। তাঁরা যেহেতু উচ্চতর বুদ্ধিগত ও কল্পনাময় আবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের চিত্তজয় করতে পারেন না, যেহেতু তাঁরা আমাদের মন পেতে চান স্নায়ুমণ্ডলীর শিহরণ এবং অধস্তন আবেগময় সত্তার মধ্য দিয়ে, এবং এতে তাঁরা উল্লেখজনকভাবে সাফল্যও লাভ করেন। তাঁদের নাটকে ঘটনার ক্রমপরিণতি কাব্যগুণে নয়, মঞ্চসাফল্যের ফলে আবেদন সৃষ্টি করে ; তার ভাব ও মনস্তত্ত্ব নাটকীয় নয়, অতি নাটকীয়। তাদের পক্ষে কোন মহৎ কাব্য-সম্পদ দিয়েও এসব মূলীভূত নাটকীয় ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয়নি, কারণ তাঁদের পদ্যের মধ্যে কাব্যের আত্মা যতটা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে কাব্যের গঠনগত কতকগুলি বাহ্যগুণ ও বাইরের ঠাট্। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে, যেমন পীল এবং ওয়েব্‌স্টারের কিছু পংক্তিতে এবং অনুচ্ছেদে। কিছু কাব্যিক স্পর্শ দিয়ে, কিন্তু কবির মানস প্রকৃতির মধ্যে রূপান্তরকারী কোন দৃষ্টি কিংবা কোন বলিষ্ঠ পূর্ণায়নী শক্তি ব্যতিরেকে, জীবনের উপস্থাপনাই হল তাঁদের সৃষ্টির সাধারণ চারিত্র্য। এই সমস্ত দোষ ত্রুটির উপরে জোর দেওয়ার প্রয়োজন আছে, কেননা এই সব কবির নির্বিচার প্রশংসা খাঁটি নাট্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথ শিল্পগত দৃষ্টিভঙ্গিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে কিংবা তাকে একেবারে বাদ দিয়ে দিতে সাহায্য করে। এবং নাট্যিক রূপবন্ধের উত্তরকালের সাধনায় মহাশক্তিধর কবিরাও যে ব্যর্থ হয়েছেন তার আসল কারণই হল এই আকর্ষণীয় মিথ্যাচারের অনুকরণ। ব্রাউনিং-এর মত স্রষ্টা,—এমন একটি মন যার সত্যকার নাটকীয় প্রবণতা ছিল,—তিনিও যে প্রথম শ্রেণীর নাটক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সফল হতে পারেননি, তার কারণ-ব্যাখ্যা এখানেই পাই।

এলিজাবেথীয় যুগের ছোট নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র মার্লোই তাঁর সঙ্গীদের থেকে দূরে সরে আছেন, সেটা তিনি পেরেছেন শুধু তাঁর বলিষ্ঠ এবং সমৃদ্ধ কাব্যিক মনোভাবের জন্যে নয়, পরন্তু এইজন্যে যে তিনি জানেন তাঁকে কি করতে হবে। একমাত্র তাঁরই স্পষ্টভাবে অধিগত কিছু নাট্যিক বোধ আছে। আপন শৈল্পিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন, তাঁর সম্বন্ধে এইটাই শেষ কথা নয় ; এছাড়া তাঁর উদ্দেশ্যটিও হল নাটকীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে উচ্চতরস্তরের

১। বেন জনসন হলেন ব্যতিক্রম, তাঁর সংগঠনের বোধ আছে, কিন্তু তাঁর রূপায়ণ হল শুষ্কভার ও প্রেরণাহীন, এ হল খুব বেশি খুঁৎখুঁতে কারিগরের রচনা, সৃজনশীল শিল্পীর সৃষ্টি নয়।

একটি যথার্থ শিল্পসঙ্গত উদ্দেশ্য। তিনি জানেন কর্মরত মানবাত্মাই হল তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু এবং কর্মই হল সেই বিষয়বস্তুর মূল শক্তি। যে সঙ্কল্পকে মানুষ জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে চলেছে, অহমিকায় আসুরিক সেই সংকল্প জীবনে জয়লাভ করেও মহাকালের কাছে শেষ পর্যন্ত হেরে যাচ্ছে অথবা এই সংকল্পের প্রচণ্ডতা যেসব শক্তিকে তার প্রতিপক্ষে খেলাব জন্যে নামিয়ে আনে তাদের সামনে সে নিজেকে ভেঙে চুরমার কবে দিচ্ছে। এই মানবীয় সংকল্পকে নিয়েই তিনি নাট্যসৃষ্টির চেষ্টা করেন। এটা নিশ্চয়ই বিয়োগান্তক নাটক রচনার একটি মহান্ এবং উপযুক্ত বিষয়, আর তাঁর অতি বর্ণাঢ্য এবং অতি ঋজু রচনাশৈলী ও ছন্দঃস্পন্দন এই বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করার পক্ষে বেশ উপযোগী। দুঃখজনকভাবে মার্লোর মধ্যে নাটাক বোধ থাকা সত্ত্বেও নাটকীয় প্রযুক্তির কোন বাস্তব ক্ষমতা ছিল না। তাঁর নির্মিত মূর্তিগুলির মধ্যে শেষপর্যন্ত প্রাণসঞ্চার করতে তিনি পারেন না; ইংরাজী কাব্যে ও কথাসাহিত্যে বহু প্রচলিত বাহ্যরীতিতে তিনি চরিত্রকে গঠন করেন, কিন্তু তাকে আপনা থেকে বিকশিত করে তোলেন না; তাকে পটের ছবি করে রাখেন, কিন্তু জীবনে সক্রিয় করে তোলেন না; তার উপরে বাইরে থেকে রং চাপান কিংবা বাইরে থেকে কুঁদে তার চেহারাটি বের করেন, কিন্তু তাকে ভিতর থেকে সৃষ্টি করেন না; অথচ ভিতর থেকে সৃষ্টি করাই হল কাব্যরচনার বা অন্ততঃ নাট্যরচনার একমাত্র সত্যকার পদ্ধতি। এমনকি, গঠনকার্যের পক্ষেও যেসব কলাকৌশল অপরিহার্য, তাও তাঁর আয়ত্তে নেই; তাঁর একটিমাত্র বিয়োগান্ত নাটকে তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে এবং তাদের আদ্যন্ত ক্রিয়াকলাপকে জীবন্তভাবে একত্র সংগ্রথিত করেছেন, এবং যদিও সেটা একটা বলিষ্ঠ রচনা তবু সেটাতেও মহৎ সৃষ্টির সেই মহিমা তেমন নেই। এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চের তাগিদে লিখতে গিয়ে তাঁকেও এমন একটা ছাঁচ গ্রহণ করতে হয়েছে যার অতিমাত্রিক জটিলতা তার বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠ ঋজুতা এবং তাঁর প্রতিভার একমুখী তীব্রতার পক্ষে অনুপযুক্ত। এছাড়া, সেই যুগের অর্ধ সভ্য সামাজিকের মুখ চেয়ে নাটকরচনা করতে গিয়ে যে রুচি তাঁব উদ্দেশ্যের পক্ষে একান্তই প্রতিকূল এবং যাকে তাব উদ্দেশ্যের আওতায় আনার এবং তার সমস্তরে তুলে ধবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ নমনীয়তা তাঁর ছিল না, সেই রুচির কাছে তাঁকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। বস্তুতঃ, মার্লো নাট্যকারের প্রতিভা নিয়ে জন্মাননি; তাঁব আসল প্রতিভা ছিল গীতিকাব্যিক, আখ্যানকাব্যিক এবং মহাকাব্যিক। নিজের জন্মলব্ধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ মার্লো একেবারে বিচ্ছিন্ন সব দৃশ্যে এবং অনুচ্ছেদে এবং, যেসব চরম মুহূর্তে গীতিকাব্যিক আর্তি এবং মহাকাব্যিক স্পর্শ নাটকের কাঠামোর মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে, সেই মুহূর্তগুলিতে, তাঁর কবি মনোভাবকে প্রকাশ করতে পেরেছেন।

শেক্‌স্‌পীয়রের যুগে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন নাট্যবন্ধেব দিকে এবং তখন পরিস্থিতিও নাট্যিক প্রতিভার অনুকূল ছিল। কিন্তু একমাত্র শেক্‌স্‌পীয়রই তাঁর নিজের যুগে,—এবং শুধু নিজের যুগে কেন,—সমগ্র ইংরাজী সাহিত্যেই একা দাঁড়িয়ে আছেন সত্যিকার মহান্ ও অকৃত্রিম নাট্যিক কবিরূপে; এদিক থেকে নিঃসঙ্গ হলেও তিনি একাই একশ'। তাঁর ভাব, ভঙ্গি এবং গুণগত উৎকর্ষেও সম্পূর্ণ অদ্বিতীয় হয়ে আছেন তিনি। কারণ তাঁর সঙ্গে তাঁর সমসাময়িকদের সাদৃশ্য তো শুধু বাইরের; তাঁদেরও একই বাহ্য রূপবন্ধ এবং একই স্থূল উপাদান রয়েছে, কিন্তু নেই সেই অভ্যন্তরীণ নাট্যিক পদ্ধতি যার সাহায্যে শেক্‌স্‌পীয়র সেই রূপবন্ধ ও সেই উপাদানকে পরিবর্তিত করে তাদের একটা সম্পূর্ণ অন্য তাৎপর্য এবং গুরুত্ব দান করেছেন এবং উত্তরকালের রোমান্টিক নাটক যদিও শেক্‌স্‌পীয়বের মনের ভাব এবং তুলির টান অনুকরণ করতে খুবই চেষ্টা করেছিল, তবু তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ভিন্ন এক প্রকৃতির কবিচিত্তের দ্বারা, এবং সৃষ্টির বাহ্য পদ্ধতির সঙ্গে যদি আন্তর প্রক্রিয়া গুলিযে না ফেলি, তাহলে বলতে হবে তার আন্তর প্রক্রিয়াও ছিল সত্যিই আলাদা। এই নাটক জীবনকে অধিকার করে, তার স্বাভাবিক পরিণাম সব একত্র সংগ্রথিত করে এবং সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকভাবে তাদের উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য এবং অনবদ্য করে তুলতে চায়। শেক্‌স্‌পীয়র কিন্তু তাঁর গোড়ার দিকের অনুকরণমূলক রচনাগুলি ছাড়া অথবা যখন তাঁর মধ্যে সত্যিকার কবি প্রেরণা ছিল না তখনকার দু'একটি বিরলদৃষ্টান্ত ছাড়া, কখনো এরকমটি করেন না। জীবনকে জবর-দখল করার এবং তাকে কল্পনার ফুলঝুরিতে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন তাঁর হয় না কারণ

জীবনই তাঁর ধ্যানরূপের মাধ্যমে নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করার জন্যে তাঁকে দখল করে নিয়েছে, তিনি নিজে জীবনের হৃৎ-কেন্দ্রে আত্মসমাহিত হয়ে বসে আছেন এবং তারই প্রবেগেউৎসারিতকরে চলেছেনকত সবসত্তা,কত সব চরিত্র। যে পৃথিবী থেকে তিনি তাঁর সৃষ্টির ইঙ্গিত সব গ্রহণ করে থাকেন, সেই পৃথিবীর মানুষের মতই বাস্তব হল তার সৃষ্ট জগতের এইসব সত্তা এবং চরিত্র। কি বিপুল বৈচিত্র্য তাঁর সৃষ্টির মধ্যে! যেন কোন্ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে—জীবন্ত সব চিত্রকল্প বাঁধ ভেঙে উদ্দাম গতিতে বেরিয়ে আসছে প্রকাশক্ষম বাণী ও অটুট গতিচ্ছন্দের বহুব সমুদ্রস্রোতে ভর করে। বস্তুতঃ মনে হয়, তাঁব নাটকীয় পদ্ধতির অন্য কোন বুদ্ধিগত উদ্দেশ্য, কোন রসতাত্ত্বিক অভিপ্রায় বা আধাত্মিক রহস্যই নেই: সাধারণভাবে তার একমাত্র ব্রতই হল কবিদৃষ্টি দিয়ে জীবনের বিচিত্র রূপদর্শনের আনন্দ উপভোগ করা এবং এমন এক প্রাণময় স্তরের সৃষ্টির আনন্দ আস্বাদন করা প্রাণশক্তি ছাড়া যার অন্য কোন কেন্দ্রই নেই, প্রাণের দুর্লক্ষ্য ক্রিয়া থেকে স্বতঃউৎসারিত সামঞ্জস্য বিধান ছাড়া জীবনের বিচিত্ররূপের মধ্যে আব কোন সামঞ্জস্যসূত্রেই নেই, মানুষের মধ্যে এবং মানুষেব দৃষ্টির সম্মুখে ক্রিয়ারত প্রকৃতির অন্তর্নিহিত প্রাণময় পুরুষের ঐক্য এবং মানবতার ঐক্য ছাড়া অন্য কোন ঐক্যই নেই। প্রাণপুরুষের এই বিশুদ্ধ সৃষ্টিশীল আনন্দেরই নাম হল শেক্‌স্‌পীয়র; এর বাইরে সেই যুগে সর্বত্র এই আনন্দই তাঁর মধ্যে অবতীর্ণ হয় কবিদৃষ্টিতে আত্মদর্শনের আনন্দ লাভ করার জন্যে।

এখন শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভার সীমার কথা বলা যেতে পারে। প্রতিভার সামর্থ্যই বলি, কি সীমাই বলি—সবই জন্ম নিয়েছে যে শক্তি তাকে কাব্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে তার এই বিশেষ প্রকৃতি থেকে। প্রাথমিক পরিচয়ে তিনি একজন শিল্পী নন, কবির্মনীষী কিংবা সেই ধরনের অন্য কিছুও নন, বরং তিনি হলেন প্রাণময় স্তরের একজন মহান্ স্রষ্টা, এবং গভীরতরভাবে, যদিও সুস্পষ্ট সীমার মধ্যেই, তিনি হলেন জীবনের দ্রষ্টা। তাঁর শিল্পই হল জীবন—যে জীবন তার নিজের উৎসারে এবং উত্তেজনায় নিজেই নিজের রূপ রচনা করে চলেছে, সেটা কোন রকমের সামঞ্জস্যের মধ্যে, নয়,—কারণ কোন সামঞ্জস্যই এখানে নেই,—কোন সুচারু সুষমার মধ্যেও নয়; তবু জীবনের এই রূপ রচনার মধ্যে তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই আছে অতি উত্তম পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে একটার-পর-একটা জীবনচিত্রের অনুক্রম; ভিড় করে এসেছে সেসব ছবি, তবু তার বিন্যাস কত সার্থক; দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। আর এই জীবন চিত্রের এলোমেলো বহুমুখী গতির মধ্যেও রয়েছে যেন একটা অতি অন্তরঙ্গ ছন্দঃপরিকল্পনা। কাব্যিক চিন্তাকে তিনি বিস্ময়কর ভাষায় প্রকাশ করেছেন; তবু তিনি চিন্তার জন্যেই চিন্তা করেন না, তাঁর চিন্তা জীবনের জন্যেই। তিনি নিজে জীবন সম্পর্কে ততটা চিন্তা করেন না, যতটা জীবনই নিজে তাঁর মধ্যে শত মুখে, নানা ভাবাবেশে, নানা মুহূর্তে চিন্তা করে চলে। জীবনের এই চিন্তনে থাকে সূক্ষ্ম চিন্তাগত আবেদনের সমৃদ্ধ সমাহার, কিন্তু সেটা কোন সুস্পষ্ট বুদ্ধিগত দৃষ্টিভঙ্গির গোটা অঙ্ক মিলিযে নেবার জন্যে নয়, এই চিন্তাগত আবেদন এমন কোন সমুচ্চ শক্তির কাছেও নয় যা একটা আদর্শগত বা আধ্যাত্মিক সুফল প্রসব করতে পারে। মানবচরিত্রের যে বিকাশ তিনি দেখিয়েছেন আপন সীমার মধ্যে তার অবাধ শক্তি; কিন্তু যা তিনি দেখিয়েছেন তা হল বাহ্যচরিত্র, বাহ্যপ্রবৃত্তি এবং বাহ্যক্রিয়ার মাধ্যমে দৃষ্ট মানবাত্মা, এ হল প্রাণময় স্তরের আত্মা; এ কিন্তু চিন্তার স্তরের আত্মাও নয়, গভীরতর হৃদ্‌গত আত্মাও নয় কিংবা মানবাত্মার কোন গহনতর সত্যও নয়। এইসব গভীরতর জিনিসের কিছু কিছু অবশ্য আমরা তাঁর সৃষ্টিতে পেয়েও যেতে পারি, কিন্তু যেটুকু পাই, সেটুকুও শুধু ছায়ার মাধ্যমেই; যেটুকু দেখি, সেটুকুও শুধু রঙিন কাঁচের মধ্যে আংশিক প্রতিবিম্ব মাত্র; এই প্রাপ্তি ঐ সব গভীরতর জিনিসের নিজস্ব ক্রিয়ার মধ্যে ঘটে না। তাঁর কবিদৃষ্টিতে এবং সেইজন্যে তাঁর কবি-মনোভাবেও শেক্‌স্‌পীয়র বস্তুতঃ কখনো জীবনের উর্ধ্বে উঠে যাননি কিংবা জীবনের নেপথ্যেও প্রবেশ করেননি; তিনি দেখেননি জীবন নিজের সীমা পেরিয়ে কোন্ অসীমের সাগরে গিযে মেশে, কিংবা কোন্ অদৃশ্য মহাশক্তি জীবনের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল রয়েছে। একবার তাঁর দু'টি কি তিনটি বিয়োগান্তক নাটকে তিনি এর জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয়; কিন্তু তাতে যেটুকু তিনি দেখতে পেয়েছেন তা হল কিছু প্রচণ্ড প্রাণশক্তির ক্রিয়া যাকে হয় তিনি জীবন্ত প্রতীকের মধ্যে বিন্যস্ত করেছেন, না

হয় মানুষের কর্মের অন্তরালে ব্যঞ্জিত করেছেন, যেমন 'ম্যাকবেথে' ; কখনো-বা যাকে শরীরী করেছেন, যেমন 'কিংলিয়রে',—এখানে তাঁর সৃষ্ট মানবচরিত্রগুলির যেদুর্দমনীয় জীবন তৃষ্ণা বিয়োগান্তক পরিণতি লাভ করেছে তার মধ্যে এটা ফুটে উঠেছে। যাই হোক, তাঁর নাটক অবশ্য শুধু বাহ্যক্রিয়ারই নাটক নয়, কারণ তার জীবনের উৎস রয়েছে ভিতরে, এবং এ জীবন আমাদের বাহ্যজীবনের চেয়ে গভীরতর। এ সেই 'বিরাট্' নয়, যে শুধু স্থূল রূপের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, এ হল 'হিরণ্যগর্ভ', স্বপ্ন দ্রষ্টা জ্যোতির্মানস, সে এই রূপজগতের মাধ্যমে তাদের অন্তরালে তার নিজেরই প্রতি-রূপ দেখবার জন্যে চেয়ে আছে। মহাতাপস মুনি বিশ্বামিত্রের বিকল্প জগৎসৃষ্টির পৌরাণিক কৌশলটি অন্য যে কোন কবির চেয়ে শেক্স্পীয়রই মানসিকভাবে সম্পন্ন করেছেন বেশি ; তাঁর কবিদৃষ্টির শক্তি একটি আলাদা শেক্স্পীয়রীয় জগৎই সৃষ্টি করেছে ; এবং এই জগতে বাস্তব উপাদান থাকলেও এ হল পূর্ণ অর্থেই একটি কল্পনার জগৎ, বিস্ময় ও মুক্ত প্রাণশক্তির জগৎ ; এটা জীবনের শুধু বাহ্য বাস্তবতার এমন জগৎ নয়, যেখানে, যা কিছু স্থূল ক্লিন্ন তা-ই অতি-শায়িত এবং তীব্র জীবনস্পন্দন লাভ করে, সৌন্দর্যের অতিবাস্তব লীলা, কৌতূহল এবং প্রাচুর্যের মধ্যে ফুটে ওঠে।

কাব্যের বিবর্তন সম্বন্ধে যে কোন দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের থাকুক না কেন, তাতে এটা লক্ষ্য করা দরকার যে, কোন্ সীমার মধ্যে শেক্স্পীয়র তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, কারণ তাতে আমরা নির্দেশ করতে পারব উন্নতির কোন্ বিন্দুতে তিনি পৌঁছাতে পেরেছিলেন। অবশ্য এটাও মনে রাখতে হবে যে, তাঁর সীমার জন্যে তাঁর সৃষ্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কিছু এসে যায় না। এবং এমনকি তার প্রত্যক্ষ ত্রুটি এবং স্খলনও তাঁকে ছোট করতে পারে না, কারণ—তাঁর তুলিকা-স্পর্শের মধ্যে শক্তির এমন এক অব্যভিচারী স্বর্গীয়তা রয়েছে যা এসব দোষত্রুটিকে উপেক্ষণীয় করে তোলে। এলিজাবেথীয় যুগের যে রূঢ়তা, হিংস্রতা এবং ব্যভিচার, তিনিও তার অংশীদার, তার চড়া সুর তিনি যতই নামিয়ে আনুন না কেন। তবে একটা শক্তির স্রোতের টানে এগুলির আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁর পরিকল্পনার সাধারণ বিরাটত্বের মধ্যে গিয়ে তারা পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। মাঝে মাঝে তাঁর স্খলন হয়েছে আধা-গদ্যময় পদ্যের সুদীর্ঘ বিস্তারে এবং আয়াসক্লিষ্ট অসুন্দর কাব্যিক অভিব্যক্তির খেয়ালখুশির মধ্যে। এসব কাব্যিক অভিব্যক্তি কখনো-কখনো হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর রকমে অসুন্দর। কিন্তু তবু সেগুলি যে সব সময়ে কবিশক্তির ব্যর্থতার জন্যে হয়নি, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তবু যে মহাকবি নাটকের সত্য সম্পর্কে বেশি যত্নবান এবং বাচনিক পারিপট্যের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যিনি প্রকাশভঙ্গির অন্তর্নিহিত শক্তির প্রবাহে চালিত হয়েছেন ; তাঁর পক্ষে এগুলি হল ইচ্ছাকৃত ত্রুটি। তাঁর ত্রুটিগুলি মেনে নিতে আমরা বাধ্য, সেগুলি অন্য কবির মধ্যে দেখলে আমাদের সমালোচনার বোধ তৎক্ষণাৎ নিন্দা করতে প্রত্যাখ্যান করতে তৎপর হয়ে উঠত কিন্তু শেক্স্পীয়রের ক্ষেত্রে সেগুলি তাঁর শক্তিরই অংশ বলে সেগুলিকে মেনে নিই, যেমন আমরা মেনে নেই মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড দোষত্রুটি সব। তাঁর সীমা বহুলাংশে তাঁর সামর্থ্যেরই সর্ত। তাঁর স্তাবকেরা তাঁকে যেমন দেখতে চান, নিশ্চয়ই সে-রকমের সমগ্র বিশ্বরহস্যের ব্যাখ্যাতা তিনি নন ; কারণ মানুষের যে প্রাণময় সত্তাকে তিনি প্রকাশ করেছেন, সেই প্রাণময় সত্তারও কিছু কিছু জিনিস তাঁর আয়ত্তের বাইরে থেকে গেছে ; কিন্তু এই ধরনের এবং এতখানি শক্তিসম্পন্ন একটি জীবনবীক্ষাকে তীব্রতম কাব্যিক অভিব্যক্তির এমন বিপুল উৎসারণের মধ্যে এমন বিস্ময়কর, এমন বিচিত্র এবং চির-জীবন্ত রূপদান করা কবিপ্রতিভার একটি অনুপম কীর্তি। ভাবীকাল আমাদের জন্যে নাটকীয় রূপবন্ধের এমন এক উচ্চতর গভীরতর লক্ষ্য, এমনকি প্রাণময় স্তরেরই আরো গভীর সূক্ষ্ম লক্ষ্য আবিষ্কার করতে পারে যা কোন শেক্স্পীয়র কোন কালে ধারণাও করতে পারেননি ; কিন্তু সেটা যতদিন না শেক্স্পীয়রের সমান শক্তি, বিষয়ের উপর সমান দখল এবং দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ পূর্ণতার সঙ্গে এবং প্রকাশশীল বাণীর সমপরিমাণ তীব্রতার সঙ্গে করা হচ্ছে, ততদিন তিনি তাঁর সার্বভৌম আসনটি ছাড়ছেন না। তাঁর সম্পর্কে যে দাবি করা হয় যে, তিনি হলেন সব চেয়ে বড় কবি সে দাবি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পার,—তিনি পুরোপুরি তা নন—কিন্তু শ্রব্যকাব্যের কবিদের মধ্যে না হলেও দৃশ্যকাব্যের কবিদের মধ্যে তিনি যে সর্বাগ্রগণ্য, সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এই পর্যন্ত তাহলে ইংরাজী কাব্যের আত্মা নাটকের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেছে, তার বেশি কখনো এগোতে পারেনি। এবং এটা প্রধানতঃ হয়েছে এই কারণে যে এটি নিজেই এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যসূত্রের প্রভাব বরণ করে নিয়েছিল; এ শুধু শেক্‌স্‌পীয়রীয় কাঠামোকেই ধরে থাকেনি, বরং সেই যুগের সমস্ত স্থূল অশৈল্পিক ত্রুটিগুলিকেও সে আঁকড়ে ধরেছিল। শুধু শেক্‌স্‌পীয়রীয় কাঠামোকে ধরে থাকলে বিশেষ ক্ষতি হ'ত না; কারণ এটাকে ঠিকভাবে একটু পরিমার্জিত করে নিলে এটা এখনো কোন-কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে, বিশেষ করে যেখানে গভীরতর প্রাণময় স্তরের চিন্তা বর্ণাঢ্য রোমান্টিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে সেখানে এটি প্রযুক্ত হতে পারে। যাই-হোক, মহাকবিরা, মহৎ অন্তর্মুখী শক্তিসম্পন্ন কবিরা, চারু-শিল্পীরা, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল ব্যক্তিরা গায়কেরা—সকলেই এঁরা সোজাসুজি নাটকীয় কাঠামোর দিকে ফিরেছেন, মারাত্মক-ভাবে বহির্মুখী হতে শুরু করেছেন; তাঁরা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছেন, নাট্যকারের ভঙ্গি করেছেন, তাঁরা ঘটনার উপরে জোর দিয়েছেন, এবং ভুলে গিয়েছেন যে, ঘটনার অন্তরে কিছু সম্ভাবনাও থাকা দরকার। নাটক হল জীবন, ঘটনা ও আবেগের বলিষ্ঠ উপস্থাপনা—এই ধারণার মধ্যে তাঁরা নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছেন। এবং যেহেতু এটা একটা সঠিক ধারণা নয়, এবং তা সঠিক ধারণা হোক বা না হোক, এটা যেহেতু তাঁদের প্রতিভার নিজস্ব প্রবণতার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায় না, সেহেতু তাঁদের ব্যর্থতা হয়েছে অপরিহার্য। ড্রাইডেন হোঁচট্‌ খেয়েছেন প্রচণ্ডভাবে তাঁর পদ্যবদ্ধ নাটক-গুলিতে। সকলের মধ্যে আবার ওয়ার্ডসওার্থ্‌—যিনি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে কম এলিজাবেথীয় ভাবাপন্ন,—তিনিও খুঁৎখুঁতে একঘেয়েমির সঙ্গে লিখেছেন 'বর্ডারার্স', বায়রন তাঁর আদিম শক্তিকে বাজে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও নিকৃষ্টতর নাটকীয় কাঠামোর মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন, কীটস্‌ তাঁর অসমাপ্ত 'হাইপারিয়ন্‌' ছেড়ে পাঠশালার দুষ্টু ছেলের মত এলিজাবেথীয় রীতির অনুকরণের দিকে ফিরেছেন, এমনকি শেলিও 'সেন্সি'র এলিজাবেথীয় প্রচণ্ডতাকে রূপ দিতে গিয়ে নাট্যকাব্যের জন্যে তাঁর নিজের একটি নতুন সুচারু সাহিত্যরূপের আবিষ্কারকে ভুলে গেছেন; টেনিসন্‌, সুইন্‌বার্ন—'আটালান্তা'র পরেও—সেই একই আলেয়ার পিছনে ছুটেছেন—মূঢ়তা ও ব্যর্থতার সেই আলেয়া। এসব ক্ষেত্রে এঁরা সকলেই নিশির ডাকের শিকার হয়েছেন। সাম্প্রতিককালে একটি নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে; কিন্তু নাটকীয় কাঠামোর নব-রূপায়ণের জন্যে এবং নাটকীয় মনোভঙ্গির যথাযথ ব্যবহারের জন্যে সঠিক অবস্থা পুরোপুরি এসেছে কিনা সেটা তখনো সন্দেহের বিষয়। সে যা-ই হোক, সেই নিয়তি-নির্দিষ্ট স্রষ্টা—যদি তাঁর আসবার কথা থাকে, তবে বলব—এখনো আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছান নি। [ক্রমশ]

অনুবাদক : **রামেশ্বর শ'**

শ্রীঅরবিন্দ

বৈশাখ—চৈত্র

১৩৮৩

বর্ণানুক্রমিক বাৎসরিক সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
অচিন পথের পাগল (কবিতা) ...	অমলেশ ভট্টচার্য	...	৮৯
অতিমানসের সাধনায় শ্রীঅরবিন্দ ...	(বেতার ভাষণ)	...	২৩৩
অপরূপ এক স্বপ্ন ...	চম্পকলাল	নীরদবরণ	২৫২
অরোরা (কবিতা) ...	অনির্বাণ	...	১৮৪
আত্ম-সমর্পণ ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২৩৫
আদর্শ মানব ঐক্য ..	শ্রীঅরবিন্দ	...	২২৮,২৫০,২৮৫,৩৫৫,৩৭৯
আদি লেখা ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৬৫
আন্তরিকতা কি ...	শ্রীমা	অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬১
আশ্রম প্রসঙ্গে নলিনীদার ঘরোয়া কথা		...	৩০১
উষাস্তোত্র ...	শ্রীঅরবিন্দ	...	মাঘ
ঊর্ধ্বায়ন ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	অণিমা মজুমদার	১২
একখানি চিঠি ...	শ্রীঅরবিন্দ	...	১৮
একটি অসমাপ্ত পত্র ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	..	৭৪
একটি জাপানী গল্প ..	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৪১
কেমনে পেলাম মায়ের চরণ ..	নির্মলা	...	৩৬২
কমলার মধ্যেও হরি আছেন (কবিতা)	জগদীশ চন্দ্র দাশ	...	৩৮৮
কোজাগরী (কবিতা)	বিহারীলাল	...	২৫৬
কাবেরী (কবিতা) ...	অনির্বাণ	...	১৪
কোন দেবতার প্রতিশ্রুতি (কবিতা) ...	অমলেশ ভট্টাচার্য	...	১৭
কাজরী (কবিতা) ...	অনির্বাণ	...	১১৭
গান (কবিতা) ...	রবি গুপ্ত	...	১৮৭
গোব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৩৭৩
জরৎকারু (কবিতা) ..	অনির্বাণ	...	২৯১
জননীর প্রসন্নতা (কবিতা) ...	পৃথ্বীসিং নাহার	...	২৯৩
জীবনের অন্য নাম নিয়ত প্রার্থনা (কবিতা) ...	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	১৭

বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
জাগিল জননী ...	শ্রীঅরবিন্দ ...		বৈশাখ
ত্রিযামা প্রহরে (কবিতা) ...	অমলেশ ভট্টাচার্য ..		২৯৪
দর্শন ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...		৩৩৭
দান্তের দিব্যদর্শন ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...		২১০
দুটি কবিতা ...	মীরা মুখোপাধ্যায় ...		২৩২
দেবতার তপস্যা (কবিতা) ...	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
দ্যৌ মে পিতা মাতা পৃথিবী ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...		৪১৭
দুঃখের দান ...	শ্রীমা ...		২৬
নিয়ন্তা (কবিতা) ...	শ্রীদিলীপকুমার রায় ...		২৫৫
নিখিলকে স্মরণ করে (কবিতা) ...	ইন্দুলেখা ...		২৬১
নিখিলদার দিনলিপি থেকে কয়েক পৃষ্ঠা		...	২৬২
নিখিলদা (সম্পাদকীয়) ...	অমলেশ ভট্টাচার্য ...		২৬৬
নির্বাণ (কবিতা) ...	নিশিকান্ত ...		৭
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...		১৭১
পণ্ডিচেরী তীর্থে ...	মণি বাগচী ...		১১৯
পত্রালোচনা ...	শতদল ...		৪২১
পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্স পরিক্রমা ...	সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ...		৫৯
পারের পারী (কবিতা) ...	শ্রীদিলীপকুমার রায় ...		৩৮৭
প্রকাশের বেদনা ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...		২৬৯
ফরাসী লেখা এক টুকরো ...	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২১২
ভাগবত লীলা (সাবিত্রী : পঞ্চ অঙ্ক)	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৫১
ভবিষ্যতের কবিতা ...	শ্রীঅরবিন্দ	রামেশ্বর শ'	৭৫,১১২,১৪১,১৭৭, ২২৩, ২৯৭, ৩৪৮,৩৮২,৪২৪
'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে আরো যৎকিঞ্চিৎ	অমলেশ ভট্টাচার্য ...		৩৯০
বলাকা মণ্ডলী ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...		৩৬
বেদের কবিতা ...	গৌরী ধর্মপাল ...		২৫৭, ২৮৮, ৩৫৭,
বেদের অনুবাদ ...	শ্রীঅরবিন্দ		৪০৯
মার্কসতন্ত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...		৯৩
মৃণালিনী দেবী ...	ইলা দেবী ...		৫৩
মারিয়ানা (ফরাসী নাটক) ...	অ্যালফ্রেড দ্য ম্যসে	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩১১
মায়ের মন্ত্র ...		শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩৩৮
মায়ের ঘরোয়া কথা ...	শ্রীমা ...		৬৯,১০৩, ১২৭,১৬১,৩৬৭, ২১৩, ২৪৫, ২৭৯, ৩৪৫, ৩৭৬, ৪১১, ৪১৫,

বিষয়		লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
মা (কবিতা)	...	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	..	১৪৫
মায়ের পণ্ডিচেরী আগমন		অমলেশ ভট্টাচার্য	...	১৮৬
মৃত্যুভয় (কবিতা)	...	শ্রীঅরবিন্দ	রণজিৎ সরকার	৮
মধুময়ী মা	...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২৭
যোগ-জীবন	...	শ্রীমা	অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়	৭২, ১০৫, ২৪৭, ২৮২
যেন একজন দেবতা হেঁটে যাচ্ছেন স্বর্গের রাস্তা দিয়ে (কবিতা)	...	জগদীশচন্দ্র দাশ	...	১৮৮
রামায়ণী শক্তি	...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	১২৫
শিশিরকে স্মরণ করে	...	নীরদবরণ	...	৩৬০
শ্রীঅরবিন্দের একটি ফরাসী কবিতা	...	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২১১
শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' সম্বন্ধে মায়ের কথা			শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৯৯
শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে (কবিতা)	...	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	...	২৩১
শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা	...	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩০৮
শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহাবশেষ সংস্থাপনা উৎসব	...	হিমাংশু নিয়োগী	...	৯১
শ্রীঅরবিন্দের অভিভাষণ	...	শ্রীঅরবিন্দ	হেনা চৌধুরী	১৩৯
শ্রীঅরবিন্দের যোগশিক্ষা	...	শ্রীঅরবিন্দ	অমলেশ ভট্টাচার্য	২৪
শ্রীনলিনীকান্ত সুভাষিত	...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৩১
শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ	...	অনির্বাণ	...	৫১
শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী	...	হিমাংশু নিয়োগী	...	৫৫
শ্রীঅরবিন্দায় (কবিতা)	...	শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	১৮৫
শ্রীঅরবিন্দের চিঠি	...	সাহানা দেবী	...	১১০
শতাব্দীর সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্'	...	অমলেশ ভট্টাচার্য	...	১৮৯
স্বর্ণ-শিশু (কবিতা)	...	নিশিকান্ত	...	৯
'সাবিত্রী' সম্বন্ধে পত্রাবলী	...	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮৫, ১০৬,
সামঞ্জস্যের কথা	...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২১৬
সাবিত্রী	...	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...	৮১,৯৮,১৩৩,১৬৬,২০৫, ২৩৮,২৭২,৩০৩,৩৪০ ৩৬৯, ৪১২
সার কথা (পুস্তক সমালোচনা)	...		...	১৫১

—রচনাবলী—

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র বাংলা রচনা-সংগ্রহ একত্রে আটখণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, যোগ, ইত্যাদি জীবনের মর্মসত্যের বাস্তব বিশ্লেষণে এবং শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের জীবন-সাধনার গভীর ভাব-অবগাহনে তা সিদ্ধ-স্নাত।

সুদৃশ্য মনোটাইপে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ডবল-ডিমাই সাইজের পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার প্রতিটি বৃহৎ খণ্ড রেক্সিন ও বোর্ড বাঁধাই, মুদ্রণ ও গ্রন্থণ পারিপাট্যে সৌন্দর্যে চিত্তাকর্ষক।

প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য—২৫·০০ টাকা।

সম্পূর্ণ রচনাবলীর গ্রন্থসূচী

সাহিত্য ও শিল্পকলা

প্রথম খণ্ড : ১। সাহিত্যিকা, ২। রূপ ও রস, ৩। আধুনিকী, ৪। শিক্ষা ও দীক্ষা, ৫। রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় খণ্ড : ১। শিল্পকথা, ২। কবির্মনীষী-১ম, ৩। কবির্মনীষী-২য়, ৪। কবির্মনীষী-৩য়

তৃতীয় খণ্ড : ১। বাংলার প্রাণ, ২। মৃতের কথোপকথন, ৩। গানের গান, ৪। ফরাসী যোড়শী, ৫। মারিয়ানা (ফরাসী নাটিকা), ৬। তিস্তাজিলের মৃত্যু (ফরাসী নাটিকা), ৭। অনুবাদমালা (কবিতা)

দেশ-সমাজ-রাজনীতি

চতুর্থ খণ্ড : ১। ভারত-রহস্য, ২। ভারতে হিন্দু ও মুসলমান, ৩। স্বরাজের পথে, ৪। স্বরাজ-গঠনের ধারা, ৫। শ্রীঅরবিন্দ ও বর্তমান যুদ্ধ, ৬। আদি লেখা

পঞ্চম খণ্ড : ১। ভাবীসমাজ, ২। বোলশেভিকি, ৩। নীট্‌শের বাণী, ৪। নারীর কথা, ৫। স্মৃতির পাতা-১ম, ৬। স্মৃতির পাতা-২য়

ধর্ম-সাধনা—জ্ঞান-বিজ্ঞান

ষষ্ঠ খণ্ড : ১। ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা, ২। বেদমন্ত্র, ৩। উপনিষদ—কথা ও কাহিনী, ৪। নব্যবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান

সপ্তম খণ্ড : ১। পূর্ণযোগ, ২। দেবজন্ম, ৩। সাধকের কথা, ৪। চেতনার অবতরণ, ৫। আলোর পথে-১ম, ৬। আলোর পথে-২য়, ৭। এ যুগের সাধনা, ৮। তিন কাহিনী, ৯। কালের আহ্বান

অষ্টম খণ্ড : ১। ভারতের নবজন্ম, ২। কর্মযোগী, ৩। মা, ৪। যোগসাধনার ভিত্তি, ৫। যোগের পথে আলো, ৬। চিন্তাকণা ও দৃষ্টিনিমেষ, ৭। চিন্তাবলী ও সূত্রাবলী (অষ্টম খণ্ডের এই প্রথম সাতখানি গ্রন্থ শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী রচনাবলী অনুবাদ) ৮। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী', ৯। শতাব্দীর প্রণাম

শৃণ্বন্তু ঃ ৬৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩। ফোন : ৩৪-১৩৫১
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮, শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০৭১। ফোন : ৪৪-৩০৫৭

THE COLLECTED WORKS
OF
NOLINI KANTA GUPTA

Volume One
Volume Two
Volume Three
Volume Four
Volume Five

VOLUME SIX IS IN PRESS

The collected works of SRI NOLINI KANTA GUPTA, shed a new light on the pressing problems of Man and his future. In the context of the present bewildering conditions of the world, they have a special relevance, and it is hoped that they will aid the modern man in his search of new hope for a new life of unity and harmony.

size : Double demy
pp : 406

Cloth Binding with attractive art-paper jacket.

Price Rs. 15·00 Each

Available at :

SRINVANTU
63, College Street
Calcutta-700073
34-1351

Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700012
34-2376

Published by : Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry-2

Ellora Chemical Industries

Manufacturers of
Plastic Solution, Rubber
Solution and all Kinds of
Thinner etc.
and Order Suppliers

20 A, Patuatola Lane
Calcutta-9

Phone : 34-3720

Ellora Enterprise

Please Contact
For
Art Paper
&
Art Board

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone : 34-3720

Even the profoundest and surest political instinct is not wisdom.

—Sri Aurobindo



Cargo Surveyors
Analytical Chemists
Gram : JUTASPECTA
Telex : NOPROB CA 2414
Phone : 240046/47

ESKAPS (INDIA) PRIVATE LTD
30, Chowringhee Road
Calcutta-700016

Smiles are a richer wealth than tears.

—Sri Aurobindo



The Hooghly Mills Co. Ltd.

MANUFACTURERS & EXPORTERS

10 Clive Row

Calcutta-1

Telegraphic Address
"VICTO" Calcutta

Telephone No
22-5451 (2 Lines)
Codes : Acme & Bentley's
Second Phrase

SRINVANTU PUBLICATIONS

সাবিত্রী—শ্রীঅরবিন্দ	...	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪·০০
মধুময়ী মা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২·০০
মধুময়ী মা (২য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২·০০
মধুময়ী মা (৩য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	২·০০
কবির্মনীষী (৩য় পর্যায়)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪·৫০
Light of Lights—Nolini Kanta Gupta	...	3 00
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	..	১·৫০
শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' উপাখ্যান—শ্রীমণিবিষ্ণু চৌধুরী	...	৩·৫০
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের সমগ্র রচনাবলী (৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ)	...	যন্ত্রস্থ
রচনাবলী : প্রথম খণ্ড : সাহিত্যিকা	...	২৫·০০
রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড : শিল্পকথা	...	২৫·০০
আলবার পদাবলী—শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	....	১০·০০
মায়ের অবতরণ কেন ?	...	·৫০

The National Tape Loom Co.

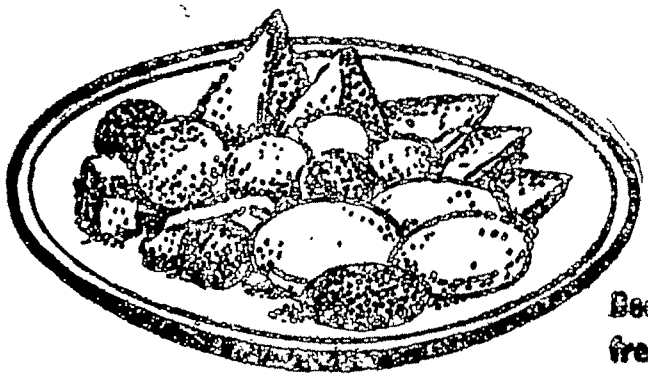
Manufacturers of SILK, COTTON & GLASS TAPES

7, LYONS RANGE
3rd Floor, Room No. 2
Calcutta-1

Phone : Office : 22-3718/5066

Telephone

VANASPATI COOKS A DELICIOUS MEAL— SO WHOLESOME TOO.



Because it's
fresh and pure
and enriched
with Vitamin A and D

Always ask for Telephone Vanaspati. People love its taste. It's a delicious cooking medium. So good for curries, fried foods, western and oriental cooking. It's economical and so pure. Always fresh, it's enriched with Vitamin A and D for extra goodness. Remember to ask for :

Telephone

VANASPATI



cooking medium that's wholesome.

A produce of Swaika Vanaspati Products Ltd.



মনে রাখবেন!

আর দেরি নয়
এখনই সঞ্চয়
করার সময়

আপনার নিশ্চিন্ত সুখের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে

ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট

১৫ বছর পরে
৪১,৮০০৲ টাকা পেতে হলে প্রতিমাসে
১০০৲ টাকা সঞ্চয় করুন
অথবা
২০ বছর পরে ৩৮,৩০০৲ টাকা পেতে হ'লে প্রতিমাসে
৫০৲ টাকা সঞ্চয় করুন।

॥ এই প্রকল্পের অন্যান্য সঞ্চয়-ব্যবস্থা নিচের তালিকায় পাবেন ॥

মাসিক সঞ্চয়	১০ বছর পরে পাবেন	১৫ বছর পরে পাবেন	২০ বছর পরে পাবেন	২৫ বছর পরে পাবেন
১০৲	২০৬৬৲	৪১৮০৲	৭৬৬০৲	১৩,৩৮০৲
২০৲	৪১৩২৲	৮৩৬০৲	১৫,৩২০৲	২৬,৭৬০৲
৫০৲	১০,৩৩০৲	২০,৯০০৲	৩৮,৩০০৲	৬৬,৯০০৲
১০০৲	২০,৬৬০৲	৪১,৮০০৲	৭৬,৬০০৲	১,৩৩,৮০০৲

এই প্রকল্পে আপনার সঞ্চয় দ্রুত হারে বেড়ে উঠবে!

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১
অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিস

Progressive- UIB-6/76

২৫ MAY 19

প্রচ্ছদপট মুদ্রক ॥ কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস ॥ কলিকাতা ৯